ভারতে বিবেকানন্দ

ভারতে বিবেকানন্দ

স্বামিজীর আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাঁহার
ভারতভ্রমণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, অভিনন্দন
ও তাহার উত্তর সমূহ, তাঁহার সমুদয়
ভারতীয় বক্তৃতার উৎকৃষ্ট অনুবাদ
প্রভৃতি

একাদশ সংস্করণ

পাঁচ টাকা

7/14 (৩)

ভারতে বিবেকানন্দ

সিংহল

স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপ ও আমেরিকায় সাড়ে তিন বৎসর বেদান্ত প্রচারের পর দেশে প্রত্যাগমন করেন, ১৫ই জানুয়ারী ১৮৯৭ সালে। তিনি নর্থ জার্ম্মান লয়েড লাইনের 'প্রিন্স রিজেণ্ট 'লিওপোল্ড' নামক জাহাজে করিয়া সিংহলের অন্তর্গত কলম্বোয় পঁহুছিলেন। তাঁহার সঙ্গে দুইটি সাহেব ও একটি মেম। সাহেবদ্বয়ের নাম কাপ্তেন সেভিয়ার ও মিষ্টার গুড্উইন। মেমটি পূর্ব্বোক্ত কাপ্তেনের সহধর্ম্মিণী। সেভিয়ার-দম্পতি ইতঃপূর্ব্বে কার্য্যোপলক্ষে ভারতে আসিয়াছিলেন ও অনেকদিন বাসও করিয়াছিলেন। উভয়েই বৃদ্ধ; সন্তান-সন্ততি নাই। ইংলণ্ডে স্বামিজীর বক্তৃতা শুনিয়া বেদান্তের অদ্বৈতবাদকেই আপনাদের ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইচ্ছা—ভারতের কোন নিভৃত প্রদেশে একটি আশ্রম স্থাপন করিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল তথায় অতিবাহিত করিবেন এবং অদ্বৈতবাদ প্রচারে 'তন্ মন ধন' সব নিয়োগ করিবেন। তাঁহাদের বাসনা সফল হইয়াছে। হিমালয়ের অন্তর্গত আলমোড়ার নিকটবর্ত্তী মায়াবতী নামক স্থানে অদ্বৈত-আশ্রম, ইঁহাদেরই অর্থানুকূল্যে স্থাপিত হইয়াছে।

মিষ্টার গুড্উইন যুবা, অনায়িক, ঘোর কর্ম্মনিষ্ঠ। তিনি একজন বিখ্যাত সাঙ্কেতিক-লেখনবিৎ (Stenographer)। যখন স্বামিজী আমেরিকায় বক্তৃতা করিতেছিলেন, তাঁহার বক্তৃতা রিপোর্ট করিবার জন্য এরূপ এক ব্যক্তির প্রয়োজন হওয়াতে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। ইনি প্রথম বেতন লইয়া কর্ম্মে নিযুক্ত হন, পরে স্বামিজীর গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তদবধি সর্ব্বদা তাঁহার সহিত ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার জন্যই স্বামিজীর বক্তৃতাগুলি সাধারণে পড়িতে পাইতেছেন। দুঃখের বিষয়, ভারত-প্রবাসের অল্প দিন পরই উতকামন্দে তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

কলম্বোর হিন্দুসমাজ স্বামিজীর অভ্যর্থনার জন্য একটি অভ্যর্থনা-সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। তাহার দুইজন সভ্য স্বামিজীর জনৈক গুরুভাই এবং হ্যারিসন নামক কলম্বোবাসী জনৈক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সাহেব জাহাজে উঠিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহাকে তীরে লইয়া যাইবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই একখানি ষ্টীম লঞ্চ প্রস্তুত ছিল। যখন ষ্টীম লঞ্চে করিয়া স্বামিজী কিনারায় পঁহুছিলেন, তখন দেখা গেল—সহস্র সহস্র হিন্দুর ভিড়, সকলেই স্বামিজীর অভ্যর্থনার্থ সমবেত। তথা হইতে তাঁহাকে একখানি গাড়ী করিয়া বার্ণেস ষ্ট্রীট নামক রাস্তায় তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য নির্দ্দিষ্ট বাঙ্গলায় লইয়া যাওয়া হইল। এই রাস্তাটি কলম্বোর প্রান্তভাগে অবস্থিত—কলম্বোয় যে দারুচিনির বিখ্যাত বাগান আছে, তথা হইতে সিকি মাইল। এই রাস্তার যেখানে আরম্ভ, সেইখানে একটি বৃহৎ তোরণ নির্ম্মিত হইয়া নারিকেল বৃক্ষের শাখা,

পত্র ও পুষ্পের দ্বারা 'Welcome' (স্বাগতম্) লিখিত হইয়াছিল। ঐ রাস্তা হইতে বাঙ্গলা পর্য্যন্ত তালপত্র দ্বারা শোভিত হইয়াছিল। বাঙ্গলার প্রবেশমুখে আর একটি ঐরূপ অর্দ্ধচন্দ্রাকার তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই বাঙ্গলায় বহু হিন্দুর সমক্ষে সিংহলের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মাননীয় কুমার স্বামী মহাশয় একটি অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিলেন।

এই অভিনন্দন-পত্রের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, সিংহলবাসীরা যে স্বামিজীর ভারত-প্রত্যাবর্ত্তনের পর সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার সুযোগ পাইলেন, তাহাতে 'আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিতেছেন এবং তাঁহার পাশ্চাত্যদেশবাসিগণের সমক্ষে সার্ব্বভৌম হিন্দুধর্ম্মের ভাব-প্রচার কার্য্যে পরম আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। সন্ধ্যা হইয়া যাওয়াতে স্বামিজী অভিনন্দন পত্রের বিস্তারিত উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি সংক্ষেপে বলিলেন—"আপনাদের অভিনন্দনে আমি পরম আনন্দিত। তবে আমি এই অভিনন্দনকে আমার ব্যক্তিগত কার্য্যের জন্য প্রশংসা মনে করি না। এই অভিনন্দনে ইহাই সূচিত হইতেছে যে, "হিন্দুগণ ধর্ম্মকেই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু বলিয়া মনে করেন। আপনারা এক্ষেত্রে কোন বিখ্যাত রাজপুরুষ, যোদ্ধা অথবা ধনীর অভিনন্দন করিতেছেন না। একজন ভিক্ষুক-সন্ন্যাসীর জন্য এই সকল আয়োজন। ইহাতে কি বুঝিতেছেন না যে, হিন্দুর মতি গতি কোন্ দিকে? যদি হিন্দুজাতি জীবিত থাকিতে চায়, তবে এই ধর্ম্মকেই তাহার জাতীয় মেরুদণ্ডস্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে।"

পরদিন শনিবার ঐ বাঙ্গলায় স্বামিজীকে দর্শন করিবার জন্য ধনী দরিদ্র নানাবিধ লোকের সমাগম হইতে লাগিল। তিনিও ধনিদরিদ্রনির্ব্বিশেষে সকলকে যথোচিত সম্ভাষণ ও সকলের প্রশ্নের যথোচিত উত্তর দিতে লাগিলেন। একটি দরিদ্রা রমণীর স্বামী সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি ফল-মূল উপহার হস্তে স্বামিজীর নিকট উপস্থিত হইয়া স্বামিজীকে ঈশ্বর লাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামিজী তাঁহাকে ভগবদ্গীতা পাঠ এবং গৃহস্থের কর্ত্তব্য যথোচিত পালন করিতে উপদেশ দিলেন। রমণী বলিলেন, "গীতা না হয় পড়িলাম, কিন্তু যদি সত্য উপলব্ধি করিতে না পারিলাম, তবে কি হইল?" উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে আগত জনৈক দরিদ্র-ভক্ত একদিন স্বামিজীকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতোষপূর্ব্বক খাওয়াইলেন। কিন্তু স্বামিজী এবং তাঁহার সঙ্গিগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি স্বামিজীর সম্মুখে আসন পরিগ্রহ করিলেন না; স্বামিজী যতক্ষণ রহিলেন, তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্বামিজীর পাশ্চাত্য শিষ্যগণ দরিদ্র হিন্দুগণেরও ঈশ্বর-উপলব্ধি করিবার প্রবল আগ্রহ ও সাধু-ভক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইতে লাগিলেন। স্বামিজীর সম্মানার্থ এই বাঙ্গলার নাম 'বিবেকানন্দ-মন্দির' হইল।

শনিবার অপরাহ্ণে 'ফ্লোরাল হল' নামক স্থানে স্বামিজী একটি বক্তৃতা করিলেন। এত শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল যে, হলে তিলার্দ্ধ স্থান ছিল না। প্রাচ্যভূমে আসিয়া ইহাই স্বামিজীর প্রথম বক্তৃতা।

কলম্বোয় স্বামিজীর বক্তৃতা

যে সামান্য কার্য্য আমার দ্বারা হইয়াছে, তাহা আমার নিজের কোন অন্তর্নিহিত শক্তিবলে হয় নাই; পাশ্চাত্যদেশে পর্য্যটনকালে এই পরম-পবিত্র আমার প্রিয় মাতৃভূমি হইতে যে উৎসাহবাক্য, যে শুভেচ্ছা, যে আশীর্ব্বাণী লাভ করিয়াছি. উহা সেই শক্তিতেই হইয়াছে। অবশ্য কিছু কাজ হইয়াছে বটে, কিন্তু এই পাশ্চাত্যদেশ-ভ্রমণে বিশেষ উপকার হইয়াছে আমার; কারণ, পূর্ব্বে যাহা হয়ত হৃদয়ের আবেগে বিশ্বাস করিতাম, এখন সে বিষয় আমার পক্ষে প্রমাণসিদ্ধ সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে সকল হিন্দুর মত আমিও বিশ্বাস করিতাম—ভারত পুণ্যভূমি—কর্ম্মভূমি। মাননীয় সভাপতি মহাশয়ও তাহা বলিয়াছেন—আজ আমি এই সভার সমক্ষে দাঁড়াইয়া দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি—ইহা সত্য সত্য! অতি সত্য! যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে, যাহাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে—যদি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে পৃথিবীর সকল জীবকেই তাহার কর্ম্মফল ভুগিতে আসিতে হইবে—যদি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে ভগবল্লাভাকাঙ্ক্ষী জীব-মাত্রকেই পরিণামে আসিতে হইবে—যদি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে মনুষ্যজাতির ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষান্তি ধৃতি দয়া শৌচ প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিকাশ হইয়াছে—যদি এমন কোন দেশ থাকে, যেখানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে—তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, তাহা আমাদের

'পুণ্যভূমি' ভারত

মাতৃভূমি—এই ভারতভূমি। অতি প্রাচীনকাল হইতেই এখানে বিভিন্ন ধর্ম্মের সংস্থাপকগণ আবির্ভূত হইয়া সমগ্র জগৎকে বারংবার সনাতন ধর্ম্মের পবিত্র আধ্যাত্মিক বন্যায় ভাসাইয়াছেন। এখান হইতেই উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সর্ব্বত্র দার্শনিক জ্ঞানের প্রবল তরঙ্গ বিস্তৃত হইয়াছে। আবার এখান হইতেই তরঙ্গ ছুটিয়া সমগ্র জগতের ইহলোকসর্ব্বস্ব সভ্যতাকে আধ্যাত্মিক জীবন প্রদান করিবে। অপরদেশীয় লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়দগ্ধকারী জড়বাদ-রূপ অনল নির্ব্বাণ করিতে যে অমৃতসলিলের প্রয়োজন, তাহা এখানেই বর্ত্তমান। বন্ধুগণ, বিশ্বাস করুন, ভারতই জগৎকে আধ্যাত্মিক তরঙ্গে ভাসাইবে।

'নিরীহ' হিন্দু

আমি সমগ্র জগতে ভ্রমণ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা বিভিন্ন জাতির ইতিহাস মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাও এ বিষয় বিশেষরূপ অবগত আছেন। যদি বিভিন্ন দেশের মধ্যে পরস্পর তুলনা করা যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে, এই সহিষ্ণু নিরীহ হিন্দুজাতির নিকট জগৎ যতদূর ঋণী, আর কোন জাতিরই নিকট ততদূর নহে। 'নিরীহ হিন্দু' কথাটি সময়ে সময়ে তিরস্কারবাক্যরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে; কিন্তু যদি কোন তিরস্কারবাক্যের মধ্যে গভীর সত্য লুক্কায়িত থাকে, তবে তাহা উহাতেই আছে। হিন্দুগণ চিরকালই জগৎপিতার প্রিয়সন্তান। জগতের অন্যান্য স্থানে সভ্যতার বিকাশ হইয়াছে সত্য; প্রাচীনকালে ও বর্ত্তমানকালে অনেক শক্তিশালী বড় বড় জাতি হইতে উচ্চ উচ্চ ভাব বাহির হইয়াছে সত্য;

প্রাচীনকালে ও বর্ত্তমানকালে অদ্ভুত অদ্ভুত তত্ত্ব এক জাতি হইতে অপর জাতিতে প্রচারিত হইয়াছে সত্য; প্রাচীনকালে ও বর্ত্তমান-কালে কোন কোন জাতীয়-জীবন-তরঙ্গ প্রসারিত হইয়া চতুর্দ্দিকে মহাশক্তিশালী সত্যের বীজসমূহ ছড়াইয়াছে সত্য; কিন্তু বন্ধুগণ, ইহাও দেখিবেন, ঐ সকল সত্য-প্রচার, রণভেরীর নির্ঘোষ ও রণসাজে সজ্জিত গর্ব্বিত সেনাকুলের পদবিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই হইয়াছিল—রক্তরঞ্জিত না করিয়া, লক্ষ লক্ষ নরনারীর অজস্র রুধিরস্রোত না বহাইয়া কোন জাতিই অপর জাতিকে নূতন ভাব প্রদান করিতে অগ্রসর হইতে পারে নাই। প্রত্যেক ওজস্বী ভাব-প্রচারের পশ্চাতেই অসংখ্য লোকের হাহাকার, অনাথের ক্রন্দন ও বিধবার অশ্রুপাত লক্ষিত হইয়াছিল।

প্রধানতঃ এই উপায়েই অপর জাতিসকল জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন—কিন্তু ভারত ঐ উপায় অবলম্বন না করিয়াও সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া জীবিত রহিয়াছে। যখন গ্রীসের অস্তিত্বই ছিল না, রোম যখন ভবিষ্যতের অন্ধকার-গর্ভে লুক্কায়িত ছিল যখন আধুনিক ইউরোপীয়গণের পূর্ব্বপুরুষেরা জার্ম্মানির গভীর অরণ্য-মধ্যে অসভ্য অবস্থায় থাকিয়া নীলবর্ণে আপনাদিগকে অনুরঞ্জিত করিত, তখনও ভারতের ক্রিয়াশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আরও প্রাচীনকালে—ইতিহাস যাহার কোন খবর রাখে না, কিংবদন্তীও যে সুদূর অতীতের ঘনান্ধকারের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সাহস করে না, সেই অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত ভাবের পর ভাব-তরঙ্গ ভারত হইতে প্রসৃত হইয়াছে, কিন্তু উহার প্রত্যেকটিই সম্মুখে শান্তি ও পশ্চাতে আশীর্ব্বাণী

লইয়া অগ্রসর হইয়াছে। জগতের সকল জাতির মধ্যে আমরাই কখন অপর জাতিকে যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা জয় করি নাই, সেই শুভ কর্ম্মফলেই আমরা এখনও জীবিত। এমন সময় ছিল, যখন প্রবল গ্রীকবাহিনীর বীরদর্পে বসুন্ধরা কম্পিত হইত। এখন তাহারা কোথায়? তাহাদের এখন চিহ্নমাত্রও নাই। গ্রীসদেশের গৌরবরবি আজ অস্তমিত! এমন সময় ছিল, যখন রোমের শ্যেনাঙ্কিত বিজয়পতাকা জগতের বাঞ্ছিত সমস্ত ভোগ্য-পদার্থের উপরেই উড্ডীয়মান ছিল। রোম সর্ব্বত্রই যাইত ও মানবজাতির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিত। রোমের নামে ধরা কাঁপিত। আজ ক্যাপিটোলাইন-গিরি* ভগ্নস্তূপ মাত্রে পর্য্যবসিত। যেখানে সীজারগণ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করিতেন সেখানে আজ ঊর্ণনাভ তন্তু রচনা করিতেছে! অপরাপর অনেক জাতি এইরূপ উঠিয়াছে, আবার পড়িয়াছে; মদগর্ব্বে স্ফীত হইয়া প্রভুত্ব বিস্তারপূর্ব্বক স্বল্পকালমাত্র পরপীড়াকলুষিত জাতীয়-জীবন অতিবাহিত করিয়া জলবুদ্বুদের ন্যায় বিলীন হইয়াছে।

ধর্ম্মপ্রাণতা ভারতের জীবনের চির-স্থায়িত্বের ও তদভাব অন্যান্য জাতির ক্ষণ-স্থায়িত্বের কারণ

এইরূপেই এই সকল জাতি মনুষ্যসমাজে আপনাদের চিহ্ন এককালে অঙ্কিত করিয়া এখন তিরোহিত হইয়াছে। আপনারা কিন্তু এখনও জীবিত, আর আজ যদি মনু এই ভারতভূমিতে পুনরাগমন করেন, তিনি এখানে আসিয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য

* Capitoline Hill,—রোম নগরে সাতটি পর্ব্বতের উপর নির্ম্মিত ছিল। তন্মধ্যে যেটির উপর রোমকদিগের কুলদেবতা জুপিটারের সুবৃহৎ মন্দির ছিল, তাহার নাম ক্যাপিটোলাইন গিরি। জুপিটার দেবের মন্দিরের নাম ক্যাপিটল; তাহা হইতে পাহাড়টির নাম হইয়াছে।

হইবেন না; তিনি—কোন্ অপরিচিত স্থানে আসিয়া পড়িলাম—বলিয়া মনে করিবেন না! সহস্র সহস্র বর্ষব্যাপী চিন্তা ও পরীক্ষার ফলস্বরূপ সেই প্রাচীন বিধান সকল এখানে এখনও বর্ত্তমান; সনাতনকল্প, শত শত শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ সেই সকল আচার এখানে এখনও বর্ত্তমান। যতই দিন যাইতেছে, ততই দুঃখ-দুর্ব্বিপাক তাহাদের উপর আঘাতের পর আঘাত করিতেছে, তাহাতে এই একমাত্র ফল হইতেছে যে, সেগুলি আরও দৃঢ়, আরও স্থায়ী আকার ধারণ করিতেছে। ঐ সকল আচার ও বিধানের কেন্দ্র কোথায়, কোন্ হৃদয় হইতে শোণিত সঞ্চালিত হইয়া উহাদিগকে পুষ্ট রাখিতেছে, আমাদের জাতীয়-জীবনের মূল প্রস্রবণই বা কোথায়—ইহা যদি জানিতে চান, তবে বিশ্বাস করুন, তাহা এখানেই বর্ত্তমান। সমগ্র জগৎ ঘুরিয়া আমি যে যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছি।

অন্যান্য জাতির পক্ষে ধর্ম্ম—সংসারের অন্যান্য কার্য্যের ন্যায় একটা কাজ মাত্র। রাজনীতিচর্চ্চা আছে, সামাজিকতা আছে, ধন এবং প্রভুত্বের দ্বারা যাহা পাওয়া যায়, ইন্দ্রিয়নিচয় যাহাতে আনন্দ অনুভব করে, সেই সকলের চেষ্টা আছে। এই সব নানা কার্য্যের ভিতর এবং ভোগে নিস্তেজ ইন্দ্রিয়গ্রাম কিসে একটু উত্তেজিত হইবে—সেই চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে, একটু আধটু ধর্ম্মকর্ম্মও করা আছে। এখানে—এই ভারতে কিন্তু মানুষের সমস্ত চেষ্টা ধর্ম্মের জন্য—ধর্ম্মলাভই তাহার জীবনের একমাত্র কার্য্য; চীন-জাপান যুদ্ধ হইয়া

ধর্ম্মই ভারতের মুখ্য সম্বল, অন্যান্য দেশের তদ্রূপ রাজনীতি বা সমাজনীতি

গিয়াছে, আপনাদের মধ্যে কয়জন তাহা জানেন? পাশ্চাত্য সমাজে যে সকল নানাবিধ গুরুতর রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন সংঘটিত হইয়া উহাকে সম্পূর্ণ নূতন আকার দিবার চেষ্টা করিতেছে, আপনাদের মধ্যে কয়জন তাহার সংবাদ রাখেন? যদি রাখেন, দুই চারি জন মাত্র। কিন্তু আমেরিকায় এক বিরাট ধর্ম্মসভা বসিয়াছিল এবং তথায় একজন হিন্দু সন্ন্যাসী প্রেরিত হইয়াছিলেন, কি আশ্চর্য্য দেখিতেছি, এখানকার সামান্য মুটে-মজুরেও তাহা জানে! ইহাতে বুঝা যাইতেছে, কোন্ দিকে হাওয়া বহিতেছে, জাতীয়-জীবনের মূল কোথায়। দেশীয়, বিশেষতঃ বিদেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গকে প্রাচ্য জনসাধারণের অজ্ঞতার গভীরতায় শোকপ্রকাশ করিতে পূর্ব্বে পূর্ব্বে শুনিতাম, আর এক নিঃশ্বাসে ভূপ্রদক্ষিণকারী পর্য্যটকগণের পুস্তকে ঐ বিষয় পড়িতাম। এখন আমি বুঝিতেছি, তাঁহাদের কথা সত্যও বটে, আবার অসত্যও বটে। ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রাঁস, জার্ম্মানি বা যে কোন দেশের একজন চাষাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করুন, তুমি কোন্ রাজনৈতিক দলভুক্ত? সে আপনাকে বলিয়া দিবে, সে উদারনৈতিক অথবা রক্ষণশীলদলভুক্ত, সে কাহার জন্যই বা ভোট দিবে। আমেরিকার চাষা জানে, সে রিপাবলিকান্ বা ডেমোক্রাট্ সম্প্রদায়ভুক্ত।* সে এমন কি, রৌপ্য-সমস্যা† সম্বন্ধেও কিছু

* আমেরিকার যুক্তরাজ্যের দুইটি প্রবল রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের নাম। প্রথমোক্ত সম্প্রদায় কেন্দ্রীভূত শাসনপ্রণালী ও আমদানীর উপর শুল্ক বসাইবার বিশেষ পক্ষপাতী। শেষোক্তেরা কেন্দ্রীভূত শাসনতন্ত্রের ক্ষমতাসঙ্কোচে বিশেষ প্রয়াসী ও অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী।

† রৌপ্যসমস্যা—Silver question,– ব্যবসায়বাণিজ্যের ন্যূনাধিক্য, নূতন

অবগত আছে। কিন্তু তাহার ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন সে বলিবে, আমি আর কিছু জানি না, গির্জ্জায় গিয়া থাকি মাত্র! বড় জোর সে বলিবে, আমার পিতা খৃষ্টধর্ম্মের অমুক শাখাভুক্ত ছিলেন। সে জানে, গির্জ্জায় যাওয়াই ধর্ম্মের চূড়ান্ত।

অপর দিকে আবার একজন ভারতীয় কৃষককে জিজ্ঞাসা করুন, সে রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু জানে কি না; সে আপনার প্রশ্নে বিস্মিত হইয়া 'হাঁ' করিয়া থাকিবে! সে বলিবে, সে আবার কি? সে সোসিয়ালিজ্‌ম্* প্রভৃতি সামাজিক আন্দোলন সম্বন্ধে,

---

খনির আবিষ্কার প্রভৃতি নানা কারণে ভিন্ন ভিন্ন দেশে রৌপ্য ধাতুর পরিমাণ অল্পাধিক হইয়া থাকে। ইউরোপে এইরূপে প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক রৌপ্য জমিয়া গিয়াছে। কাজেই সেখানে রৌপ্যের দর পূর্ব্বাপেক্ষা কম হইয়াছে; অর্থাৎ যে পরিমাণ রৌপ্যে যে পরিমাণ দ্রব্যবিশেষ পূর্ব্বে পাওয়া যাইত, সে পরিমাণ আর এখন পাওয়া যায় না। ইউরোপের সহিত যে সকল অপরাপর দেশের বানিজ্যসম্বন্ধ আছে, অথবা যে সকল স্থান তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হইয়াছে, ঐ সকলে কিন্তু রৌপ্যের দর ঐরূপে কম না হওয়ায় দ্রব্য এবং মুদ্রাদি বিনিময়ের সময় রৌপ্যের দর লইয়া বিশেষ গোল বাধে। উহাতে ভারত এবং অপরাপর দেশকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। সেই গোল মিটাইবার জন্য সকল ইউরোপীয় জাতি মিলিয়া এখন স্বর্ণমুদ্রাবিশেষের একটি নির্দ্দিষ্ট দর স্থির করিয়া দেওয়ায় ঐ বিবাদের জটিলতা আজকাল কিছু কমিয়াছে। ইহাকেই রৌপ্যসমস্যা বা Silver question কহে।

* সোসিয়ালিজ্‌ম্— Socialism, পাশ্চাত্যদেশের একটি প্রবল সম্প্রদায়ের মত। এই সম্প্রদায় অল্পবিত্ত শ্রমজীবীর দ্বারাই গঠিত। ইহারা বলে, মুলধনী ও শ্রমজীবী উভয়েরই ব্যবসায়ে লাভের অংশ সমান থাকা উচিত। অন্ততঃ এক্ষণে যেরূপ ঘোর পার্থক্য আছে, তাহা যাহাতে কমিয়া গিয়া শ্রমজীবীরা পূর্ব্বাপেক্ষা লাভের অংশ অধিক পায়, এইরূপ নিয়ম হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্যে পুস্তিকা-প্রচার, বক্তৃতা প্রভৃতি দ্বারা এই সম্প্রদায় শ্রমজীবীদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করাইয়া ধর্ম্মঘট প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা তাহাদের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করিয়া কতক পরিমানে কৃতকার্য্য হইয়াছে। এবং ধর্ম্মঘট করিবার সময় যাহাতে তাহাদের পরিবারবর্গের আহারাদির কষ্ট না হয়, সেইজন্য চাঁদা তুলিয়া

পরিশ্রম ও মূলধনের সম্বন্ধ বিষয়ে এবং এতদ্রূপ অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সে জীবনে কখন এ সকল বিষয় সম্বন্ধে শুনে নাই। সে কঠোর পরিশ্রম করিয়া জীবিকার্জ্জন করে; রাজনীতি বা সমাজনীতির সে এইটুকুমাত্র বুঝে। তাহাকে কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তোমার ধর্ম্ম কি ?—সে আপনার কপালের তিলক দেখাইয়া বলিবে, আমি এই সম্প্রদায়ভুক্ত। ধর্ম্মবিষয়ে প্রশ্ন করিলে তাহার মুখ হইতে এমন দুই একটি কথা বাহির হইবে, যাহাতে আমরাও উপকৃত হইতে পারি। আমি ইহা নিজ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি। এই ধর্ম্মই আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি।

প্রত্যেক ব্যক্তিরই একটা না একটা বিশেষত্ব আছে, প্রত্যেক ব্যক্তিই বিভিন্ন পথে উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। আমরা হিন্দু,— আমরা বলি, অনন্ত পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে মানুষের জীবন একটি বিশেষ নির্দ্দিষ্ট পথে চালিয়া থাকে; কারণ, অনন্ত অতীতকালের কর্ম্মসমষ্টিই বর্ত্তমান আকারে প্রকাশ পায়; আর আমরা বর্ত্তমানে যেরূপ ব্যবহার করি, তদনুসারেই আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হইয়া থাকে। এই কারণেই দেখা যায়, এই পৃথিবীতে জাত প্রত্যেক ব্যক্তিরই একদিকে না একদিকে বিশেষ ঝোঁক থাকে; সেই পথে তাহাকে যেন চলিতেই হইবে; সেই ভাব অবলম্বন ব্যতীত সে বাঁচিতে পারিবে না। ব্যক্তি সম্বন্ধে যেমন, ব্যক্তির

ফণ্ড প্রভৃতি করিয়াছে ও নিত্য করিতেছে। পাশ্চাত্যদেশের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিও ইহাদের প্রার্থনা ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিয়া ইহাদের সহিত সহানুভূতি করিয়া থাকেন।

সমষ্টি জাতি সম্বন্ধেও ঠিক তাই। প্রত্যেক জাতির একটা না একটা যেন বিশেষ ঝোঁক থাকে। প্রত্যেক জাতিরই যেন বিশেষ বিশেষ জীবনোদ্দেশ্য থাকে। প্রত্যেক জাতিকেই যেন সমগ্র মানবজাতির জীবনকে সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ করিবার জন্য কোন এক ব্রতবিশেষ পালন করিতে হয়। নিজ নিজ জীবনোদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিয়া প্রত্যেক জাতিকেই সেই সেই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয়। রাজনৈতিক বা সামরিক শ্রেষ্ঠতা কোন কালে আমাদের জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য নহে—কখন ছিলও না, আর জানিয়া রাখুন, কখনও হইবেও না। তবে আমাদের অন্য জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য আছে। তাহা এই,—সমগ্র জাতির আধ্যাত্মিক শক্তি একত্রীভূত করিয়া যেন এক বিদ্যুতাধারে রক্ষা করা এবং যখনই সুযোগ উপস্থিত হয়, তখনই এই সমষ্টিভূত শক্তির বন্যায় সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করা। যখনই পারসীক, গ্রীক, রোমক, আরব বা ইংরাজেরা তাহাদের অজেয় বাহিনীযোগে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বিভিন্ন জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছে, তখনই ভারতের দর্শন ও অধ্যাত্মবিদ্যা এই সকল নূতন পথের মধ্য দিয়া জগতে বিভিন্ন জাতির শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে। সমগ্র মনুষ্যজাতির উন্নতিকল্পে শান্তিপ্রিয় হিন্দুরও কিছু দিবার আছে—আধ্যাত্মিক আলোকই জগৎকে ভারতের দান।

জগৎকে ভারতও কিছু দিতে পারে—ধর্ম্ম

এইরূপে অতীতের ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা দেখিতে পাই, যখনই কোন প্রবল দিগ্বিজয়ী জাতি পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছে, ভারতের সহিত অন্যান্য দেশের,

অন্যান্য জাতির সম্মেলন ঘটাইয়াছে, চিরস্বাতন্ত্র্যপ্রিয় ভারতের যখনই স্বাতন্ত্র্য ভঙ্গ করিয়াছে—যখনই এই ব্যাপার ঘটিয়াছে, তখনই তাহার ফলস্বরূপ সমগ্র জগতে ভারতীয় আধ্যাত্মিক তরঙ্গের বন্যা ছুটিয়াছে। বর্ত্তমান (ঊনবিংশ) শতাব্দীর প্রারম্ভে বিখ্যাত জার্ম্মান দার্শনিক শোপেনহাউয়ার বেদের এক প্রাচীন অনুবাদ হইতে জনৈক ফরাসী যুবক কৃত অস্পষ্ট লাটিন অনুবাদ পাঠ করিয়া বলিয়াছেন, "ঔপনেখতের (উপনিষদের পারস্য অনুবাদের নাম) মূল ব্যতীত উহা অপেক্ষা জগতে হৃদয়ের উন্নতিবিধায়ক আর কোন গ্রন্থ নাই। জীবদ্দশায় উহা আমাকে শান্তি দিয়াছে, মৃত্যুকালেও উহাই আমায় শান্তি দিবে।"* তৎপরে সেই বিখ্যাত জার্ম্মান ঋষি ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন যে, "গ্রীক সাহিত্যের পুনরভ্যুদয়ে জগতের চিন্তা-প্রণালীতে যেরূপ গুরুতর পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, শীঘ্রই তদপেক্ষা শক্তিশালী ও বহুস্থানব্যাপী ভাববিপর্য্যয় ঘটিবে।" আজ তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইতেছে। যাঁহারা চক্ষু খুলিয়া আছেন, যাঁহারা পাশ্চাত্য জগতের বিভিন্ন জাতির মনের গতি বুঝেন, যাঁহারা চিন্তাশীল

পাশ্চাত্যজগতে উপনিষদ্-প্রচার

---

* মোগল সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারাসেকো পারস্য ভাষায় উপনিষদের অনুবাদ করান। ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই অনুবাদকার্য্য সমাপ্ত হয়। সুজাউদ্দৌল্লার রাজসভাস্থ ফরাসী রেসিডেণ্ট জেণ্টিল সাহেব বর্ণিয়ার সাহেবের দ্বারা এই পারস্য অনুবাদ আকেতিল ডুপেরো নামক বিখ্যাত পর্য্যটক ও জেন্দাবেস্তার আবিষ্কর্ত্তাকে পাঠাইয়া দেন। তিনি উহার লাটিন অনুবাদ করেন। বিখ্যাত জার্ম্মান দার্শনিক শোপেনহাউয়ার এই লাটিন অনুবাদ পাঠ করিয়া বিশেষরূপ আকৃষ্ট হন। শোপেনহাউয়ারের দর্শন এই উপনিষদের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত। এইরূপে ইউরোপে উপনিষদের ভাব প্রথম প্রবেশ করে।

এবং বিভিন্ন জাতি সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করেন, তাঁহারা দেখিবেন, ভারতীয় চিন্তার এই ধীর, অবিরাম প্রবাহের দ্বারা জগতের ভাবগতি, চালচলন এবং সাহিত্যের কি গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। তবে ভারতীয় প্রচারের একটি বিশেষত্ব আছে। আমি সে সম্বন্ধে আপনাদিগকে পূর্ব্বেই কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি। আমরা কখন বন্দুক ও তরবারির সাহায্যে কোন ভাব প্রচার করি নাই। যদি ইংরাজী ভাষায় কোন শব্দ থাকে, যাহা দ্বারা জগতের নিকট ভারতের দান প্রকাশ করা যাইতে পারে—যদি ইংরাজী ভাষায় এমন কোন শব্দ থাকে, যদ্দ্বারা মানবজাতির উপর ভারতীয় সাহিত্যের প্রভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে—তাহা এই—Fascination (সম্মোহনী শক্তি)। হঠাৎ যাহা মানুষকে মুগ্ধ করে, ইহা সেরূপ কিছু নহে—বরং ঠিক তাহার বিপরীত; উহা ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে মানবমনে তাহার প্রভাব বিস্তার করে। অনেকের পক্ষে ভারতীয় চিন্তা, ভারতীয় প্রথা, ভারতীয় আচার-ব্যবহার, ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় সাহিত্য প্রথম দৃষ্টিতে বিসদৃশ বোধ হয়। কিন্তু যদি তাহারা অধ্যবসায় সহকারে আলোচনা করে, মনোযোগ সহকারে ভারতীয় গ্রন্থরাশি অধ্যয়ন করে, ভারতীয় আচার-ব্যবহারের মূলীভূত মহান্ তত্ত্বসমূহের সহিত সবিশেষ পরিচিত হয়, তবে দেখা যাইবে, শতকরা নিরানব্বই জন ভারতীয় চিন্তার সৌন্দর্য্যে, ভারতীয় ভাবে মুগ্ধ হইয়াছে। লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থিত, অশ্রুত অথচ মহাফলপ্রসূ, উষাকালীন ধীর শিশির-সম্পাতের ন্যায়

ভারতীয় ভাবপ্রচারের বিশেষত্ব

এই শান্ত সহিষ্ণু 'সর্ব্বংসহ' ধর্ম্মপ্রাণ জাতি চিন্তা-জগতে আপন প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

আবার প্রাচীন ইতিহাসের পুনরভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। কারণ, আজ যখন আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্যাবিষ্কারের মুহুর্মুহুঃ প্রবল আঘাতে প্রাচীন আপাতদৃঢ় ও অভেদ্য ধর্ম্মবিশ্বাসসমূহের ভিত্তি পর্য্যন্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতেছে—যখন বিভিন্ন সম্প্রদায় মানব-জাতিকে তাঁহাদের মতানুবর্ত্তী করিবার যে বিশেষ বিশেষ দাবী করিয়া থাকেন, তাহা শূন্যমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া হাওয়ায় উড়িয়া যাইতেছে, যখন আধুনিক প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে প্রবল মুষলাঘাতে প্রাচীন বদ্ধমূল সংস্কারসমূহকে ভঙ্গুর কাচপাত্রের ন্যায় গুঁড়াইয়া ফেলিতেছে—যখন পাশ্চাত্য জগতে ধর্ম্ম কেবল অজ্ঞদিগের হস্তে এবং জ্ঞানিগণ ধর্ম্মসম্পর্কিত সমুদয় বিষয়কে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন—তখনই ভারতের (যেখানকার অধিবাসিগণের ধর্ম্মজীবন সর্ব্বোচ্চ দার্শনিক সত্যসকল দ্বারা নিয়মিত) দর্শন, ভারত-বাসীর মনের ধর্ম্মবিষয়ক সর্ব্বোচ্চ ভাবসমূহ জগতের সমক্ষে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাই আজ এই সকল মহান্ তত্ত্ব—অসীম অনন্ত জগতের একত্ব, নির্গুণ ব্রহ্মবাদ, জীবাত্মার অনন্ত স্বরূপ ও তাহার বিভিন্ন জীবশরীরে অবিচ্ছেদ সংক্রমণরূপ অপূর্ব্ব তত্ত্ব, ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত তত্ত্ব,—এই সকল তত্ত্ব পাশ্চাত্য জগৎকে বৈজ্ঞানিক জড়বাদের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে স্বভাবতঃই অগ্রসর হইয়াছে। প্রাচীন সম্প্রদায়সমূহ জগৎকে একটী ক্ষুদ্র মৃৎপিণ্ডমাত্র

ভারতীয় ধর্ম্ম—যুক্তিভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উহাই বৈজ্ঞানিক পাশ্চাত্য জগৎকে অধর্ম্ম হইতে রক্ষার জন্য অগ্রসর হইয়াছে

মনে করিত, আর ভাবিত, কালও অতি অল্পদিনমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। দেশ, কাল ও নিমিত্তের অনন্তত্ব এবং সর্ব্বোপরি মানবাত্মার অনন্ত মহিমার বিষয় কেবল আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র-সমূহে বর্ত্তমান এবং সর্ব্বকালেই এই মহান্ তত্ত্ব সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম-তত্ত্বানুসন্ধানের ভিত্তি। যখন ক্রমোন্নতিবাদ, শক্তিসাতত্য (Conservation of Energy) * প্রভৃতি আধুনিক ভয়ানক মতসকল সর্ব্বপ্রকার অপরিণত ধর্ম্মমতের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে—তখন সেই মানবাত্মার অপূর্ব্ব সৃজন, ঈশ্বরের অদ্ভুত-বাণীস্বরূপ বেদান্তের অপূর্ব্ব হৃদয়গ্রাহী মনের উন্নতি ও বিস্তারসাধক তত্ত্বসমূহ ব্যতীত আর কিছু কি শিক্ষিত মানবজাতির শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারে?

কিন্তু আমি ইহাও বলিতে চাই, ভারতবহির্ভূত প্রদেশে ভারতীয় ধর্ম্মের প্রভাব বলিতে ভারতীয় ধর্ম্মের মূলতত্ত্বসমূহ—যে ভিত্তিমূলের উপর ভারতীয় ধর্ম্মরূপ সৌধ নির্ম্মিত, আমি তাহাই মাত্র লক্ষ্য করিতেছি। উহার বিস্তারিত শাখা-প্রশাখা শত শত শতাব্দীর সামাজিক আবশ্যকতায় যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৌণ বিষয় উহার সহিত জড়িত হইয়াছে, বিভিন্ন প্রথা, দেশাচার ও সামাজিক কল্যাণ বিষয়ক খুঁটিনাটি-বিচার প্রকৃতপক্ষে 'ধর্ম্ম'সংজ্ঞার অন্তর্ভূত হইতে পারে না। আমরা ইহাও জানি, আমাদের শাস্ত্রে দুই

* বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, জগতে যত বিভিন্ন শক্তি আছে, তাহারা ক্রমাগত একটি অপরটিতে পরিণত হইতেছে, কিন্তু শক্তির সমষ্টির পরিমাণ সর্ব্বদাই একরূপ। এই তত্ত্বকে Conservation of Energy বলে

প্রকার সত্যের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট প্রভেদ করা হইয়াছে।—একটি সনাতন। উহা মানুষের স্বরূপ; আত্মার স্বরূপ; ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধ; ঈশ্বরের স্বরূপ; পূর্ণত্ব; সৃষ্টিতত্ত্ব; সৃষ্টির অনন্তত্ব; জগৎ যে শূন্য হইতে প্রসূত নহে, পূর্ব্বাবস্থিত কোন কিছুর বিকাশমাত্র, এতদ্বিষয়ক মতবাদ; যুগ-প্রবাহসম্বন্ধীয় অদ্ভুত নিয়মাবলী এবং এতদ্বিধ অন্যান্য তত্ত্বসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতির সার্ব্বজনীন, সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বদেশিক বিষয়সমূহ এই সকল সনাতন তত্ত্বের ভিত্তি। এগুলি ব্যতীত আবার অনেকগুলি গৌণ বিধিও আমাদের শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়; সেইগুলির দ্বারা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কার্য্য নিয়মিত। সেগুলিকে 'শ্রুতির' অন্তর্গত বলিতে পারা যায় না, তাহারা প্রকৃতপক্ষে 'স্মৃতি'র—পুরাণের—অন্তর্গত। এইগুলির সহিত প্রথমোক্ত তত্ত্ব-সমূহের কোন সম্পর্ক নাই। আমাদের আর্য্যজাতির ভিতরও এগুলি ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইয়া বিভিন্ন আকারে পরিণত হইতেছে, দেখা যায়। এক যুগের যে বিধান, অন্য যুগের তাহা নহে। যখন এ যুগের পর অন্য যুগ আসিবে, তাহারা আবার অন্য আকার ধারণ করিবে। মহামনা ঋষিগণ আবির্ভূত হইয়া নূতন দেশকালোপযোগী নূতন নূতন আচার প্রবর্ত্তন করিবেন।

ভারতীয় ধর্ম্মের দুই বিভাগ—সনাতন ও যুগধর্ম্ম

জীবাত্মা পরমাত্মা এবং ব্রহ্মাণ্ডের এই সকল অপূর্ব্ব অনন্ত চিত্তোন্নতিবিধায়ক ক্রমবিকাশশীল ধারণার ভিত্তিস্বরূপ মহান্ তত্ত্বসমূহ ভারতেই প্রসূত হইয়াছে। ভারতেই কেবল মানুষ ক্ষুদ্র জাতীয় দেবতার জন্য, 'আমার ঈশ্বর সত্য, তোমার ঈশ্বর মিথ্যা,

এস, যুদ্ধের দ্বারা ইহার মীমাংসা করি' বলিয়া প্রতিবেশীর সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হয় নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার জন্য যুদ্ধরূপ সঙ্কীর্ণ ভাব কেবল এই ভারতেই কখন দেখা দিতে পারে নাই। এই সকল মহান্ মূলতত্ত্ব মানুষের অনন্ত স্বরূপের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সহস্র বর্ষ পূর্ব্বের ন্যায় আজও মানবজাতির কল্যাণসাধনে শক্তি-সম্পন্ন। যতদিন এই পৃথিবী বর্ত্তমান থাকিবে, যতদিন কর্ম্মফল থাকিবে, যতদিন আমরা ব্যষ্টি জীবরূপে জন্মগ্রহণ করিব এবং যতদিন স্বীয় শক্তির দ্বারা আমাদিগকে নিজেদের অদৃষ্ট গঠন করিতে হইবে, ততদিন উহাদের ঐরূপ শক্তি বর্ত্তমান থাকিবে।

সর্ব্বোপরি, ভারত জগৎকে কোন্ তত্ত্ব শিখাইবে, তাহা বলিতেছি। যদি আমরা বিভিন্ন জাতির মধ্যে ধর্ম্মের উৎপত্তি ও পরিণতির প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করি, তবে আমরা সকল স্থলেই দেখিব যে, প্রথমে প্রত্যেক জাতিরই পৃথক্ পৃথক্ দেবতা ছিল। এই সকল জাতির মধ্যে যদি পরস্পর বিশেষ সম্বন্ধ থাকিত, তবে সেই সকল দেবতার আবার এক সাধারণ নাম হইত। যেমন বেবিলোনীয় দেবতাগণ। যখন বেবিলোনীয়েরা বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের দেবতা-সকলের সাধারণ নাম বল (Ball) ছিল। এইরূপ য়াহুদী জাতিরও বিভিন্ন দেবগণের সাধারণ নাম মোলক (Moloch) ছিল। আরও দেখিতে পাইবেন, এই সকল বিভিন্ন জাতির মধ্যে জাতিবিশেষ অপর সকল হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিত এবং তাহারা আপন রাজাকে সকলের রাজা বলিয়া দাবী করিত। এই ভাব হইতে আবার

স্বভাবতঃই এইরূপ ঘটিত যে, সেই জাতি নিজের দেবতাকেও অপর সকলের দেবতা করিয়া তুলিতে চাহিত। বেবিলোনীয়েরা বলিত, বল মেরোডক দেবতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—অন্যান্য দেবগণ তদপেক্ষা নিকৃষ্ট। মোলক য়াভে অন্যান্য মোলক হইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আর দেবগণের এই শ্রেষ্ঠতা-নিকৃষ্টতা যুদ্ধের দ্বারা স্থিরীকৃত হইত। ভারতেও এই দেবগণের মধ্যে সংঘর্ষ, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী দেবগণ শ্রেষ্ঠতালাভের জন্য পরস্পরের প্রতিযোগিতা করিতেছিলেন। কিন্তু ভারতের ও সমগ্র জগতের সৌভাগ্যবলে এই অশান্তি-কোলাহলের মধ্য হইতে 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—(ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪৬)—'একমাত্র সত্তাই আছেন, বিপ্র অর্থাৎ সাধুগণ তাঁহাকে নানাপ্রকারে বর্ণন করিয়া থাকেন'—এই মহাবাণী উত্থিত হইয়াছিল। শিব, বিষ্ণু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন—অথবা বিষ্ণুই সর্ব্বস্ব, শিব কিছুই নহেন, তাহাও নহে। এক ভগবানকেই কেহ শিব, কেহ বিষ্ণু আবার অপরে অন্যান্য নানা নামে ডাকিয়া থাকে। নাম বিভিন্ন কিন্তু বস্তু এক। পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি কথার মধ্যে সমগ্র ভারতের ইতিহাস পাঠ করিতে পারা যায়। সমগ্র ভারতের ইতিহাস বিস্তারিত ওজস্বী ভাষায় সেই এক মূল তত্ত্বের পুনরুক্তিমাত্র। এই দেশে এই তত্ত্ব বার বার পুনরুক্ত হইয়াছে; পরিশেষে উহা এই জাতির রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, এই জাতির ধমনীতে প্রবাহিত প্রত্যেক শোণিতবিন্দুতে উহা মিশ্রিত হইয়া শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে—জাতীয় জীবনের এক

পাশ্চাত্য দেশে ও ভারতে বিভিন্ন দেবগণের সংঘর্ষ—পাশ্চাত্য দেববিশেষের প্রাধান্য লাভ, ভারতের 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'

অঙ্গস্বরূপ হইয়া গিয়াছে, যে উপাদানে এই বিরাট জাতীয় শরীর নির্ম্মিত, তাহার অংশস্বরূপ হইয়া গিয়াছে। এইরূপে এই ভূমি পরধর্ম্মে বিদ্বেষরাহিত্যের এক অপূর্ব্ব লীলাক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়াছে। এই শক্তিবলেই আমরা আমাদের এই প্রাচীন মাতৃ-ভূমিতে সকল ধর্ম্মকে, সকল সম্প্রদায়কে সাদরে ক্রোড়ে স্থান দিবার অধিকার লাভ করিয়াছি।

এই ভারতে আপাতবিরোধী বহু সম্প্রদায় বর্ত্তমান, অথচ সকলেই নির্ব্বিরোধে বাস করিতেছে। এই অপূর্ব্ব ব্যাপারের একমাত্র বাখ্যা এই পরধর্ম্মে দ্বেষরাহিত্য। তুমি হয়ত দ্বৈতবাদী, আমি হয়ত অদ্বৈতবাদী। তোমার হয়ত বিশ্বাস—তুমি ভগবানের নিত্য দাস, আবার আর একজন হয়ত বলিতে পারে, আমি ভগবানের সহিত অভিন্ন; কিন্তু উভয়েই খাঁটি হিন্দু। ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? সেই মহাবাক্য পাঠ কর, তাহা হইলেই ইহা কিরূপে হয় বুঝিবে,—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। হে আমার স্বদেশীয় ভ্রাতৃবৃন্দ! সর্ব্বোপরি, এই মহান্ সত্য আমাদিগকে জগৎকে শিখাইতে হইবে। অন্যান্য দেশের মহা মহা শিক্ষিত ব্যক্তিগণও নাক সিঁট্‌কাইয়া আমাদের ধর্ম্মকে পৌত্তলিকতা নামে অভিহিত করেন। আমি তাঁহাদিগকে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি; কিন্তু তাঁহারা স্থির হইয়া কখন এটি ভাবেন না যে, তাঁহাদের মস্তিষ্কে কি ঘোরতর কুসংস্কারসকল বর্ত্তমান। এখনও সর্ব্বত্র এই ভাব—এই ঘোর সাম্প্রদায়িকতা, মনের এই ঘোর সঙ্কীর্ণতা—তাঁহার নিজের যাহা আছে, তাহাই জগতে মহা মূল্যবান্ সামগ্রী। অর্থোপাসনাই তাঁহার মতে জীবনের একমাত্র সদ্ব্যবহার।

তাঁহার যাহা আছে, তাহাই যথার্থ উপার্জ্জনের বস্তু, আর সকল কিছুই নহে। যদি তিনি মৃত্তিকায় কোন অসার বস্তু নির্ম্মাণ করিতে পারেন, অথবা কোন যন্ত্র আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন, তবে আর সব ফেলিয়া দিয়া তাঁহাকেই ভাল বলিতে হইবে। জগতে শিক্ষার বহুল প্রচার সত্ত্বেও সমগ্র জগতের এই অবস্থা! কিন্তু বাস্তবিক জগতে এখনও শিক্ষার প্রয়োজন—জগতে এখনও সভ্যতার প্রয়োজন। বলিতে কি,

উহার ফলস্বরূপ কেবল ভারতেই প্রকৃতপক্ষে পরধর্ম্মে দ্বেষরাহিত্য (Religious Toleration) বিদ্যমান

এখনও কোথাও সভ্যতার আরম্ভমাত্র হয় নাই, এখনও মনুষ্য-জাতির শতকরা ৯৯.৯ জন অল্প-বিস্তর অসভ্য অবস্থায় রহিয়াছে। বিভিন্ন পুস্তকে তোমরা এই সব কথা পড়িতে পার, পরধর্ম্মে বিদ্বেষ-রাহিত্য ও এতদ্বিধ তত্ত্বসম্বন্ধে আমরা গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকি বটে, কিন্তু আমি নিজ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি, জগতে এই ভাবগুলির বাস্তব সত্তা বড় কম; শতকরা নিরানব্বই জন এ সকল বিষয় মনে স্থান দেয় না। পৃথিবীর যে কোন দেশেই আমি গিয়াছি, সেখানেই দেখিয়াছি, এখনও পরধর্ম্মাবলম্বীর উপর প্রবল পীড়ন বর্ত্তমান; নূতন বিষয় শিক্ষা সম্বন্ধে পূর্ব্বেও যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইত, এখনও সেই প্রাচীন আপত্তিসকল উত্থাপিত হইয়া থাকে। জগতে যতটুকু পরধর্ম্মে বিদ্বেষরাহিত্য ও ধর্ম্মভাবের সহিত সহানুভূতি আছে, কার্য্যতঃ তাহা এখানেই—এই আর্য্যভূমেই বিদ্যমান, অপর কোথাও নাই। এখানেই কেবল ভারতবাসীরা মুসলমানদের জন্য মসজিদ ও খ্রীশ্চিয়ানদের জন্য গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়া দেয়, আর কোথাও

নহে। যদি তুমি অন্যান্য দেশে গিয়া মুসলমানগণকে বা অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণকে তোমার জন্য একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিতে বল, দেখিও তাহারা কিরূপ সাহায্য করে। তৎপরিবর্ত্তে তাহারা সেই মন্দির এবং পারে ত সেই সঙ্গে তোমার দেহমন্দিরটিও ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিবে। এই কারণেই জগতের পক্ষে এই শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন—ভারতের নিকট জগৎকে এখনও এই পরধর্ম্মে দ্বেষরাহিত্য—শুধু তাহাই নহে, পরধর্ম্মের প্রতি প্রবল সহানুভূতি শিক্ষা করিতে হইবে। শিবমহিম্নস্তোত্রে কথিত হইয়াছে—

"ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥"

অর্থাৎ—"বেদ, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত ও বৈষ্ণব মত, এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মত সম্বন্ধে কেহ একটিকে শ্রেষ্ঠ, কেহ অপরটিকে হিতকর বলে। সমুদ্র যেমন নদীসকলের একমাত্র গম্যস্থান, রুচিভেদে সরল-কুটিল নানাপথগামী জনগণের তুমিও তদ্রূপ একমাত্র গম্য।"

ভিন্ন ভিন্ন পথে যাইতেছে বটে, কিন্তু সকলেই এক স্থানে চলিয়াছে। কেহ একটু বক্রপথে ঘুরিয়া ফিরিয়া কেহ বা সরল পথে যাইতে পারে; কিন্তু অবশেষে, হে প্রভু, সকলেই তোমার নিকট আসিবে। তখনই তোমার ভক্তি এবং তোমার শিবদর্শন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, যখন তুমি শুধু তাঁহাকে কেবল যে শিবলিঙ্গে দেখিবে, তাহা নহে, সর্ব্বত্র দেখিবে। তিনিই যথার্থ সাধু, তিনিই যথার্থ

হরিভক্ত, যিনি সেই হরিকে সর্ব্বজীবে ও সর্ব্বভূতে দেখিয়া থাকেন। যদি তুমি যথার্থ শিবের ভক্ত হও, তবে তুমি তাঁহাকে সর্ব্বজীবে ও সর্ব্বভূতে দেখিবে। যে নামে, যে রূপে তাঁহাকে উপাসনা করা হউক না কেন, তোমাকে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহারই উপাসনা। কাবার * দিকে মুখ করিয়াই কেহ জানু অবনত করুক অথবা খ্রীষ্টিয় গির্জ্জায় বা বৌদ্ধ চৈত্যেই উপাসনা করুক, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সে তাঁহারই উপাসনা করিতেছে। যে কোন নামে যে কোন মূর্ত্তির উদ্দেশে যে ভাবেই পুষ্পাঞ্জলি প্রদত্ত হউক না কেন, তাহা তাঁহারই পাদপদ্মে পৌঁছে, কারণ, তিনি সকলের একমাত্র প্রভু, সকল আত্মার অন্তরাত্মাস্বরূপ। জগতে কি অভাব, তাহা তিনি তোমা-আমা অপেক্ষা অনেক ভালরূপ জানেন। সর্ব্ববিধ ভেদ তিরোহিত হইবে, ইহা অসম্ভব। ভেদ থাকিবেই। বৈচিত্র্য ব্যতীত জীবন অসম্ভব। চিন্তারাশির এই সংঘর্ষ ও বৈচিত্র্যই—জ্ঞান, উন্নতি প্রভৃতি সকলের মূলে। জগতে অনন্ত প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবসমূহ বিদ্যমান থাকিবেই। কিন্তু তাহা বলিয়া যে পরস্পরকে ঘৃণা করিতে হইবে, পরস্পরে বিরোধ করিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। অতএব সেই মূল সত্য আমাদিগকে পুনরায় শিক্ষা করিতে হইবে, যাহা কেবলমাত্র এখান হইতে—আমাদের মাতৃভূমি হইতেই—প্রচারিত হইয়াছিল। আর

---

* মহম্মদের জন্মভূমি মুসলমানদিগের প্রধান তীর্থ মক্কানগরীতে অবস্থিত প্রসিদ্ধ মন্দির। ইহার মধ্যে একখণ্ড কৃষ্ণপ্রস্তর রক্ষিত আছে। কথিত আছে, দেবদূত গেব্রিয়েলের নিকট হইতে এই প্রস্তরখণ্ড পাওয়া যায়। মুসলমানেরা ইহাকে অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহারা যেখানেই থাকুন, এই কাবার অভিমুখে ফিরিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন।

একবার ভারতকে জগতের সমক্ষে এই সত্য প্রচার করিতে হইবে। কেন আমি একথা বলিতেছি ? কারণ, এই সত্য শুধু যে আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থেই নিবদ্ধ, তাহা নহে। আমাদের জাতীয় সাহিত্যের প্রত্যেক বিভাগে, আমাদের জাতীয় জীবনে ইহা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। এখানে—কেবল এখানেই ইহা প্রাত্যহিক জীবনে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, আর চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, এখানে ছাড়া আর কোথাও ইহা কার্য্যে পরিণত করা হয় না। এই ভাবে আমাদিগকে জগৎকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে হইবে। ভারত এতদপেক্ষাও অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষা দিতে সমর্থ বটে কিন্তু সেগুলি কেবল পণ্ডিতদের জন্য। এই শান্তভাব, এই তিতিক্ষা, এই পরধর্ম্মে দ্বেষরাহিত্য, এই সহানুভূতি ও ভ্রাতৃভাবরূপ মহতী শিক্ষা আবাল-বৃদ্ধবনিতা, শিক্ষিত অশিক্ষিত সর্ব্বজাতি, সর্ব্ববর্ণ শিক্ষা করিতে পারে—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।'

কলম্বোর দেবমন্দির

পরদিন রবিবারেও অনেক ব্যক্তি স্বামিজীকে দর্শন করিতে আসিলেন। স্বামিজীও সকলকে মধুর উপদেশ দানে তৃপ্ত করিলেন। সন্ধ্যাকালে স্বামিজী দেবদর্শনে স্থানীয় মন্দিরে যাত্রা করিলেন। অগণ্য ব্যক্তি তাঁহার গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল ও মধ্যে মধ্যে গাড়ী থামাইয়া গোলাপ-জল ও পুষ্পমাল্য দ্বারা তাঁহাকে সজ্জিত করিয়া ফলোপহার দিতে লাগিল। স্বামিজীর সম্মানার্থ স্থানীয় প্রথানুসারে তাঁহার যাইবার পথে প্রায় প্রত্যেক হিন্দুর গৃহের দ্বারদেশেই, বিশেষতঃ কলম্বোর তামিলপল্লীর মধ্যভাগে অবস্থিত

চেকুষ্ট্রীটের প্রত্যেক গৃহদ্বার আলোকমালা ও ফলরাশিতে সুশোভিত হইয়াছিল। মন্দিরে পৌঁছিবামাত্র সমাগত জনগণ 'জয় মহাদেব' ধ্বনি করিয়া স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করিল। মন্দিরের পুরোহিতগণ ও সমাগত জনগণের সহিত অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া, স্বামিজী মন্দির হইতে নিজ বাঙ্গলায় ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখেন, অনেকগুলি ব্রাহ্মণ তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। তিনি তাঁহাদের সহিত রাত্রি আড়াইটা পর্য্যন্ত বসিয়া ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা করিলেন। সোমবার এখানে স্বামিজীর আর একটি বক্তৃতা হয়।

কাণ্ডি

কলম্বো হইতে স্বামিজীর জাহাজে করিয়া বরাবর মাদ্রাজ যাইবার সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু সিংহল এবং দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন সহর হইতে ক্রমাগত তার আসিতে লাগিল যে, আপনি একবার মাত্র পদার্পণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন। সকলের অনুরোধে স্বামিজী তাঁহার পূর্ব্ব অভিপ্রায় পরিবর্ত্তন করিয়া স্থলপথে ভ্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি ১৯শে মঙ্গলবার প্রাতে রেলযোগে কাণ্ডি যাত্রা করিলেন। কাণ্ডি সিংহলের প্রসিদ্ধ পার্ব্বত্য স্বাস্থ্য-নিবাস। কাণ্ডিনিবাসীরা দেবমন্দিরের চিহ্নিত পতাকা লইয়া 'জয়' ও বাদ্যধ্বনি সহকারে স্বামিজীকে একটি বাঙ্গলায় লইয়া গিয়া এক মনোহর অভিনন্দন প্রদান করিলেন।

অভিনন্দনের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম ও সহরের প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য বস্তু দর্শনের পর স্বামিজী কাণ্ডি পরিত্যাগ

করিলেন ও সেই দিবস সন্ধ্যাকালে মাতালে নামক স্থানে পৌছিয়া তথায় রাত্রি যাপন করিলেন।

জাফনাভিমুখে—অনুরাধাপুর

বুধবার প্রাতে স্বামিজী প্রায় দুইশত মাইল দূরবর্ত্তী জাফনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথের উভয়পার্শ্ব শস্যভারশ্যামলাঙ্গ হইয়া উজ্জ্বল শোভা ধারণে যাত্রিগণের নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিল। দুর্ভাগ্যক্রমে ডাম্বুল নামক স্থান হইতে কয়েক মাইল গিয়াই গাড়ীর একখানা চাকা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে পথে প্রায় তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইল। তৎপরে গো-শকট যোগে কানাহাড়ি ও তিনপানি হইয়া ধীরে ধীরে অনুরাধাপুরে পৌছিলেন। অনুরাধাপুর এক অতি প্রাচীন সহর। এখানে অনেক প্রাচীন ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান। সেই সকল দেখিয়া মনে হয়, এক সময়ে প্রায় দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ইহা পৃথিবীর এক বৃহত্তম সহর ছিল। এখানে বৌদ্ধগণের অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি এখনও বর্ত্তমান আছে। যথা—বুদ্ধগয়ার মহাবোধি বৃক্ষের একটি শাখা হইতে উৎপন্ন এক প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ, সেই সুপ্রাচীন যুগের স্থাপত্যবিদ্যার প্রকৃষ্ট নিদর্শন একপ্রাচীন সরোবর, 'দাগোবা' নামে বিখ্যাত প্রাচীন স্তূপসমূহ। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুসন্ধানবলে যে সকল বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা অনুমান করেন যে, তামিলগণের দ্বারা সিংহল আক্রমণের পর হইতে এই সকল দাগোবার মধ্যে পূর্ব্বকালীন বৌদ্ধগণের দ্বারা আবিষ্কৃত রাশি রাশি মণিমুক্তা, হীরা-জহরৎ গুপ্তভাবে রক্ষিত রহিয়াছে।

এই বৃক্ষতলে প্রায় দুই-তিন সহস্র শ্রোতার সমক্ষে স্বামিজী 'উপাসনা' সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিলেন। তিনি ইংরাজীতে বলিতে লাগিলেন আর দ্বিভাষিগণ তামিল ও সিংহলী ভাষায় অনুবাদ করিয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিল। তিনি তাঁহার শ্রোতৃবর্গকে অসার পূজাড়ম্বর ত্যাগ করিয়া বেদের উপদেশাবলী কার্য্যে পরিণত করিতে উপদেশ দিলেন। ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমতা বুঝাইয়া দিয়া এই বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রধান স্থানে তিনি বলিলেন, ঈশ্বরকে শিব বিষ্ণু বুদ্ধ অথবা যে নামই দাও না, তিনি সেই একই। এই কারণেই অপর ধর্ম্মের প্রতি শুধু বিদ্বেষশূন্য হইলেই চলিবে না, উহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে হইবে।

জাফনার পথে— ভাভোনিয়া

অনুরাধাপুর হইতে জাফনা ১২০ মাইল দূরবর্ত্তী। এদিকে পথও যেরূপ কদর্য্য, অশ্বগুলিও তদ্রূপ, সুতরাং অতি কষ্টে যাইতে হইল। কেবল পথের অপূর্ব্ব শোভায় এ কষ্ট তত গায়ে লাগিল না। যাহা হউক, পথে দুই রাত্রি কাহারও নিদ্রা হয় নাই। মধ্যে ভাভোনিয়া নামক স্থানের হিন্দুগণ স্বামিজীকে এক অভিনন্দন প্রদান করিল। ইহারা স্বামিজীর দর্শনে অতীব হৃষ্ট হইয়া আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান বিবেচনা করিয়াছিল—অভ্যর্থনায় বলিল, স্বামিজীর মধুর স্বভাব, উদার ভাব ও নিঃস্বার্থতা তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে।

জাফনা

সংক্ষেপে ইহাদিগের অভিনন্দনের উত্তর দিয়া স্বামিজী আবার সিংহলের শোভাময় জঙ্গলের মধ্য দিয়া জাফনাভিমুখে অগ্রসর

হইতে লাগিলেন। পরদিন প্রাতে সিংহল ও জাফনা দ্বীপের সংযোগসেতু 'হস্তী গিরিবর্ত্মে' স্বামিজীকে এক অভ্যর্থনা প্রদত্ত হইল। জাফনা সহর হইতে ১২ মাইল অগ্রে উক্ত সহরের গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ স্বামিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তথা হইতে গাড়ী করিয়া সকলেই স্বামিজীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। জাফনা সহরের প্রত্যেক রাস্তা, এমন কি, প্রতিগৃহ নানারূপে শোভিত হইয়াছিল। সায়ংকালে যখন মশালের আলো জালিয়া স্বামিজীকে হিন্দুকলেজের প্রাঙ্গণে লইয়া যাওয়া হইল, তখন সেই দৃশ্য অতি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। এই স্থানে এক বৃহৎ সামিয়ানার মধ্যে স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করা হইল। সমবেত লোক সংখ্যা ১০০০০ হইতে ১৫০০০ হইবে। এই অভিনন্দন পত্রের বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল :—

শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামী

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

জাফনাসহরাধিবাসী আমরা হিন্দুগণ সিংহলে হিন্দুধর্ম্মের প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ এই স্থানে আপনাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি। লঙ্কাদ্বীপের এই অংশে পদার্পণ করিবার জন্য আপনাকে যে আমন্ত্রণ করিয়াছিলাম, আপনি তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক স্বীকার করাতে আমরা ধন্য হইয়াছি।

প্রায় দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া এখানে বাস করিয়াছিলেন। তখন জাফনায় তামিল রাজগণ রাজত্ব করিতেন। তাঁহারা উহাদের ধর্ম্মের

পোষকতা করিতেন। কিন্তু যখন তাঁহাদের রাজ্য গিয়া পর্ত্তুগীজ ও ওলন্দাজের অধিকার হইল, তখন তাহারা ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাধা দিতে লাগিল, প্রকাশ্যে পূজাপাঠ বন্ধ করিয়া দিল এবং পবিত্র মন্দিরসমূহ, এমন কি এখানকার যে দুইটি মন্দিরের যশঃ বহুদূরব্যাপী ছিল, সেগুলিও ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিল। ইহারা ক্রমাগত বল-পূর্ব্বক আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল বটে, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের প্রাচীন ধর্ম্ম ত্যাগ করিলেন না, তাহাই তাঁহারা দৃঢ় বিশ্বাসে ধরিয়া রহিলেন। এই ধর্ম্মই আমরা তাঁহাদিগের নিকট মহামূল্য দায়স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের সুশাসনে সেই ধর্ম্মের পুনরায় উন্নতি হইতেছে। শুধু ইহাই নহে, যে সকল মন্দির ভগ্ন হইয়াছিল, সেইগুলি কিছু কিছু পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে, কতক কতক হইতেছে।

আপনি বেদে প্রকাশিত সত্যের আলোক চিকাগো ধর্ম্ম মহা-সভায় প্রকাশ করিয়াছেন, ভারতের ব্রহ্মবিদ্যা ইংলণ্ড ও আমেরিকায় প্রচার করিয়াছেন, সমগ্র পাশ্চাত্যদেশবাসীকে হিন্দু-ধর্ম্মের সত্যসমূহ জানাইয়াছেন, এবং তদ্দ্বারা পাশ্চাত্যদেশকে প্রাচ্যভূমির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়াছেন। এইরূপে আমাদের ধর্ম্মের জন্য আপনি যে নিঃস্বার্থ-ভাবে পরিশ্রম করিয়া-ছেন, তজ্জন্য আমরা এই সুযোগে, আপনাকে আমাদের হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আরও, জড়বাদ-সর্ব্বস্ব যুগে —যখন সর্ব্বত্রই শ্রদ্ধার হ্রাস ও আধ্যাত্মিক সত্যান্বেষণে লোকের অরুচি—এই ঘোর দুর্দ্দিনে আপনি যে আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মের

পুনরভ্যুদয়ের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন, তজ্জন্যও আমাদের বহুতর ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

আপনি পাশ্চাত্যদেশবাসীকে আমাদের ধর্ম্মের উদারতা সম্বন্ধে বিজ্ঞপ্ত করিয়াছেন, এবং তদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের অন্তরে এই সত্য দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন যে, পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ যাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, এমন সকল বিষয় হিন্দুদের দর্শনে রহিয়াছে। এই সকল কারণে আমরা যে আপনার প্রতি কতদূর কৃতজ্ঞ, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে অসমর্থ।

বলাই বাহুল্য, আপনি যখন পাশ্চাত্য দেশে আমাদের ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন তখন আমরা উৎসুকভাবে আপনার কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলাম। আপনি যেরূপ সর্ব্বান্তঃকরণে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিলেন এবং উহাতে সফলকামও হইতেছিলেন, তাহাতে আমরা অন্তরে অন্তরে পরমানন্দ অনুভব করিতেছিলাম; পাশ্চাত্যদেশের যে সকল স্থান, জ্ঞান ও ধর্ম্মচর্চ্চায় সমুন্নত, সেই সকল স্থানের সংবাদপত্র আপনার ও আপনার অমূল্য গ্রন্থরাশির যে গুণগান করিয়াছে, তাহা হইতেই বুঝা যায়, আপনার মহান্ ব্রত কিরূপে উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

আমাদের দেশে অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনি যে শুভ পদার্পণ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। আপনি যেমন বেদকে সর্ব্বপ্রকার আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মূলভিত্তিস্বরূপ মনে করেন, আমাদেরও সেই বিশ্বাস। আশা করি, আমরা আপনাকে বহুবার এখানে দেখিতে পাইব।

ঈশ্বর আপনার মহৎকার্য্যের সহায় হইয়া আপনাকে সফলকাম

করিয়াছেন। তাঁহার নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন স্বাস্থ্য ও বল দান করিয়া দীর্ঘকাল আপনাকে আপনার মহান্ ব্রতসাধনে নিযুক্ত রাখেন।

বশম্বদ

জাফনাবাসী সমগ্র হিন্দুগণের পক্ষ হইতে।

স্বামিজী এই অভিনন্দনের যে উত্তর দিলেন, তাহা অতিশয় মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। পরদিন (রবিবার) সন্ধ্যাকালে উক্ত স্থানেই স্বামিজী 'বেদান্ত' সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। উহার সম্পূর্ণ অনুবাদ দেওয়া গেলঃ—

জাফনায় স্বামিজীর বক্তৃতা

বেদান্ত

বিষয় অতি বৃহৎ কিন্তু সময় সংক্ষিপ্ত ; একটি বক্তৃতায় হিন্দু-দিগের ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ অসম্ভব। সুতরাং আমি তোমাদের নিকট আমাদের ধর্ম্মের মূল তত্ত্বগুলি যত সহজ ভাষায় পারি, বর্ণনা করিব। যে 'হিন্দু' নামে পরিচয় দেওয়া এখন আমাদের প্রথাস্বরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহার এখন কিন্তু আর সার্থকতা নাই ; কারণ ঐ শব্দের অর্থ এই—যাহারা সিন্ধু নদের পারে বাস করিত। প্রাচীন পারসিকদিগের উচ্চারণবৈকল্যে এই 'সিন্ধু' শব্দ 'হিন্দু'রূপে পরিণত হইয়াছে ; তাঁহারা সিন্ধু-নদের পরপার-নিবাসী সকল লোককেই হিন্দু বলিতেন। এইরূপে 'হিন্দু' শব্দ আমাদের নিকট আসিয়াছে ; মুসলমান শাসনকাল হইতে আমরা ঐ শব্দ নিজেদের উপর প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছি।

হিন্দু

অবশ্য এই শব্দ ব্যবহারে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখন ইহার আর সার্থকতা নাই ; কারণ তোমরা এইটি বিশেষ লক্ষ্য করিও যে, বর্ত্তমানকালে সিন্ধুনদের এই-তীরবর্ত্তী সকলে আর প্রাচীন কালের মত এক ধর্ম্ম মানেন না। সুতরাং ঐ শব্দে শুধু খাঁটি হিন্দুমাত্র বুঝায় না ; উহাতে মুসলমান, খৃষ্টিয়ান, জৈন এবং ভারতের অপরাপর অধিবাসিগণকেও বুঝাইয়া থাকে। অতএব আমি 'হিন্দু' শব্দ ব্যবহার করিব না। তবে আমরা কোন্ শব্দ ব্যবহার করিব ?—আমরা 'বৈদিক' (অর্থাৎ যাহারা বেদ-মতানুবর্ত্তী) শব্দ ব্যবহার করিতে পারি, অথবা 'বৈদান্তিক' শব্দ ব্যবহার করিলে আরও ভাল হয়। জগতের অধিকাংশ প্রধান প্রধান ধর্ম্মই বিশেষ বিশেষ কতকগুলি গ্রন্থকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার কারয়া থাকে।. লোকের বিশ্বাস, এই গ্রন্থগুলি ঈশ্বর অথবা অন্য কোন অতিপ্রাকৃত পুরুষবিশেষের বাক্য—সুতরাং ঐ গ্রন্থগুলিই তাহাদের ধর্ম্মের ভিত্তি। পাশ্চাত্যদেশে আধুনিক পণ্ডিতদের মতে, ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে হিন্দুদিগের বেদই প্রাচীনতম। অতএব বেদ সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা আবশ্যক।

বেদ নামক শব্দরাশি কোন পুরুষমুখনিঃসৃত নহে। উহার সন তারিখ এখনও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, কখনও নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। আর আমাদের (হিন্দুদের) মতে, বেদ অনাদি অনন্ত। একটি বিশেষ কথা তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, জগতের অন্যান্য ধর্ম্ম ঈশ্বর-নামক ব্যক্তির অথবা ভগবানের দূত বা প্রেরিত পুরুষের বাণী বলিয়া তাহাদের শাস্ত্রের প্রামাণ্য দেখায়। হিন্দুরা কিন্তু বলেন, বেদের অন্য কোন প্রমাণ নাই, বেদ

বেদ

স্বতঃপ্রমাণ; কারণ, বেদ অনাদি অনন্ত, উহা ঈশ্বরের জ্ঞানরাশি। বেদ কখনই লিখিত হয় নাই, উহা কখনই সৃষ্ট হয় নাই, অনন্তকাল ধরিয়া উহা রহিয়াছে। যেমন সৃষ্টি অনাদি অনন্ত, তেমনি ঈশ্বরের জ্ঞানও অনাদি অনন্ত। বেদ অর্থে এই ঐশ্বরিক জ্ঞানরাশি (বিদ্-ধাতুর অর্থ—জানা)। বেদান্ত নামক জ্ঞানরাশি ঋষি নামধেয় পুরুষ-সমূহের দ্বারা আবিষ্কৃত। ঋষির অর্থ মন্ত্রদ্রষ্টা; তিনি পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন মাত্র, ঐ জ্ঞান ও ভাবরাশি তাঁহার নিজের চিন্তাপ্রসূত নহে। যখনই তোমরা শুনিবে, বেদের অমুক অংশের ঋষি অমুক, তখন ভাবিও না যে, তিনি উহা লিখিয়াছেন অথবা নিজের মন হইতে উহা সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনি পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত ভাবরাশির দ্রষ্টামাত্র। ঐ ভাবরাশি অনন্ত কাল হইতেই এই জগতে বিদ্যমান ছিল—ঋষি উহা আবিষ্কার করিলেন মাত্র। ঋষিগণ আধ্যাত্মিক আবিষ্কর্ত্তা।

ঋষি

বেদনামক গ্রন্থরাশি প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে নানাবিধ যাগ-যজ্ঞের কথা আছে; উহাদের মধ্যে অধিকাংশই বর্ত্তমান যুগের অনুপযোগী বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং কতকগুলি এখনও কোন না কোনও আকারে বর্ত্তমান। কর্ম্মকাণ্ডের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি, যথা সাধারণ মানবের কর্ত্তব্য—ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী এই সকল বিভিন্ন আশ্রমীর বিভিন্ন কর্ত্তব্য এখনও পর্য্যন্ত অল্প বিস্তর অনুসৃত হইয়া আসিতেছে।

বেদের দুই বিভাগ—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। জ্ঞানকাণ্ড উপনিষদ্‌ই সমগ্র হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ

দ্বিতীয় ভাগ জ্ঞানকাণ্ড—আমাদের ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক অংশ। উহার নাম বেদান্ত অর্থাৎ বেদের শেষ ভাগ—বেদের চরম লক্ষ্য। বেদজ্ঞানের এই সারভাগের নাম বেদান্ত বা উপনিষদ্। আর ভারতের সকল সম্প্রদায়—দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী অথবা সৌর, শাক্ত, গাণপত্য, শৈব ও বৈষ্ণব—যে কেহ হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে চাহে, তাহাকেই বেদের এই উপনিষদ্‌ভাগকে মানিয়া চলিতে হইবে। তাহারা উপনিষদ্ নিজের নিজের রুচি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করিতে পারে, কিন্তু তাহা-দিগকে উহার প্রামাণ্য স্বীকার করিতেই হইবে। এই কারণেই আমরা 'হিন্দু' শব্দের পরিবর্ত্তে 'বৈদান্তিক' শব্দ ব্যবহার করিতে চাই। ভারতের সকল প্রাচীনপন্থী দার্শনিককেই বেদান্তের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইয়াছে—আর আজকাল ভারতে হিন্দুধর্ম্মের যত শাখা প্রশাখা আছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলিকে যতই বিসদৃশ বোধ হউক না কেন, উহাদের উদ্দেশ্য যতই জটিল বোধ হউক না কেন, যিনি বেশ করিয়া উহাদের আলোচনা করিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, উপনিষদ্ হইতেই উহাদের ভাবরাশি গৃহীত হইয়াছে। এই সকল উপনিষদের ভাব আমাদের জাতির মজ্জায় মজ্জায় এতদূর প্রবিষ্ট হইয়াছে যে, যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের খুব অমার্জ্জিত শাখাবিশেষেরও রূপকতত্ত্ব আলোচনা করিবেন, তাঁহারা সময়ে সময়ে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, উপনিষদে রূপকভাবে বর্ণিত তত্ত্ব সেই রূপকের দৃষ্টান্ত-বস্তুতে পরিণত হইয়া ঐ সকল ধর্ম্মে স্থান লাভ করিয়াছে। উপনিষদেরই বড় বড় আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক ও রূপকগুলি আজকাল

স্থূলভাবে পরিণত হইয়া আমাদের গৃহে পূজার বস্তু হইয়া রহিয়াছে। অতএব আমাদের যত প্রকার পূজার যন্ত্র প্রতিমাদি আছে, সকলেই বেদান্ত হইতে আসিয়াছে, কারণ, বেদান্তে ঐগুলি রূপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ক্রমশঃ ঐ ভাবগুলি জাতির মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিয়া পরিশেষে যন্ত্র-প্রতিমাদিরূপে প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বেদান্তের পরই স্মৃতির প্রামাণ্য। এগুলি ঋষিলিখিত গ্রন্থ, কিন্তু ইহাদের প্রামাণ্য বেদান্তের অধীন। কারণ, অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণের পক্ষে তাহাদের শাস্ত্র যেরূপ, আমাদের পক্ষে স্মৃতিও তদ্রূপ। আমরা স্বীকার করিয়া থাকি যে, বিশেষ বিশেষ ঋষিমুনি এই সকল স্মৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন; এই অর্থে অন্যান্য ধর্ম্মের শাস্ত্রসমূহের প্রামাণ্য যেরূপ, স্মৃতির প্রামাণ্যও তদ্রূপ; তবে স্মৃতিই আমাদের চরম প্রমাণ নহে। স্মৃতির কোনও অংশ যদি বেদান্তের বিরোধী হয়, তবে উহা পরিত্যাগ করিতে হইবে, উহার কোনও প্রামাণ্য থাকিবে না।

স্মৃতি যুগে যুগে বিভিন্ন

আবার এই সকল স্মৃতি যুগে যুগে বিভিন্ন। আমরা শাস্ত্রে পাঠ করি—সত্যযুগে এই এই স্মৃতির প্রামাণ্য; ত্রেতা দ্বাপর ও কলি, এই সকল যুগের প্রত্যেক যুগে আবার অন্যান্য স্মৃতির প্রামাণ্য। দেশকালপাত্রের পরিবর্ত্তন-অনুসারে আচার প্রভৃতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে; আর স্মৃতি প্রধানতঃ এই আচারের নিয়ামক বলিয়া সময়ে সময়ে উহাদেরও পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। আমি এই বিষয়টি তোমাদিগকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে বলি। বেদান্তে ধর্ম্মের যে মূল তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যাত

হইয়াছে, তাহা অপরিবর্ত্তনীয়। কেন?—কারণ, ঐগুলি, মানব ও প্রকৃতিতে যে অপরিবর্ত্তনীয় তত্ত্বসমূহ রহিয়াছে তাহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐগুলির কখনও পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। আত্মা স্বর্গ প্রভৃতির তত্ত্ব কখনও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঐ সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল, এখনও তাহাই আছে, লক্ষ লক্ষ বৎসর পরেও তাহাই থাকিবে। কিন্তু যে সকল ধর্ম্মকার্য্য আমাদের সামাজিক অবস্থা ও সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে, সমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সেইগুলিও পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। সুতরাং সময়-বিশেষে কোন বিশেষ বিধিই সত্য ও ফলপ্রদ হইবে, অপর সময়ে নহে। তাই আমরা দেখিতে পাই, কোন সময়ে কোন খাদ্য-বিশেষের বিধান রহিয়াছে, অন্য সময়ে তাহা আবার নিষিদ্ধ। সেই খাদ্য সেই সময়বিশেষের উপযোগী ছিল কিন্তু ঋতুপরিবর্ত্তন ও অন্যান্য কারণে উহা তৎকালের অনুপযোগী হওয়ায় স্মৃতি ঐ খাদ্য ব্যবহার নিষেধ করিয়াছেন। এই কারণে স্বভাবতঃই ইহা প্রতীত হইতেছে যে, যদি বর্ত্তমানকালে আমাদের সমাজের কোন পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়, তবে ঐ পরিবর্ত্তন সাধন করিতেই হইবে; ঋষিরা আসিয়া, কিরূপে ঐ সকল পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে তাহার উপায় দেখাইয়া দিবেন। আমাদের ধর্ম্মের মূল সত্যগুলি এক বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তিত হইবে না, উহারা সমভাবে থাকিবে।

পুরাণ

তৎপরে পুরাণ। পুরাণ পঞ্চলক্ষণ। উহাতে ইতিহাস, সৃষ্টিতত্ত্ব, দার্শনিক-তত্ত্বসকলের নানাবিধ রূপকের দ্বারা বিবৃতি প্রভৃতি নানা বিষয় আছে। বৈদিক-ধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণে প্রচার করিবার জন্য পুরাণ লিখিত হয়। বেদ যে ভাষায়

লিখিত, তাহা অতি প্রাচীন। পণ্ডিতদের মধ্যেও অতি অল্পসংখ্যকই ঐ সকল গ্রন্থের সময় নিরূপণে সক্ষম। পুরাণ তৎকালীন লোকের ভাষায় লিখিত—উহাকে আধুনিক সংস্কৃত বলা যায়। ঐগুলি পণ্ডিতদিগের জন্য নহে, সাধারণ লোকের জন্য; কারণ, সাধারণ লোক দার্শনিক তত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম। তাহাদিগকে ঐ সকল তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য স্থূলভাবে সাধু, রাজা ও মহাপুরুষগণের জীবনচরিত এবং ঐ জাতির মধ্যে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্য দিয়া শিক্ষা দেওয়া হইত। ঋষিরা যে কোন বিষয় পাইয়াছেন, তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকটিই ধর্ম্মের নিত্য সত্য বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

তন্ত্র

তারপর তন্ত্র। এইগুলি কতক কতক বিষয়ে প্রায় পুরাণের মত এবং তাহাদের মধ্যে কতকগুলিতে কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত প্রাচীন যাগযজ্ঞকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

এই সকলগুলি হিন্দুদের শাস্ত্র। আর যে জাতির মধ্যে এত অধিক পরিমাণে ধর্ম্মশাস্ত্র বিদ্যমান এবং যে জাতি অগণ্য বর্ষ ধরিয়া দর্শন ও ধর্ম্মের চিন্তায় তাহার শক্তিকে নিয়োজিত করিয়াছে, সে জাতির মধ্যে এত অধিক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় অতি স্বাভাবিক। আরও সহস্র সহস্র সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় কেন হইল না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়! কোন কোন বিষয়ে এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অতিশয় বিভিন্নতা বিদ্যমান। সম্প্রদায় সকলের এই সকল খুঁটিনাটি বিভিন্নতা বুঝিবার এক্ষণে আমাদের সময় নাই। সুতরাং যে সকল মতে, যে সকল তত্ত্বে হিন্দুমাত্রেরই বিশ্বাস থাকা আবশ্যক,

সম্প্রদায় সকলের সেই সাধারণ তত্ত্বগুলির সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ সৃষ্টিতত্ত্ব। হিন্দুদের সকল সম্প্রদায়েরই এই মত যে, এই সৃষ্টি, এই প্রকৃতি, এই মায়া—অনাদি অনন্ত। জগৎ কোন বিশেষ দিনে সৃষ্ট হয় নাই। একজন ঈশ্বর আসিয়া এই জগৎকে সৃষ্টি করিলেন, তারপর তিনি ঘুমাইতেছেন, ইহা হইতে পারে না। সৃষ্টিকারিণী শক্তি এখনও বর্ত্তমান। ঈশ্বর অনন্ত কাল ধরিয়া সৃষ্টি করিতেছেন, তিনি কখনই বিশ্রাম করেন না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

সৃষ্টিতত্ত্ব

"যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
* * * উপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥" ৩।২৩,২৪।

যদি আমি ক্ষণকাল কর্ম্ম না করি, তবে জগৎ ধ্বংস হইয়া যাইবে।

জগতে এই যে সৃষ্টিশক্তি দিবারাত্র কার্য্য করিতেছে, ইহা যদি ক্ষণকালের জন্য বন্ধ থাকে, তবে এই জগৎ ধ্বংস হইয়া যায়। এমন সময়ই ছিল না, যখন সমগ্র জগতে এই শক্তি ক্রিয়াশীল ছিল না; তবে অবশ্য যুগশেষে প্রলয় হইয়া থাকে। আমাদের সৃষ্টি ইংরাজী Creation নহে। Creation বলিতে ইংরাজীতে 'কিছু না হইতে কিছু হওয়া, অসৎ হইতে সতের উদ্ভব' এই অপরিণত মতবাদ বুঝাইয়া থাকে। আমি এরূপ অসঙ্গত কথা বিশ্বাস করিতে বলিয়া তোমাদের বুদ্ধি ও বিচার শক্তির অবমাননা করিতে চাহি না। সমগ্র প্রকৃতিই বিদ্যমান থাকে, কেবল প্রলয়ের সময় উহা ক্রমশঃ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর হইতে থাকে, শেষে একেবারে অব্যক্তভাব ধারণ করে। পরে কিছুকাল যেন বিশ্রামের পর

আবার কে যেন উহাকে বাহিরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়; তখন পূর্ব্বের ন্যায়ই সমবায়, পূর্ব্বের ন্যায়ই ক্রমবিকাশ, পূর্ব্বের ন্যায়ই প্রকাশ হইতে থাকে। কিছুকাল এইরূপ খেলা চলিয়া আবার ঐ খেলা ভাঙ্গিয়া যায়—ক্রমশঃ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর হইতে থাকে, শেষে সমুদয় আবার লীন হইয়া যায়। আবার বাহির হইয়া আসে। অনন্তকাল এইরূপ তরঙ্গতুল্য গতিতে একবার সম্মুখে আর বার পশ্চাতে আসিতেছে। দেশ কাল এবং অন্যান্য সমুদয়ই এই প্রকৃতির অন্তর্গত। এই কারণেই সৃষ্টির আরম্ভ আছে বলা সম্পূর্ণ পাগলামি মাত্র। সৃষ্টির আরম্ভ বা শেষ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই আসিতে পারে না। এই হেতু যখনই আমাদের শাস্ত্রে সৃষ্টির আদি বা অন্তের উল্লেখ করা হইয়াছে, তখনই কোন যুগবিশেষের আদি-অন্ত বুঝিতে হইবে; উহার অন্য কোন অর্থ নাই।

কে এই সৃষ্টি করিতেছেন?—ঈশ্বর। ইংরাজীতে সাধারণতঃ God শব্দে যাহা বুঝায়, আমার অভিপ্রায় তাহা নহে। সংস্কৃত 'ব্রহ্ম' শব্দ ব্যবহার করাই সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত। তিনিই এই জগৎপ্রপঞ্চের সাধারণ কারণস্বরূপ। ব্রহ্মের স্বরূপ কি? ব্রহ্ম নিত্য নিত্যশুদ্ধ নিত্যজাগ্রত সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ দয়াময় সর্ব্বব্যাপী নিরাকার অখণ্ড। তিনিই এই জগৎ সৃষ্টি করেন। এক্ষণে প্রশ্ন এই, যদি এই ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা ও নিত্য বিধাতা হন, তাহা হইলে দুইটি আপত্তি উপস্থিত হয়। জগতে ত যথেষ্ট বৈষম্য রহিয়াছে—এখানে কেহ সুখী কেহ দুঃখী; কেহ ধনী কেহ দরিদ্র;—এরূপ বৈষম্য কেন হয়? আবার এখানে নিষ্ঠুরতাও বর্ত্তমান। কারণ, এখানে একের জীবন অন্যের মৃত্যুর

ঈশ্বর

উপর নির্ভর করিতেছে। এক প্রাণী আর এক প্রাণীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতেছে, প্রত্যেক মানবই নিজ ভ্রাতার গলা টিপিবার চেষ্টা করিতেছে। এই প্রতিযোগিতা, এই নিষ্ঠুরতা, এই উৎপাত, এই দিবা রজনী গগনবিদারী দীর্ঘনিঃশ্বাস—ইহাই জগতের অবস্থা! —ইহাই যদি ঈশ্বরের সৃষ্টি হয়, তবে সেই ঈশ্বর ঘোরতর নিষ্ঠুর!

ঈশ্বরের বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ

মানুষ যত নিষ্ঠুর দানব কল্পনা করিয়া থাকুক না কেন, ওই ঈশ্বর তাহা অপেক্ষাও নিষ্ঠুর। বেদান্ত বলেন, ঈশ্বর এই বৈষম্য ও প্রতিযোগিতার কারণ নহেন, তবে কে ইহা করিল? আমরা নিজেরাই ইহা করিয়াছি। মেঘ সকল ক্ষেত্রে সমান ভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করিল। কিন্তু যে ক্ষেত্র উত্তমরূপে কৃষ্ট, তাহাই উহাতে শস্যশালী হইল, যে ভূমি সুকৃষ্ট নহে, তাহা ঐ বৃষ্টির ফললাভ করিতে পারিল না। ইহা সেই মেঘের অপরাধ নহে। তাঁহার অনন্ত অপরিবর্ত্তনীয় দয়া—আমরাই কেবল এই বৈষম্য সৃষ্টি করিতেছি। কিরূপে আমরা এই বৈষম্য সৃষ্টি করিলাম? কেহ জগতে সুখী হইয়া জন্মাইল কেহ বা অসুখী, তাহারা ত এই বৈষম্য সৃষ্টি করে নাই? করিয়াছে বৈ কি। তাহাদের পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের দ্বারা এই ভেদ—এই বৈষম্য হইয়াছে।

এক্ষণে আমরা সেই দ্বিতীয় তত্ত্বের আলোচনায় আসিলাম—যাহাতে শুধু আমরা হিন্দুরা নাহি—বৌদ্ধ ও জৈনগণও একমত।

কর্ম্মফল

আমরা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকি, সৃষ্টির ন্যায় জীবনও অনন্ত। শূন্য হইতে যে জীবনের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা নহে—তাহা হইতেই পারে না। এইরূপ জীবনে

কোন প্রয়োজনই নাই। কালে যাহার আরম্ভ, কালে তাহার অন্ত হইবে। গতকল্য যদি জীবনের আরম্ভ হইয়া থাকে, তবে আগামী কল্য উহার শেষ হইবে—শেষে উহার সম্পূর্ণ ধ্বংস হইবে। অবশ্যই জীবন পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল। আজকাল ইহা বড় বেশী বুঝাইবার আবশ্যক নাই; কারণ, আজকালকার সমুদয় বিজ্ঞান এই বিষয়ে আমাদিগকে সাহায্য করিতেছে—আমাদের শাস্ত্রনিহিত তত্ত্বগুলি জড় জগতের ব্যাপারগুলির সাহায্যে ব্যাখ্যা করিতেছে। তোমরা সকলেই ইহা পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছ যে, আমাদের প্রত্যেকেই অনন্ত অতীতের কর্ম্মসমষ্টির ফলস্বরূপ। কবিগণের বর্ণনানুযায়ী শিশু, প্রকৃতি হইতে সাক্ষাৎ প্রসূত হইয়া আসে না, তাহার স্কন্ধে অনন্ত অতীতকালের কর্ম্মসমষ্টি রহিয়াছে। ভালই হউক মন্দই হউক, সে নিজ অতীত কর্ম্মের ফলভোগ করিতে আসে। আমরা জানি, এই কারণেই জন্ম হয়। ইহা হইতেই বৈষম্যের উৎপত্তি। ইহাই কর্ম্মবিধান; আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অদৃষ্টের গঠনকর্ত্তা। এই মতবাদের দ্বারা অদৃষ্টবাদ খণ্ডিত হয় এবং ইহাই ঈশ্বরের বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ নিরাকৃত করে। আমরা যাহা কিছু ভোগ করি, তাহার জন্য আমরাই দায়ী, অপর কেহ নহে। আমরাই কার্য্য ও আমরাই কারণস্বরূপ। সুতরাং আমরা স্বাধীন! যদি আমি অসুখী হই, তবে বুঝিতে হইবে, আমিই আমাকে অসুখী করিয়াছি। ইহা হইতে ইহাও প্রতীয়মান হইবে যে, আমি যদি ইচ্ছা করি, তবে সুখীও হইতে পারি। যদি আমি অপবিত্র হই, তবে তাহাও আমার নিজকৃত; তাহা হইতে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, আমি ইচ্ছা করিলে আবার পবিত্র হইতে

পারি। এইরূপ সমুদয় বিষয়ে বুঝিতে হইবে। মানবের ইচ্ছা কোন ঘটনাধীন নহে। মানবের অনন্ত প্রবল মহৎ ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীনতার সমক্ষে, সকল শক্তি, এমন কি, প্রাকৃতিক শক্তিগুলি পর্য্যন্ত মাথা নোয়াইবে—উহাদের দাস হইয়া থাকিবে।

এইবারে স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন আসিবে—আত্মা কি? আত্মাকে না জানিলে আমাদের শাস্ত্রের ঈশ্বরকেও জানিতে পারি না। ভারতে ও ভারতেতর প্রদেশে বহিঃপ্রকৃতির আলোচনা দ্বারা সেই সর্ব্বাতীত সত্তার আভাস পাইবার চেষ্টা হইয়াছে। আমরা জানি, ইহার ফলও অতি শোচনীয় হইয়াছে।

আত্মতত্ত্ব

অতীত সত্তার আভাস পাওয়া দূরে থাক্, আমরা যতই জড়জগতের আলোচনা করি, ততই অধিক জড়বাদী হইতে থাকি। যদিও একটু-আধটু ধর্ম্মভাব পূর্ব্বে থাকিত, তাহাও জড়জগতের আলোচনা করিতে করিতে দূর হইয়া যায়। অতএব আধ্যাত্মিকতা ও সেই পরমপুরুষের জ্ঞান বাহ্যজগৎ হইতে পাওয়া যায় না। অন্তর-মধ্যে, আত্মার মধ্যে উহার অন্বেষণ করিতে হইবে। বাহ্যজগৎ আমাদিগকে সেই অনন্ত সম্বন্ধে কোন সংবাদ দিতে পারে না, অন্ত-র্জ্জগতে অন্বেষণ করিলেই উহার সংবাদ পাওয়া যায়। অতএব কেবল আত্মতত্ত্বের অন্বেষণেই, আত্মতত্ত্বের বিশ্লেষণেই পরমাত্ম-তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব। জীবাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় সকলের মতভেদ আছে বটে, কিন্তু কতক কতক বিষয়ে সকলের ঐক্যও আছে;—তাহা এই যে—জীবাত্মাসকল অনাদি অনন্ত, তাহারা স্বরূপতঃ অবিনাশী। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক আত্মায় সর্ব্ববিধ শক্তি আনন্দ পবিত্রতা সর্ব্বব্যাপিতা ও সর্ব্বজ্ঞত্ব অন্তর্নিহিত

রহিয়াছে। এই গুরুতর তত্ত্বটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রত্যেক মানবে, প্রত্যেক প্রাণীতে—সে যতই দুর্ব্বল বা মন্দ হউক, সে বড়ই হউক, ছোটই হউক, সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ আত্মা রহিয়াছেন। আত্মা হিসাবে কোন প্রভেদ নাই—প্রভেদ কেবল প্রকাশের তারতম্যে। আমার ও ঐ ক্ষুদ্রতম প্রাণীর মধ্যে প্রভেদ কেবল প্রকাশের তারতম্যে—স্বরূপতঃ তাহার সহিত আমার কোন ভেদ নাই; সে আমার ভ্রাতা, তাহারও যে আত্মা, আমারও তাহাই। ভারত এই মহত্তম তত্ত্ব জগতের সমক্ষে প্রচার করিয়াছে। অন্যান্য দেশে সমগ্র মানবের ভ্রাতৃভাব-তত্ত্ব প্রচারিত হইয়া থাকে—ভারতে উহা 'সর্ব্বপ্রাণীর ভ্রাতৃভাব' এই আকার ধারণ করিয়াছে। অতি ক্ষুদ্রতম প্রাণী, এমন কি ক্ষুদ্র পিপীলিকাগণ পর্য্যন্ত আমার ভাই—তাহারা আমার দেহস্বরূপ। 'এবং তু পণ্ডিতৈর্জ্ঞাত্বা সর্ব্বভূতময়ং হরিম্' ইত্যাদি।—এইরূপে পণ্ডিতগণ সেই প্রভুকে সর্ব্বভূতময় জানিয়া সকল প্রাণীকে ভগবান্ জ্ঞানে উপাসনা করিবেন। সেই কারণেই ভারতে তির্য্যগ্‌জাতি ও দরিদ্রগণের প্রতি এত দয়ার ভাব বর্ত্তমান; সকল বস্তু সম্বন্ধেই, সকল বিষয়েই ঐ দয়ার ভাব। আত্মায় সমুদয় শক্তি বর্ত্তমান, এই মত ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মিলনভূমি।

স্বভাবতঃই এইবার আমাদের ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনার সময় আসিয়াছে। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই আত্মা সম্বন্ধে একটি কথা বলিতে চাই। যাঁহারা ইংরাজী ভাষা চর্চ্চা করেন, তাঁহারা অনেক সময় Soul ও Mind এই দুইটি কথায় বড় গোলযোগে পড়িয়া যান। সংস্কৃত আত্মা ও ইংরাজী Soul শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্নার্থবাচী। আমরা যাহাকে মন বলি,

Soul কি আত্মা?

পাশ্চাত্যেরা তাহাকে Soul বলেন। পাশ্চাত্য প্রদেশে আত্মা সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান কোন কালে ছিল না। প্রায় বিশ বৎসর হইল, সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের সাহায্যে ঐ জ্ঞান পাশ্চাত্য প্রদেশে আসিয়াছে। আমাদের এই স্থূল শরীর রহিয়াছে, ইহার পশ্চাতে মন। কিন্তু মন আত্মা নহে। উহা সূক্ষ্ম শরীর—সূক্ষ্ম তন্মাত্রায় নির্ম্মিত। উহাই জন্মজন্মান্তরে বিভিন্ন শরীর আশ্রয় করে—কিন্তু উহার পশ্চাতে Soul বা মানুষের আত্মা রহিয়াছে। এই আত্মা শব্দ Soul বা Mind শব্দের দ্বারা অনূদিত হইতে পারে না—সুতরাং আমাদিগকে সংস্কৃত 'আত্মা' শব্দ অথবা আজকালকার পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মতানুযায়ী Self শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। যে শব্দই আমরা ব্যবহার করি না কেন, আত্মা—মন ও স্থূল-শরীর উভয় হইতেই পৃথক্, এই ধারণাটি মনের মধ্যে পরিষ্কারভাবে রাখিতে হইবে। আর এই আত্মাই মন বা সূক্ষ্ম শরীরকে সঙ্গে লইয়া এক দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে। যে সময়ে উহা সর্ব্বজ্ঞত্ব ও পূর্ণত্ব লাভ করে, তখনই উহার আর জন্মমৃত্যু হয় না—তখন উহা স্বাধীন হইয়া যায়,—ইচ্ছা করিলে এই মন বা সূক্ষ্ম শরীরকে রাখিতেও পারে অথবা উহাকে পরিত্যাগ করিয়া অনন্তকালের জন্য স্বাধীন ও মুক্ত হইয়া যাইতে পারে। স্বাধীনতাই আত্মার লক্ষ্য। ইহাই আমাদের ধর্ম্মের বিশেষত্ব। আমাদের ধর্ম্মেও স্বর্গ-নরক আছে, কিন্তু উহারা চিরস্থায়ী নহে। স্বর্গ-নরকের স্বরূপ বিচার করিলেই সহজেই প্রতীত হয় যে, উহারা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। যদি স্বর্গ বলিয়া কিছু থাকে, তবে তাহা এই মর্ত্ত্যলোকেরই পুনরাবৃত্তি-মাত্র হইবে—একটু না হয় বেশী সুখ, একটু না হয় বেশী ভোগ।

তাহাতে বরং আরও মন্দই হইবে। এইরূপ স্বর্গ অনেক॥ যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত ইহলোকে কোন সৎকর্ম্ম করে, তাহারা মৃত্যুর পর এইরূপ কোন স্বর্গে ইন্দ্রাদি দেবতা হইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই দেবত্ব বিশেষ বিশেষ পদ মাত্র। এই দেবতারাও এক সময়ে মানুষ ছিলেন; সৎকর্ম্মবশে ইহাদের দেবত্বপ্রাপ্তি হইয়াছে। ইন্দ্র-বরুণাদি নাম কোন দেববিশেষের নহে। সহস্র সহস্র ইন্দ্র হইবেন। রাজা নহুষ মৃত্যুর পর ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রত্ব পদমাত্র। কোন ব্যক্তি সৎকর্ম্মের ফলে উন্নত হইয়া ইন্দ্রত্বলাভ করিলেন, কিছুদিন সেই পদে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন, আবার সেই দেবদেহ ত্যাগ করিয়া পুনরায় মনুষ্যজন্ম লাভ করিলেন। মনুষ্যজন্ম আবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জন্ম। কোন কোন দেবতা স্বর্গসুখের বাসনা ত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু যেমন এই জগতের অধিকাংশ লোক ধন মান ঐশ্বর্য্য হইলে উচ্চতত্ত্ব ভুলিয়া যায়, সেইরূপ অধিকাংশ দেবতাই ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া মুক্তির চেষ্টা করেন না, তাঁহাদের শুভ কর্ম্মের ফল ভোগ হইয়া গেলে তাঁহারা এই পৃথিবীতে পুনরায় আসিয়া মনুষ্য-রূপ ধারণ করেন। অতএব এই পৃথিবীই কর্ম্মভূমি; এই পৃথিবী হইতেই আমরা মুক্তিলাভ করিতে পারি। সুতরাং এই সকল স্বর্গে পর্য্যন্ত আমাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই। তবে কোন্ বস্তু লাভের জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত?—মুক্তি। আমাদের শাস্ত্র বলেন, শ্রেষ্ঠতম স্বর্গেও তুমি প্রকৃতির দাসমাত্র। বিশ হাজার বৎসর তুমি রাজত্ব ভোগ করিলে—তাহাতে কি হইল? যতদিন তোমার শরীর থাকে,

স্বর্গ

মুক্তিই আমাদের লক্ষ্য

ততদিন তুমি সুখের দাসমাত্র। যতদিন দেশ কাল তোমার উপর কার্য্য করিতেছে, ততদিন তুমি ক্রীতদাস মাত্র। এই কারণেই আমাদিগকে বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি উভয়কে জয় করিতে হইবে। প্রকৃতি যেন তোমার পদতলে থাকে—প্রকৃতিকে পদদলিত করিয়া তোমাকে তাহার বাহিরে গিয়া স্বাধীন মুক্তভাবে নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। তখন তুমি জন্মের অতীত হইলে—সুতরাং তুমি মৃত্যুরও পারে যাইলে। তখন তোমার সুখ চলিয়া গেল—সুতরাং তুমি তখন দুঃখেরও অতীত হইলে। তখনই তুমি সর্ব্বাতীত অব্যক্ত অবিনাশী আনন্দের অধিকারী হইলে। আমরা যাহাকে এখানে সুখ ও কল্যাণ বলি, তাহা সেই অনন্ত আনন্দের এক কণামাত্র। ঐ অনন্ত আনন্দই আমাদের লক্ষ্য।

আত্মা যেমন অনন্ত আনন্দস্বরূপ, উহা তেমনি লিঙ্গবর্জ্জিত। আত্মাতে নরনারী ভেদ নাই। দেহসম্বন্ধেই নরনারী ভেদ।

আত্মা লিঙ্গ ও বয়োবর্জ্জিত

অতএব আত্মাতে স্ত্রী-পুং ভেদারোপ ভ্রমমাত্র—শরীর সম্বন্ধেই উহা সত্য। আত্মার সম্বন্ধে কোনরূপ বয়সও নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না, সেই প্রাচীন পুরুষ সর্ব্বদাই একরূপ।

কিরূপে এই আত্মা বদ্ধ হইলেন? আমাদের শাস্ত্রই ঐ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর দিয়া থাকেন। অজ্ঞানই বন্ধনের কারণ। আমরা

বন্ধন ও মুক্তি

অজ্ঞানেই বদ্ধ হইয়াছি—জ্ঞানোদয়েই উহা নাশ হইবে, আমাদিগকে এই অন্ধতমের অপর পারে লইয়া যাইবে। এই জ্ঞানলাভের উপায় কি?—ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বরোপাসনা এবং সর্ব্বভূতকে ভগবানের মন্দির জ্ঞানে সর্ব্বভূতে

প্রেম দ্বারা সেই জ্ঞানলাভ হয়। ঈশ্বরে পরমানুরক্তিবলে জ্ঞান উদয় হইবে—অজ্ঞান দূরীভূত হইবে—সকল বন্ধন খসিয়া যাইবে ও আত্মা মুক্তি লাভ করিবেন। আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরের দ্বিবিধ স্বরূপের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে—সগুণ ও নির্গুণ। সগুণ ঈশ্বর অর্থে সর্ব্বব্যাপী, জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা—জগতের অনাদি জনকজননী। তাঁহার সহিত আমাদের নিত্যভেদ। মুক্তি অর্থে তাঁহার সামীপ্য ও সালোক্য প্রাপ্তি। নির্গুণ ব্রহ্মের বর্ণনায় তাঁহার প্রতি সচরাচর প্রযুক্ত সর্ব্বপ্রকার বিশেষণ অনাবশ্যক ও অযৌক্তিক বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। সেই নির্গুণ সর্ব্বব্যাপী পুরুষকে জ্ঞানবান্ বলা যাইতে পারে না; কারণ, জ্ঞান মনের ধর্ম্ম। তাঁহাকে চিন্তাশীল বলা যাইতে পারে না; কারণ, চিন্তা সসীম জীবের জ্ঞানলাভের উপায় মাত্র। তাঁহাকে বিচারপরায়ণ বলা যাইতে পারে না; কারণ, বিচারও সসীমতা—দুর্ব্বলতার চিহ্নস্বরূপ। তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলা যাইতে পারে না; কারণ, বদ্ধ ভিন্ন মুক্ত পুরুষের সৃষ্টিতে প্রবৃত্তি হয় না। তাঁহার আবার বন্ধন কি? প্রয়োজন ভিন্ন কেহই কোন কার্য্য করে না। তাঁহার আবার প্রয়োজন কি? অভাব না থাকিলে কেহ কোন কার্য্য করে না।—তাঁহার আবার অভাব কি? বেদে তাঁহার প্রতি 'সঃ' শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই। 'সঃ' শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট না হইয়া নির্গুণ ভাব বুঝাইবার জন্য 'তৎ' শব্দের দ্বারা তাঁহার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। 'সঃ' শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইলে ব্যক্তিবিশেষ বুঝাইত, তাহাতে জীবজগতের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ পার্থক্য সূচিত করিত। নির্গুণবাচক 'তৎ' শব্দের

সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম

প্রয়োগ করা হইয়াছে, 'তৎ'শব্দবাচ্য নিগুর্ণ ব্রহ্ম প্রচারিত হইয়াছে। ইহাকেই অদ্বৈতবাদ বলে।

এই নিগুর্ণ পুরুষের সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ?—তাঁহার সহিত আমরা অভিন্ন। আমরা প্রত্যেকেই সেই সর্ব্বপ্রাণীর মূল কারণস্বরূপ—নিগুর্ণ পুরুষের বিভিন্ন বিকাশমাত্র। যখনই আমরা এই অনন্ত নিগুর্ণ পুরুষ হইতে আমাদিগকে পৃথক্ ভাবি, তখনই আমাদের দুঃখের উৎপত্তি, আর এই অনির্ব্বচনীয় নিগুর্ণ সত্তার সহিত আমাদের অভেদ-জ্ঞানেই মুক্তি। সংক্ষেপতঃ আমাদের শাস্ত্রে আমরা ঈশ্বরের এই দ্বিবিধ ভাবের উল্লেখ দেখিতে পাই। এখানে ইহা বলা আবশ্যক যে, নিগুর্ণ ব্রহ্মবাদই সর্ব্বপ্রকার নীতি-বিজ্ঞানের ভিত্তি। অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রত্যেক জাতির ভিতর এই সত্য প্রচারিত হইয়াছে—মনুষ্য-জাতিকে আত্মতুল্য ভালবাসিবে। ভারতবর্ষে আবার মনুষ্য ও ইতরপ্রাণীতে কোন প্রভেদ করা হয় নাই, প্রাণিনির্ব্বিশেষে সকলকেই আত্মতুল্য প্রীতি করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু অপর প্রাণিবর্গকে আত্মতুল্য ভাল-বাসিলে কেন কল্যাণ হইবে, কেহই তাহার কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। একমাত্র নিগুর্ণ ব্রহ্মবাদই ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ। তখনই তুমি ইহা বুঝিবে, যখন তুমি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডকে এক অখণ্ডস্বরূপ জানিবে—যখন তুমি জানিবে, অপরকে ভালবাসিলে নিজেকেই ভালবাসা হইল, অপরের ক্ষতি করিলে নিজেরই ক্ষতি করা হইল। তখনই আমরা বুঝিব, কেন অপরের অনিষ্ট করা উচিত নয়। সুতরাং এই নিগুর্ণ

অদ্বৈতবাদই নীতিজ্ঞানের ভিত্তি

ব্রহ্মবাদেই নীতিবিজ্ঞানের মূলতত্ত্বের যুক্তি পাওয়া যায়। অদ্বৈতবাদের কথা বলিতে গিয়া আরও অনেক কথা আসিয়া পড়ে। সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসবান্ হইলে হৃদয়ে কি অপূর্ব্ব প্রেমের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা আমি জানি। বিভিন্ন সময়ের প্রয়োজনানুসারে লোকের উপর ভক্তির প্রভাব ও কার্য্যকারিতার বিষয় আমি সবিশেষ অবগত আছি।

চাই বীর্য্য উপায়—অদ্বৈতবাদ

কিন্তু আমাদের দেশে এখন আর কাঁদিবার সময় নাই—এখন কিছু বীর্য্যের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই নির্গুণ ব্রহ্মে বিশ্বাস হইলে—সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কারবিবর্জ্জিত হইয়া 'আমিই সেই নির্গুণ ব্রহ্ম' এই জ্ঞান সহায়ে নিজের পায়ের উপর নিজে দাঁড়াইলে হৃদয়ে কি অপূর্ব্ব শক্তির বিকাশ হয়, তাহা বলা যায় না। ভয়?—কার ভয়? আমি প্রকৃতির নিয়ম পর্য্যন্ত গ্রাহ্য করি না। মৃত্যু আমার নিকট উপহাসের বস্তুমাত্র। মানুষ তখন নিজ আত্মার মহিমায় অবস্থিত হয়—যে আত্মা অনাদি-অনন্ত ও অবিনাশী, যাঁহাকে কোন যন্ত্র ভেদ করিতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, জল গলাইতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না, যিনি অনন্ত. জন্মরহিত মৃত্যুশূন্য, যাঁহার মহিমার সম্মুখে সূর্য্য চন্দ্র সমূহ—এমন কি, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সিন্ধুতে বিন্দুতুল্য প্রতীয়মান হয়, যাঁহার মহিমার সম্মুখে দেশকালের অস্তিত্ব বিলীন হইয়া যায়। আমাদিগকে এই মহিমময় আত্মার প্রতি বিশ্বাসসম্পন্ন হইতে হইবে—তবেই বীর্য্য আসিবে। তুমি যাহা চিন্তা করিবে, তুমি তাহাই হইবে। যদি তুমি আপনাকে দুর্ব্বল ভাব, তবে তুমি দুর্ব্বল হইবে; তেজস্বী ভাবিলে তেজস্বী হইবে। যদি তুমি আপনাকে

অপবিত্র ভাব, তবে তুমি অপবিত্র; আপনাকে বিশুদ্ধ ভাবিলে বিশুদ্ধই হইবে। অদ্বৈতবাদ আমাদিগকে আপনাকে দুর্ব্বল ভাবিতে উপদেশ দেয় না, পরন্তু আপনাকে তেজস্বী সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বজ্ঞ ভাবিতে উপদেশ দেয়। আমার ভিতরে ঐ ভাব এখনও প্রকাশিত না হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু উহা ত আমার ভিতরে রহিয়াছে। আমার মধ্যে সকল জ্ঞান সকল শক্তি পূর্ণ পবিত্রতা ও স্বাধীনতার ভাব রহিয়াছে। তবে আমি ঐগুলি জীবনে প্রকাশিত করিতে পারি না কেন?—কারণ, আমি উহাতে বিশ্বাস করি না। যদি আমি এখনই উহাতে বিশ্বাসী হই, তবেই উহার প্রকাশ হইবে—নিশ্চয়ই হইবে। অদ্বৈতবাদ ইহাই শিক্ষা দেয়। অতি শৈশবাবস্থা হইতেই তোমাদের সন্তানগণ তেজস্বী হউক, তাহাদিগকে কোনরূপ দুর্ব্বলতা কোনরূপ বাহ্যানুষ্ঠান শিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই। তাহারা তেজস্বী হউক নিজের পায়ে নিজেরা দাঁড়াক;—সাহসী সর্ব্বজয়ী সর্ব্বংসহ হউক। এই সকল গুণসম্পন্ন হইতে হইলে তাহাদিগকে প্রথমে আত্মার মহিমাসম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হইবে। ইহা বেদান্তেই—কেবল বেদান্তেই পাইবে—উহাতে অন্যান্য ধর্ম্মের মত ভক্তি-উপাসনা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক উপদেশ আছে—যথেষ্ট পরিমাণেই আছে বটে, কিন্তু আমি যে আত্মতত্ত্বের কথা বলিতেছি, তাহাই জীবন ও শক্তিপ্রদ ও অতি অপূর্ব্ব। বেদান্তেই কেবল সেই মহান্ তত্ত্ব নিহিত, যাহা সমগ্র জগতের ভাবরাশিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিবে এবং বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের সামঞ্জস্য বিধান করিবে।

আমি তোমাদের নিকট আমাদের ধর্ম্মের প্রধান প্রধান তত্ত্ব

সকল বলিলাম। ঐগুলি কিরূপে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, এক্ষণে তৎসম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলিব। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতে যে সকল কারণ বর্ত্তমান, তাহাতে এখানে অনেক সম্প্রদায় থাকিবারই কথা। কার্য্যতঃও দেখিতেছি, এখানে অনেক সম্প্রদায়। আরও একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার এখানে দেখা যাইতেছে যে, এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের সহিত বিরোধ করে না। শৈব এ কথা বলে না যে, বৈষ্ণবমাত্রেই অধঃপাতে যাইবে, অথবা বৈষ্ণবও শৈবকে এ কথা বলে না। শৈব বলে, আমি আমার পথে চলিতেছি, তুমি তোমার পথে চল ; পরিণামে আমরা একস্থানে পৌঁছিব। ভারতের সকল সম্প্রদায়ই এ কথা স্বীকার করিয়া থাকে। ইহাকেই ইষ্টনিষ্ঠা বলে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এ কথা স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে যে, ঈশ্বরোপাসনার বিভিন্ন প্রণালী আছে। ইহাও স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে যে, বিভিন্ন প্রকৃতির পক্ষে বিভিন্ন সাধনপ্রণালীর প্রয়োজন। তুমি যে প্রণালীতে ঈশ্বর লাভ করিবে, সে প্রণালী হয়ত আমার খাটিবে না, হয়ত তাহাতে আমার ক্ষতি হইতে পারে। সকলকেই এক পথে যাইতে হইবে, এ কথার কোন অর্থ নাই, ইহাতে বরং ক্ষতিই হইয়া থাকে ; সুতরাং সকলকে এক পথ দিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা একেবারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যদি কখন পৃথিবীর সর্ব্বলোক একধর্ম্মমতাবলম্বী হইয়া এক পথে চলে, তবে বড় দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। তাহা হইলে লোকের স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও প্রকৃত ধর্ম্মভাব একেবারে বিনষ্ট হইবে। ভেদই আমাদের জীবনযাত্রার

ইষ্টনিষ্ঠা

মূলমন্ত্র। সম্পূর্ণরূপে ভেদ চলিয়া গেলে সৃষ্টিও লোপ পাইবে। যতদিন চিন্তাপ্রণালীর এই বিভিন্নতা থাকিবে, ততদিনই আমরা বর্ত্তমান থাকিব। তবে ভেদ আছে বলিয়া বিরোধের প্রয়োজন নাই। তোমার পক্ষে তোমার পথ ভাল বটে, কিন্তু আমার পক্ষে নহে। আমার পক্ষে আমার পথ ঠিক, কিন্তু তোমার পক্ষে নহে। প্রত্যেকেরই ইষ্ট বিভিন্ন, এ কথায় এই বুঝায় যে, প্রত্যেকের পথ বিভিন্ন। এটি মনে রাখিও, জগতের কোন ধর্ম্মের সহিত আমাদের বিবাদ নাই। আমাদের প্রত্যেকেরই বিভিন্ন ইষ্টদেবতা। কিন্তু যখন দেখি, লোকে আসিয়া আমাদের নিকট বলিতেছে, ইহাই এক-মাত্র পথ এবং ভারতের ন্যায় অসাম্প্রদায়িক দেশে জোর করিয়া আমাদিগকে ঐ মতাবলম্বী করিতে চায়, তখন আমরা তাহাদের কথা শুনিয়া হাস্যই করিয়া থাকি। যাহারা ঈশ্বরলাভোদ্দেশে বিভিন্নপথাবলম্বী ভ্রাতাদিগের বিনাশ সাধন করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের মুখে প্রেমের কথা বড়ই অসঙ্গত ও অশোভন। তাহাদের প্রেমের বিশেষ কিছু মূল্য নাই। অপরে অন্য পথের অনুসরণ করিতেছে, যে ইহা সহ্য করিতে পারে না, সে আবার প্রেমের কথা বলে! যদি ইহাই প্রেম হয়, তবে আর দ্বেষ কি? খ্রীষ্ট বুদ্ধ বা মহম্মদ—জগতের যে কোন অবতারেরই উপাসনা করুক না, কোন ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত আমাদের বিবাদ নাই। হিন্দু বলেন, 'এস ভাই, তোমার যে সাহায্য আবশ্যক, তাহা আমি করিতেছি; কিন্তু আমি আমার পথে চলিব, তাহাতে কিছু বাধা দিও না। আমি আমার ইষ্টের উপাসনা করিব। তোমার পথ খুব ভাল, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার পক্ষে হয় ত উহাতে ঘোরতর অনিষ্ট ঘটিতে

পারে। কোন্ খাদ্য আমার শরীরের উপযোগী, তাহা আমার নিজ অভিজ্ঞতা হইতে আমিই বুঝিতে পারি, কোটি কোটি ডাক্তার সে সম্বন্ধে আমাকে কিছু শিক্ষা দিতে পারে না। এইরূপ কোন্ পথ আমার উপযোগী হইবে, তাহা আমার অভিজ্ঞতা হইতে আমিই ঠিক বুঝিতে পারি।'—ইহাই ইষ্টনিষ্ঠা। এই কারণেই আমরা বলিয়া থাকি যে, যদি কোন মন্দিরে গিয়া অথবা কোন যন্ত্র বা প্রতিমার সাহায্যে তুমি তোমার আত্মায় অবস্থিত ভগবানকে উপলব্ধি করিতে পার, বেশ ত দু'শ প্রতিমা গড় না কেন। যদি কোন বিশেষ অনুষ্ঠানের দ্বারা তোমার ঈশ্বর উপলব্ধির সাহায্য হয়, তবে শীঘ্র ঐ সকল অনুষ্ঠান অবলম্বন কর। যে কোন ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান তোমাকে ভগবানের নিকট লইয়া যায়, তাহাই অবলম্বন কর ; যে কোন মন্দিরে যাইলে তেমার ঈশ্বরলাভের সহায়তা হয়, তাহাতেই গিয়া উপাসনা কর। কিন্তু বিভিন্ন পথ লইয়া বিবাদ করিও না। যে মুহূর্ত্তে তুমি বিবাদ করিবে, সেই মুহূর্ত্তে তুমি ঈশ্বর-পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছ—তুমি সম্মুখে অগ্রসর না হইয়া পিছু হটিতেছ, ক্রমশঃ পশুপদবীতে উপনীত হইতেছ।

সমাজ-সংস্কার

আমাদের ধর্ম্ম কাহাকেও বাদ দিতে চায় না, উহা সকলকেই নিজের কোলে টানিয়া লইতে চায়। আমাদের জাতিভেদ ও অন্যান্য নিয়মাবলী ধর্ম্মের সহিত সংসৃষ্ট আপাততঃ বোধ হইলেও বাস্তবিক তাহা নহে। সমগ্র হিন্দুজাতিকে রক্ষা করিবার জন্য এই সকল নিয়মের আবশ্যক ছিল। যখন এই আত্মরক্ষার প্রয়োজন থাকিবে না, তখন ঐগুলি আপনা হইতেই উঠিয়া যাইবে। এক্ষণে আমার

যতই বয়োবৃদ্ধি হইতেছে, ততই এই প্রাচীন প্রথাগুলি আমার ভাল বলিয়াই বোধ হইতেছে। এক সময়ে আমি ঐগুলির অধিকাংশই অনাবশ্যক ও বৃথা মনে করিতাম। কিন্তু যতই আমার বয়স হইতেছে, ততই আমি ঐগুলির কোনটিরও বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি! কারণ শত শত শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফলে ঐগুলি গঠিত হইয়াছে। কাল্‌কের শিশু, যে কালই হয়ত মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, সে যদি আসিয়া আমাকে আমার অনেক দিনের সংকল্পিত বিষয় সকল পরিত্যাগ করিতে বলে, এবং আমিও যদি সেই শিশুর কথা শুনিয়া তাহার মতানুসারে আমার কার্য্যপ্রণালীর পরিবর্ত্তন করি, তবে আমিই আহাম্মক হইলাম, অপর কেহ নহে। ভারতেতর নানা দেশ হইতে আমরা সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ পাইতেছি, তাহারও অধিকাংশ ঐ ধরণের। তাহাদিগকে বল—তোমরা যখন একটি স্থায়ী সমাজ গঠন করিতে পারিবে, তখন তোমাদের কথা শুনিব। তোমরা দুদিন একটা ভাব ধরিয়া রাখিতে পার না, বিবাদ করিয়া উহা ছাড়িয়া দাও; ক্ষুদ্র পতঙ্গের ন্যায় তোমাদের ক্ষণস্থায়ী জীবন! বুদ্বুদের ন্যায় তোমাদের উৎপত্তি, বুদ্বুদের ন্যায় লয়! অগ্রে আমাদের ন্যায় স্থায়ী সমাজ গঠন কর—প্রথমে এমন কতকগুলি সামাজিক নিয়ম ও প্রথার প্রবর্ত্তন কর, যাহাদের শক্তি শত শত শতাব্দী ধরিয়া অব্যাহত থাকিতে পারে—তখন তোমাদের সহিত এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিবার সময় হইবে। কিন্তু যতদিন না তাহা হইতেছে, ততদিন তোমরা চঞ্চল বালকমাত্র!

আমাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার ছিল, তাহা বলা

শেষ হইয়াছে। আমি এক্ষণে বর্ত্তমান যুগের যাহা বিশেষ প্রয়োজন,—এমন একটি বিষয় তোমাদিগকে বলিব। মহাভারতকার বেদব্যাসের জয় হউক!—তিনি বলিয়া গিয়াছেন, 'কলিযুগের দানই একমাত্র ধর্ম্ম'। অন্যান্য যুগে যে সকল কঠোর তপস্যা ও যোগাদি প্রচলিত ছিল, তাহা আর এখন চলিবে না। এই যুগে বিশেষ প্রয়োজন দান—অপরকে সাহায্য করা। দান শব্দে কি বুঝায়? ধর্ম্মদানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান, তারপর বিদ্যাদান, তারপর প্রাণদান। অন্ন-বস্ত্র দান সর্ব্বনিকৃষ্ট দান। যিনি ধর্ম্মজ্ঞান প্রদান করেন, তিনি আত্মাকে অনন্ত জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। যিনি বিদ্যা দান করেন, তিনিও আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের সহায়তা করেন। অন্যান্য দান, এমন কি, প্রাণদান পর্য্যন্ত তাহার তুলনায় অতি তুচ্ছ। অতএব তোমাদের এইটুকু জানা উচিত যে, এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানদান হইতে অন্যান্য সর্ব্ব-কর্ম্ম নিকৃষ্ট। আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিস্তার করিলেই মনুষ্যজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহায্য করা হয়। আমাদের শাস্ত্র আধ্যাত্মিক ভাবের অনন্ত প্রস্রবণ। আর এই ত্যাগের দেশ ভারত ব্যতীত পৃথিবীতে আর কোথায় এইরূপ ধর্ম্মের অপরোক্ষানুভূতির দৃষ্টান্ত পাইবে? জগৎ সম্বন্ধে আমার একটু অভিজ্ঞতা আছে। আমায় বিশ্বাস কর,—অন্যান্য দেশে অনেক লম্বা লম্বা কথা শুনিতে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু এখানেই—কেবল এখানেই এমন লোক পাওয়া যায়, যে ধর্ম্ম জীবনে পরিণত করিয়াছে। শুধু ধর্ম্মের লম্বাচওড়া কথা বলিলেই ধর্ম্ম হয় না; তোতাপাখীও লম্বা লম্বা কথা কয়, আজকাল কলেও কথা কয়,—কিন্তু এমন জীবন দেখাও দেখি,

কলিযুগের ধর্ম্ম—দানই শ্রেষ্ঠ সাধন

যাহাতে ত্যাগ আধ্যাত্মিকতা তিতিক্ষা ও অনন্তপ্রেম বিদ্যমান। এই সকল গুণ থাকিলেই তুমি ধার্ম্মিক পুরুষ হইলে। যখন আমাদের শাস্ত্রে এই সকল সুন্দর সুন্দর ভাব রহিয়াছে এবং আমাদের দেশে এমন মহৎ জীবন সকল উদাহরণ স্বরূপ রহিয়াছে, তখন যদি আমাদের যোগিশ্রেষ্ঠগণের হৃদয় ও মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তা-রত্নগুলি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া ধনী দরিদ্র, উচ্চ-নীচ সকলের সম্পত্তি না হয়, তবে তাহা বড়ই দুঃখের বিষয়। ঐ সকল তত্ত্ব আবার শুধু ভারতেই প্রচার করিতে হইবে, তাহা নহে, সমগ্র জগতে উহা ছড়াইতে হইবে। ইহাই আমাদের এক শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। আর যতই তুমি অপরকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে, ততই তুমি দেখিবে, তুমি নিজের কল্যাণ বিধান করিতেছ। যদি তোমরা যথার্থই তোমাদের ধর্ম্ম ভালবাস, যদি তোমরা যথার্থই তোমাদের দেশকে ভালবাস, তবে তোমাদিগকে সর্ব্বসাধারণের দুর্ব্বোধ্য শাস্ত্রাদি হইতে এই রত্নরাজি লইয়া তাহাদের প্রকৃত উত্তরাধিকারিগণকে দানরূপ মহাব্রত সাধনে প্রাণপণ করিতে হইবে। সর্ব্বোপরি আমাদিগকে একটি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।—হায়! শত শত শতাব্দী ধরিয়া আমরা ঘোরতর ঈর্ষ্যাবিষে জর্জ্জরিত হইতেছি—আমরা সর্ব্বদাই পরস্পরের হিংসা করিতেছি! অমুক আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেন হইল—আমি কেন তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলাম না—অহরহঃ আমাদের এই চিন্তা! এমন কি, ধর্ম্মকর্ম্মেও আমরা এই শ্রেষ্ঠত্বের অভিলাষী—আমরা এমন ঈর্ষ্যার দাস হইয়াছি!—ইহা ত্যাগ করিতে হইবে। যদি ভারতে কোন প্রবল পাপ রাজত্ব করিতে

থাকে, তবে তাহা এই ঈর্ষ্যাপরায়ণতা। সকলেই আজ্ঞা দিতে চায়, আজ্ঞা পালন করিতে কেহই প্রস্তুত নহে! প্রথমে আজ্ঞা পালন করিতে শিক্ষা কর, আজ্ঞা দিবার শক্তি আপনা হইতেই আসিবে। সর্ব্বদাই দাস হইতে শিক্ষা কর, তবেই তুমি প্রভু হইতে পারিবে। প্রাচীনকালের সেই অদ্ভুত ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের অভাবেই ইহা ঘটিয়াছে। ঈর্ষ্যাদ্বেষ পরিত্যাগ কর, তবেই তুমি এখনও যে সব বড় বড় কাজ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা করিতে পারিবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অদ্ভুত অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছিলেন—আমরা ভক্তি ও স্পর্দ্ধার সহিত তাঁহাদের কার্য্যকলাপের আলোচনা করিয়া থাকি। কিন্তু এক্ষণে আমাদের কার্য্য করিবার সময়—আমাদের পরবংশীয়েরাও যেন আশীর্ব্বাদ ও গৌরব সহকারে আমাদের কার্য্যকলাপের আলোচনা করে! আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যতই শ্রেষ্ঠ ও মহিমান্বিত হউন না কেন, প্রভুর আশীর্ব্বাদে আমরা প্রত্যেকেই এমন কার্য্য সকল করিব যে, তাহাতে তাঁহাদেরও গৌরবরবি ম্লান করিয়া দিবে!

ভারত

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি

সিংহলে স্বামিজীর অভ্যর্থনা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। কলম্বো হইতে জাফনা পর্য্যন্ত লোকে একবাক্যে উৎসাহ সহকারে স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। সিংহল দেশে পূর্ব্বে কেহই স্বামিজীকে জানিত না, উক্ত দেশে তাঁহার জন্মও নহে ; তারপর বড় বড় সহর হইতে অন্যান্য স্থানে যাতায়াতের এমন সুবিধা নাই, যাহাতে স্বামিজীর আগমনবার্ত্তা সর্ব্বসাধারণে জানিতে পারে। সুতরাং তাঁহার এই অভ্যর্থনা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে। এই অল্প কয়েকদিনেই লোকের মনের উপর স্বামিজী এরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে, কিছুদিন পরে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী শিবানন্দ যাইয়া কিছুদিনের জন্য এখানে কার্য্য করেন। এক্ষণে সিংহলে রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকটী কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

জাফনায় স্বামিজীর বক্তৃতা হইয়া গেলে পর স্বামিজী ভারতে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। জাফনা হইতে জলপথে ভারতবর্ষ ৫০ মাইল দুরবর্ত্তী। একখানি দেশী জাহাজ ভাড়া লওয়া হইল। রাত্রি বারটার কিছু পরেই স্বামিজী ও তাঁহার সঙ্গিগণ রওনা হইলেন। বায়ু অনুকূল থাকাতে বড়ই আনন্দের সহিত সকলে ভারতাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। পর দিবস

দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই পাম্বানে জাহাজ পৌঁছিল; অপরাহ্ণে একখানি নৌকা করিয়া স্বামিজী তীরে অবতরণ করিলেন। জেটিতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর বা রামনাদের রাজা স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করিলেন। জেটির নিম্নেই এক চন্দ্রাতপ নানাবিধ পুষ্পপত্রে অতি সুন্দররূপে শোভিত হইয়াছিল। এই চন্দ্রাতপের নিম্নে পাম্বান-বাসীর পক্ষ হইতে নাগলিঙ্গম্ পিলে মহাশয় এক অভিনন্দন পাঠ করিলেন। অভিনন্দনে তাঁহারা স্বামিজীকে তাঁহাদের ধর্ম্মাচার্য্য-রূপে সম্বোধন করিয়া বলিলেন. 'পাশ্চাত্যদেশে আপনার হিন্দুধর্ম্ম প্রচারে যথেষ্ট সুফল ফলিয়াছে; এক্ষণে এই নিদ্রিত ভারতকে তাহার বহুদিনের অজ্ঞাননিদ্রা হইতে জাগাইবার জন্য অনুগ্রহপূর্ব্বক উঠিয়া পড়িয়া লাগুন।' রামনাদের রাজাও হৃদয়ের আবেগের সহিত স্বামিজীকে এক স্বতন্ত্র অভিনন্দন প্রদান করিলেন। স্বামিজী নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করিলেন।

পাম্বান অভিনন্দনের উত্তর

আমাদের পুণ্য মাতৃভূমিতেই ধর্ম্ম ও দর্শনের উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি। এখানেই বড় বড় ধর্ম্মবীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এখানেই—কেবল এখানেই ত্যাগধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে; এখানেই—কেবল এখানেই অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত মনুষ্যের সম্মুখে উচ্চতম আদর্শসমূহ স্থাপিত হইয়াছে।

ধর্ম্মই ভারতের জাতীয় জীবনের মেরু-দণ্ডস্বরূপ

আমি পাশ্চাত্যদেশের অনেক স্থানে ঘুরিয়াছি—অনেক দেশ পর্য্যটন করিয়াছি, অনেক জাতি দেখিয়াছি। আমার

বোধ হয় প্রত্যেক জাতিরই এক একটি মুখ্য আদর্শ আছে। সেই আদর্শই যেন তাহার জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপ। রাজনীতি, যুদ্ধ, বাণিজ্য বা যন্ত্রবিজ্ঞান ভারতের মেরুদণ্ড নহে; ধর্ম্মই—কেবল ধর্ম্মই ভারতের যথার্থ মেরুদণ্ডস্বরূপ। ধর্ম্মের প্রাধান্য ভারতে চিরকাল।

শারীরিক শক্তিবলে অনেক অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে সত্য; বুদ্ধিবলে বিজ্ঞানসাহায্যে যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহা দ্বারা অনেক অদ্ভুত কার্য্য দেখান যায়, ইহাও সত্য; কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তির যেরূপ প্রভাব, এগুলির প্রভাব তাহার তুলনায় কিছুই নহে।

ভারতের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায়, ভারত বরাবরই কার্য্যকুশল। আজকাল আমরা শিক্ষা পাইয়া থাকি—হিন্দুরা হীনবীর্য্য ও নিষ্কর্ম্মা; যে সকল ব্যক্তির নিকট এই শিক্ষা পাওয়া যায়, তাঁহাদের নিকট আমরা অধিক জ্ঞানের প্রত্যাশা করি। তাঁহাদের শিক্ষায় এই ফল ফলিয়াছে যে অন্যান্য দেশের লোকের নিকট হিন্দুরা হীনবীর্য্য ও নিষ্কর্ম্মা—ইহা একটি কিংবদন্তীস্বরূপ দাঁড়াইয়াছে। ভারত যে কোন কালে নিষ্ক্রিয় ছিল, একথা আমি কোন মতেই স্বীকার করি না। আমাদের এই পবিত্র মাতৃভূমি যেরূপ কর্ম্মপরায়ণ, অন্য কোন স্থানই সেরূপ নহে। তাহার প্রমাণ—এই অতি প্রাচীন মহান্ জাতি এখনও জীবিত রহিয়াছে। আর ইহা মহামহিমময় জীবনের প্রতি সন্ধিতে ইহা যেন অবিনাশী অক্ষয় নব যৌবন লাভ করিতেছে। ভারতে কর্ম্মপরায়ণতা যথেষ্ট আছে

অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতও কর্ম্মপরায়ণ

বটে কিন্তু অপরের উহাতে লক্ষ্য না পড়িবার কারণ এই—মনুষ্য-প্রকৃতিই এই—যে, যে কার্য্য করে বা ভাল বোঝে, সে সেটিকেই জগতের একমাত্র কার্য্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসে! মুচি জুতা শেলাই-ই বুঝে, মিস্ত্রি গাঁথনিই বুঝে—জগতে যে আর কিছু করিবার বা বুঝিবার আছে তাহা তাহাদের বুঝিবার অবসর হয় না। যখন আলোক-পরমাণুর স্পন্দন অতি তীব্র হয়, তখন আমরা আলোক দেখিতে পাই না; কারণ আমাদের দর্শনশক্তির একটা সীমা আছে—তাহার বাহিরে আর আমরা দেখিতে পাইব না। যোগী কিন্তু তাঁহার আধ্যাত্মিক অন্তর্দ্দৃষ্টিবলে সাধারণ অজ্ঞলোকের জড়দৃষ্টি ভেদ করিয়া ভিতরের জিনিস দেখিতে সমর্থ হন।

এক্ষণে সমগ্র জগৎ আধ্যাত্মিক খাদ্যের জন্য ভারতভূমির দিকে তাকাইয়া আছে। আর ভারতকে জগতের সকল জাতির জন্য ইহা যোগাইতে হইবে। এখানেই মানবজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ-সকল বিদ্যমান। পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলী এক্ষণে আমাদের সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনে নিবদ্ধ ভারতবাসীর সনাতন-বিশেষত্ব-পরিচায়ক এই আদর্শকে বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন।

ভারতেতর দেশে ভারতীয় ধর্ম্মের প্রভাব

ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে আলোচনা করিলে দেখা যায়, কোন ধর্ম্মপ্রচারকই ভারতের বাহিরে হিন্দু-মত প্রচারে গমন করেন নাই। কিন্তু এখন আমাদের মধ্যে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আসিতেছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি জগতের কল্যাণের জন্য আবির্ভূত হইয়া থাকি'। ধর্ম্মেতিহাস-গবেষণায় আবিষ্কৃত হইয়াছে যে,

যে কোন জাতির ভিতর উত্তম নীতিশাস্ত্র প্রচলিত, তাহারাই উহার কতক অংশ আমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে, আর যে সকল ধর্ম্মে আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান পরিস্ফুট, তাহারাও মুখ্য বা গৌণ ভাবে উহা আমাদের নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দুর্ব্বলের উপর প্রবলের যেরূপ অত্যাচার, দস্যুতা, জুলুম প্রভৃতি হইতেছে, জগতের ইতিহাসে আর কখনও এরূপ হয় নাই। সকলেই জানেন, বাসনা জয় না করিলে মুক্তি নাই। যে প্রকৃতির দাস, সে কখনও মুক্ত হইতে পারে না। জগতের সমগ্র জাতিই এক্ষণে এই মহাসত্য বুঝিয়া উহার আদর করিতে শিখিতেছে। যখনই শিষ্য এই সত্য-ধারণার উপযুক্ত হয়, তখনই তাহার উপর গুরুর কৃপা হয়। ভগবান্ অনন্ত কাল ধরিয়া সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের প্রতি অনন্ত দয়া প্রকাশ করিয়া তাহাদের জন্য সাহায্য প্রেরণ করিতেছেন। আমাদের প্রভু সকল ধর্ম্মেরই ঈশ্বর—এই উদার ভাব কেবল ভারতেই বর্ত্তমান। জগতের অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে এরূপ উদার ভাব দেখাও, দেখি!

বিধির বিধানে আমরা হিন্দুগণ, বড় কঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ অবস্থায় পড়িয়াছি। পাশ্চাত্য জাতিসকল আমাদের নিকট আধ্যাত্মিক সহায়তার জন্য আসিতেছে। সমগ্র ভারতসন্তানগণের এক্ষণে কর্ত্তব্য—তাহারা যেন সমগ্র জগৎকে মানব-জীবন-সমস্যার প্রকৃষ্ট সমাধান শিক্ষা দিবার জন্য সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগকে উপযুক্ত করে। তাহারা সমগ্র জগৎকে ধর্ম্ম শিখাইতে ধর্ম্মতঃ ন্যায়তঃ বাধ্য। একটি বিষয় আমরা গৌরবের সহিত স্মরণ করিতে পারি। অন্যান্য

দেশের ভাল ভাল ও বড় লোকেরা পার্ব্বত্যদুর্গনিবাসী, পথিকের সর্ব্বস্বলুণ্ঠনকারী দস্যু ব্যারণগণ হইতে তাঁহাদের বংশাবলীর উৎপত্তি হইয়াছে, এইরূপ বাহির করিতে পারিলে বড় প্রীতি ও গৌরব অনুভব করেন। আমরা হিন্দুগণ কিন্তু আমাদিগকে পর্ব্বতগুহানিবাসী ফলমূলাহারী ব্রহ্ম-ধ্যানপরায়ণ ঋষিমুনির বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব অনুভব করি। আমরা এক্ষণে অবনত ও হীন হইয়া থাকিতে পারি, কিন্তু যদি আমরা আমাদের ধর্ম্মের জন্য আবার প্রাণপণ করি, তবে আমরা আবার মহৎপদবীতে উন্নীত হইতে পারি।

হিন্দু ও পাশ্চাত্য জাতির মূল পার্থক্য

আপনারা আমাকে যে হৃদয়ের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছেন, তজ্জন্য আমার হৃদয়ের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। রামনাদের রাজা আমার উপর যে ভালবাসা দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার প্রতি আমি যে কি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ, তাহা ভাষায় প্রকাশে অক্ষম। যদি আমার দ্বারা কিছু সৎকার্য্য হইয়া থাকে, তবে তাহার প্রত্যেকটির জন্য ভারত এই মহাপুরুষের নিকট ঋণী; কারণ, আমাকে চিকাগোয় পাঠাইবার কল্পনা তাঁহার মনেই প্রথম উদিত হয়, তিনিই আমার মাথায় ঐ ভাব প্রবেশ করাইয়া দেন এবং উহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আমাকে বার বার উত্তেজিত করেন। তিনি এক্ষণে আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহে আরো অধিক কার্য্যের আশা করিতেছেন। যদি ইঁহার ন্যায় আরো কয়েকজন রাজা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির কল্যাণে আগ্রহান্বিত হইয়া ইহার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন, তবে বড়ই ভাল হয়।

স্বামিজীর উত্তর শেষ হইলে তিনি একখানি গাড়ীতে চড়িয়া রাজার বাঙ্গলাভিমুখে চলিলেন। রাজার অভিপ্রায়ানুসারে গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া লওয়া হইল—সকলে মিলিয়া, এমন কি, রাজা পর্য্যন্ত সেই শকট সেই ক্ষুদ্র সহরের মধ্য দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। তিন দিন স্বামিজী এখানে বড়ই আনন্দে কাটাইলেন। পাম্বান ও তন্নিকটবর্ত্তী রামেশ্বরের অনেক অধিবাসী এই সময়ে আসিয়া স্বামিজীর দর্শনলাভ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিল। একদিন স্বামিজী রামেশ্বর মন্দির দর্শনার্থে গমন করিলেন। প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে স্বামিজী এখানে পদব্রজে আসিয়াছিলেন। তখন তিনি সাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন না। যাহা হউক, স্বামিজীর গাড়ী যখন মন্দির সন্নিধানে পৌছিল, তখন এক বৃহতী জনতা হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব, মন্দিরের চিহ্নিত পতাকা, দেশী সঙ্গীত এবং অন্যান্য সম্মানের চিহ্ন লইয়া উপস্থিত হইল। মন্দিরে উপস্থিত হইবার পর স্বামিজী ও তাঁহার শিষ্যবর্গকে মন্দিরের মণিমাণিক্য হীরা জহরত প্রভৃতি প্রদর্শিত হইল। স্বামিজী সমস্ত মন্দিরটি বেড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাকে মন্দিরের অদ্ভুত কারুকার্য্য সকল প্রদর্শিত হইতে লাগিল। সহস্র স্তম্ভোপরি স্থাপিত চাঁদনীটিও স্বামিজী দেখিলেন। অবশেষে তাঁহাকে সমবেত লোকগণের সমক্ষে বক্তৃতা দিতে বলা হইল। স্বামিজী ইংরাজীতে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। নাগলিঙ্গম্ মহাশয় তামিল ভাষায় অনুবাদ করিয়া শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইতে লাগিলেন।

রামেশ্বর মন্দিরে বক্তৃতা

ধর্ম্ম অনুরাগে—অনুষ্ঠানে নহে। হৃদয়ের পবিত্র ও

অকপট প্রেমেই ধর্ম্ম। যদি দেহ মন শুদ্ধ না হয়, তবে মন্দিরে গিয়া শিবপূজা করা বৃথা! যাহাদের দেহ মন পবিত্র, শিব তাহাদেরই প্রার্থনা শুনেন। আর যাহারা অশুদ্ধস্বভাব হইয়াও অপরকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে যায়, তাহারা অসদ্গতি প্রাপ্ত হয়। বাহ্য পূজা মানস পূজার বহিরঙ্গ মাত্র—মানস পূজা ও চিত্তশুদ্ধিই আসল জিনিস। এইগুলি না থাকিলে বাহ্য পূজায় কোন ফললাভ হয় না। এই কলিযুগে লোকে এত হীনস্বভাব হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহারা মনে করে—তাহারা যাহা খুশি করুক না কেন, তীর্থস্থানে গমন করিবামাত্র তাহাদের পাপ ক্ষালিত হইয়া যাইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যদি কেহ অপবিত্রভাবে কোন তীর্থে গমন করে, তবে সেখানে অপরাপর ব্যক্তির যত পাপ সব তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়ে—তখন তাহাকে আরও গুরুতর পাপের বোঝা লইয়া গৃহে ফিরিতে হয়। তীর্থে সাধুগণ বাস করেন, তথায় অন্যান্য পবিত্রভাবোদ্দীপক বস্তুসমূহও থাকে। কিন্তু যদি কোন স্থানে কেবল কতকগুলি সাধু ব্যক্তি বাস করেন, অথচ সেখানে যদি একটিও মন্দির না থাকে, তাহাকেই তীর্থ বলিতে হইবে। যদি কোন স্থানে শত শত মন্দির থাকে, অথচ যদি তথায় অনেক অসাধু লোক বাস করে, তবে সেই স্থানের আর তীর্থত্ব থাকে না। আবার তীর্থে বাস করাও বড় কঠিন ব্যাপার। কারণ, অন্য স্থানের পাপ তীর্থে খণ্ডে কিন্তু তীর্থের পাপ কিছুতেই খণ্ডে না। সকল উপাসনার সার এই—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন। যিনি দরিদ্র, দুর্ব্বল, রোগী সকলেরই মধ্যে শিব দেখেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা

যথার্থ শিবপূজা

করেন। আর যে ব্যক্তি কেবল প্রতিমার মধ্যে শিব উপাসনা করে, সে প্রবর্ত্তক মাত্র। যে ব্যক্তি জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে একটি দরিদ্র ব্যক্তিকেও শিববোধে সেবা করে, তাহার প্রতি শিব, যে ব্যক্তি কেবল মন্দিরেই শিব দর্শন করে, তাহার অপেক্ষা অধিক প্রসন্ন হন।

কোন ধনী ব্যক্তির এক বাগান ছিল—তাহার দুই মালী ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন খুব অলস, সে কোন কাজ করিত না; কিন্তু তাহার প্রভু আসিবামাত্র করজোড়ে 'প্রভুর কিবা রূপ, কিবা গুণ' বলিয়া তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিত। অপর মালীটি বেশী কথা জানিত না—সে খুব পরিশ্রম করিয়া প্রভুর বাগানে সকল প্রকার ফল ও শাকসব্‌জি উৎপন্ন করিত ও সেইগুলি মাথায় করিয়া অনেক দূরে তাহার প্রভুর বাটীতে লইয়া যাইত। বল দেখি, এই দুই জন মালীর ভিতরে প্রভু সর্ব্বাপেক্ষা কাহাকে অধিক ভালবাসিবেন? এইরূপ শিব আমাদের সকলের প্রভু, জগৎ তাঁহার উদ্যানস্বরূপ, আর এখানে দুই প্রকার মালী আছে।

দুই প্রকার মালী

এক প্রকার মালীরা অলস কপট, কিছুই করিবে না, কেবল শিবের রূপের—তাঁহার চোখ নাক ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা করিবে; আর এক প্রকার লোক আছেন, যাঁহারা শিবের দরিদ্র, দুর্ব্বল সন্তানগণের জন্য, তাঁহার সৃষ্ট সকল প্রাণীর কল্যাণের জন্য চেষ্টা করেন। এই দ্বিবিধপ্রকৃতিবিশিষ্ট লোকের মধ্যে শিবের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় কে হইবে? নিশ্চয়ই যিনি শিবের সন্তানগণের সেবা করেন। যিনি পিতাকে সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে তাঁহার সন্তানগণের

সেবা অগ্রে করিতে হইবে। যিনি শিবের সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে তাঁহার সন্তানগণের সেবা সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে—অগ্রে জগতের জীবগণের সেবা করিতে হইবে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যাঁহারা ভগবানের দাসগণের সেবা করেন, তাঁহারাই ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাস। অতএব এইটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

আমি তোমাদিগকে পুনরায় বলিতেছি, তোমাদিগকে শুদ্ধচিত্ত হইতে হইবে, এবং যে কেহ তোমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়, যথাসাধ্য তাহার সেবা করিতে হইবে। এইরূপ ভাবে পরের সেবা শুভ কর্ম্ম। এই সৎকর্ম্মবলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সকলের অভ্যন্তরে যে শিব রহিয়াছেন, তিনি প্রকাশিত হন। তিনি সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। যদি দর্পণের উপর ধূলি ও ময়লা থাকে, তবে তাহাতে আমরা আমাদের মূর্ত্তি দেখিতে পাই না। আমাদের হৃদয়-দর্পণেও এইরূপ অজ্ঞান ও পাপের ময়লা রহিয়াছে।

নিস্বার্থতাই যথার্থ উপাসনা

সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান পাপ এই স্বার্থপরতা—আগে নিজের ভাবনা ভাবা। যে মনে করে, আমি আগে খাইব, আমি অপরাপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্যশালী হইব, আমি সর্ব্বসম্পদের অধিকারী হইব, যে মনে করে, আমি অপরের অগ্রে স্বর্গে যাইব, আমি অপরের অগ্রে মুক্তিলাভ করিব, সেই ব্যক্তিই স্বার্থপর। স্বার্থশূন্য ব্যক্তি বলেন, আমি সকলের অগ্রে যাইতে চাই না, সকলের শেষে যাইব—আমি স্বর্গে যাইতে চাই না—যদি আমার ভ্রাতৃবর্গের সাহায্যের জন্য নরকে যাইতে হয়, তাহাতেও প্রস্তুত আছি। কেহ ধাম্মিক কি অধাম্মিক পরখ করিতে হইলে দেখিতে হইবে, সে ব্যক্তি কতদূর

নিঃস্বার্থ। যে অধিক নিঃস্বার্থ সেই অধিক ধার্ম্মিক, সেই শিবের সামীপ্য লাভ করে। সে পণ্ডিতই হউক, মূর্খই হউক, সে শিবের বিষয় কিছু জানুক বা না জানুক, সে অপর ব্যক্তি অপেক্ষা শিবের অধিক নিকটবর্ত্তী। আর যদি কেহ স্বার্থপর হয়, সে যদি জগতে যত দেবমন্দির আছে, সব দেখিয়া থাকে, সব তীর্থ দর্শন করিয়া আসিয়া থাকে, সে যদি চিতাবাঘের মত সাজিয়া বসিয়া থাকে, তাহা হইলেও সে শিব হইতে অনেক দূরে অবস্থিত।

পাম্বানে স্বামিজীর স্মৃতিস্তম্ভ

পাশ্চাত্যদেশে ধর্ম্মপ্রচারের পর স্বামিজী ভারতবর্ষে আসিয়া প্রথম পাম্বানে পদার্পণ করেন। এই ঘটনা স্মরণার্থ রামনাদের রাজা একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। উহার উপর যে কথাগুলি ক্ষোদিত আছে, তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল :—

"পাশ্চাত্যদেশে স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তধর্ম্ম প্রচারে অপূর্ব্ব সফলতা লাভের পর তাঁহার ইংরাজ শিষ্যগণের সহিত ভারতের যে স্থানে প্রথম পদার্পণ করেন, রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতি সেই স্থানে এই স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিলেন।"

রামনাদে অভ্যর্থনা

পাঠকবর্গের জানা আবশ্যক, পাম্বান ভারতের নিকটবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্রদ্বীপ। সুতরাং পাম্বান হইতে আবার জাহাজে চড়িয়া ভারতে আসিতে হইল। ভারতে পৌঁছিয়া রামনাদের রাজার ছত্রে স্বামিজী প্রাতর্ভোজনক্রিয়া নির্ব্বাহ করিলেন। তারপর তিরুপিলানি নামক স্থানে পৌঁছিলে তথাকার অধিবাসিগণ

স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করিলেন। সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় রামনাদ দেখা গেল। সমুদ্রতীর হইতে স্বামিজী বরাবর গো-শকটে যাইতেছিলেন, কিন্তু রামনাদের নিকট পৌঁছিয়া স্বামিজী একখানি নৌকায় উঠিয়া একটি বৃহৎ হ্রদের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলেন। দাক্ষিণাত্যে এরূপ অনেক বড় বড় হ্রদ আছে। সুতরাং রামনাদে উক্ত হ্রদের তীরে স্বামিজীর অভ্যর্থনা হইল। হ্রদতীরে অভ্যর্থনা হওয়ার দরুণ সভা বেশ জমিয়াছিল। রামনাদের রাজা অবশ্য অভ্যর্থনাকারীদের অগ্রণী। তিনি স্বয়ং স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া রামনাদের কয়েকটি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দিলেন। যখন সকলে রামনাদের নিকট পৌঁছিয়াছিলেন, তখনই স্বামিজীর সম্মানার্থ তোপ পড়িতে আরম্ভ হইয়াছিল। যখন রামনাদে পৌঁছিলেন, তখন হাউই (Rocket) বাজি ছোড়া হইতে লাগিল। স্বামিজী রাজার গাড়ীতে চড়িয়া রাজভ্রাতা পরিচালিত রাজার শরীর-রক্ষকগণের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া চলিতে লাগিলেন। রাজা পদব্রজে সমবেত জনতার নেতৃস্বরূপ হইয়া স্বামিজীর অনুধাবন করিতে লাগিলেন। রাস্তার দুই ধারে মশাল জ্বলিতেছিল। দেশী বিলাতী দুই প্রকার বাদ্য হইতেছিল। স্বামিজীর জাহাজ হইতে নামিবার পর হইতে নগর প্রবেশ পর্য্যন্ত বিলাতী বাদ্য চলিতেছিল—তাহারা 'হের, এসেছেন বিজয়ী বীর' (See the conquering hero comes) এই গান গাহিতেছিল। অৰ্দ্ধেক পথ এইরূপে আসা হইলে রাজা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া স্বামিজী সুন্দর রাজশিবিকায় আরোহণ করিয়া শঙ্কর-ভিলায় আসিলেন। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর স্বামিজী উক্ত স্থানের বৃহৎ বক্তৃতাহলে গমন করিলেন।

ইতোমধ্যেই তথায় লোকের ভিড় হইয়া গিয়াছিল। স্বামিজীকে দেখিবামাত্র তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। রাজা প্রথমতঃ স্বামিজীকে বহু প্রশংসাবাদ করিয়া তাঁহার ভ্রাতা রাজা দিনকর সেতুপতিকে নিম্নলিখিত অভিনন্দনপত্র পাঠ করিতে বলিলেন। অভিনন্দন পাঠ শেষ হইলে উক্ত অভিনন্দনপত্রটি অতি সুন্দর কারুকার্য্যখচিত একটি বড় রূপার গিল্‌টি-করা বাক্সে করিয়া তাঁহাকে উপহারস্বরূপ প্রদত্ত হইল।

রামনাদ অভিনন্দন

শ্রীপরমহংসযতিরাজদিগ্বিজয়কোলাহলসর্ব্বমতসম্প্রতিপন্নপরমযোগেশ্বরশ্রীমদ্ভগবচ্ছ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসকরকমলসঞ্জাত রাজাধিরাজসেবিত শ্রীবিবেকানন্দস্বামিপূজ্যপাদেষু,

স্বামিন্,

এই প্রাচীন ঐতিহাসিক সংস্থান সেতুবন্ধ রামেশ্বর বা রামনাথপুরম্ অথবা রামনাদের অধিবাসী আমরা—আমাদের এই মাতৃভূমিতে সাদরে আপনাকে 'স্বাগত' সম্ভাষণ করিতেছি। যে স্থান সেই মহাধর্ম্মবীর আমাদের পরম ভক্তিভাজন প্রভু শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের পদার্পণে পবিত্র হইয়াছে, সেই ভারতে প্রথম পদার্পণের সময় আমরা যে প্রথমেই আপনাকে আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তি-অর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছি, ইহাতে আমরা আপনাদিগকে মহা-সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিতেছি।

আমাদের মহান্ সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃত মহত্ত্ব পাশ্চাত্যদেশের মনীষিগণের চিত্তে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য আপনি যে

চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসার্হ এবং ঐ চেষ্টায় অভূত-পূর্ব্ব সুফল ফলিয়াছে, তাহাতে আমরা অকপট আনন্দ ও গৌরব অনুভব করিয়াছি। আপনি অপূর্ব্ব বাগ্মিতাসহকারে ও স্পষ্ট অভ্রান্ত ভাষায় ইউরোপ ও আমেরিকার শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট ঘোষণা করিয়াছেন ও তাঁহাদিগের হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস করাইয়া দিয়াছেন যে, হিন্দুধর্ম্মই আদর্শ সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম এবং উহা সকল জাতি ও সকল ধর্ম্মাবলম্বী নরনারীরই প্রকৃতির উপযোগী। আপনি মহানিঃস্বার্থ ভাবের প্রেরণায়, মহোচ্চ উদ্দেশ্য প্রাণে লইয়া ও মহা স্বার্থত্যাগ করিয়া সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ইউরোপ ও আমেরিকায় সত্য ও শান্তির সংবাদ বহন করিয়াছেন এবং ভারতের আধ্যাত্মিক জয়পতাকা উড়াইয়াছেন। আপনি উপদেশে ও জীবনে উভয়তঃ সার্ব্বভৌম ভ্রাতৃভাবের প্রয়োজনীয়তা ও কার্য্যে পরিণতির সম্ভাবনীয়তা দেখাইয়াছেন। সর্ব্বোপরি আপনার পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রচারের ফলে গৌণভাবে ভারতের উদাসীন পুত্রকন্যাগণের প্রাণে অনেক পরিমাণে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের আধ্যাত্মিক মহত্ত্বের ভাব জাগরিত হইয়াছে এবং তাহাদের পরম প্রিয় অমূল্যধর্ম্মের চর্চ্চা ও অনুষ্ঠানে একটা আন্তরিক আগ্রহ জন্মিয়াছে।

এইরূপে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় প্রদেশের আধ্যাত্মিক পুন-রুত্থানের জন্য আপনি যে নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনার প্রতি বাক্যের দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে আমরা অক্ষম। আপনার অন্যতম অনুরক্ত শিষ্য আমাদের রাজার প্রতি আপনি যে বরাবরই পরম অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন,

এ কথা উল্লেখ না করিলে এই অভিনন্দনপত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার রাজ্যে প্রথম পদার্পণ করার জন্য তিনি আপনাকে যেরূপ সম্মানিত ও গৌরবান্বিত বোধ করিতেছেন, তাহা তিনি ভাষায় প্রকাশে অসমর্থ।

উপসংহারে আমরা সেই সর্ব্বশক্তিমানের নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন, আপনি যে কল্যাণকর কার্য্য এত সুন্দররূপে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা পরিচালন করিতে আপনাকে দীর্ঘ জীবন, স্বাস্থ্য ও বল প্রদান করেন। আপনার পরম ভক্ত আজ্ঞাবহ শিষ্য-গণের শ্রদ্ধা ও প্রেমসহকৃত এই অভিনন্দন।

(২৫শে জানুয়ারী, ১৮৯৭)

স্বামিজী এই অভিনন্দনের যে উত্তর প্রদান করেন, তাহার সমগ্রটির বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল :—

রামনাদ অভিনন্দনের উত্তর

ভারত আবার জাগিতেছে

সুদীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়া বোধ হইতেছে। মহাদুঃখ অবসান প্রায় প্রতীত হইতেছে। মহানিদ্রায় নিদ্রিত শব যেন জাগ্রত হইতেছে। ইতিহাসের কথা দূরে থাকুক, কিংবদন্তী পর্য্যন্ত যে সুদূর অতীতের ঘনান্ধকার ভেদে অসমর্থ, তথা হইতে এক অপূর্ব্ব বাণী যেন শ্রুতিগোচর হইতেছে। জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মের অনন্ত হিমালয়স্বরূপ আমাদের মাতৃভূমি ভারতের প্রতিশৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইয়া যেন ঐ বাণী মৃদু অথচ দৃঢ় অভ্রান্ত ভাষায় কোন্ অপূর্ব্ব রাজ্যের সংবাদ বহন করিতেছে। যতই দিন যাইতেছে, ততই যেন উহা স্পষ্টতর, ততই

যেন উহা গভীরতর হইতেছে। যেন হিমালয়ের প্রাণপ্রদ বায়ুস্পর্শে মৃতদেহের শিথিলপ্রায় অস্থিমাংসে পর্য্যন্ত প্রাণসঞ্চার করিতেছে—নিদ্রিত শব জাগ্রত হইতেছে। তাহার জড়তা ক্রমশঃ দূর হইতেছে। অন্ধ যে সে দেখিতেছে না, বিকৃতমস্তিষ্ক যে সে বুঝিতেছে না যে, আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই এক্ষণে ইঁহার গতিরোধে সমর্থ নহে, আর ইনি নিদ্রিত হইবেন না—কোন বহিঃস্থ শক্তিই এক্ষণে আর ইঁহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিবে না, কুম্ভকর্ণের দীর্ঘনিদ্রা ভাঙ্গিতেছে।

হে রাজন্, হে রামনাদবাসী ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা যে দয়া প্রকাশ করিয়া হৃদয়ের সহিত আমাকে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনারা আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আপনারা আমার প্রতি যে হৃদয়ের সহিত ভালবাসা প্রকাশ করিতেছেন, ইহা আমি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছি। কারণ, মুখের ভাষা অপেক্ষা হৃদয়ে হৃদয়ে ভাববিনিময় অতি অপূর্ব্ব—আত্মা নীরবে অথচ অভ্রান্ত ভাষায় অপর আত্মার সহিত বাক্যালাপ করেন—তাই আমি আপনাদের ভাব প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি। হে রামনাদাধিপ, আমাদের ধর্ম্ম ও মাতৃভূমির জন্য যদি এই দীনজনের দ্বারা পাশ্চাত্যদেশে কোন কার্য্য কৃত হইয়া থাকে, যদি আমাদের স্বদেশবাসীর চিত্ত তাহাদের গৃহেই অজ্ঞাত ও গুপ্তভাবে রক্ষিত অমূল্য রত্নরাজীর প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য কোন কার্য্য কৃত হইয়া থাকে, যদি তাহারা, অজ্ঞানান্ধতাবশে তৃষ্ণার তাড়নায় প্রাণত্যাগ না করিয়া বা অপর স্থানের মলিন পয়ঃপ্রণালীর

জলপান না করিয়া তাহাদের স্বগৃহসমীপবর্ত্তিনী অনন্তপ্রবাহিণী নির্ঝরিণীর নির্ম্মল জল পান করিতে আহূত হইয়া থাকে, যদি আমাদের স্বদেশবাসীকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে কর্ম্মপরায়ণ করিবার জন্য, রাজনৈতিক উন্নতি, সমাজসংস্কার বা কুবেরের ঐশ্বর্য্য হইলেও ধর্ম্মই যে ভারতের প্রাণ, ধর্ম্ম গেলেই যে ভারতের প্রাণও যাইবে, ইহা বুঝাইবার জন্য যদি কোন কর্ম্ম কৃত হইয়া থাকে, হে রামনাদাধিপ, ভারত অথবা ভারতেতর প্রদেশে মৎকর্ত্তৃক যে কিছু কার্য্য হইয়াছে, তাহার জন্য প্রশংসার ভাগী আপনি। কারণ, আপনিই আমার মস্তকে প্রথম এই ভাব প্রবেশ করাইয়া দেন এবং আপনিই পুনঃ পুনঃ আমাকে কার্য্যের জন্য উত্তেজিত করেন। আপনি যেন অন্তর্দৃষ্টি বলে ভবিষ্যৎ জানিতে পারিয়া আমাকে বরাবর সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন, কখনই আমাকে উৎসাহ দিতে বিরত হন নাই। অতএব আপনি যে আমার সফলতায় প্রথম আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন এবং আমি যে ভারতে আসিয়া প্রথম আপনার রাজ্যে নামিলাম, ইহা ঠিকই হইয়াছে। হে ভদ্র মহোদয়গণ, আপনাদের রাজা যেমন পূর্ব্বেই বলিয়াছেন—আমাদিগকে বড় বড় কাজ করিতে হইবে, অদ্ভুত শক্তির বিকাশ দেখাইতে হইবে, অপর জাতিকে আমাদিগকে অনেক বিষয় শিখাইতে হইবে। দর্শন ধর্ম্ম বা নীতিবিজ্ঞানই বল অথবা মধুরতা কোমলতা বা মানবজাতির প্রতি অকপট প্রীতিরূপ সদ্‌গুণরাজিই বল, আমাদের এই মাতৃভূমি এই সকলেরই প্রসূতি। এখনও ভারতে এইগুলি বিদ্যমান আর আমি পৃথিবীর সম্বন্ধে যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমি এখন দৃঢ়ভাবে সাহসের সহিত বলিতে পারি, এখনও ভারত এই

সকল বিষয়ে পৃথিবীর সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই সামান্য আশ্চর্য্য ব্যাপারটি লক্ষ্য করিয়া দেখুন। গত ৪।৫ বর্ষ ধরিয়া জগতে অনেক গুরুতর রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। পাশ্চাত্যদেশের সর্ব্বত্রই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সম্প্রদায় উঠিয়া উহার বিভিন্ন প্রদেশের প্রচলিত নিয়মপদ্ধতিসমূহকে একেবারে বিপর্য্যস্ত করিবার চেষ্টা করিয়া কতক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইতেছে। আমাদের দেশের লোককে জিজ্ঞাসা করুন, তাহারা এ সকলের কথা কিছু শুনিয়াছে কি না। তাহারা কিছুই শুনে নাই। কিন্তু চিকাগোয় ধর্ম্মমহাসভা বসিয়াছিল, ভারত হইতে সেই মহাসভায় একজন সন্ন্যাসী প্রেরিত হইয়া সাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন এবং সেই অবধি পাশ্চাত্যদেশে কার্য্য করিতেছেন, এখানকার অতি দরিদ্র ভিক্ষুক পর্য্যন্ত তাহা জানে। লোকে বলিয়া থাকে, আমাদের দেশের সাধারণ লোক বড় স্থূলবুদ্ধি, তাহারা দুনিয়ার কোন প্রকার সংবাদ রাখে না, সংবাদ চাহেও না। পূর্ব্বে আমারও ঐ মতের দিকে ঝোঁক ছিল, কিন্তু এখন বুঝিতেছি, আমি অনভিজ্ঞতাবশতঃ ওরূপ মনে করিতাম। না দেখিয়া কাল্পনিক গবেষণা অপেক্ষা অথবা একনিঃশ্বাসে ভূপ্রদক্ষিণকারী ও ত্বরিতদৃষ্টিতে দেশদর্শকগণের পুস্তক পাঠ অপেক্ষা নিজের চোখে দেখিলে অনেক বেশী জ্ঞানলাভ হয়। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই জ্ঞানলাভ করিয়াছি যে, আমাদের দেশের সাধারণ লোক নির্ব্বোধও নহে অথবা তাহারা যে জগতের সংবাদ লইতে কম ব্যাকুল, তাহাও নহে; জগতের অন্যান্য স্থানের লোক যেমন সংবাদ সংগ্রহে আগ্রহান্বিত, ইহারাও তদ্রূপ।

ধর্ম্মই ভারতের মেরুদণ্ড, রাজনীতি বা অপর কিছু নহে

তবে প্রত্যেক জাতিরই এক একটি জীবনোদ্দেশ্য আছে। প্রত্যেক জাতিই প্রাকৃতিক নিয়মে কতকগুলি বিশেষত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সকল জাতি মিলিয়া যেন এক মহা ঐক্যতান বাদ্যের সৃষ্টি করিয়াছে—প্রত্যেক জাতিই যেন উহাতে এক একটি পৃথক্ পৃথক্ সুর দিতেছে। উহাই উহার জীবনীশক্তি। উহাই উহার জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড, মূলভিত্তি। আমাদের এই পবিত্র মাতৃভূমির মূলভিত্তি, মেরুদণ্ড বা জীবনকেন্দ্র একমাত্র ধর্ম্ম। অপরে রাজনীতির কথা বলুক, বাণিজ্যবলে অগাধ ধনরাশি উপার্জ্জনের গৌরব, বাণিজ্যনীতির শক্তি ও উহার প্রচার, বাহ্য স্বাধীনতা-লাভের অপূর্ব্ব সুখের কথা বলুক। হিন্দু এ সকল বুঝে না, বুঝিতে চাহেও না। তাঁহাদের সহিত ধর্ম্ম, ঈশ্বর, আত্মা, অনন্ত, মুক্তি—এ সকল সম্বন্ধে কথা বলুন। আমি আপনাদিগকে নিশ্চিত বলিতেছি, অন্যান্য দেশের অনেক তথাকথিত দার্শনিক হইতে আমাদের দেশের হীনতম কৃষক পর্য্যন্ত এ সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে অধিক অভিজ্ঞ। ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদিগকে বলিয়াছি, এখনও আমাদিগের জগৎকে শিখাইবার কিছু আছে। এই কারণেই শত শত বর্ষ অত্যাচারেও প্রায় সহস্র বর্ষ ধরিয়া বৈদেশিক শাসনে ও পীড়নেও এই জাতি এখনও জীবিত রহিয়াছে। এই জাতি এখনও জীবিত—কারণ, এখনও এই জাতি ঈশ্বর ও ধর্ম্মরূপ মহারত্নকে পরিত্যাগ করে নাই।

আমাদের এই মাতৃভূমিতে এখনও যে ধর্ম্ম ও অধ্যাত্মবিদ্যারূপ নির্ঝরিণী বহিতেছে, এখনও তাহা হইতে মহাবন্যা প্রবাহিত হইয়া সমগ্র জগৎকে ভাসাইয়া রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ ও প্রতিদিন নূতন

ভাবে সমাজগঠনের চেষ্টায় প্রায় অর্দ্ধমৃত হীনদশাপন্ন পাশ্চাত্য ও অন্যান্য জাতিকে নূতন জীবন প্রদান করিবে। নানাবিধ মত-মতান্তরের বিভিন্ন সুরে ভারতগগন প্রতিধ্বনিত হইতেছে সত্য,

ত্যাগ

কোন সুর ঠিক তালে মানে বাজিতেছে, কোনটি বা বেতালা বটে, কিন্তু বেশ বুঝা যাইতেছে, উহাদের মধ্যে একটি প্রধান সুর যেন ভৈরব রাগে সপ্তমে উঠিয়া অপর-গুলিকে আর শ্রুতিবিবরে পৌছিতে দিতেছে না। ত্যাগের ভৈরব রাগের নিকট অন্যান্য রাগরাগিণী যেন লজ্জায় মুখ লুকাইয়াছে। 'বিষয়ান্ বিষবৎ ত্যজ'—ভারতীয় সকল শাস্ত্রেই এই কথা—ইহাই সকল শাস্ত্রের মূলতত্ত্বস্বরূপ। দুনিয়া দুদিনের একটা মায়ামাত্র। জীবন ত ক্ষণিক মাত্র। ইহার পশ্চাতে দূরে—অতি দূরে, সেই অনন্ত অপার রাজ্য—যাও, সেখানে চলিয়া যাও। এ রাজ্য মহা-বীর মনীষিগণের হৃদয়জ্যোতিতে উদ্ভাসিত, তাঁহারা এই তথা-কথিত অনন্ত জগৎকেও একটি ক্ষুদ্র মৃত্তিকাস্তূপমাত্র জ্ঞান করেন—তাঁহারা ক্রমশঃ সে রাজ্য ছাড়াইয়া আরও দূরে—দূরতম রাজ্যে চলিয়া যান। কাল, অনন্ত কালেরও তথায় অস্তিত্ব নাই—তাঁহারা কালের সীমা ছাড়াইয়া দূরে—অতি দূরে চলিয়া যান। তাঁহাদের পক্ষে দেশেরও সত্তা নাই—তাঁহারা তাহারও পারে যাইতে চাহেন। ইহাই ধর্ম্মের গূঢ়তম রহস্য। ভূতপ্রকৃতিকে এইরূপে অতিক্রম করিবার চেষ্টা, যেরূপেই হউক, যতই ক্ষতিস্বীকার করিয়া হউক, কোনরূপে প্রকৃতির মুখের অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া অন্ততঃ এক-বারও চকিতের মত সেই দেশকালাতীত সত্তার দর্শনচেষ্টা—ইহাই আমাদের জাতির প্রকৃতি। তোমরা আমাদের জাতিকে উৎসাহ

উদ্দীপনায় মাতাইতে চাও—তাহাদিগকে এই রাজ্যের কোন সংবাদ দাও—তাহারা মাতিবে। তোমরা তাহাদের নিকট রাজনীতি সমাজসংস্কার ধনসঞ্চয়ের উপায় বাণিজ্যনীতি প্রভৃতি যাহাই বল না, তাহারা এক কান দিয়া শুনিবে, অপর কান দিয়া তাহা বাহির হইয়া যাইবে। অতএব জগৎকে তোমাদিগকে এই ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে হইবে। এখন প্রশ্ন এই, জগতের নিকট আমাদের কিছু শিখিবার আছে কি না। সম্ভবতঃ অপর জাতির নিকট হইতে আমাদিগকে কিছু বহির্ব্বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে, কিরূপে দল গঠন ও পরিচালন করিতে হয়, বিভিন্ন শক্তিকে প্রণালীবদ্ধভাবে কাজে লাগাইয়া কিরূপে অল্প চেষ্টায় অধিক ফললাভ করিতে হয়, তাহা শিখিতে হইবে। ত্যাগ আমাদের সকলের লক্ষ্য হইলেও আমাদের দেশের সকল লোক যতদিন পর্য্যন্ত না সম্পূর্ণরূপে ত্যাগে সমর্থ হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত সম্ভবতঃ পাশ্চাত্যদিগের নিকট ঐ সকল বিষয় কিছু কিছু শিখিতে হইবে! কিন্তু মনে রাখা উচিত—ত্যাগই আমাদের সকলের আদর্শ। যদি কেহ ভারতে ভোগসুখই পরম-পুরুষার্থ বলিয়া প্রচার করে, যদি কেহ জড়জগৎই ভারতবাসীর ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করে, তবে সে মিথ্যাবাদী। এই পবিত্র ভারতভূমে তাহার স্থান নাই—ভারতের লোক তাহার কথা শুনিতে চায় না। পাশ্চাত্য-সভ্যতার যতই চাকচিক্য ও ঔজ্জ্বল্য থাকুক না কেন, উহা যতই অদ্ভুতব্যাপারসমূহ প্রদর্শন করুক না কেন,—আমি এই সভায় দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, ও সব মিথ্যা, ভ্রান্তি—ভ্রান্তিমাত্র। ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, আত্মাই একমাত্র সত্য, ধর্ম্মই একমাত্র সত্য। ঐ সত্য ধরিয়া থাক।

তথাপি যাহারা উচ্চতম সত্যের এখনও অধিকারী হয় নাই, আমাদের এরূপ ভ্রাতৃবর্গের পক্ষে এই প্রকার জড়বাদ সম্ভবতঃ কল্যাণের কারণ হইতে পারে—অবশ্য উহা আমাদের কার্য্যোপযোগী করিয়া লইতে হইবে। সকল দেশেই, সকল সমাজেই একটি বিষম ভ্রম চলিয়া আসিতেছে। আর বিশেষ তুঃখের বিষয় এই যে, যে ভারতে পূর্ব্বে এই ভ্রম কখনও হয় নাই, কিছুদিন হইতে সেখানেও এই ভ্রান্তি প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সেই ভ্রম এই—অধিকারী বিচার না করিয়া সকলের পক্ষে একরূপ ব্যবস্থা প্রদান। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু সকলের এক পথ নহে। তুমি যে সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছ, আমারও সেই প্রণালী হইতে পারে না। তোমরা সকলে জান, সন্ন্যাস-আশ্রমই হিন্দু-জীবনের চরম লক্ষ্য। আমাদের শাস্ত্র সকলকে সন্ন্যাসী হইতে আদেশ করিতেছেন। যে না করে, সে হিন্দু নহে, তাহার নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার নাই। সে শাস্ত্রের অমান্যকারী। সংসারের সুখ সমুদয় ভোগ করিয়া প্রত্যেক হিন্দুকেই জীবনের শেষভাগে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে। যখন ভোগের দ্বারা প্রাণে প্রাণে বুঝিবে যে, সংসার অসার —তখন তোমাকে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে। আমরা জানি—ইহাই হিন্দুর আদর্শ। যখন বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া বুঝিবে, সংসারফলের ভিতরটা ভুয়ামাত্র—আমড়ার ন্যায় উহার আঁটি ও চামড়াই সার, তখন সংসার ত্যাগ করিয়া যেখান হইতে আসিয়াছ, তথায় ফিরিবার চেষ্টা কর। মন যেন চক্রগতিতে সম্মুখে ইন্দ্রিয়ের দিকে ধাবমান হইতেছে—উহাকে আবার চক্রগতিতে

জড়বাদের প্রয়োজনীয়তা

ফিরিয়া পশ্চাতে আসিতে হইবে। প্রবৃত্তিমার্গ ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তিমার্গের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে—ইহাই আদর্শ। কিন্তু কতকটা ভোগ না করিলে এই আদর্শে উপনীত হওয়া যায় না। শিশুকে ত্যাগধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া যায় না। সে জন্মিয়া অবধি সোনার স্বপন দেখিতেছে। সে ইন্দ্রিয়গতপ্রাণ—তাহার জীবনটা কতকগুলি ইন্দ্রিয়সুখের সমষ্টিমাত্র। সকল সমাজের বালকবৎ অজ্ঞান লোকসকলও এইরূপ। তাহাদিগকে সংসারের অসারতা বুঝিতে হইলে প্রথমে তাহাদিগকে কিছু ভোগ করিতে হইবে—তবেই তাহারা বৈরাগ্য লাভ করিতে সমর্থ হইবে। আমাদের শাস্ত্রে ইহার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরবর্ত্তী কালে সন্ন্যাসীর নিয়ম অনুসারে সমাজের আপামর সাধারণ সকলকে পরিচালিত করিবার একটা বিশেষ চেষ্টা হইয়াছে। ইহা মহা ভুল। ভারতে যে দুঃখদারিদ্র্য দেখা যাইতেছে, তাহা অনেকটা এই কারণেই হইয়াছে। গরীব লোকের অত শত ধর্ম্মের বাঁধনের কোন আবশ্যকতা নাই—অথচ তাহাকে নানাবিধ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক নিয়মে বাঁধিবার চেষ্টা! তাহাকে অত বাঁধিবার চেষ্টা না করিয়া, তাহার কার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া হাত গুটাইয়া লও দেখি। বেচারা একটু সংসারের সুখ ভোগ করিয়া লউক। দেখিবে, সে ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে—ক্রমশঃ ত্যাগ তাহার আপনা আপনিই আসিবে।

হে ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা পাশ্চাত্য জাতির নিকট ভোগচেষ্টায় কিরূপে সফলতা লাভ করা যায়, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শিখিতে পারি। কিন্তু অতি সাবধানে এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

আমাকে অতিশয় দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, আজকাল আমরা যে সকল পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি দেখিতে পাই, তাঁহাদের প্রায় কাহারও জীবন বড় আশাপ্রদ নহে। আমাদের এখন একদিকে প্রাচীন হিন্দু সমাজ, অপর দিকে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা। যদি আমায় কেহ এই দুইটির মধ্যে কোন একটিকে পছন্দ করিয়া লইতে বলে, আমি প্রাচীন হিন্দু সমাজকেই পছন্দ করিব। কারণ, সেকেলে হিন্দু অজ্ঞ হইলেও, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইলেও তাহার একটা বিশ্বাস আছে—সেই জোরে সে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে পারে; কিন্তু সাহেবীভাবাপন্ন ব্যক্তি একেবারে মেরুদণ্ডহীন—সে চারিদিক হইতে কতকগুলি এলোমেলো ভাব লইয়াছে—তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য নাই, শৃঙ্খলা নাই—সেগুলিকে সে আপনার করিয়া লইতে পারে নাই; কতকগুলি ভাবের বদহজম হইয়া খিচুড়ী পাকাইয়া গিয়াছে। সে নিজের পায়ের উপর নিজে দাঁড়াইতে পারে না—তাহার মাথা দিনরাত্র বোঁ বোঁ করিয়া এদিক্-ওদিক্ ঘুরিতেছে। সে যে সকল কার্য্য করে, তাহার গূঢ় কারণ কি শুনিবে?—আমাদের হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা ইংরাজলোকে কিসে তাহার পিট চাপড়াইয়া দুটা 'বাহবা' দিবে, ইহাই তাহার সর্ব্বকার্য্যের অভিসন্ধির মূলে! সে যে সমাজসংস্কারে অগ্রসর হয়, সে যে আমাদের কতকগুলি সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করে, তাহার কারণ—ঐ সকল আচার সাহেবদের মতবিরুদ্ধ! কেন আমাদের কতকগুলি প্রথা দোষাবহ?—কারণ, সাহেবেরা এরূপ বলিয়া থাকে! এরূপ ভাব আমি চাহি না। বরং নিজের যাহা আছে, তাহা লইয়া নিজের জোরের উপর

প্রাচ্য না পাশ্চাত্য

থাকিয়া মরিয়া যাও। যদি জগতে কিছু পাপ থাকে, তবে দুর্ব্বলতাই সেই পাপ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা ত্যাগ কর—দুর্ব্বলতাই মৃত্যু, দুর্ব্বলতাই পাপ। এই প্রাচীন পথাবলম্বী ব্যক্তিগণ সকলেই মানুষ ছিলেন—তাঁহাদের সকলেরই একটা দৃঢ়তা ছিল; কিন্তু এই পাশ্চাত্য ভাবমোহে বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তিগণ এখনও কোন নির্দ্দিষ্ট জীবপদবী লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদিগকে পুরুষ বলিব, না স্ত্রী বলিব, না পশুবিশেষ বলিব! তবে পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কতকগুলি আদর্শ পুরুষও আছেন। তোমাদের রাজা একজন এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত। সমগ্র ভারতে ইঁহার ন্যায় নিষ্ঠাবান্ হিন্দুও দেখিতে পাইবে না; আবার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল বিষয়েই সবিশেষ সংবাদ রাখেন, এমন রাজাও এ ভারতে বাহির করিতে পারিবে না। ইনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয়েরই সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন—উভয় জাতির যেটুকু ভাল, তাহাই ইনি গ্রহণ করিয়াছেন।

মনু মহারাজ তৎকৃত সংহিতায় বলিয়াছেন,—

> শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
> অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥ ২।২৩৮

—শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নীচ ব্যক্তির নিকট হইতেও উত্তম বিদ্যা গ্রহণ করিবে। অতি নীচ জাতির নিকট হইতেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, অর্থাৎ মুক্তিমার্গের উপদেশ লইবে। নীচকুল হইতেও বিবাহার্থ উত্তমা স্ত্রী গ্রহণ করিবে।

মনু মহারাজ যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক কথা। আগে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াও, তারপর সকল জাতির নিকট হইতেই শিক্ষা

গ্রহণ কর, যাহা কিছু পার আপনার করিয়া লও, যাহা কিছু তোমার কাজে লাগিবে, তাহা গ্রহণ কর। তবে একটি কথা মনে রাখিও—তোমরা যখন হিন্দু, তখন তোমরা যাহা কিছু শিক্ষা কর না কেন, সকলই যেন তোমাদের জাতীয় জীবনের মূলমন্ত্রস্বরূপ ধর্ম্মের নিম্নস্থান গ্রহণ করে। প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন এক এক বিশেষ কার্য্যসাধনোদ্দেশ্যে জন্ম পরিগ্রহ করে। তাহার অনন্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে তাহার জীবনের এই নির্দ্দিষ্ট গতি নিয়মিত হইয়া থাকে। হে রামনাদ-নিবাসিগণ! তোমরাও প্রত্যেকে এক বিশেষ ব্রতসাধনোদ্দেশ্যে জন্মিয়াছ। মহামহিমময় হিন্দুজাতির অনন্ত ভূত জীবনের সমুদয় কর্ম্মসমষ্টি তোমাদের এই জীবনব্রতের নির্দ্দেশক। সাবধান, তোমাদের লক্ষ লক্ষ পিতৃপুরুষ তোমাদের প্রত্যেক কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন! সেই ব্রত কী—যে ব্রত সাধনোদ্দেশ্যে প্রত্যক হিন্দুসন্তানের জন্ম? মনু মহারাজ মহা স্পর্দ্ধার সহিত ব্রাহ্মণের জন্মের যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা কি তোমরা পড় নাই?—

'বৈঠিয়ে আপনা ঠাঁব'

ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে॥ ১।৯৯

—'ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে'—ধর্ম্মরূপ ধনভাণ্ডারের রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণের জন্ম। আমি বলি, এই পবিত্র ভারতভূমিতে যে কোন নরনারী জন্মগ্রহণ করে, তাহারই জন্মগ্রহণের কারণ—'ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে'। অন্যান্য সকল বিষয়কেই আমাদের জীবনের সেই মূল উদ্দেশ্যের অধীন করিতে হইবে। যেমন সঙ্গীতে একটি

প্রধান সুর থাকে—অন্যান্য সুরগুলি তাহারই অধীন, তাহারই অনুগত হইলে তবে সঙ্গীতে ঠিক লয় হইয়া থাকে, এখানেও তাহাই করিতে হইবে। এমন জাতি থাকিতে পারে, যাহাদের মূলমন্ত্র রাজনৈতিক প্রাধান্য; ধর্ম্ম ও অন্যান্য সমুদয় বিষয় তাহাদের এই মূল উদ্দেশ্যের নিম্নস্থান অধিকার অবশ্যই করিবে। কিন্তু এই আর এক জাতি রহিয়াছে, যাহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ধর্ম্ম ও বৈরাগ্য; যাহাদের একমাত্র মূলমন্ত্র এই যে—এ জগৎ ক্ষণস্থায়ী ভ্রমমাত্র, মিথ্যা; ধর্ম্ম ব্যতীত আর যাহা কিছু—জ্ঞান বিজ্ঞান ভোগ ঐশ্বর্য্য মান যশঃ ধন দৌলত—সবই উহার নিম্নে। তোমাদের রাজার চরিত্রের ইহাই বিশেষত্ব—তিনি তাঁহার পাশ্চাত্যবিদ্যা, তাঁহার ধন মান পদমর্য্যাদা—সবই তাঁহার ধর্ম্মের অধীন—ধর্ম্মের সহায়ক করিয়াছেন;—যে ধর্ম্ম যে আধ্যাত্মিকতা যে পবিত্রতা হিন্দুজাতির, প্রত্যেক হিন্দুসন্তানের জন্মগত সংস্কাররূপ। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার লোকের মধ্যে—একজন, যাহার মধ্যে হিন্দু জাতির জীবনের মূলশক্তিস্বরূপ আধ্যাত্মিকতা বিদ্যমান, যাহার আর কিছু নাই অর্থাৎ প্রাচীন, পাশ্চাত্যশিক্ষায় অশিক্ষিত সম্প্রদায়; আর একজন, যে পাশ্চাত্য সভ্যতার কতকগুলি নকল হীরা জহরৎ লইয়া বসিয়া আছে, অথচ যাহার ভিতর সেই জীবন-প্রদ শক্তিসঞ্চারী আধ্যাত্মিকতা নাই;—এই উভয় সম্প্রদায়ে যদি তুলনা করা যায়, তবে আমার বিশ্বাস—সমবেত শ্রোতৃবর্গ সকলেই একমত হইয়া প্রথমোক্ত সম্প্রদায়েরই পক্ষপাতী হইবেন। কারণ, এই প্রাচীন সম্প্রদায়ের উন্নতির কতকটা আশা করিতে পারা যায় —তাহার একটা ধরিবার জিনিস আছে, জাতীয় মূলমন্ত্র তাহার

প্রাণে জাগিতেছে—সুতরাং তাহার বাঁচিবার আশা আছে; শেষোক্ত সম্প্রদায়ের কিন্তু মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; যেমন কোন বিশেষ ব্যক্তির পক্ষে—যদি তাহার মর্ম্মে কোন আঘাত না লাগিয়া থাকে, তাহার মর্ম্মস্থান যদি অব্যাহত থাকে, তবে অন্য কোন অঙ্গে যতই আঘাত লাগুক না, তাহাকে সাংঘাতিক বলা যাইতে পারে না—কারণ, অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা তাহাদের ক্রিয়া জীবন-ধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় নহে; সেইরূপ আমাদের জাতির মর্ম্মস্থানে ঘা না লাগিলে তাহার বিনাশের কোন আশঙ্কা নাই। সুতরাং এইটি বেশ স্মরণ রাখিবে, তোমরা যদি ধর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্যজাতির জড়বাদ-সর্ব্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিন পুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে। ধর্ম্ম ছাড়িলে হিন্দুর জাতীয় মেরুদণ্ডই ভগ্ন হইয়া গেল—যে ভিত্তির উপর জাতীয় সুবিশাল সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাই ভাঙ্গিয়া গেল; সুতরাং ফল দাঁড়াইল—সম্পূর্ণ ধ্বংস।

অতএব হে বন্ধুগণ, আমাদের জাতীয় উন্নতির ইহাই পথ—আমাদের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট হইতে আমরা যে অমূল্য ধর্ম্ম-ধন উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছি, তাহাকে প্রাণপণে ধরিয়া থাকাই আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। তোমরা কি এমন দেশের কথা শুনিয়াছ, যে দেশে বড় বড় রাজারা আপনাদিগকে প্রাচীন রাজগণের অথবা পুরাতন দুর্গনিবাসী, পথিকদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনকারী, দস্যু ব্যারণগণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব বোধ না করিয়া অরণ্যবাসী, অর্দ্ধনগ্ন তাপসগণের বংশধর বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করিয়া থাকেন?—তোমরা কি এমন

দেশের কথা শুনিয়াছ ? যদি না শুনিয়া থাক, শুন—আমাদের মাতৃভূমিই সেই দেশ। অন্যান্য দেশে বড় বড় ধর্ম্মাচার্য্যগণ আপনাদিগকে কোন প্রাচীন রাজার বংশধর বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন, এখানে বড় বড় রাজারা আপনাদিগকে কোন প্রাচীন ঋষির বংশধর বলিয়া প্রমাণে সচেষ্ট। এই কারণেই আমি বলিতেছি, তোমরা ধর্ম্মে বিশ্বাস কর বা নাই কর, যদি জাতীয় জীবনকে অব্যাহত রাখিতে চাও, তবে তোমাদিগকে এই ধর্ম্মরক্ষায় সচেষ্ট হইতে হইবে। এক হস্তে দৃঢ়ভাবে ধর্ম্মকে ধরিয়া অপর হস্ত প্রসারিত করিয়া অন্যান্য জাতির নিকট যাহা শিক্ষা করিবার, তাহা শিক্ষা কর; কিন্তু মনে রাখিও যে, সেইগুলিকে হিন্দুজীবনের সেই মূল আদর্শের অনুগত রাখিতে হইবে—তবেই ভবিষ্যৎ ভারত অপূর্ব্ব মহিমমণ্ডিত হইয়া আভির্ভূত হইবে।

ভবিষ্য-ভারত

আমার দৃঢ় ধারণা—শীঘ্রই সে শুভদিন আসিতেছে; আমার বিশ্বাস—ভারত কোন কালে যাহা ছিল না, শীঘ্রই সে শ্রেষ্ঠতার অধিকারী হইবে। প্রাচীন ঋষিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঋষিগণের অভ্যুদয় হইবে, আর তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তাঁহাদের বংশধরগণের এই অভূতপূর্ব্ব অভ্যুদয়ে শুধু যে সন্তুষ্ট হইবেন তাহা নহে, আমি নিশ্চিত বলিতেছি, তাঁহারা পরলোকে আপন আপন স্থান হইতে তাঁহাদের বংশধরগণকে এরূপ মহিমান্বিত—এরূপ মহত্ত্বশালী দেখিয়া আপনাদিগকে মহা গৌরবান্বিত জ্ঞান করিবেন! হে ভ্রাতৃবৃন্দ, আমাদের সকলকেই এখন কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে, এখন ঘুমাইবার সময় নহে। আমাদের কার্য্যকলাপের উপরই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ঐ দেখ, ভারতমাতা ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিতেছেন। তিনি

কিছুকাল নিদ্রিত ছিলেন মাত্র। উঠ, তাঁহাকে জাগাও—আর নূতন জাগরণে নব প্রাণে পূর্ব্বাপেক্ষা মহাগৌরবমণ্ডিতা করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে তাঁহার অনন্ত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিতা কর! আর যিনি শৈবদিগের শিব, বৈষ্ণবদিগের বিষ্ণু, কর্ম্মীদিগের কর্ম্ম, বৌদ্ধদিগের বুদ্ধ, জৈনদিগের জিন, ঈশাহি ও য়াহুদীদিগের য়াভে, মুসলমানদিগের আল্লা, বৈদান্তিকদিগের ব্রহ্ম—যিনি সকল ধর্ম্মের সকল সম্প্রদায়ের প্রভু, সেই সর্ব্বব্যাপী পুরুষ—যাঁহার সম্পূর্ণ মহিমা ভারতই কেবল জানিয়াছিল—(প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান ভারতই কেবল লাভ করিয়াছিল আর কোন জাতিই প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্ব লাভ করিতে পারে নাই। তোমরা হয় ত আমার এ কথায় আশ্চর্য্য হইতেছ, কিন্তু অন্য কোন শাস্ত্র হইতে প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্ব বাহির কর, দেখি! অন্যান্য জাতির এক একজন জাতীয় ঈশ্বর বা জাতীয় দেবতা ছিল—য়াহুদীর ঈশ্বর, আরাবের ঈশ্বর ইত্যাদি; আর সেই ঈশ্বর আবার অন্যান্য জাতির ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে নিযুক্ত। কিন্তু ঈশ্বরের দয়াময়ত্ব, তিনি যে পরম দয়াময়, তিনি যে আমাদের পিতা মাতা সখা প্রাণের প্রাণ আত্মার অন্তরাত্মা—এ তত্ত্ব কেবল ভারতই জানিত)—সেই দয়াময় প্রভু আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন, আমাদিগকে সাহায্য করুন, আমাদিগকে শক্তি দিন, যাহাতে আমরা আমাদের উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে পারি।

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ॥
তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ হরি ওঁ॥

—আমরা যাহা শ্রবণ করিলাম, তাহা যেন ভুক্ত দ্রব্যের ন্যায় আমাদের পুষ্টি বিধান করে, আমাদের উহা বলস্বরূপ হউক, উহা দ্বারা আমাদের এমন বীর্য্য উৎপন্ন হউক যে, আমরা যেন অপরের কিছু সাহায্য করিতে পারি। আমরা—আচার্য্য ও শিষ্য—যেন কখনও পরস্পর বিদ্বেষ না করি। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরিঃ ওঁ।

সভাভঙ্গের পূর্ব্বে রাজা প্রস্তাব করিলেন, স্বামিজীর রামনাদে শুভ পদার্পণের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এই স্থান হইতে চাঁদা সংগৃহীত হইয়া মাদ্রাজ দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে প্রেরিত হউক।

স্বামিজী যে কয়দিন রামনাদে ছিলেন, অনেক লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে ও তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে আসিত। একদিন তিনি এখানকার খৃষ্টীয়ান স্কুলগৃহে একটি বক্তৃতা দেন। স্বামিজীর সম্মানার্থ একদিন রাজপ্রাসাদে দরবার হয়। এখানেও তাঁহাকে তামিল ও সংস্কৃত ভাষায় অনেকগুলি অভিনন্দন দেওয়া হয়। এখানে স্বামিজী একটী সুন্দর ক্ষুদ্র বক্তৃতাও দেন—তাহাতে তিনি বলেন, রামনাদাধিপ যদিও সাংসারিক পদমর্য্যাদায় খুব উচ্চ, তথাপি তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা ঈশ্বরে যুক্ত। স্বামিজী এই কারণে তাঁহাকে রাজর্ষি আখ্যা প্রদান করিলেন। এতদ্ব্যতীত স্বামিজী আর একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতাও করেন, উহা ফনোগ্রাফে তোলা হয়। তাহাতে তিনি ভারতে শক্তিপূজার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করেন। রবিবার সন্ধ্যাকালে এই দরবার হয়। ঐ দিনই নিশীথকালে স্বামিজী রামনাদ হইতে যাত্রা করিলেন।

পরমকুড়ি অভিনন্দন

রামনাদ হইতে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিয়া স্বামিজী পরমকুড়ি নামক স্থানে পৌছিলেন। তৎস্থাননিবাসিগণ পরম সমারোহ সহকারে স্বামিজীর অভ্যর্থনা করেন। তাঁহারা স্বামিজীকে একখানি অভিনন্দন পত্রও প্রদান করেন। এই অভিনন্দন পত্রে, তাঁহারা স্বামিজীর পাশ্চাত্যদেশে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের সফলতায় আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন, 'আপনার সঙ্গে যে পাশ্চাত্য শিষ্যগণ রহিয়াছেন, তাহাতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, পাশ্চাত্যেরা আপনার ধর্ম্মোপদেশ শুধু শুনিয়া ও উহাতে সায় দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই—উহা তাঁহাদের জীবনকে পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে। আপনার অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া আমাদের সেই প্রাচীন ঋষিগণের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে, যাঁহারা তপস্যা ও আত্মসংযম দ্বারা পরমাত্মার উপলব্ধি করিয়া মানবজাতির প্রকৃত আচার্য্য ও নেতা হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।'

পরমকুড়ি অভিনন্দনের উত্তর

স্বামিজী এই অভিনন্দনের যে উত্তর প্রদান করেন, তাহার কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল :—

আপনারা আমাকে যেরূপ যত্নসহকারে হৃদয়ের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাদিগকে কি ভাষায় ধন্যবাদ প্রদান করিব, তাহা আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না। তবে যদি আমাকে অনুমতি করেন ত আমি বলিতে চাই,—লোকে আমাকে পরম যত্নের সহিত অভ্যর্থনাই করুক অথবা আমাকে 'দূর দূর' করিয়া

এখান হইতে তাড়াইয়াই দিক, আমার স্বদেশের প্রতি, বিশেষতঃ আমার স্বদেশবাসীর প্রতি ভালবাসার কিছু ইতরবিশেষ হইবে না; কারণ, আমরা গীতায় পাঠ করিয়াছি—'কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে করা উচিত—আমাদের ভালবাসাও নিষ্কাম হওয়া উচিত।' পাশ্চাত্যদেশে যে কার্য্য হইয়াছে, তাহা অতি অল্পই;—এখানে এমন কোন ব্যক্তিই উপস্থিত নাই, যিনি আমাপেক্ষা শতগুণ কার্য্য করিতে না পারিতেন। আমি আগ্রহের সহিত সেই দিনের প্রতীক্ষা করিয়া আছি,—যে দিন মহামনীষী ধর্ম্মবীরগণ অভ্যুত্থিত হইয়া ভারত হইতে বহির্গত হইয়া জগতের শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত ভারতের অরণ্যরাজী হইতে সমুত্থিত ও ভারতভূমির নিজস্ব সেই আধ্যাত্মিকতা ও ত্যাগতত্ত্ব প্রচার করিবেন। মানবজাতির ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে দেখা যায়, সময়ে সময়ে সব জাতির মধ্যে যেন একটা সংসারে বিরক্তির ভাব আসিয়া থাকে।

আধ্যাত্মিকতা ও জড়বাদের তরঙ্গগতিতে আবির্ভাব ও তিরোভাব

তাহারা দেখে, তাহারা যে কোন মতলব করিতেছে, তাহাই যেন হাত ফস্‌কিয়া পলাইতেছে—প্রাচীন আচার প্রথাগুলি যেন সব ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে, সব আশা ভরসা নষ্ট হইয়া যাইতেছে—সবই যেন আল্‌গা আল্‌গা হইয়া যাইতেছে। জগতে দুই প্রকার বিভিন্ন ভিত্তির উপর সামাজিক জীবন প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে—এক, ধর্ম্মভিত্তির উপর; আর এক, সামাজিক প্রয়োজনের উপর। একটির ভিত্তি—আধ্যাত্মিকতা, অপরটির—জড়বাদ; একটির ভিত্তি—অতীন্দ্রিয়বাদ, অপরটির—প্রত্যক্ষবাদ। একটি এই ক্ষুদ্র জড়জগতের সীমার বাহিরে দৃষ্টিপাত করে, এবং এমন কি,

অপরটির সহিত কোন সংস্রব না রাখিয়া, কেবল আধ্যাত্মিক ভাব লইয়াই জীবন যাপন করিতে সাহসী হয়; অপরটি নিজের চতুষ্পার্শ্বে যাহা দেখিতে পায়—তাহার উপর জীবনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াই তৃপ্ত;—সে আশা করে, ইহারই উপর সে জীবনের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপনে কৃতকার্য্য হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয়, কখন কখন অধ্যাত্মবাদ প্রবল হয়, তাহার পরই আবার জড়বাদ প্রাধান্য লাভ করে —যেন তরঙ্গবৎ গতিতে একটির পর আর একটি আসিয়া থাকে! এক দেশেই আবার বিভিন্ন সময়ে এই বিভিন্ন তরঙ্গ দেখিতে পাইবে। এক সময়ে জড়বাদ পূর্ণ প্রতাপে রাজত্ব করিতে থাকে—ঐশ্বর্য্যসম্পত্তিই গৌরবের অধিকারী হয়; যে শিক্ষায় অধিক অন্নাগমের উপায় হয়, যাহাতে অধিক সুখলাভের উপায় হয় —তাহারই আদর হইতে থাকে। ক্রমে এই অবস্থা হইতে আবার অবনতি আরম্ভ হয়। সৌভাগ্যসম্পদ্ হইলেই মানবজাতির অন্তর্নিহিত ঈর্ষ্যাদ্বেষও প্রবলাকার ধারণ করে—পরস্পর প্রতিযোগিতা ও ঘোর নিষ্ঠুরতাই যেন তখনকার যুগধর্ম্ম হইয়া পড়ে। 'চাচা আপন বাঁচা'—ইহাই তখন সকলের মূলমন্ত্রস্বরূপ হইয়া পড়ে। এই অবস্থা কিছুদিন চলিবার পর লোকে আবার বুঝিতে আরম্ভ করে যে, 'তাইত করলুম কি, সবই যে বৃথা হল!' ধর্ম্ম সহায় না হইলে— ক্রমশঃ জড়বাদের গভীর আবর্ত্তে মজ্জমান জগতের সাহায্যার্থ ধর্ম্ম অগ্রসর না হইলে,—জগতের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী! তখন লোকে নব আশায় আশান্বিত হইয়া নব অনুরাগে নূতন ভাবে নূতন গৃহ প্রস্তুত করিবার জন্য নূতন ভিত্তির পত্তন করে। তখন ধর্ম্মের আর এক বন্যা আসে।

কালে আবার ইহার অবনতি হয়। প্রকৃতির অব্যর্থ নিয়মে ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এমন একদল লোকের অভ্যুদয় হয়,* যাহারা বিশেষ বিশেষ ক্ষমতার একচেটিয়া দাবী করিয়া থাকে। ইহার অব্যবহিত ফল,—পুনরায় জড়বাদের দিকে গতি। জড়বাদের দিকে গতি একবার আরম্ভ হইলে—বিভিন্ন প্রকার শত শত বিষয়ে একচেটিয়া দাবী আরম্ভ হয়। ক্রমশঃ এমন সময় আসে, যখন সমগ্র জাতির শুধু আধ্যাত্মিক ক্ষমতাগুলি নহে, তাহার সর্ব্বপ্রকার লৌকিক ক্ষমতা ও অধিকারগুলিও অল্পসংখ্যক কয়েকটি ব্যক্তির একচেটিয়া হয়। এই অল্পসংখ্যক লোক সর্ব্বসাধারণের ঘাড়ে চড়িয়া তাহাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। তখন সমাজকে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হইতে হয়। এই সময় জড়বাদ দ্বারা বিশেষ সাহায্য হইয়া থাকে। যদি আপনারা আমাদের মাতৃভূমি ভারত-ভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করেন, দেখিবেন—এখানেও এক্ষণে সেই ব্যাপার ঘটিতেছে। ইউরোপে আপনাদের ধর্ম্মপ্রচারার্থ একজন গিয়াছিলেন, আজ যে আপনারা তাঁহার অভ্যর্থনার জন্ত সমবেত হইয়াছেন—ইউরোপীয় জড়বাদ ইহার পথ উন্মুক্ত করিয়া না দিলে ইহা অসম্ভব হইত। স্থতরাং এক হিসাবে জড়বাদ যথার্থই ভারতের কিছু কল্যাণ সাধন করিয়াছে—উহা সকলেরই উন্নতির দ্বার খুলিয়া দিয়াছে—উচ্চ বর্ণের একচেটিয়া অধিকার দূর করিয়া দিয়াছে—অতি অল্প-সংখ্যক ব্যক্তির হস্তে যে অমূল্য রত্ন গুপ্তভাবে ছিল, এবং তাহারাও

---

* এই বিষয় বিস্তারিত ভাবে স্বামিজীর 'বর্ত্তমান ভারত' গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে।

যাহার ব্যবহার ভুলিয়া গিয়াছিল, তাহা সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। ঐ অমূল্য রত্নের অর্দ্ধভাগ নষ্ট হইয়াছে, অপরার্দ্ধ এমন সকল লোকের হস্তে রহিয়াছে, যাহারা গরুর জাবপাত্রে শয়ান কুকুরের মত—নিজেরাও খাইবে না, অপরকেও খাইতে দিবে না!

অপর দিকে আবার আমরা ভারতে যে সকল রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছি, সে সকল ইউরোপে যুগ যুগ ধরিয়া রহিয়াছে, শত শত শতাব্দী ধরিয়া ঐগুলি পরীক্ষিত হইয়াছে; আর সেগুলি যে সামাজিক প্রয়োজন পরিপূরণে অসমর্থ, তাহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইউরোপের রাজনৈতিক শাসনসংস্থষ্ট সর্ব্বপ্রকার প্রণালী এক এক করিয়া অনুপযোগী বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে, আর এক্ষণে ইউরোপ অশান্তিসাগরে ভাসিতেছে—কি করিবে, কোথায় যাইবে, বুঝিতে পারিতেছে না। ঐশ্বর্য্যসম্পদের অত্যাচার অসহ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের সব ধন, সব ক্ষমতা অল্পসংখ্যক কয়েকটি ব্যক্তির হস্তে—তাঁহারা নিজেরা কোন কার্য্য করেন না, কিন্তু তাঁহারা লক্ষ লক্ষ নরনারী দ্বারা কাজ করাইয়া লইবার ক্ষমতা রাখেন। এই ক্ষমতাবলে তাঁহারা সমগ্র জগৎ রক্তস্রোতে প্লাবিত করিতে পারেন। ধর্ম্ম ও আর আর যাহা কিছু, সবই তাঁহাদের পদতলে। তাঁহারাই সর্ব্বেসর্ব্বা শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন। পাশ্চাত্য জগৎ মুষ্টিমেয় শাইলকের শাসনে পরিচালিত হইতেছে। আপনারা যে প্রণালীবদ্ধ-শাসন, স্বাধীনতা, পার্লিয়ামেণ্ট-মহাসভা প্রভৃতির কথা শুনেন—সেগুলি বাজে কথামাত্র। পাশ্চাত্য দেশ শাইলকগণের অত্যাচারে জর্জ্জরীভূত, প্রাচ্যদেশ

পাশ্চাত্য সমাজের অসম্পূর্ণতা

আবার পুরোহিতগণের অত্যাচারে কাতরভাবে ক্রন্দন করিতেছে। উভয়কেই পরস্পরকে শাসনে রাখিতে হইবে।

মনে করিবেন না, ইহাদের মধ্যে একটি দ্বারা মাত্র জগতের কল্যাণ হইবে। অপক্ষপাতী ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্টিতে সকলকেই সমান করিয়াছেন। অতি অধম অসুরপ্রকৃতি মানবের পর্য্যন্ত এমন কিছু গুণ আছে, যাহা একজন মহা সাধুরও নাই। অতি নগণ্য কীটেরও এমন কিছু গুণ থাকিতে পারে, যাহা হয়ত মহাপুরুষেরও নাই। অতি দরিদ্র শ্রমজীবী—তুমি মনে করিতেছ, যাহার জীবনে ভোগ করিবার কিছু নাই, যাহার তোমার মত বুদ্ধি নাই, যে বেদান্তদর্শনাদি বুঝিতে পারে না—তাহারও শরীর কিন্তু তোমার মত কষ্টে অত কাতর হয় না। তুমি তাহাকে একরূপ টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ফেলিতে পার, পরদিনেই সে সুস্থ হইয়া উঠিবে। তাহার জীবন ইন্দ্রিয়গত; কিন্তু সে সেই ইন্দ্রিয়সুখভোগেই তৃপ্ত। সুতরাং তাহার জীবনে একদিকে যেমন সুখের অভাব, অপর দিকে তেমনি সুখের আধিক্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে তাহার জীবনেও সামঞ্জস্য রহিয়াছে। অতএব ঐন্দ্রিয়িক মানসিক বা আধ্যাত্মিক, ভগবান্ সকলকেই অপক্ষপাতিতা সহকারে সম্পূর্ণ সমান সুখ দিয়াছেন। অতএব মনে করিবে না, আমরাই জগতের উদ্ধারকর্ত্তা। আমরা জগৎকে অনেক বিষয় শিক্ষা দিতে পারি বটে, কিন্তু আমরাও জগতের নিকট অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে পারি। আমরা জগৎকে যে বিষয়ে শিক্ষা দিতে সমর্থ, জগৎ তাহার জন্য এক্ষণে অপেক্ষা করিতেছে। যদি পাশ্চাত্য সভ্যতা আধ্যাত্মিক ভিত্তির

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা আছে

উপর স্থাপিত না হয়, তবে উহা আগামী পঞ্চাশ বর্ষের মধ্যে সমূলে বিনষ্ট হইবে। মানবজাতিকে তরবারিবলে শাসন করিবার চেষ্টা বৃথা ও অনাবশ্যক। তোমরা দেখিবে—যে সকল স্থান হইতে 'পাশববলে জগৎ শাসন' এই ভাবের উদ্ভব, সেই স্থানগুলিতেই প্রথমে অবনতি আরম্ভ হয়, সেই সকল সমাজ শীঘ্রই ধ্বংস হইয়া যায়। জড়শক্তির লীলাক্ষেত্র ইউরোপ যদি নিজের ভিত্তি সরাইয়া আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে তাহার সমাজ স্থাপন না করে, তবে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। উপনিষদের ধর্ম্মই ইউরোপকে রক্ষা করিবে।

পাশ্চাত্যদেশে ধর্ম্মপ্রচারের আবশ্যকতা

আমাদের দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন শাস্ত্র ও বিভিন্ন দর্শনের যতই মতভেদ থাকুক—এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এমন এক সাধারণ ভিত্তি আছে, যাহা দ্বারা সমুদয় জগতের ভাবস্রোত পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। সেই সাধারণ ভিত্তি এই—জীবাত্মার সর্ব্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস। ভারতের সর্ব্বত্র হিন্দু জৈন বৌদ্ধ, সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে—আত্মা সর্ব্বশক্তির আধারস্বরূপ। আর তোমরা বেশ জান, ভারতে এমন কোন সম্প্রদায় নাই, যাহারা বিশ্বাস করে যে, শক্তি পবিত্রতা বা পূর্ণতা বাহির হইতে লাভ করিতে হয়। ঐগুলি আমাদের জন্মগত অধিকার—আমাদের স্বভাবসিদ্ধ। তোমার প্রকৃত স্বরূপ অপবিত্রতারূপ আবরণের দ্বারা আবৃত রহিয়াছে। কিন্তু তুমি যথার্থ যাহা তাহা অনাদিকাল হইতেই পূর্ণ অচল অটল সুমেরুবৎ! আত্মসংযম করিতে তোমার বহিঃসাহায্যের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই; তুমি জ্ঞাতসারে বা

হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ ভিত্তি—আত্ম-বিশ্বাস

অজ্ঞাতসারে অনাদিকাল হইতেই পূর্ণসংযমী, এই কারণে অবিদ্যাকেই সর্ব্বপ্রকার অনিষ্টের মূল বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ভগবান্ ও মানবে, সাধু ও পাপীতে প্রভেদ কিসে?—কেবল অজ্ঞানে। অজ্ঞানেই প্রভেদ হয়। সর্ব্বোচ্চ মানব ও তোমার পদতলে অতি কষ্টে সঞ্চারণকারী ঐ ক্ষুদ্র কীটের মধ্যে প্রভেদ কিসে?—অজ্ঞানেই এই প্রভেদ করিয়াছে। কারণ, অতি কষ্টে বিচরণশীল ঐ ক্ষুদ্র কীটের মধ্যেও অনন্ত শক্তি, জ্ঞান ও পবিত্রতা—এমন কি, সাক্ষাৎ অনন্ত ভগবান্ রহিয়াছেন! এখন উহা অব্যক্তভাবে রহিয়াছে—উহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। ভারত জগৎকে এই এক মহাসত্য শিখাইবে—কারণ, ইহা আর কোথাও নাই। ইহাই আধ্যাত্মিকতা—ইহাই আত্মবিজ্ঞান। মানুষ কি বলে দণ্ডায়মান হইয়া কার্য্য করিতে সক্ষম হয়?—বীর্য্য! বীর্য্যই সাধুত্ব—দুর্ব্বলতাই পাপ। যদি উপনিষদে এমন কোন শব্দ থাকে, যাহা বজ্রবেগে অজ্ঞানরাশির উপর পতিত হইয়া উহাকে একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিতে পারে, তবে উহা—'অভীঃ'! যদি জগৎকে কোন ধর্ম্ম শিখাইতে হয়, তবে তাহা এই 'অভীঃ'! কি ঐহিক, কি আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েই 'অভীঃ'—এই মূলমন্ত্র অবলম্বন করিতে হইবে। কারণ, ভয়ই পাপ ও অধঃপতনের নিশ্চিত কারণ। ভয় হইতেই মৃত্যু, ভয় হইতেই সর্ব্বপ্রকার অবনতি আসিয়া থাকে। এক্ষণে প্রশ্ন এই, এই ভয়ের উদ্ভব কোথা হইতে হয়?—আত্মার

জীবাত্মার অনন্ত শক্তি-মত্তায় বিশ্বাসই সর্ব্ব সমস্যার মীমাংসায় সমর্থ

স্বরূপজ্ঞানের অভাব হইতেই ভয়ের উদ্ভব। যিনি রাজার রাজা মহারাজ, তুমি তাঁহার উত্তরাধিকারী—তুমি সেই ঈশ্বরের অংশস্বরূপ। শুধু তাহাই নহে, অদ্বৈতবাদ-মতে তুমিই স্বয়ং ব্রহ্ম—তুমি আপনার স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া আপনাকে ক্ষুদ্র মানুষ ভাবিতেছ। আমরা স্বরূপ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি—আমরা ভেদজ্ঞানে অভিনিবিষ্ট হইয়াছি; আমি তোমা অপেক্ষা বড়, তুমি আমা অপেক্ষা বড়—আমরা কেবল এই করিতেছি! 'আত্মার মধ্যে সকল শক্তি অন্তর্নিহিত'—ভারত জগৎকে এই মহাশিক্ষা দিবে। হৃদয়ে এই তত্ত্ব ধারণ করিলে তোমার নিকট জগৎ আর একভাবে প্রতিভাত হইবে;—পূর্ব্বে তুমি নরনারী ও অন্যান্য প্রাণীকে যে দৃষ্টিতে দেখিতে, তখন অন্য দৃষ্টিতে তাহাদিগকে দেখিবে। তখন এই পৃথিবী আর দ্বন্দ্বক্ষেত্ররূপে প্রতীয়মান হইবে না—তখন আর ইহা বোধ হইবে না যে, এ পৃথিবীতে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া দুর্ব্বলের উপর বলবানের জয়লাভের জন্য নরনারীর জন্ম; তখন বোধ হইবে এ পৃথিবী আমাদের ক্রীড়াক্ষেত্র; স্বয়ং ভগবান্ বালকের ন্যায় এখানে খেলিতেছেন—আর আমরা তাঁহার খেলার সঙ্গী, তাঁহার কার্য্যের সহায়ক। যতই ভয়ানক, যতই বীভৎস বোধ হউক—ইহা খেলামাত্র! আমরা ভ্রান্তিবশতঃ এই ক্রীড়াকে একটা ভয়ানক ব্যাপার ভাবিতেছি। যখন আমরা আত্মার স্বরূপ জানিতে পারি, তখন অতি দুর্ব্বল হতভাগ্য, অতি অধম পাপীর হৃদয়েও আশার সঞ্চার হয়। শাস্ত্র কেবল বলিতেছেন—নিরাশ হইও না; তুমি যাহাই কর না কেন, তোমার স্বরূপের কখন পরিবর্ত্তন হয় না; তুমি কখন তোমার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন করিতে পার না।

প্রকৃতি কখন প্রকৃতির বিনাশ সাধন করিতে পারে না। তোমার প্রকৃতি শুদ্ধ। লক্ষ লক্ষ বর্ষ ধরিয়া তোমার এই স্বরূপ অব্যক্ত-ভাবে থাকিতে পারে, কিন্তু চরমে উহা আপন তেজে ফুটিয়া বাহির হইবে। এই কারণেই ইহা সকলের নিকট আশার সংবাদ বহন করে—কাহাকেও নিরাশাসাগরে ডুবায় না। বেদান্ত, ভয়ে ধর্ম্ম করিতে বলেন না। বেদান্ত বলেন না যে, শয়তান সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টিতে তোমার দিকে লক্ষ্য করিতেছে; যদি তুমি একবার পদস্খলিত হও, অমনি তোমার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে!

বেদান্তে শয়তানের প্রসঙ্গই নাই; বেদান্ত বলেন, তোমার অদৃষ্ট তোমার নিজের হাতে,—তোমার নিজের কর্ম্মই তোমার এই শরীর গঠন করিয়াছে, অপর কেহ তোমার হইয়া তোমার শরীর গঠন করে নাই। সেই সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ অজ্ঞানবশতঃ তোমার নিকট অব্যক্ত রহিয়াছেন; আর তুমি যে সমস্ত সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছ, তাহার জন্য তুমিই দায়ী। ভাবিও না, তোমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তুমি এই জগতে আনীত হইয়া এই ভয়াবহ স্থানে স্থাপিত হইয়াছ। তুমি জান—তুমিই ধীরে ধীরে তোমার জগৎ রচনা করিয়াছ এবং এখনও করিতেছ। তুমি নিজেই আহার করিয়া থাক, অপর কেহ তোমার হইয়া আহার করে না। তুমি যাহা খাও, তাহার সারভাগ তুমিই শরীরে শোষণ করিয়া লও—অপর কেহই তোমার হইয়া উহা করে না। তুমিই ঐ খাদ্য হইতে রক্ত মাংস দেহ প্রস্তুত করিয়া থাক, অপর কেহ তোমার হইয়া উহা করে না। তুমি বরাবরই ইহা করিতেছ। একটি দীর্ঘ শৃঙ্খলের এক অংশের গঠনপ্রণালী

কর্ম্মবাদ

জানিতে পারিলে সমুদয় শৃঙ্খলটিকেই জানিতে পারা যায়। যদি ইহা সত্য হয় যে, এক মুহূর্ত্তেও তুমি নিজ শরীর গঠন করিয়াছ, তবে ইহাও সত্য যে, পূর্ব্বেও প্রতি মুহূর্ত্তে তুমি নিজ শরীর গঠন করিয়াছ, পরেও করিবে। আর ভাল-মন্দ সবেরই দায়িত্ব-ভার তোমার। ইহাই মহা ভরসার কারণ। আমি যাহা করিয়াছি, আমিই আবার তাহা নাশ করিতে পারি।

যদিও আমাদের শাস্ত্রে এই কঠোর কর্ম্মবাদ রহিয়াছে, তথাপি আমাদের ধর্ম্ম ভগবৎকৃপা অস্বীকার করেন না। আমাদের শাস্ত্র বলেন, ভগবান্ শুভাশুভরূপী এই ঘোর সংসার-প্রবাহের অপর পারে রহিয়াছেন। তিনি বন্ধনশূন্য নিত্যদয়াময়, সর্ব্বদাই জগতের ত্রিতাপে অভিভূত নরনারীকে সংসার-সাগরের পরপারে লইয়া যাইবার জন্য বাহু প্রসারিত করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার দয়ার সীমা নাই; আর রামানুজ বলেন —বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির নিকটই এই দয়ার আবির্ভাব হইয়া থাকে।

ভগবৎকৃপা

অতএব আপনারা দেখিতেছেন, সমাজের নূতন ভিত্তি স্থাপন করিতে আপনাদের ধর্ম্ম কিরূপ ভাবে সাহায্য করিতে পারে। যদি আমার অধিক সময় থাকিত, তবে আমি দেখাইতে পারিতাম— পাশ্চাত্যদেশ অদ্বৈতবাদের কতকগুলি সিদ্ধান্ত হইতে এখনও কিরূপ শিক্ষা পাইতে পারে। কারণ, এই জড়বিজ্ঞানের দিনে সগুণ ঈশ্বর, দ্বৈতবাদ—এ সকলের বড় একটা আদর নাই। তবে যদি কেহ খুব অমার্জ্জিত অনুন্নত ধর্ম্মপ্রণালীতেও বিশ্বাস করে, আমাদের ধর্ম্মে তাহাদেরও স্থান আছে। যদি কেহ এত মন্দির ও প্রতিমাদি চায়, যাহাতে জগতের সকল লোকেরই আকাঙ্ক্ষা

চরিতার্থ হইতে পারে; যদি কেহ সগুণ ঈশ্বরকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে চাহে, তবে আমাদের শাস্ত্র তাহাদিগকে বিশেষ সাহায্যই করিবে। বলিতে কি, সগুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে যে সকল উচ্চ উচ্চ ভাব ও তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, জগতের অন্য কোথাও সেরূপ দেখিতে পাইবে না। যদি কেহ আবার খুব যুক্তিবাদী হইতে চাহে, নিজের তর্কবুদ্ধিকে পরিতৃপ্ত করিতে চাহে—তবে আমরা তাহাকেও নির্গুণ ব্রহ্মবাদরূপ প্রবল যুক্তিসহ মতবাদ শিক্ষা দিতে পারি।

বক্তৃতান্তে স্বামিজী পুনরায় অভিনন্দনদাতৃগণকে ধন্যবাদ দিলেন।

মনমাতুরা অভিনন্দন

পরমকুডি হইতে যাত্রা করিয়া স্বামিজী মনমাতুরায় গেলেন। মনমাতুরা ও তৎসমীপবর্ত্তী শিবগঙ্গার জমিদার ও অন্যান্য অধিবাসিগণ তাঁহাকে এক অভিনন্দন প্রদান করিলেন। প্রথমে এই স্থানে স্বামিজী আসিতে পারিবেন না, এই মর্ম্মে তার করা হয়। ইহাতে তাঁহারা অতীব দুঃখিত হইয়াছিলেন, স্বামিজীর আগমনে সকলেই পরম পুলকিত হন ও আপনাদিগকে ধন্য মনে করেন। অভিনন্দনপত্রের একস্থলে তাঁহারা বলেন—'পাশ্চাত্য উদরসর্ব্বস্ব জড়বাদ যে সময়ে ভারতীয় ধর্ম্মভাবসমূহের উপর তীব্র আক্রমণ করিতেছিল, সেই সময় আপনার ন্যায় একজন শক্তিশালী আচার্য্যের অভ্যুদয়ে ধর্ম্মজগতে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—আমাদের ধর্ম্ম ও দর্শনরূপ অমূল্য সুবর্ণের উপর যে

ধূলিরাশি কিছুকালের জন্য সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা দূর হইয়া আপনার তীক্ষ্ণ প্রতিভারূপ মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে প্রচলিত মুদ্রারূপে জগতের সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইবে। আপনি যেরূপ উদারভাবে চিকাগোর ধর্ম্মমহাসভায় সমবেত অসংখ্য বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর সমক্ষে ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের স্থির বিশ্বাস,—আমাদের পূজনীয়া মহারাণীর রাজত্বে যেমন সূর্য্য অস্ত যায় না, তেমনি আপনারও ধর্ম্মরাজ্য সমগ্র জগতে বিস্তৃত হইবে।

মনমাদুরা অভিনন্দনের উত্তর

আপনারা আমাকে হৃদয়ের সহিত যে অভিনন্দন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদের নিকট যে কি গভীর কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ হইলাম, তাহা ভাষায় প্রকাশে অক্ষম। দুঃখের বিষয়, আমার প্রবল ইচ্ছাসত্ত্বেও আমার শরীরের অবস্থা এখন এমন নহে যে, আমি দীর্ঘ বক্তৃতা করি। আমাদের সংস্কৃতজ্ঞ বন্ধুটি আমার প্রতি অনুগ্রহপূর্ব্বক সুন্দর সুন্দর বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন বটে, তথাপি আমার একটা স্থূল শরীর আছে—হইতে পারে স্থূল শরীর ধারণ বিড়ম্বনা, কিন্তু উপায় নাই। আর স্থূল শরীর জড়ের নিয়মানুসারেই পরিচালিত হইয়া থাকে। স্থূল শরীরের ক্লান্তি অবসাদ প্রভৃতি সবই হইয়া থাকে। পাশ্চাত্যদেশে আমার দ্বারা যে সামান্য কার্য্য হইয়াছে, তাহার জন্য ভারতের প্রায় সকল স্থানেই লোকে যেরূপ অপূর্ব্ব আনন্দ ও সহানুভূতি

প্রকাশ করিতেছেন, তাহা দেখিবার জিনিস বটে। তবে আমি ঐ আনন্দ ও সহানুভূতি কেবল এইভাবে গ্রহণ করিতেছি যে, আমি ভাবী মহাত্মাগণের উপর উহা প্রয়োগ করিতে চাই। আমার মনে হয়, আমার দ্বারা যে যৎসামান্য কার্য্য হইয়াছে, যদি তাহার জন্য সমগ্র জাতি এতদূর প্রশংসা করে, তবে আমাদের পরে যে সকল মহা মহা দিগ্বিজয়ী ধর্ম্মবীর মহাত্মা আবির্ভূত হইয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিবেন, তাঁহারা এই জাতির নিকট হইতে না জানি আরও কত প্রশংসা ও সম্মান লাভ করিবেন। ভারত ধর্ম্মভূমি। হিন্দু, ধর্ম্ম—কেবল ধর্ম্মই বুঝে। শত শত শতাব্দী ধরিয়া হিন্দু কেবল এই শিক্ষাই পাইয়াছে। সেই শিক্ষার ফলও এই হইয়াছে যে, ইহাই তাহাদের জীবনের একমাত্র ব্রতস্বরূপ দাঁড়াইয়াছে। আপনারা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন যে, ইহা সত্য। সকলেই দোকানদার হউক বা স্কুল মাষ্টার হউক বা যোদ্ধা হউক, ইহার কোন প্রয়োজন নাই; কিন্তু এই সামঞ্জস্যপূর্ণ জগতে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ভাব লইয়া এক মহাসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করিবে। সম্ভবতঃ আমরা এই জাতীয় ঐক্যতানের আধ্যাত্মিক সুর বাজাইবার জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক নিযুক্ত। আমাদের মহামহিমান্বিত পূর্ব্বপুরুষদের (যাঁহাদের বংশধর বলিয়া যে কোন জাতি গৌরব অনুভব করিতে পারে) নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা যে সকল মহান্ তত্ত্বরাশি পাইয়াছি, আমরা যে এখনও তাহা হারাই নাই—ইহা দেখিয়াই আমার মনে পরম আনন্দ হইতেছে! ইহাতে আমাদের জাতির ভাবী উন্নতি সম্বন্ধে আমার আশা—শুধু আশা নহে, দৃঢ় বিশ্বাস

ধর্ম্মই হিন্দুর জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি

হইতেছে। আমার প্রতি ব্যক্তিগত ভালবাসার জন্য আমার আনন্দ হয় নাই, আমাদের জাতীয় হৃদয় যে এখনও অটুট রহিয়াছে, ইহাতেই আমার পরমানন্দ। এখনও ভারতের জাতীয় হৃদয় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। ভারত এখনও বাঁচিয়া আছে—কে বলে সে মরিয়াছে? পাশ্চাত্যেরা আমাদিগকে কর্ম্মকুশল দেখিতে চায়, কিন্তু ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য বিষয়ে আমাদের জাতীয় হৃদয় নিবদ্ধ নয় বলিয়া আমরা তাহাদিগকে তাহাদের মনের মত কর্ম্মকুশলতা দেখাইতে পারি না। যদি কেহ আমাদিগকে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখিতে চায়, সে নিরাশ হইবে; আমরাও যদি আবার কোন যুদ্ধপ্রিয় জাতিকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে ক্রিয়াশীল দেখিতে চাই, আমরাও তদ্রূপ নিরাশ হইব। পাশ্চাত্যেরা আসিয়া দেখুক, আমরা তাহাদের ন্যায় কর্ম্মী, আমরা এখনও জীবিত রহিয়াছি। এই সকল ভাবিয়া আমরা যে আদৌ পূর্ব্বাবস্থা হইতে হীন হইয়া পড়িয়াছি, এই কথাতে আমার বিশ্বাসই হয় না।

আমাদের জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি যে অটুট, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তথাপি এখন আমাকে গোটাকতক কড়া কথা বলিতে হইবে। আশা করি, আপনারা উহা ভাল ভাবেই গ্রহণ করিবেন। এইমাত্র আপনারা অভিযোগ করিলেন যে, ইউরোপীয় জড়বাদ আমাদিগকে একবারে মাটি করিয়া ফেলিয়াছে।

ভারতের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার জন্য আমরাই দায়ী

আমি বলি, দোষ শুধু ইউরোপীয়দের নহে, দোষ প্রধানতঃ আমাদের। আমরা যখন বৈদান্তিক, তখন আমাদিগকে সর্ব্বদাই সকল বিষয় ভিতরের দিক্ হইতে—আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখিবার চেষ্টা করিতে

হইবে। আমরা যখন বৈদান্তিক, তখন নিশ্চয় করিয়া জানি, যদি আমরা নিজের অনিষ্ট নিজেরা না করি, তবে জগতে এমন কোন শক্তি নাই, যাহা আমাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারে। ভারতের এক-পঞ্চমাংশ অধিবাসী মুসলমান হইয়াছে। যেমন সুদূর অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, ভারতের দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসী প্রাচীনকালে বৌদ্ধ হইয়াছিল; সেইরূপ ভারতের এক-পঞ্চমাংশ লোক মুসলমান হইয়াছে। এখনই প্রায় দশ লক্ষের অধিক খৃষ্টিয়ান হইয়া গিয়াছে। ইহা কাহার দোষ? আমাদের একজন ঐতিহাসিক চিরস্মরণীয় ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন, 'যখন অনন্ত-জীবন নির্ঝরিণী নিকটেই বহিয়া যাইতেছে, তখন এই দরিদ্র হতভাগ্যগণ ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মরিবে কেন?' প্রশ্ন এই,—ইহাদের জন্য আমরা কি করিয়াছি? কেন তাহারা মুসলমান হইবে না? আমি ইংলণ্ডে জনৈকা সরলা বালিকার সম্বন্ধে শুনিয়াছিলাম, সে অসৎ পথে পদার্পণ করিবার —বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে জনৈকা সম্ভ্রান্ত মহিলা তাহাকে উক্ত পথে যাইতে নিষেধ করেন। তাহাতে সেই বালিকা উত্তর দেয়—'এই উপায়েই আমি কেবল লোকের সহানুভূতি পাইতে পারি। এখন আমায় কেহই সাহায্য করিবে না; কিন্তু আমি যদি পতিতা হই, তবে সেই দয়াবতী মহিলারা আসিয়া আমাকে তাঁহাদের গৃহে লইয়া যাইবেন, আমার জন্য সব করিবেন, কিন্তু এখন তাঁহারা কিছুই করিবেন না।' আমরা এখন তাহাদের জন্য কাঁদিতেছি, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে আমরা

সমাজের নিম্নস্তরে জ্ঞান-বিস্তারের চেষ্টার অভাবই তাহাদের হিন্দু-ধর্ম্ম পরিত্যাগের কারণ

তাহাদের জন্য কি করিয়াছি? আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই আপন আপন হৃদয়ে হস্ত রাখিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করুক্ দেখি—আমরা নিজেরা কি শিখিয়াছি; আর নিজেরা নিজেদের হাতে জ্ঞানের মশাল লইয়া কতদুর উহার আলোক বিস্তারের সহায়তা করিয়াছি! আমরা যে উহা করি নাই, তাহা আমাদেরই দোষ—আমাদেরই কর্ম্ম। কাহারও দোষ দিবে না, দোষ দাও আমাদের নিজেদের কর্ম্মকে। যদি তোমরা আসিতে না দিতে, তবে কি জড়বাদ, কি মুসলমান ধর্ম্ম, কি খৃষ্টান ধর্ম্ম, কি জগতের অন্য কোন বাদ—কিছুই এখানে স্বীয় প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হইত? যদি দেহ—পাপ, কুৎসিত খাদ্য, ও নানাবিধ অনিয়মের দ্বারা পূর্ব্ব হইতেই হীনবীর্য্য না হইয়া থাকে, তবে কোন প্রকার জীবাণু নরদেহ আক্রমণ করিতে পারে না। সুস্থ ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার বিষাক্ত জীবাণুর মধ্যে বাস করিয়াও নিরাপদ থাকিবে। আমরা ত তাহাদিগকে পূর্ব্বে সাহায্য করি নাই, সুতরাং অপর জাতির উপর সমুদয় দোষ নিক্ষেপের পূর্ব্বে প্রথমেই নিজেকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা উচিত:—আর প্রতীকারের এখনও সময় আছে।

আমরা ক্ষুদ্র অনাবশ্যক বিষয়সমূহে অভিনিবিষ্ট হইয়া উচ্চতর প্রয়োজনীয় বিষয় ভুলিয়াছি

প্রথমেই, ঐ যে অর্থহীন বিষয়গুলি লইয়া প্রাচীনকাল হইতেই বাদানুবাদ চলিতেছে, তাহা পরিত্যাগ কর। গত ছয় সাতশত বৎসর ধরিয়া কি ঘোর অবনতি হইয়াছে, দেখ। বড় বড় মন্দরা শত শত বর্ষ ধরিয়া এই মহাবিচারে ব্যস্ত যে,—একঘটি জল খাইব ডান হাতে, কি বাঁ হাতে; হাত তিনবার ধুইব না চারিবার;

কুলকুচা করিব পাঁচবার কি ছয়বার! যাহারা সারা জীবন এইরূপ দুরূহ প্রশ্নসমূহের মীমাংসায় ও এই সকল তত্ত্ব-সম্বন্ধে বড় বড় মহাপাণ্ডিত্যপূর্ণ দর্শন লিখিতে ব্যস্ত তাহাদিগের নিকট আর কি আশা করিতে পারা যায়? আমাদের ধর্ম্মটা যে রান্নাঘরে ঢুকিয়া সেইখানেই আবদ্ধ থাকিবে— এইরূপ আশঙ্কা বিলক্ষণ রহিয়াছে। আমরা এখন বৈদান্তিকও নহি, পৌরাণিকও নহি, তান্ত্রিকও নহি, আমরা এখন কেবল 'ছুঁৎমার্গী', আমাদের ধর্ম্ম এখন রান্নাঘর। আমাদের ঈশ্বর হইয়াছেন ভাতের হাঁড়ি, আর মন্ত্র 'আমায় ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা, আমি মহাপবিত্র'! যদি আমাদের দেশে আর এক শতাব্দী ধরিয়া এই ভাব চলে, তবে আমাদের প্রত্যেককেই পাগ্‌লা গারদে যাইতে হইবে! মন যখন জীবনের উচ্চতম তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করিতে অসমর্থ হয়, তখন তাহাকে মস্তিষ্ক-দৌর্ব্বল্যের নিশ্চিত লক্ষণ জানিতে হইবে। এই অবস্থায় মৌলিক তত্ত্ব গবেষণায় মানুষ একেবারে অসমর্থ হয়, নিজের সমুদয় তেজ, কার্য্যকরী শক্তি ও চিন্তাশক্তি হারাইয়া ফেলে; আর যতদূর সম্ভব ক্ষুদ্রতম গণ্ডির মধ্যেই তাহার কার্য্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হয়, তাহার বাহিরে সে আর যাইতে পারে না। প্রথমে এইগুলি একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইবে। মহাবীর্য্যের সহিত কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে। ঐগুলি বাদ দিলেও, যে ধনভাণ্ডার আমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছি, তাহা অফুরন্ত থাকিবে। সমগ্র জগৎ সেই ধনভাণ্ডার হইতে সাহায্য পাইবার জন্য উৎসুক হইয়া আছে। উহা হইতে ধনরাশি

বিতরণ না করিলে সমগ্র জগৎ ধ্বংস হইবে। অতএব বিতরণে আর বিলম্ব করিও না। ব্যাস বলিয়াছেন কলিযুগে দানই একমাত্র ধর্ম্ম—তন্মধ্যে আবার ধর্ম্মদান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান; বিদ্যাদান তাহার নিম্নে; তারপর প্রাণদান; সর্ব্বনিকৃষ্ট দান—অন্নদান। অন্নদান আমরা যথেষ্ট করিয়াছি; আমাদের ন্যায় দানশীল জাতি আর নাই। এখানে ভিক্ষুকের নিকটও যতক্ষণ পর্য্যন্ত একখানা রুটি থাকিবে, সে তাহার অর্দ্ধেক দান করিবে। এইরূপ ব্যাপার কেবল ভারতেই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যথেষ্ট অন্নদান করিয়াছি, এক্ষণে আমাদিগকে অপর দুই প্রকার দানে অগ্রসর হইতে হইবে—ধর্ম্ম ও বিদ্যাদান। যদি আমরা সকলেই অকুতোভয় হইয়া, হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া, ভাবের ঘরে এক বিন্দু চুরি না রাখিয়া কাজে লাগিয়া যাই, তবে আগামী ২৫ বৎসরের মধ্যে আমাদের সমুদয় সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইবে—বিরুদ্ধমতাবলম্বী আর কেহ থাকিবে না এবং সমগ্র ভারতবাসী আবার প্রাচীন আর্য্যগণের ন্যায় উন্নত হইবে।

আমাদিগকে সমগ্র জগৎকে ধর্ম্মদান করিতে হইবে

এখন আমার যেটুকু বলিবার ছিল, সব বলিলাম। আমি আমার সঙ্কল্পিত কার্য্যপ্রণালী বলিয়া বেড়াইতে বড় ভালবাসি না। কি করিতে ইচ্ছা করি না করি, মুখে না বলিয়া কাজে দেখাইতে আমি ভালবাসি। অবশ্য আমি একটা নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়াছি, যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, যদি আমার শরীর থাকে, তবে সঙ্কল্পিত বিষয়গুলি আমার কার্য্যে পরিণত করিবার ইচ্ছা আছে। জানি না,

আমার কার্য্য-প্রণালী

আমি কৃতকার্য্য হইব কি না; তবে একটা মহান্ আদর্শ লইয়া তাহাতেই মনঃপ্রাণ নিয়োগ—ইহাই জীবনের এক উচ্চ সার্থকতা। তাহা না হইলে এই ক্ষুদ্র পশুজীবন যাপনে ফল কি? জীবনকে এক মহান্ আদর্শের অনুবর্ত্তী করাই জীবনের একমাত্র সার্থকতা। ভারতে এই মহাকার্য্য সাধন করিতে হইবে। এই কারণে ভারতের বর্ত্তমান পুনরুজ্জীবনে আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। যদি বর্ত্তমান শুভমুহূর্ত্তের সাহায্য আমি না লই, তবে আমি মহামূর্খের ন্যায় কার্য্য করিব।

মাতুরা অভিনন্দন

মনমাতুরা হইতে মাতুরায় আসিয়া স্বামিজী রামনাদের রাজার সুন্দর বাঙ্গলায় অবস্থান করিলেন। অপরাহ্ণে একটি মখমলের খাপে পুরিয়া স্বামিজীকে নিম্নলিখিত অভিনন্দনপত্র প্রদত্ত হইল:—

পরম পূজ্যপাদ স্বামিজী,

মাতুরাবাসী আমরা হিন্দু সাধারণ—আমাদের এই প্রাচীন পবিত্র নগরীতে আপনাকে অন্তরের সহিত পরম শ্রদ্ধাসহকারে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি। আমরা আপনাতে হিন্দু সন্ন্যাসীর জীবন্ত উদাহরণ দেখিতেছি। আপনি সংসারের সমুদয় বন্ধন ও আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনরূপ মহান্ পরহিতব্রতে নিযুক্ত হইয়াছেন। আপনি নিজ জীবনেই প্রমাণ করিয়াছেন যে, হিন্দুধর্ম্মের সহিত বাহ্য অনুষ্ঠানের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই, কেবল উন্নত দার্শনিক ধর্ম্মই ত্রিতাপতাপিত জীবকে শান্তিদানে সমর্থ।

আপনি আমেরিকা ও ইংলণ্ডবাসীকে সেই ধর্ম্ম ও দর্শনকে শ্রদ্ধা করিতে শিখাইয়াছেন—যাহা প্রত্যেক মানবকে তাহার নিজের অধিকার ও অবস্থানুযায়ী উপায়ে উন্নতিপথে আরোহণে সাহায্য করে। যদিও গত চার বৎসর আপনি পাশ্চাত্যদেশবাসীকেই শিক্ষা দিয়াছেন, তথাপি এই দেশেও সেই সকল বক্তৃতা ও উপদেশ কম আগ্রহসহকারে পঠিত হয় নাই, এবং উহা বিদেশাগত উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান জড়বাদের প্রভাবকেও সঙ্কুচিত করিতে কম সাহায্য করে নাই।

ভারত আজ পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছে, তাহার কারণ, তাহাকে সমগ্র জগতের আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনরূপ মহাব্রত সাধন করিতে হইবে। কলিযুগের অন্তর্ব্বর্ত্তী এই উপযুগের শেষভাগে আপনার ন্যায় মহাপুরুষের আবির্ভাবে আমরা নিশ্চিত বুঝিতেছি, শীঘ্রই অনেকানেক মহাত্মা আবির্ভূত হইয়া এই ব্রত উদ্‌যাপন করিবেন।

প্রাচীন বিদ্যার লীলাভূমি, সুন্দরেশ্বরদেবের প্রিয়, যোগিগণের পবিত্র দ্বাদশান্তক্ষেত্র এই মাদুরা—আপনি ভারতীয় দর্শনের যে সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে পরমানন্দ প্রকাশে ও সমগ্র মনুষ্য-জাতির যে অমূল্য উপকার সাধন করিতেছেন, কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাহার স্বীকারে—ভারতীয় অন্য কোন নগরীর পশ্চাদ্‌গামী নহে জানিবেন।

আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আপনাকে দীর্ঘ-জীবন, উদ্যম ও বল প্রদান করুন এবং জগতের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত রাখুন।

মাদুরা অভিনন্দনের উত্তর

আমার খুব ইচ্ছা যে, কয়েকদিন তোমাদের নিকট থাকিয়া

তোমাদের সুযোগ্য সভাপতি মহাশয়ের আদেশ মত আমার পাশ্চাত্যদেশের সমুদয় অভিজ্ঞতা ও বিগত চার বৎসর ধরিয়া আমার প্রচারকার্য্যে কি ফল হইল, ইত্যাদি সমুদয় বিষয় বিবৃত করি। দুঃখের বিষয়, সন্ন্যাসিগণকেও দেহভার বহন করিতে হয়। বিগত তিন সপ্তাহ ধরিয়া ক্রমাগত নানাস্থানে ভ্রমণ ও দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া আমি এত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, অদ্য সন্ধ্যাকালেও বক্তৃতা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। এই কারণে, তোমরা আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ, তজ্জন্য তোমাদিগকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিয়াই আমাকে সন্তুষ্ট হইতে হইবে; আর অন্যান্য বিষয় ভবিষ্যতের জন্য রাখিতে হইবে। স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল হইলে ও আর একটু অবকাশ পাইলে আমাদের অন্যান্য সমুদয় বিষয় আলোচনা করিবার সুবিধা হইবে। অদ্য এই অল্প সময়ের মধ্যে সবকথা বলিবার সুযোগ হইবে না। একটি কথা বিশেষভাবে আমার মনে উদয় হইতেছে। আমি এক্ষণে মাদুরায় তোমাদের স্বনামপ্রসিদ্ধ স্বদেশবাসী উদার-চেতা রামনাদাধিপের অতিথি। তোমরা বোধ হয় অনেকেই জান, উক্ত রাজাই আমার মাথায় চিকাগো সভায় যাইবার ভাব প্রবেশ করাইয়া দেন, এবং বরাবরই তিনি হৃদয়ের সহিত তাঁহার দ্বারা যতদূর সম্ভব আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। সুতরাং অভি-নন্দনপত্রে আমাকে যে সকল প্রশংসাবাদ করা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ এই দাক্ষিণাত্যনিবাসী মহাপুরুষেরই প্রাপ্য। কেবল আমার মনে হয়, তিনি রাজা না হইয়া সন্ন্যাসী হইলেই ভাল ছিল; কারণ, তিনি সন্ন্যাসেরই উপযুক্ত।

যখনই জগতের অংশবিশেষে কোন জিনিসের আবশ্যক হয়, তখনই জগতের অপরাংশ হইতে তাহা গিয়া উহাকে নূতন জীবন প্রদান করিয়া থাকে। কি ভৌতিক, কি আধ্যাত্মিক উভয় রাজ্যেই ইহা সত্য। যদি জগতের কোন অংশে ধর্ম্মের অভাব হয়, এবং অপর কোথাও সেই ধর্ম্ম থাকে, তবে আমরা জ্ঞাতসারে চেষ্টা করি বা না করি, যেখানে সেই ধর্ম্মের অভাব, তথায় আপনা আপনি ধর্ম্মস্রোত প্রবাহিত হইয়া উভয় স্থানের সামঞ্জস্য বিধান করিবে। মানবজাতির ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই—একবার নহে, দুইবার নহে, কিন্তু বার বার এই প্রাচীন ভারতকে যেন বিধাতার নিয়মে জগৎকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে হইয়াছে। দেখিতে পাই—যখনই কোন জাতির দিগ্বিজয় বা বাণিজ্য প্রাধান্যে জগতের বিভিন্ন অংশ একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে এবং যখনই এক জাতির অপর জাতিকে কিছু দিবার সুযোগ হইয়াছে, তখনই প্রত্যেক জাতিই অপর জাতিকে রাজনৈতিক, সামাজিক বা আধ্যাত্মিক—যাহার যাহা আছে—তাহাই দিয়াছে। ভারত সমগ্র জগৎকে ধর্ম্ম ও দর্শন শিখাইয়াছে। পারস্য সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের অনেক পূর্ব্বেই ভারত জগৎকে আপন আধ্যাত্মিক সম্পদ্ প্রদান করিয়াছে। পারস্য সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়কালে আর একবার এই ঘটনা হয়। গ্রীকদিগের অভ্যুদয়কালে তৃতীয়বার। আবার ইংরাজের প্রাধান্যকালে এই চতুর্থবার সে আপন বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট ব্রত পালনে নিযুক্ত হইতেছে। যেমন আমরা ইচ্ছা করি বা না করি, পাশ্চাত্যদিগের সম্মিলিতভাবে কার্য্যপ্রণালী ও বাহ্য সভ্যতার

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-জগতের আদান-প্রদান

ভাব আমাদের দেশের ভিতর প্রবেশ করিয়া সমগ্র দেশকে ছাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে, সেইরূপ ভারতীয় ধর্ম্ম ও দর্শন পাশ্চাত্য দেশকে বন্যায় ভাসাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে। কেহই ইহার গতিরোধে সমর্থ নহে। আমরাও পাশ্চাত্য দেশীয় জড়বাদপ্রধান সভ্যতাপ্রভাবের সম্পূর্ণ প্রতিরোধে অসমর্থ। সম্ভবতঃ কিছু কিছু বাহ্যসভ্যতা আমাদের পক্ষে কল্যাণকর, পাশ্চাত্যদেশের পক্ষে আবার সম্ভবতঃ একটু আধ্যাত্মিকতার আবশ্যক। তাহা হইলেই উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে; আমাদিগকে যে পাশ্চাত্যদেশ হইতে সব শিখিতে হইবে অথবা তাহাদিগকে আমাদের নিকট সব শিখিতে হইবে, তাহা নহে। সমগ্র জগৎ যুগযুগান্তর ধরিয়া যে আদর্শ-জগতের কল্পনা করিয়া আসিতেছে, যাহাতে শীঘ্র তাহার আবির্ভাব হয়, যাহাতে সকল জাতির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়, এতদুদ্দেশ্যে প্রত্যেকেরই যতটুকু সাধ্য ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগকে দেওয়া উচিত। এই আদর্শ-জগতের কখন আবির্ভাব হইবে কি না, তাহা আমি জানি না; এই সামাজিক সম্পূর্ণতা কখন আসিবে কি না, এ সম্বন্ধে আমার নিজেরই সন্দেহ আছে। কিন্তু জগতের এই আদর্শ অবস্থা কখন আসুক বা না আসুক, আমাদের প্রত্যেককে এই অবস্থা আনয়নের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। মনে করিতে হইবে, কালই জগতের এই অবস্থা আসিবে, আর আমার—কেবল আমার কার্য্যের উপরই ইহা নির্ভর করিতেছে। আমাদের প্রত্যেককেই ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে যে, জগতের অপর সকলে নিজ নিজ কার্য্য শেষ করিয়া বসিয়া আছে,—একমাত্র আমারই কেবল কাজ করিবার

বাকি আছে ; আর যদি আমি নিজ কার্য্য সাধন করি, তবেই জগৎ সম্পূর্ণ হইবে। আমাদের নিজেদের উপর এই দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে হইবে।

মধ্যপথ অবলম্বনীয়

যাহা হউক, দেখা যাইতেছে—ভারতে ধর্ম্মের এক প্রবল পুনরুত্থান হইয়াছে। ইহাতে খুব আনন্দের কারণ আছে বটে, কিন্তু আবার বিপদেরও আশঙ্কা আছে। কারণ, ধর্ম্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে আবার ভয়ানক গোঁড়ামিও আসিয়া থাকে। কখন কখন লোকে এত বাড়াবাড়ি করিয়া থাকে যে, অনেক সময় যাঁহাদের চেষ্টায় এই পুনরভ্যুত্থান সাধিত হয়, কিছুদূর অগ্রসর হইলে তাঁহারাও উহা আর নিয়মিত করিতে পারেন না। অতএব পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হওয়া ভাল। আমাদের তুই পথের মাঝামাঝি চলিতে হইবে। এক দিকে কুসংস্কারপূর্ণ প্রাচীন সমাজ, অপর দিকে জড়বাদ—ইউরোপীয় ভাব নাস্তিকতা, তথাকথিত সংস্কার, যাহা পাশ্চাত্য জগতের উন্নতির মূল ভিত্তিতে পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট। এই তুইটি হইতেই সাবধান হইতে হইবে। প্রথমতঃ আমরা কখন পাশ্চাত্য জাতি হইতে পারিব না, সুতরাং উহাদের অনুকরণ বৃথা। মনে কর, তোমরা পাশ্চাত্য জাতির সম্পূর্ণ অনুকরণে সমর্থ হইলে, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে ইহাতে সমর্থ হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই তোমাদের মৃত্যু হইবে—তোমাদের জীবন কিছুমাত্র থাকিবে না ; আর ইহা অসম্ভব। কালের প্রারম্ভ হইতে, মানবজাতির ইতিহাসের লক্ষ লক্ষ বর্ষ ধরিয়া একটি নদী হিমালয় হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে ; তুমি কি উহাকে উহার উৎপত্তিস্থান হিমালয়ের

তুষারময় শৃঙ্গে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে চাও ? তাহাও যদি সম্ভব হয়, তথাপি তোমাদের পক্ষে ইউরোপীয়ভাবাপন্ন হইয়া যাওয়া অসম্ভব। ইউরোপীয়গণের পক্ষে যদি কয়েক শতাব্দীর শিক্ষাসংস্কার পরিত্যাগ করা অসম্ভব বোধ কর, তবে তোমাদের পক্ষে শত শত শতাব্দীর সংস্কার পরিত্যাগ করা কিরূপে সম্ভবপর হইবে ? তাহা কখনই হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ ইহাও আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা সচরাচর যেগুলিকে আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাস বলি, সেগুলি আমাদের নিজ নিজ ক্ষুদ্র গ্রাম্য দেবতা সম্বন্ধীয় ও কতকগুলি ক্ষুদ্র কুসংস্কারপূর্ণ দেশাচার মাত্র। এইরূপ দেশাচার অসংখ্য ও পরস্পরবিরোধী। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি মানিব, কোন্‌টি মানিব না ? উদাহরণস্বরূপ দেখ, দাক্ষিণাত্যের একজন ব্রাহ্মণ অপর ব্রাহ্মণকে এক টুক্‌রা মাংস খাইতে দেখিলে ভয়ে দুই শত হাত পিছাইয়া যাইবে; আর্য্যাবর্ত্তের ব্রাহ্মণ কিন্তু মহাপ্রসাদের অতিশয় ভক্ত, পূজার জন্য তিনি শত শত ছাগবলি দিতেছেন। তুমি তোমার দেশাচারের দোহাই দিবে, তিনি তাঁহার দেশাচারের দোহাই দিবেন। ভারতের বিভিন্ন দেশে নানাবিধ দেশাচার আছে, কিন্তু প্রত্যেক দেশাচারই স্থানবিশেষে আবদ্ধ; মাত্র অজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহাদের নিজ নিজ পল্লীতে প্রচলিত আচারকেই ধর্ম্মের সার বলিয়া মনে করে, ইহাই তাহাদের মহাভ্রম।

দেশাচার ও ধর্ম্মের পার্থক্য

ইহা ব্যতীত আরও কতকগুলি মুশ্‌কিল আছে। আমাদের শাস্ত্রে দুই প্রকার সত্য উপদিষ্ট হইয়াছে। এক প্রকার সত্য মানুষের নিত্যস্বরূপবিষয়ক—ঈশ্বর, জীবাত্মা ও প্রকৃতির পরস্পর সম্বন্ধবিষয়ক।

অপর প্রকার সত্য কোন বিশেষ দেশকাল অবস্থার উপর নির্ভর করে।

সনাতন ও যুগধর্ম্ম

প্রথম প্রকার সত্য প্রধানতঃ আমাদের শাস্ত্র বেদে রহিয়াছে। দ্বিতীয় প্রকার সত্য স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতিতে রহিয়াছে। আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, চিরকালের জন্য বেদই আমাদের চরম লক্ষ্য ও চরম প্রমাণ। আর যদি কোন পুরাণ কোনরূপ বেদের বিরোধী হয় তবে পুরাণের সেই অংশ নির্ম্মমভাবে ত্যাগ করিতে হইবে।

বেদ ও স্মৃতি

আমরা স্মৃতিতে কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই, বিভিন্ন স্মৃতির উপদেশ বিভিন্ন প্রকার। এক স্মৃতি বলিতেছেন—ইহাই দেশাচার, এই যুগে ইহারই অনুসরণ করিতে হইবে। অপর স্মৃতি আবার ঐ যুগের জন্যই অন্যবিধ আচারের সমর্থন করিতেছেন। কোন স্মৃতি আবার সত্য প্রভৃতি যুগভেদে বিভিন্ন আচারের সমর্থন করিয়াছেন। এক্ষণে দেখ, তোমাদের শাস্ত্রের এই মতটি কি উদার ও মহান্! সনাতন সত্যসমূহ মানব প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যতদিন মানুষ বাঁচিবে, ততদিন উহাদের পরিবর্ত্তন হইবে না—অনন্তকাল ধরিয়া সর্ব্বদেশে সর্ব্বাবস্থায়ই ঐগুলি ধর্ম্ম। স্মৃতি অপর দিকে বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় অনুষ্ঠেয় কর্ত্তব্যসমূহের কথাই অধিক বলিয়া থাকেন, সুতরাং কালে কালে সেগুলির পরিবর্ত্তন হয়। এইটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে—কোন সামান্য সামাজিক প্রথার পরিবর্ত্তন হইতেছে বলিয়া তোমাদের ধর্ম্ম গেল, মনে করিও না। মনে রাখিও, এই সকল প্রথা ও আচারের চিরকালই পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই ভারতেই এমন সময় ছিল, যখন গোমাংস ভোজন না করিলে

কোন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব থাকিত না। বেদপাঠ করিলে দেখিতে পাইবে, কোন বড় সন্ন্যাসী বা রাজা বা অন্য কোন বড়লোক আসিলে ছাগ ও গোহত্যা করিয়া তাঁহাদিগকে ভোজন করান প্রথা ছিল। ক্রমশঃ সকলে বুঝিল—আমাদের জাতি প্রধানতঃ কৃষিজীবী, সুতরাং ভাল ভাল ষাঁড়গুলি মারিলে সমগ্র জাতিরই ধ্বংস হইবে। এই কারণেই গোহত্যা প্রথা রহিত করা হইল—গোহত্যা মহাপাতক বলিয়া পরিগণিত হইল। প্রাচীন শাস্ত্র পাঠে আমরা দেখিতে পাই, তখন হয়ত এমন আচার সকল প্রচলিত ছিল, যাহা এখন আমরা বীভৎস জ্ঞান করি। ক্রমশঃ সেগুলিরও পরিবর্ত্তে অন্য বিধির প্রবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। ঐগুলিরও আবার পরিবর্ত্তন হইবে, তখন নূতন নূতন স্মৃতির অভ্যুদয় হইবে। এইটিই বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বেদ চিরকাল একরূপ থাকিবে, কিন্তু স্মৃতির প্রাধান্য যুগপরিবর্ত্তনেই শেষ হইয়া যাইবে। সময়স্রোত যতই চলিবে, ততই পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্মৃতির প্রামাণ্য লোপ পাইবে, আর মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া সমাজকে পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল পথে পরিচালিত করিবেন; সেই যুগের পক্ষে যাহা অত্যাবশ্যকীয়, যাহা ব্যতীত সমাজ বাঁচিতেই পারে না—তাঁহারা আসিয়া সেই সকল কর্ত্তব্য ও পথ সমাজকে দেখাইয়া দিবেন। এইরূপে আমাদিগকে এই উভয় বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে; আর আমি আশা করি, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই একদিকে যেমন উদার ভাব—হৃদয়ের প্রশস্ততা আসিবে, অপর দিকে তেমনি দৃঢ় নিষ্ঠা ও বিশ্বাস থাকিবে; তাহা হইলেই তোমরা আমার কথার মর্ম্ম বুঝিবে,—তবেই বুঝিবে, আমার উদ্দেশ্য সকলকেই আপনার করিয়া

লওয়া, কাহাকেও ত্যাগ করা নহে। আমি চাই, গোঁড়ার নিষ্ঠাটুকু ও তাহার সহিত জড়বাদীর উদার ভাব। হৃদয় সমুদ্রবৎ গভীর অথচ আকাশবৎ প্রশস্ত হওয়া চাই। আমাদিগকে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতিশীল জাতির মত উন্নতিশীল হইতে হইবে, আবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আবহমানকালের চিরসঞ্চিত সংস্কারসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইতে হইবে; আর হিন্দুই কেবল প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন প্রথার সম্মান করিতে জানে। সাদা কথায় বলি—সব বিষয়েই আমাদিগকে মুখ্য গৌণ উভয়ের বিভিন্নতা কোথায়, তাহা শিখিতে হইবে। মুখ্য বিষয়গুলি সর্ব্বকালের জন্য, গৌণ তত্ত্বগুলি কোন বিশেষ সময়ের উপযোগী মাত্র। যদি সময়ে সেইগুলির পরিবর্ত্তে অন্য প্রথাসকল প্রবর্ত্তন না করা হয় তবে সেগুলিতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। আমার এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, তোমাদিগকে প্রাচীন আচার-পদ্ধতিসমূহের নিন্দা করিতে হইবে। কখনই নহে, অতিশয় কুৎসিত আচারগুলিরও নিন্দা করিও না। নিন্দা কিছুরই করিও না; এখন যে প্রথাগুলিকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে অনিষ্টকর বলিয়া বোধ হইতেছে, সেইগুলিই অতীত কালে সাক্ষাৎসম্বন্ধে জীবনপ্রদ ছিল। যদি এখন সেইগুলিকে উঠাইয়া দিতে হয়, তবে উঠাইয়া দিবার সময় সেইগুলির নিন্দা করিও না; বরং উহাদের দ্বারা আমাদের জাতীয় জীবনরক্ষারূপ যে মহৎ কার্য্যের সাধন হইয়াছে, তাহার জন্য তাহাদিগের প্রশংসা কর ও তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আর আমাদিগকে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে, কোন সেনাপতি বা রাজা

প্রাচীন প্রথার নিন্দা করিও না

কোনকালে আমাদের সমাজের নেতা ছিলেন না, ঋষিগণই চিরকাল আমাদের সমাজের নেতা। ঋষি কাহারা ? তিনিই ঋষি, যিনি ধর্ম্মকে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, যাঁহার নিকট ধর্ম্ম কেবল পুঁথিগত বিদ্যা, বাগ্‌বিতণ্ডা বা তর্কযুক্তি নহে—সাক্ষাৎ উপলব্ধি—অতীন্দ্রিয় সত্যের সাক্ষাৎকার। উপনিষদ্‌ বলিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তি সাধারণ মানবতুল্য নহেন, তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা। ইহাই ঋষিত্ব।

ঋষি হিন্দু-সমাজের নেতা

আর এই ঋষিত্বলাভ কোনরূপ দেশ কাল জাতি বা সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করে না। বাৎস্যায়ন ঋষি বলিয়াছেন—সত্যের সাক্ষাৎকার করিতে হইবে আর আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তোমাকে আমাকে—আমাদের সকলকেই ঋষি হইতে হইবে—অগাধ আত্মবিশ্বাস-সম্পন্ন হইতে হইবে ; আমরাই সমগ্র জগতে শক্তিসঞ্চার করিব। কারণ, সব শক্তি আমার ভিতরে রহিয়াছে। আমাদিগকে ধর্ম্ম সাক্ষাৎ করিতে হইবে, উপলব্ধি করিতে হইবে ; তবেই ধর্ম্মসম্বন্ধে আমাদের সকল সন্দেহ দূরীভূত হইবে ; তখনই ঋষিত্বের উজ্জ্বল জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া আমরা প্রত্যেকেই মহাপুরুষ-পদবী লাভ করিব। তখন আমাদের মুখ হইতে যে বাণী নির্গত হইবে, তাহা অব্যর্থ, অমোঘ ও শক্তিসম্পন্ন হইবে ; তখন আমাদের সম্মুখ হইতে মন্দ যাহা কিছু, তাহা আপনিই পলায়ন করিবে, আমাদিগকে আর কাহাকেও নিন্দা বা অভিসম্পাত করিতে হইবে না, অথবা কাহারও সহিত বিরোধ করিতে হইবে না। এখানে আজ যাহারা রহিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেককে তাহার নিজের ও অপরের মুক্তির জন্য ঋষিত্ব পদবী লাভ করিতে শ্রীভগবান্‌ সাহায্য করুন।

কুম্ভকোণমের পথে—ত্রিচিনপল্লী ও তাঞ্জোর

মাদুরায় অবাস্থিতিকালে স্বামিজী একদিন তথাকার সুবিখ্যাত মন্দির দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ঐ মন্দির ভারতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মন্দিরসমূহের অন্যতম। উহার স্থাপত্যকার্য্য অতি সুন্দর। মাদুরা হইতে স্বামিজী সন্ধ্যার ট্রেণে সাউথ্ ইণ্ডিয়ান রেলযোগে কুম্ভকোণম্ যাত্রা করিলেন। যে যে ষ্টেশনে গাড়ী থামিতে লাগিল, তথায়ই দেখা গেল শত শত ব্যক্তি স্বামিজীকে দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ভোর ৪টার সময় গাড়ী যখন ত্রিচিনপল্লীতে পৌঁছিল, তখন দেখা গেল—প্রায় হাজার লোক ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছে; গাড়ী ষ্টেশনে পৌঁছিবামাত্র তাহারা স্বামিজীকে এক অভিনন্দন প্রদান করিল। অভিনন্দনে তাহারা বলিল যে, আমরা আশা করিয়াছিলাম, আপনি অন্ততঃ একদিন এখানে পদার্পণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন। যাহা হউক, মাদ্রাজ-বাসীরা যে আপনাকে শীঘ্রই পাইবে, ইহা ভাবিয়াই আমরা পরম আনন্দ বোধ করিতেছি। ত্রিচিনপল্লীর জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতি এবং ছাত্রবৃন্দও স্বামিজীকে স্বতন্ত্র অভিনন্দন প্রদান করেন। স্বামিজীকে অবশ্য খুব সংক্ষেপে উত্তর দিতে হইল। তাঞ্জোর ষ্টেশনেও স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অনেক লোকের সমাগম হয়।

কুম্ভকোণম্ অভিনন্দন

কুম্ভকোণমে পৌঁছিয়া স্বামীজী তথায় তিন দিন রহিলেন। এখানে স্বামীজীকে দুইটি অভিনন্দন দেওয়া হয়। একটি

কুম্ভকোণম্‌নিবাসী সমগ্র হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে ও দ্বিতীয়টি উক্ত স্থানের হিন্দুছাত্রগণের পক্ষ হইতে। প্রথমটির বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল :—

পূজনীয় স্বামিজী,

পাশ্চাত্যদেশ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বহু মন্দিরশোভিত ও বিখ্যাত সাধুগণের নামের সহিত বিজড়িত এই পবিত্র ভূমিতে আপনার শুভাগমনে এই প্রাচীন ও ধর্ম্মের জন্য প্রসিদ্ধ কুম্ভকোণম্ নগরের সমগ্র হিন্দু অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে আমরা আপনাকে হৃদয়ের সহিত অভ্যর্থনা করিতেছি। আমেরিকা ও ইউরোপে আপনি আপনার ধর্ম্মপ্রচারব্রতে অদ্ভুতরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ঈশ্বর আপনাকে চিকাগোয় সমবেত জগতের প্রধান ধর্ম্মসমূহের বাছা বাছা প্রতিনিধিগণের মনে এই ভাব মুদ্রিত করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন যে—হিন্দুধর্ম্ম ও দর্শন উভয়ই এত উদার ও যুক্তি-সঙ্গত যে, ঈশ্বর ও ধর্ম্মসম্বন্ধে লোকের যত প্রকার আদর্শ হইতে পারে, উহা তৎসমুদয়েরই সামঞ্জস্য বিধানে সমর্থ। আমরা এই কারণে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি।

সহস্র বর্ষ ধরিয়া আমরা প্রাণের সহিত এই বিশ্বাস পোষণ করিয়া আসিতেছি যে, এ জগতের প্রাণ ও আত্মস্বরূপ ভগবানের কৃপায় সত্যেরই চিরকাল জয় হইয়া থাকে। আর আজ যে আমরা খৃষ্টিয়ানদের দেশে আপনার পবিত্র ধর্ম্মপ্রচারব্রতের সফলতায় আনন্দিত হইতেছি, তাহার কারণ এই যে, ইহা দ্বারা পরম ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুজাতি যে অমূল্য আধ্যাত্মিক সম্পত্তি জগতের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, ভারত ও ভারতেতর প্রদেশের লোকেরা তাহার সংবাদ

পাইতেছে। আপনার প্রচারকার্য্যের সফলতায় আপনার সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মা গুরুদেবের নাম আরও উজ্জ্বল হইয়াছে, উহা সভ্যজগতের সমক্ষে আমাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা ইহার দ্বারা আমরা প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছি যে, অতীতকালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন, আমরা সমগ্র জাতি তাহার জন্য আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করিতে পারি। আমরা যে গায়ে পড়িয়া অপরকে আক্রমণ করিতে যাই নাই, ইহা আমাদের সভ্যতার হীনতাসূচক নহে। আমাদের মধ্যে যখন আপনার ন্যায় স্থিরবুদ্ধি, একনিষ্ঠ ও সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ কর্ম্মী সকল রহিয়াছেন, তখন হিন্দুজাতির ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল ও আশাপ্রদ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সমগ্র জগতের ঈশ্বর—যিনি সকল জাতিরও ঈশ্বর, তিনি আপনাকে সুস্থ ও দীর্ঘজীবী করুন। তিনি হিন্দুধর্ম্ম ও দর্শনের আচার্য্যরূপে আপনার মহান্ ব্রত সাধনের জন্য আপনাকে দিন দিন সবল করুন—প্রতিদিন আপনার হৃদয়ে নূতন নূতন জ্ঞানের স্রোত প্রবাহিত করুন।

স্বামিজী ইহার উত্তরে বেদান্ত সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল :—

কুম্ভকোণম্ বক্তৃতা

গীতাকার বলিয়াছেন—‘স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ’ ২।৪০।—অল্পমাত্রও কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম করিলে তাহাতে অতি মহৎ ফললাভ হয়। যদি এই বাক্যের সমর্থনের জন্য কোন উদাহরণের আবশ্যক হয়, তবে আমি বলিতে পারি, আমার ক্ষুদ্র

জীবনে প্রতিপদে এই মহাবাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিতেছি। হে কুম্ভকোণম্‌নিবাসী ভদ্রমহোদয়গণ, আমি কার্য্য অতি সামান্য করিয়াছি; কিন্তু কলম্বোয় নামিয়া অবধি এ পর্য্যন্ত যে যে স্থানে আসিয়াছি, তথায়ই যেরূপ সহৃদয় অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছি, তাহা আমার স্বপ্নের অতীত। সেই সঙ্গে ইহাও বলি যে,—হিন্দুজাতির পূর্ব্বাপর সংস্কার ও ভাবের ইহা উপযুক্তই হইয়াছে। কারণ, হিন্দুজাতির প্রকৃত জীবনীশক্তি, হিন্দুজাতির মূলমন্ত্রই—ধর্ম্ম।

আমি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদেশে অনেক ঘুরিয়াছি, জগতের সম্বন্ধে আমার একটু অভিজ্ঞতা আছে। আমি দেখিলাম, সকল জাতিরই এক একটি প্রধান আদর্শ আছে, তাহাই সেই জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ। রাজনীতিই কোন কোন জাতির জীবনের মূল ভিত্তি-স্বরূপ, কাহারও কাহারও বা সামাজিক উন্নতি, কাহারও কাহারও আবার মানসিক উন্নতিবিধান, কাহারও বা অন্য কিছু জাতীয় জীবনের ভিত্তি। কিন্তু আমাদের মাতৃভূমির জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি ধর্ম্ম—একমাত্র ধর্ম্ম। উহাই আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড, উহারই উপর আমাদের জাতীয় জীবনরূপ প্রাসাদের মূল ভিত্তি স্থাপিত।

ধর্ম্ম'ই আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড

তোমাদের মধ্যে অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে, মাদ্রাজবাসীরা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে আমেরিকায় যে অভিনন্দন পাঠাইয়াছিলেন, তাহার উত্তরে আমি একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছিলাম যে—পাশ্চাত্যদেশের অনেক ভদ্রলোক অপেক্ষা ভারতের কৃষকগণ ধর্ম্মবিষয়ে অধিক শিক্ষিত। আজ আমি সেই বিষয়ের বিশেষ প্রমাণ পাইতেছি, ঐ বিষয়ে এখন আমার আর কোন সন্দেহ

নাই। এমন সময় ছিল, যখন ভারতের সাধারণ লোকের মধ্যে জগতের সংবাদ-জ্ঞানের এবং ঐ সংবাদসংগ্রহে আগ্রহের অভাব দেখিয়া আমার দুঃখ হইত। এখন আমি উহার রহস্য বুঝিয়াছি। আমাদের দেশের লোকও সংবাদ সংগ্রহে খুব ব্যাকুল, তবে অবশ্য যে বিষয়ে তাহার বিশেষ অনুরাগ, সেই বিষয়ের সংবাদই সে চাহিয়া থাকে; এ বিষয়ে বরং অন্যান্য দেশের—যে সকল দেশ আমি দেখিয়াছি বা পর্য্যটন করিয়াছি—সাধারণ লোক অপেক্ষা তাহাদের আগ্রহ বেশী। আমাদের কৃষকগণকে ইউরোপের গুরুতর রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন সকলের সংবাদ জিজ্ঞাসা কর, ইউরোপীয়-সমাজে যে সকল গুরুতর পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহাদের বিষয় জিজ্ঞাসা কর—তাহারা সে সকল বিষয়ের কিছুই জানে না, জানিতে চাহেও না। কিন্তু সিংহলেও (যে সিংহল একেবারে ভারতবহির্ভূত, ভারতের স্বার্থের সাহিত যাহার বিশেষ সংস্রব নাই) দেখিলাম, তথাকার কৃষককুলও জানিয়াছে যে, আমেরিকায় ধর্ম্মমহাসভা বসিয়াছিল, তাহাদেরই একজন সেখানে গিয়াছিলেন, আর তিনি কিছু পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে বিষয়ে তাহাদের হৃদয় আসক্ত, সেই বিষয়ে তাহারা জগতের অন্যান্য জাতিসমূহের ন্যায়ই সংবাদসংগ্রহে ব্যাকুল। আর ধর্ম্মই ভারতবাসীর একমাত্র প্রাণের বস্তু—আগ্রহের বস্তু।

ধর্ম্ম জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি হওয়া উচিত, অথবা রাজনীতি—এ বিষয়ে এখন আমি বিচার করিতে চাহি না; তবে ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, ভালই হউক, মন্দই হউক, ধর্ম্মেই আমাদের জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি স্থাপিত। তুমি কখন ইহার পরিবর্ত্তন

করিতে পার না, একটা জিনিস নষ্ট করিয়া তাহার বদলে অপর জিনিস বসাইতে পার না। একটি বৃহৎ বৃক্ষকে এক স্থান হইতে উপড়াইয়া অপর স্থানে তৎক্ষণাৎ পুঁতিয়া দিলে উহা যে তথায় জীবিত অবস্থায় থাকিবে, তাহা তুমি কখনই আশা করিতে পার না। ভালই হউক, মন্দই হউক, সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া ভারতে ধর্ম্মই জীবনের চরমাদর্শরূপে পরিগণিত হইতেছে; ভালই হউক, মন্দই হউক, শত শত শতাব্দী ধরিয়া ভারতের বায়ু ধর্ম্মের মহান্ আদর্শসমূহে পূর্ণ রহিয়াছে; ভালই হউক, মন্দই হউক, আমরা ধর্ম্মের এই সকল আদর্শের মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি; এক্ষণে ঐ ধর্ম্মভাব আমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, আমাদের শিরায় শিরায় প্রতি রক্তবিন্দুর সহিত উহা প্রবাহিত হইতেছে, উহা আমাদের প্রকৃতিগত হইয়া পড়িয়াছে, আমাদের জীবনের জীবনীশক্তিরূপে দাঁড়াইয়াছে। মহাতেজের বিকাশ না করিয়া—সহস্র বর্ষ ধরিয়া যে মহানদী নিজের খাত রচনা করিয়াছে তাহাকে না বুজাইয়া, তোমরা কি সেই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পার? তোমরা কি গঙ্গাকে তাহার উৎপত্তিস্থান হিমালয়ে ঠেলিয়া লইয়া গিয়া আবার তাহাকে নূতন খাতে প্রধাবিত করাইতে ইচ্ছা কর? ইহাও যদি সম্ভব হয় তথাপি এই দেশের পক্ষে তাহার বিশেষত্বসূচক ধর্ম্মজীবন পরিত্যাগ করিয়া রাজনীতি অথবা অপর কিছুকে জাতীয় জীবনের মূলভিত্তিরূপে গ্রহণ করা সম্ভব নহে। স্বল্পতম বাধার পথেই তোমরা কার্য্য করিতে পার; ধর্ম্মই ভারতের পক্ষে এই স্বল্পতম বাধার পথ। এই ধর্ম্মপথের অনুসরণ করাই ভারতের জীবন, ভারতের উন্নতি ও ভারতের কল্যাণের একমাত্র উপায়।

অন্যান্য দেশে অন্যান্য পাঁচ রকম আবশ্যকীয় জিনিসের মধ্যে ধর্ম্ম একটি। একটি চলিত উদাহরণ দিই। আমি সচরাচর এই দৃষ্টান্তটি দিয়া থাকি—অমুক সম্ভ্রান্ত মহিলার ঘরে নানা জিনিস আছে; এখানকার ফ্যাশন—একটি জাপানী পাত্র (Vase) ঘরে রাখা—না রাখিলে ভাল দেখায় না—সুতরাং তাঁহাকে একটা জাপানী পাত্র রাখিতেই হইবে। এইরূপ আমাদের কর্ত্তার বা গিন্নীর অনেক কাজ, তার মধ্যে একটু ধর্ম্মও চাই—তবেই সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ হইল। এই কারণেই তাঁহাদের একটু আধটু ধর্ম্ম করা চাই। জগতের অধিকাংশ লোকের জীবনের উদ্দেশ্য—রাজনৈতিক বা সামাজিক উন্নতির চেষ্টা—এক কথায় সংসার। ঈশ্বর ও ধর্ম্ম তাহাদের নিকট সংসারেরই একটু সুখবিধানের জন্য—তাহাদের নিকট ঈশ্বরের এইটুকু মাত্র প্রয়োজন। তোমরা কি শুন নাই, বিগত দুই শত বৎসর হইতে কতকগুলি অজ্ঞ অথচ পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে ভারতীয় ধর্ম্মের বিরুদ্ধে একমাত্র অভিযোগ শুনা যাইতেছে যে—উহা দ্বারা সাংসারিক সুখ-স্বচ্ছন্দতা লাভের সুবিধা হয় না, উহা দ্বারা কাঞ্চন লাভ হয় না, উহাতে সমগ্র জাতিকে দস্যুতে পরিণত করে না, উহাতে বলবানকে গরীবের ঘাড়ে পড়িয়া তাহার রক্ত পান করায় না! সত্যই, আমাদের ধর্ম্ম এরূপ করে না। ইহাতে অন্যান্য জাতির সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ও সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য পদভরে ভূকম্পকারী সৈন্য প্রেরণের ব্যবস্থা নাই। অতএব তাঁহারা বলেন—এ ধর্ম্মে আছে কি? উহা চল্‌তি কলে

হিন্দুধর্ম্মের উদ্দেশ্য—সাংসারিক সুখ নহে

শস্ত যোগাইয়া কাজ আদায় করিতে জানে না, অথবা উহা দ্বারা গায়ের জোর হয় না। অতএব এ ধর্ম্মে আছে কি? তাহারা স্বপ্নেও ভাবে না যে, ঐ যুক্তির দ্বারাই আমাদের ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। আমাদের ধর্ম্মে সাংসারিক সুখ হয় না, সুতরাং আমাদের ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। আমাদের ধর্ম্মই একমাত্র সত্যধর্ম্ম; কারণ, আমাদের ধর্ম্ম এই তিন দিনের ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়জগৎকেই আমাদের চরম লক্ষ্য বলে না! এই কয়েক হস্ত বিস্তৃত ক্ষুদ্র পৃথিবীতেই আমাদের ধর্ম্মের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ নহে। আমাদের ধর্ম্ম এই জগতের সীমার বাহিরে; দূরে, অতি দূরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে—সে রাজ্য অতীন্দ্রিয়—তথায় দেশ নাই, কাল নাই, সংসারের কোলাহল হইতে দূরে, অতি দূরে—সেখানে গেলে আর সংসারের সুখ দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না; তখন সমগ্র জগৎই সেই মহিমময় ভূমা আত্মারূপ মহাসমুদ্রে বিন্দুতুল্য হইয়া যায়। আমাদের ধর্ম্মই সত্য-ধর্ম্ম—কারণ, 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা,' এই উপদেশ দিয়া থাকে; আমাদের ধর্ম্ম বলে—কাঞ্চন, লোষ্ট্র বা ধূলির তুল্য; যতই ক্ষমতা লাভ কর না কেন, সবই ক্ষণিক, এমন কি, জীবনধারণই অনেক সময় বিড়ম্বনামাত্র, এই হেতুই আমাদের ধর্ম্ম সত্য। আমাদের ধর্ম্মই সত্যধর্ম্ম—কারণ, সর্ব্বোপরি উহা ত্যাগ শিক্ষা দিয়া থাকে। শত শত যুগের সঞ্চিত জ্ঞানবলে দণ্ডায়মান হইয়া উহা আমাদের মহা-জ্ঞানী প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষগণের তুলনায় যাহারা কালকের শিশুমাত্র, সেই সকল জাতির সমক্ষে সুদৃঢ় অথচ স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া থাকে, 'বালক! তুমি ইন্দ্রিয়ের দাস—কিন্তু ইন্দ্রিয়ের ভোগ অস্থায়ী—বিনাশই উহার পরিণাম; এই তিন দিনের ক্ষণস্থায়ী বিলাসের

ফল—সর্ব্বনাশ! অতএব ইন্দ্রিয়সুখের বাসনা ত্যাগ কর—ইহাই ধর্ম্মলাভের উপায়।' ত্যাগই আমাদের চরম লক্ষ্য, মুক্তির সোপান —ভোগ নহে। এই হেতু আমাদের ধর্ম্মই একমাত্র সত্যধর্ম্ম। বিস্ময়ের বিষয় এক জাতির পর আর এক জাতি সংসার-রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত মহাতেজের সহিত নিজ নিজ অংশ অভিনয় করিয়াছে, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাহাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে! কালসমুদ্রে তাহারা একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গও উৎপাদন করিতে পারে নাই—নিজেদের কিছু চিহ্ন পর্য্যন্ত রাখিয়া যাইতে পারে নাই। আমরা কিন্তু অনন্তকাল ধরিয়া কাক ভূশণ্ডীর মত বাঁচিয়া আছি—আমাদের যে কখন মৃত্যু হইবে, তাহারও চিহ্ন দেখা যাইতেছে না।

যোগ্যতম কে? —প্রাচ্য না পাশ্চাত্য

আজকাল লোকে 'যোগ্যতমের উজ্জীবন' (Survival of the fittest) বিষয় নূতন মতবাদ লইয়া অনেক কথা বলিয়া থাকে। তাহারা মনে করে, যার গায়ের জোর যত বেশী সেই তত অধিক দিন জীবিত থাকিবে। যদি তাহাই সত্য হইত, তবে প্রাচীনকালের যে সকল জাতি কেবল অন্যান্য জাতির সহিত যুদ্ধবিগ্রহে কাটাইয়াছে তাহারাই মহাগৌরবের সহিত আজও জীবিত থাকিত এবং আমরা—এই দুর্ব্বল হিন্দুজাতি—(জনৈকা ইংরাজ যুবতী আমায় এক সময় বলেন, হিন্দুরা কি করিয়াছে? তাহারা কোন একটা জাতিকেও জয় করিতে পারে নাই!)—সেই জাতি—যাহারা কখন অপর একটি জাতিকেও জয় করে নাই—তাহারাই এতদিন বিনাশ-প্রাপ্ত হইয়া যাইত; পরন্তু সেই জাতি এখনও ত্রিশকোটি প্রাণী

লইয়া সদর্পে জীবিত রহিয়াছে! আর ইহাও সত্য নহে যে, উহার সমুদয় শক্তি ক্ষয় হইয়াছে; ইহাও সত্য নহে যে, এই জাতির শরীরের সমুদয় অংশ জড়তায় আচ্ছন্ন হইয়াছে—ইহা কখনই সত্য নহে। এই জাতির এখনও যথেষ্ট জীবনীশক্তি রহিয়াছে!—যখনই উপযুক্ত সময় হয়, যখনই প্রয়োজন হয়, তখনই এই জীবনীশক্তি মহাবন্যার ন্যায় প্রবাহিত হইয়া থাকে। আমরা যেন অতি প্রাচীনকাল হইতে সমগ্র জগৎকে এক মহাসমস্যাপূরণে আহ্বান করিয়াছি। পাশ্চাত্যদেশে সকলে এই চেষ্টা করিতেছে যে, তাহারা কিসে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দ্রব্যসামগ্রীর অধিকারী হইবে; আমরা কিন্তু এখানে এই সমস্যার মীমাংসায় নিযুক্ত যে কত অল্প জিনিস লইয়া আমরা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি। উভয় জাতির মধ্যে এই সংঘর্ষ ও প্রভেদ এখনও কয়েক শতাব্দী ধরিয়া চলিবে। কিন্তু ইতিহাসে যদি কিছুমাত্র সত্য থাকে, যদি বর্ত্তমান চিহ্নসমূহ দেখিয়া ভবিষ্যৎ অনুমান করা বিন্দুমাত্র সম্ভব হয়, তবে দেখা যাইবে যে, যাহারা খুব অল্পের মধ্যে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ও উত্তমরূপে আত্মসংযম করিতে চেষ্টা করে, তাহারাই আখেরে যুদ্ধে জয়ী হইবে। আর যাহারা ভোগসুখ ও বিলাসের দিকেই ধাবমান, তাহারা আপাততঃ যতই তেজস্বী ও বীর্য্যবান বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন, পরিণামে তাহারা সম্পূর্ণ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

মনুষ্যজীবনে, এমন কি, জাতীয় জীবনে সময়ে সময়ে একরূপ সংসারের উপর বিতৃষ্ণা ভয়ানক প্রবল হইয়া থাকে। বোধ হয়, সমগ্র পাশ্চাত্যদেশে এইরূপ একটা সংসারে বিরক্তির ভাব আসিয়াছে।

পাশ্চাত্যদেশের মহা মহা মনীষিগণ এখন হইতেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই ঐশ্বর্য্য সম্পদের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা—এ সমুদয়ই বৃথা। তথাকার অধিকাংশ শিক্ষিত নরনারীই তাঁহাদের বাণিজ্যপ্রধান সভ্যতার এই প্রতিযোগিতায়, এই সংঘর্ষে, এই পাশবভাবে অতিশয় বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন; তাঁহারা, এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থার আবির্ভাবের আশা ও বাসনা করিতেছেন। এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহাদের এখনও দৃঢ় ধারণা—রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্ত্তনই ইউরোপের সমুদয় অশুভ-প্রতিকারের একমাত্র উপায়। কিন্তু তাঁহাদের বড় বড় চিন্তাশীল লোকদের ভিতর অন্য আদর্শ আসিতেছে। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন, রাজনৈতিক বা সামাজিক পরিবর্ত্তন যতই কর না কেন, মনুষ্যজীবনের দুঃখকষ্ট কিছুতেই দূর হইবে না। কেবল আত্মার উন্নতি বিধান করিতে পারিলেই সর্ব্বপ্রকার দুঃখকষ্ট ঘুচিবে। যতই শক্তিপ্রয়োগ কর না কেন, শাসনপ্রণালীর যতই পরিবর্ত্তন কর না কেন, আইনের যতই কড়াকড়ি কর না কেন, কোন জাতির অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষাই কেবল জাতীয় অসৎ প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তন করিয়া, তাহাকে সৎপথে পরিচালনা করিতে পারে। অতএব এই পাশ্চাত্য জাতিরা কিছু নূতন ভাব, কোনরূপ নূতন দর্শনের জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। তাঁহারা যে ধর্ম্মাবলম্বী, অর্থাৎ খৃষ্টধর্ম্ম—অনেক বিষয়ে মহৎ ও সুন্দর হইলেও তাঁহারা উহার মর্ম্ম ভাল করিয়া বুঝেন নাই। আর এতদিন তাঁহারা খৃষ্টধর্ম্মকে যে ভাবে বুঝিয়া আসিতেছিলেন, তাহা তাঁহাদের

পাশ্চাত্যদেশে বেদান্ত প্রচারের সময় আসিয়াছে

নিকট এখন আর পর্য্যাপ্ত বোধ হইতেছে না। পাশ্চাত্যদেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আমাদের প্রাচীন দর্শনসমূহে, বিশেষতঃ বেদান্তেই—তাঁহারা এতদিন যাহা খুঁজিতেছেন—সেই চিন্তাপ্রবাহ, সেই আধ্যাত্মিক খাদ্যপানীয় পাইতেছেন। আর ইহা কিছু বিস্ময়ের বিষয় নহে।

বেদান্তই একমাত্র সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম

জগতে যতপ্রকার ধর্ম্ম আছে, তাহার প্রত্যেকটিরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনার্থ তত্তদ্ধর্ম্মাবলম্বিগণ নানাবিধ অপূর্ব্ব যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া থাকেন। আমি তাহা শুনিয়া শুনিয়া ঐ বিষয়ে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। অতি অল্প দিনের কথা, আমার বিশেষ বন্ধু ব্যারোজসাহেব—খৃষ্টধর্ম্মই যে একমাত্র সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম—ইহা প্রতিপাদন করিতে বিশেষ চেষ্টা করেন; আপনারা তাহাও নিশ্চিত শুনিয়াছেন। এখন বাস্তবিক সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম কোন্‌টি হইতে পারে, সেই বিষয় বিচার করিয়া দেখা যাক্। আমার ধারণা, বেদান্ত—কেবল বেদান্তই সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম হইতে পারে, আর কোন ধর্ম্মই নহে। আমি আপনাদের নিকট আমার এই বিশ্বাসের যুক্তিপরম্পরা বিবৃত করিব। আমাদের ধর্ম্ম ব্যতীত জগতের প্রায় সকল প্রধান প্রধান ধর্ম্মগুলিই তাহাদের প্রবর্ত্তক বা প্রবর্ত্তকগণের জীবনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সেই সকল ধর্ম্মের যাবতীয় মত, শিক্ষা, নীতিতত্ত্ব প্রভৃতি সেই সেই ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষের জীবনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে সম্বদ্ধ। তাঁহাদের বাক্য বলিয়াই সেই মতাদির প্রামাণ্য, তাঁহাদের বাক্য বলিয়াই সেই-গুলির সত্যতা, তাঁহাদের বাক্য বলিয়াই ঐ উপদেশগুলি লোকের মনে এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। আর আশ্চর্য্যের বিষয়

সেই প্রবর্ত্তকের জীবনের ঐতিহাসিকতার উপর যেন সেই সকল ধর্ম্মের আগাগোড়া ভিত্তি স্থাপিত। যদি সেই জীবনের ঐতিহাসিকতায় কিছুমাত্র আঘাত করা যায়, যদি তাঁহাদের উক্ত তথাকথিত ঐতিহাসিকতার ভিত্তি একবার ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায়, তবে সমুদয় ধর্ম্ম-প্রাসাদটিই একেবারে সম্পূর্ণরূপে পড়িয়া যায়—আর উহার পুনরুদ্ধারের কোন সম্ভাবনা থাকে না। বাস্তবিক বর্ত্তমানকালে তথাকথিত প্রায় সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের জীবনের সম্বন্ধে তাহাই ঘটিয়াছে। আমরা জানি, তাঁহাদের জীবনের অর্দ্ধেক ঘটনা লোকে প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করে না, আর বাকী অর্দ্ধেকের উপরও বিশেষ সন্দেহ। আমাদের ধর্ম্ম ব্যতীত জগতের অন্যান্য সকল বড় বড় ধর্ম্মই এইরূপ ঐতিহাসিক জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত; আমাদের ধর্ম্ম কিন্তু কতকগুলি তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন নরনারীই বেদের প্রণেতা বলিয়া দাবী করিতে পারেন না। বেদে সনাতন তত্ত্বসমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছে—ঋষিগণ উহার আবিষ্কর্ত্তা মাত্র। স্থানে স্থানে এই ঋষিগণের নামোল্লেখ আছে বটে; কিন্তু নাম মাত্র। তাঁহারা কে ছিলেন, কি করিতেন, তাহাও আমরা জানি না। অনেক স্থলে তাঁহাদের পিতা কে ছিলেন, তাহা জানা যায় না; আর প্রায় সকলেরই জন্মস্থান ও জন্মকাল সম্বন্ধে আমরা অনভিজ্ঞ। বাস্তবিক এই ঋষিগণ নামের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না; তাঁহারা সনাতন তত্ত্বসমূহের প্রচারক ছিলেন এবং নিজেরা জীবনে সেই সকল তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া আদর্শ-জীবন যাপন করিবার চেষ্টা করিতেন।

কারণ, অন্যান্য ধর্ম্ম ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর স্থাপিত,—বেদান্তের মূল—সনাতন তত্ত্ব

আবার যেমন আমাদের ঈশ্বর নির্গুণ অথচ সগুণ, সেইরূপ আমাদের ধর্ম্মও সম্পূর্ণ নির্গুণ—অর্থাৎ কোন ব্যক্তি-বিশেষের উপর আমাদের ধর্ম্ম নির্ভর করে না ; অথচ ইহাতে অনন্ত অবতার ও মহাপুরুষের স্থান হইতে পারে। আমাদের ধর্ম্মে যত অবতার, মহাপুরুষ, ঋষি প্রভৃতি আছেন, আর কোন্ ধর্ম্মে এত ? শুধু তাহাই নহে, আমাদের ধর্ম্মে বলে—বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে আরও অনেক মহাপুরুষ অবতারাদির অভ্যুদয় হইবে। ভাগবতে আছে—'অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ'—(৩।২৬)। সুতরাং তোমাদের ধর্ম্মে নূতন নূতন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, অবতার ইত্যাদিকে গ্রহণ করিবার কোন বাধা নাই। এই হেতু ভারতের ধর্ম্মেতিহাসে যে সকল অবতার ও মহাপুরুষের বিষয় বর্ণিত আছে, যদি প্রমাণিত হয় যে, তাঁহারা ঐতিহাসিক নহেন, তাহা হইলেও আমাদের ধর্ম্ম বিন্দুমাত্র আঘাত পাইবে না ; উহা পূর্ব্বের ন্যায়ই দৃঢ় থাকিবে ; কারণ, কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর এই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত নহে—সনাতন সত্যসমূহের উপরই ইহা স্থাপিত। জগতের সকল লোককে জোর করিয়া কোন ব্যক্তিবিশেষকে মানাইবার চেষ্টা বৃথা ;—এমন কি, সনাতন ও সার্ব্ব-ভৌম তত্ত্বসমূহ লইয়াও অনেককে একমতাবলম্বী করা কঠিন। তবে যদি কখন জগতের অধিকাংশ লোককে ধর্ম্মসম্বন্ধে একমতাবলম্বী করা সম্ভব হয়, তবে কোন ব্যক্তিবিশেষকে মানাইতে চেষ্টা করিলে তাহা হইবে না ; বরং সনাতন তত্ত্বসমূহে বিশ্বাসী হইয়া অনেকে একমতাবলম্বী হওয়া সম্ভব। অথচ আমাদের ধর্ম্ম

অথচ বেদান্তে অসংখ্য অবতারদিগের স্থান আছে

ব্যক্তিবিশেষের কথার প্রামাণ্য ও প্রভাব সম্পূর্ণরূপেই স্বীকার করিয়া থাকে—এ বিষয়ে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

'ইষ্টনিষ্ঠা'রূপ যে অপূর্ব্ব মত আমাদের দেশে প্রচলিত, তাহাতে এই সকল অবতারগণের মধ্যে যাঁহাকে ইচ্ছা আদর্শ করিতে তোমায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়া থাকে। তুমি যে কোন অবতারকে তোমার জীবনের আদর্শরূপে ও বিশেষ উপাস্যরূপে গ্রহণ করিতে পার; এমন কি, তুমি তাঁহাকে সকল অবতারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করিতে পার, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু সনাতন তত্ত্বসমূহই যেন তোমার ধর্ম্মসাধনের মূলভিত্তি হয়। এই বিষয়টি বিশেষ লক্ষ্য করিলে আশ্চর্য্য হইবে, যে অবতারই হউন না কেন, বৈদিক সনাতন তত্ত্বসমূহের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ বলিয়াই আমাদের নিকট তিনি মান্য! শ্রীকৃষ্ণের ইহাই মাহাত্ম্য যে, তিনি এই তত্ত্বাত্মক সনাতন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক এবং বেদান্তের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যাতা।

জগতের সকলেরই বেদান্তের চর্চ্চা করা কেন উচিত, তাহার প্রথম কারণ এই যে, বেদান্তই একমাত্র সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম।

বেদান্ত বিজ্ঞানসম্মত

দ্বিতীয় কারণ, জগতে যত শাস্ত্র আছে, তন্মধ্যে কেবল ইহারই উপদেশাবলীর সহিত বহিঃপ্রকৃতির বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে যে ফল লব্ধ হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। অতি প্রাচীনকালে আকৃতি, বংশ ও ভাবে পরস্পর সদৃশ দুইটি বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন পথে জগতের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। আমি প্রাচীন হিন্দু ও প্রাচীন গ্রীক্‌জাতির কথা বলিতেছি। শেষোক্ত জাতি বাহ্য জগতের

বিশ্লেষণ করিয়া সেই চরম লক্ষ্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; এবং প্রথমোক্ত জাতি অন্তর্জ্জগৎ বিশ্লেষণ করিয়া ঐ কার্য্যে অগ্রসর হইল। আর তাহাদের এই বিশ্লেষণের ইতিহাসের নানা অবস্থা আলোচনা করিলে দেখা যায়, এই দুই বিভিন্ন প্রকার চিন্তা-প্রণালী সেই সুদূর চরমলক্ষ্য হইতে একই প্রকার প্রতিধ্বনি করিয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, আধুনিক জড়বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসমূহ কেবল বেদান্তীই—যাহারা আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে—নিজ ধর্ম্মের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া গ্রহণ করিতে পারে; ইহাতে বেশ স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, বর্ত্তমান জড়বাদ নিজ সিদ্ধান্তসমূহ পরিত্যাগ না করিয়া কেবল বেদান্তের সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করিলেই আধ্যাত্মিকতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে। আমাদের নিকট এবং যাঁহারা এই বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদেরও নিকট ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আধুনিক বিজ্ঞান যে সকল সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেছেন, বেদান্ত অনেক শতাব্দী পূর্ব্বেই সেই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন; কেবল আধুনিক বিজ্ঞানে সেগুলি জড়শক্তি-রূপে উল্লিখিত হইয়াছে মাত্র।

আধুনিক পাশ্চাত্য জাতিগণের পক্ষে বেদান্তের আলোচনার দ্বিতীয় হেতু—ইহার অদ্ভুত যুক্তিসিদ্ধতা। আমাকে পাশ্চাত্যদেশের অনেক ভাল ভাল বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন, বেদান্তের সিদ্ধান্তগুলি অপূর্ব্ব যুক্তিপূর্ণ। আমার সহিত ইঁহাদের একজনের বিশেষ পরিচয় আছে। তাঁহার এদিকে খাইবার বা যন্ত্রাগার হইতে বাহিরে যাইবার অবকাশ নাই, অথচ তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা

ধরিয়া আমার বেদান্তবিষয়ক বক্তৃতা শুনিতেছেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বলেন—বেদান্তের উপদেশগুলি এতদূর বিজ্ঞানসম্মত, বর্ত্তমান যুগের অভাব আকাঙ্ক্ষা এরূপ সুন্দরভাবে উহা পূরণ করিয়া থাকে, আর আধুনিক বিজ্ঞান ক্রমশঃ যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছে, তাহার সহিত ইহাদের এরূপ সামঞ্জস্য যে, আমি উহাতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারি না।

ধর্ম্মসমূহকে তুলনায় সমালোচনা করিয়া আমরা তাহা হইতে যে দুইটি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হই, তাহাদের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। প্রথম তত্ত্বটি এই যে—সকল ধর্ম্মই সত্য। আর দ্বিতীয় তত্ত্বটি এই যে—জগতের সকল বস্তু আপাততঃ বিভিন্ন বোধ হইলেও সকলই একই বস্তুর বিকাশমাত্র। বাবিলোনিয়ান ও য়াহুদীদের ধর্ম্মেতিহাস আলোচনা করিলে আমরা একটি বিশেষ ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া থাকি। আমরা দেখিতে পাই—বাবিলোনীয় ও য়াহুদী জাতির মধ্যে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা ও প্রত্যেকের পৃথক পৃথক দেবতা ছিল। এই সমুদয় পৃথক পৃথক দেবতার আবার এক সাধারণ নাম ছিল।

তথাকথিত একেশ্বরবাদের উৎপত্তির ইতিহাস

বাবিলোনীয়দিগের সমুদয় দেবতার সাধারণ নাম ছিল—বল। তন্মধ্যে বল মেরোদক প্রধান। কালে এক একটি শাখাজাতি সেই জাতির অন্তর্গত অন্যান্য শাখাজাতিগুলিকে জয় করিয়া তাহাদিগকে আপনার সহিত মিশাইয়া লয়। তাহার স্বাভাবিক ফল এই হয় যে, বিজেতা জাতির দেবতা অন্যান্য শাখাজাতির দেবতাগুলির শীর্ষস্থান অধিকার করে। সেমাইট

জাতি যে তথাকথিত একেশ্বরবাদ লইয়া গৌরব করিয়া থাকে তাহা এইরূপে সৃষ্ট হইয়াছে। য়াহুদী জাতির সমুদয় দেবতার সাধারণ নাম ছিল মোলক। ইঁহাদের মধ্যে ইস্রায়েল জাতির দেবতার নাম ছিল মোলক-য়াভা। এই ইস্রায়েল জাতি ক্রমশঃ উহার সমশ্রেণীস্থ অন্যান্য কতকগুলি জাতিকে জয় করিয়া নিজেদের মোলককে অন্যান্য মোলকগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রধান মোলক বলিয়া ঘোষণা করিল। এইরূপ ধর্ম্মযুদ্ধে যে পরিমাণ রক্তপাত ও পাশবিক অত্যাচার হইয়াছিল, তাহা আমার বোধ হয় আপনারা অনেকেই জানেন। পরবর্ত্তীকালে বাবিলোনীয়েরা মোলক-য়াভার এই প্রাধান্য লোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই।

ভারত ও অন্যান্য দেশে বিভিন্ন জাতির দেবতার প্রাধান্যলাভের চেষ্টার পৃথক্ পৃথক্ ফল—একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'

আমার বোধ হয়, ধর্ম্মবিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ জাতির প্রাধান্য-লাভের চেষ্টা ভারতের সীমান্ত প্রদেশেও ঘটিয়াছিল। এখানেও সম্ভবতঃ আর্য্য জাতির বিভিন্ন শাখা পরস্পরের পৃথক্ পৃথক্ দেবতার প্রাধান্য খ্যাপনে চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু বিধির বিধানে ভারতীয় ইতিহাস য়াহুদীদের ইতিহাসের ন্যায় হইল না। বিধাতা যেন অন্যান্য দেশাপেক্ষা ভারতকে পরধর্ম্মে বিদ্বেষশূন্য ও ধর্ম্ম সাধনায় গরিষ্ঠ ভূমি করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সেই কারণেই এখানে ঐ সকল বিভিন্ন জাতি ও তাহাদের বিভিন্ন দেবতার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব—তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। সেই ইতিহাসের অধিকার-বহির্ভূত সুদূর অতীত যুগে, কিংবদন্তীও যে সুদূর অতীতের

ঘনান্ধকার ভেদে অসমর্থ—সেই অতি প্রাচীনকালে ভারতে একজন অতি শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের অভ্যুদয় হয়; জগতে এইরূপ মহাপুরুষ-সকলের সংখ্যা অতি অল্প। এই মহাপুরুষ সেই প্রাচীনকালেই এই সত্য উপলব্ধি ও প্রচার করেন—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। বাস্তবিক জগতে একমাত্র বস্তু আছেন, বিপ্র অর্থাৎ সাধুগণ তাঁহাকে নানাভাবে বর্ণনা করেন। এরূপ চিরস্মরণীয় বাণী আর কখনও উচ্চারিত হয় নাই, এরূপ মহান্ সত্য আর কখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। আর এই সত্যই আমাদের হিন্দুজাতির জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শত শত শতাব্দী ধরিয়া এই তত্ত্ব—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবনকে ওতপ্রোতভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে। আমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়াছে—যেন সর্ব্বাংশে আমাদের জীবনের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে। আমরা ঐ মহত্তম সত্যটিকে সর্ব্বাংশে ভালবাসি—তাই আমাদের দেশ পরধর্ম্মে দ্বেষরাহিত্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ মহিমময় ভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে—কেবল এইখানেই লোকে তাহাদের ধর্ম্মে ঘোরতর বিদ্বেষসম্পন্ন অপর ধর্ম্মাবলম্বীর জন্যও মন্দির গির্জ্জাদি নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। জগৎকে আমাদের নিকট এই পরধর্ম্মে দ্বেষরাহিত্যরূপ মহাশিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

আমাদের দেশের বাহিরে এখনও কি ভয়ানক পরধর্ম্মদ্বেষ বর্ত্তমান, তাহা আপনারা কিছুই জানেন না। পরধর্ম্মদ্বেষ অনেক স্থানে এরূপ প্রবল যে, অনেক সময় আমার মনে হইয়াছে—

হয়ত আমাকে বিদেশে হাড় কখানা দিয়া যাইতে হইবে। ধর্ম্মের জন্য একজনকে মারিয়া ফেলা এত তুচ্ছ কথা যে—আজ না হউক, কালই এই মহাদৃপ্ত পাশ্চাত্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে এরূপ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতে পারে। প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সাহস করিলে সেই পাশ্চাত্য দেশবাসীকে সমাজচ্যুতি ও তাহার আনুষঙ্গিক যত প্রকার গুরুতর নির্য্যাতন সম্ভব, সব সহ্য করিতে হয়। এখানে তাহারা খুব সহজে ফড়-ফড় করিয়া আমাদের জাতিভেদের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিয়া থাকে বটে,—আমি যেমন পাশ্চাত্যদেশে গিয়া বাস করিয়াছিলাম, আপনারাও যদি সেইরূপ তথায় গিয়া কিছুদিন বাস করেন,তবে জানিতে পারিবেন—সেখানকার বড় বড় অধ্যাপক পর্য্যন্ত (যাঁহাদের কথা আপনারা এখানে খুব শুনিতে পান) ঘোরতর কাপুরুষমাত্র ; এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহারা যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন সাধারণের সমালোচনার ভয়ে তাহার শতাংশের একাংশও মুখ ফুটিয়া বলিতে সাহস করেন না।

পাশ্চাত্যদেশে পরধর্ম্মবিদ্বেষের প্রাবল্য

এই কারণেই জগৎকে এই পরধর্ম্মে দ্বেষরাহিত্যরূপ মহান্ সত্য শিক্ষা করিতে হইবে। আধুনিক সভ্যতার ভিতরে এই ভাব প্রবেশ করিলে উহার বিশেষ কল্যাণ হইবে! বাস্তবিকই এই ভাব প্রবেশ না করিলে কোন সভ্যতাই অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে না। গোঁড়ামি, রক্তপাত, পাশব অত্যাচার এ সকল যতদিন না বন্ধ হয়, ততদিন সভ্যতার বিকাশই হইতে পারে না। যতদিন না

আমাদিগকে জগৎকে ধর্ম্মে উদারতা শিক্ষা দিতে হইবে

আমরা পরস্পরের প্রতি মৈত্রীসম্পন্ন হই, ততদিন কোনরূপ সভ্যতাই মাথা তুলিতে পারে না; আর এই মৈত্রী ভাব বিকাশের প্রথম সোপান—পরস্পরের ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর সহানুভূতি প্রকাশ করা। শুধু তাহাই নহে, প্রকৃতপক্ষে এই ভাব হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করিতে হইলে পরস্পরের প্রতি শুধু মৈত্রী ভাবাপন্ন হইলেই চলিবে না,—পরস্পরের ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস যতই পৃথক্ হউক, পরস্পরকে সকল বিষয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করিতে হইবে। আমরা ভারতে ঠিক তাহাই করিয়া থাকি, এইমাত্র আপনাদিগকে আমি তাহা বলিয়াছি। এই ভারতেই কেবল হিন্দুরা খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য চার্চ্চ ও মুসলমানদের জন্য মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছে ও এখনও করিতেছে। এইরূপই করিতে হইবে। তাহারা আমাদিগকে যতই ঘৃণা করুক, তাহারা যতই পাশব ভাব প্রকাশ করুক, তাহারা যতই নিষ্ঠুরতা প্রকাশ ও অত্যাচার করুক,—তাহারা সচরাচর যেমন করিয়া থাকে—সেইরূপ আমাদের প্রতি যতই কুৎসিৎ ভাষার প্রয়োগ করুক, আমরা ঐ খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য গির্জ্জা ও মুসলমানদের জন্য মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিতে ছাড়িব না—যতদিন পর্য্যন্ত না প্রেমবলে উহাদিগকে জয় করিতে পারি; যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা জগতের সমক্ষে প্রমাণ করিতে পারি যে, ঘৃণা ও বিদ্বেষপরায়ণ জাতি কখন দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারে না—ভালবাসার বলেই জাতীয় জীবন স্থায়ী হইতে পারে; কেবল পশুত্ব ও শারীরিক শক্তি কখন জয়লাভ করিতে পারে না—ক্ষমা ও কোমলতাই সংসার-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে।

আমাদিগকে জগৎকে—ইউরোপ এবং সমগ্র জগতের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে—আর এক মহান্ তত্ত্ব শিক্ষা দিতে হইবে। সমগ্র জগতের আধ্যাত্মিক একত্বরূপ এই সনাতন মহান্ তত্ত্ব সম্ভবতঃ উচ্চজাতি অপেক্ষা নিম্নজাতির, শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অপেক্ষা সাধারণ অজ্ঞ ব্যক্তিগণের, বলবান অপেক্ষা দুর্ব্বলের পক্ষেই অধিকতর প্রয়োজনীয়। হে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, আপনাদিগের নিকট আর বিস্তারিতভাবে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই যে, ইউরোপের আধুনিক অনুসন্ধানপ্রণালী কিরূপে ভৌতিক হিসাবে সমগ্র জগতের একত্ব প্রতিপাদন করিয়াছে—ভৌতিক দৃষ্টিতেই তুমি আমি সূর্য্য চন্দ্র তারা প্রভৃতি সবই অনন্ত জড়সমুদ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গস্বরূপ। আবার শত শত শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতীয় মনোবিজ্ঞানও জড়বিজ্ঞানের ন্যায় প্রমাণ করিয়াছে যে, শরীর ও মন উভয়ই জড়সমুদ্রে বা সমষ্টির মধ্যে কতকগুলি পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞা অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গরাজি মাত্র। আবার আর এক পদ অগ্রসর হইয়া বেদান্তে দেখান হইয়াছে—এই আপাত-প্রতীয়মান জগতের একত্বভাবেরও পশ্চাতে যে যথার্থ আত্মা রহিয়াছেন, তিনিও 'এক'মাত্র। জগদ্ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র আত্মাই বিরাজমান রহিয়াছেন—সবই সেই এক সত্তামাত্র। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মূলে বাস্তবিক যে এই একত্ব রহিয়াছে, এই মহান্ তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া অনেকে ভয় পাইয়া থাকেন—অন্যান্য দেশের কথা দূরে থাকুক—এদেশেও অনেকে এই অদ্বৈতবাদে ভয় খাইয়া থাকেন!—এখনও এতন্মতাবলম্বী অপেক্ষা এই মতের বিরোধীর সংখ্যাই অধিক!

আমাদিগকে জগৎকে আর এক তত্ত্ব শিখাইতে হইবে—সমগ্র জগৎ বহু প্রতীয়মান হইলেও বাস্তবিক এক

তথাপি আমি তোমাদিগকে বলিতেছি—জগৎকে আমাদিগকে যদি কিছু জীবনপ্রদ তত্ত্ব শিক্ষা দিতে হয়—তবে তাহা এই অদ্বৈতবাদ। ভারতের মূক জনসাধারণের উন্নতিবিধানের জন্য এই অদ্বৈতবাদের প্রচার আবশ্যক। এই অদ্বৈতবাদ কার্য্যে পরিণত না হইলে আমাদের এই মাতৃভূমির পুনরুজ্জীবনের আর উপায় নাই।

যুক্তিবাদী পাশ্চাত্যজাতি নিজেদের সমুদয় দর্শন নীতিবিজ্ঞানের মূলভিত্তি অনুসন্ধান করিতেছে। কিন্তু কোন ব্যক্তিবিশেষ—তিনি যতই বড় বা ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তি হউন না কেন, তিনি যখন কাল জন্মগ্রহণ করিয়া আজই মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছেন—তখন তাঁহার অনুমোদিত বলিয়াই কোন দর্শন বা নীতিবিজ্ঞানের প্রামাণ্য হইতে পারে না। দর্শন বা নীতির প্রমাণের এইমাত্র কারণ নির্দ্দেশ করিলে তাহা কখন জগতের উচ্চশ্রেণীস্থ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের গ্রাহ্য হইতে পারে না—তাঁহারা কোন মনুষ্যের অনুমোদিত বলিয়া উহার প্রামাণ্য না মানিয়া সনাতন তত্ত্বসমূহের উপরই উহার ভিত্তি স্থাপিত দেখিতে চাহেন। নীতিবিজ্ঞানের এই সনাতন ভিত্তি সনাতন আত্মতত্ত্ব ব্যতীত আর কি হইতে পারে—যে একমাত্র অনন্ত সত্য তোমাতে, আমাতে, আমাদের সকলের আত্মায় বর্ত্তমান রহিয়াছেন? আত্মার অনন্ত একত্বই সর্ব্বপ্রকার নীতির মূল ভিত্তিস্বরূপ; তোমাতে আমাতে শুধু 'ভাই ভাই' সম্বন্ধ নহে—মানবের দাসত্বশৃঙ্খল মোচনের চেষ্টার বর্ণনাপূর্ণ সকল গ্রন্থেই এই 'ভাই ভাই' ভাবের কথা আছে এবং অতি শিশুরাই

অদ্বৈতবাদই নীতিবিজ্ঞানের মূলভিত্তি

তোমাদের নিকট উহার প্রচার করিয়াছে—কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তুমি আমি এক। ভারতীয় দর্শনের ইহাই সিদ্ধান্ত। সর্ব্বপ্রকার নীতি ও ধর্ম্মবিজ্ঞানের মূলভিত্তিই এই একত্ব।

পাশ্চাত্যদেশীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারসমূহের মূলভিত্তি অদ্বৈতবাদ, যদিও সংস্কারকগণ অনেকে তৎসম্বন্ধে অজ্ঞ

আমাদের দেশের সামাজিক অত্যাচারে পদদলিত সাধারণ লোকেরা যেমন এই মতের দ্বারা উপকৃত হইতে পারে, ইউরোপের পক্ষেও তদ্রূপ ইহার প্রয়োজন। বাস্তবিকপক্ষেও ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি, ফ্রান্স ও আমেরিকায় আজকাল যেরূপভাবে রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতিবিধানের চেষ্টা হইতেছে তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয়, অজ্ঞাতসারে এখনই তাহারা এই মহান তত্ত্বকে ঐ সকলের মূলভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিতেছে। আর হে বন্ধুগণ, আপনারা ইহাও লক্ষ্য করিবেন যে, সাহিত্যের মধ্যে যেখানে মানুষের স্বাধীনতা—অনন্ত স্বাধীনতার চেষ্টা অভিব্যক্ত, সেইখানেই ভারতীয় বৈদান্তিক আদর্শসমূহও পরিস্ফুট। কোন কোন ক্ষেত্রে লেখকগণ তাঁহাদের প্রচারিত ভাবসমূহের মূল ভিত্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, কোন কোনও স্থলে তাঁহারা আপনাদিগকে মৌলিক গবেষণাশীল বলিয়া প্রমাণ করিতে সচেষ্ট। কিন্তু কেহ কেহ আবার নির্ভয়ে কৃতজ্ঞহৃদয়ে কোন্ মূল হইতে তাঁহারা ঐ সকল তত্ত্ব পাইয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া আপনাদিগকে উহার নিকট ঋণী বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

বন্ধুগণ, যখন আমি আমেরিকায় ছিলাম, তখন—আমি অদ্বৈতবাদই অধিক প্রচার করিতেছি, দ্বৈতবাদ বড় করিতেছি না—

একবার এইরূপ অভিযোগ শুনিয়াছিলাম। দ্বৈতবাদের প্রেমভক্তি উপাসনায় যে কি অসীম অপূর্ব্ব পরমানন্দ লাভ হয়, তাহা আমি জানি, উহার অপূর্ব্ব মহিমা আমি সম্পূর্ণ অবগত। কিন্তু বন্ধুগণ, এখন আমাদের আনন্দে ক্রন্দন করিবার পর্য্যন্ত সময় নাই। আমরা যথেষ্ট কাঁদিয়াছি। এখন আর আমাদের কোমলভাব অবলম্বন করিবার সময় নহে। এইরূপে কোমলতার সাধন করিতে করিতে আমরা এখন জীবন্মৃত হইয়া পড়িয়াছি—আমরা তুলারাশির ন্যায় কোমল হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের দেশের পক্ষে এক্ষণে প্রয়োজন—লৌহবৎ দৃঢ় মাংসপেশী ও স্নায়ুসম্পন্ন হওয়া; —এমন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন হওয়া যে, কেহই যেন উহার প্রতিরোধে সমর্থ না হয়—যেন উহা ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় রহস্যভেদে সমর্থ হয়, যদিও এই কার্য্যসাধনে সমুদ্রের অতল তলে যাইতে হয়,—যদিও সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত থাকিতে হয়! ইহাই এক্ষণে আমাদের আবশ্যক; আর অদ্বৈতবাদের মহান্ আদর্শ ধারণা করিয়া উহার উপলব্ধি করিতে পারিলেই ঐ ভাবের আবির্ভাব, প্রতিষ্ঠা ও দৃঢ়তাসাধন করা যাইতে পারে।

আমার মুখ্য ভাবে অদ্বৈতবাদ প্রচারের কারণ

বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস—আপনার উপর বিশ্বাস—ঈশ্বরে বিশ্বাস—ইহাই উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়। যদি তোমার পুরাণের তেত্রিশ কোটি দেবতায় এবং বৈদেশিকেরা মধ্যে মধ্যে যে সকল দেবতার আমদানি করিয়াছে, তাহার সকলগুলিতেই বিশ্বাস থাকে, অথচ যদি তোমার আত্মবিশ্বাস না থাকে—তবে তোমার

কখনই মুক্তি হইবে না। নিজের উপর বিশ্বাসসম্পন্ন হও—সেই বিশ্বাসবলে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াও ও বীর্য্যবান্ হও। ইহাই এক্ষণে আমাদের আবশ্যক। আমরা এই ত্রিশ কোটি লোক, সহস্রবর্ষ ধরিয়া যে কোন মুষ্টিমেয় বিদেশী লোক আমাদের ভূলুণ্ঠিত দেহকে পদদলিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছে, তাহাদেরই পদানত হইয়াছি কেন? কারণ উহাদের নিজেদের উপর বিশ্বাস আছে—আমাদের তাহা নাই। আমি পাশ্চাত্যদেশে যাইয়া কি শিখিলাম? খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সকল যে মানুষকে পতিত ও নিরুপায় পাপী বলিয়া নির্দ্দেশ করে, এই সকল বাজে কথায় না ভুলিয়া উহাদের জাতীয় উন্নতির কি কারণ দেখিলাম?—দেখিলাম ইউরোপ ও আমেরিকা উভয়ত্রই জাতীয় হৃদয়ের অভ্যন্তরদেশে তাহাদের মহান্ আত্ম-বিশ্বাস নিহিত রহিয়াছে। একজন ইংরাজ বালক তোমাকে বলিবে—'আমি একজন ইংরেজ—আমি সব করিতে পারি।' আমেরিকান বালকও এই কথা বলিবে—প্রত্যেক ইউরোপীয় বালকই এই কথা বলিবে। আমাদের বালকগণ কি এই কথা বলিতে পারে? কখনই নহে, বালকগণ কেন, বালকগণের পিতারা পর্য্যন্ত একথা বলিতে পারেন না। আমরা নিজেদের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছি। এই কারণেই বেদান্তের অদ্বৈত-ভাব প্রচার করা আবশ্যক—যাহাতে লোকের হৃদয় জাগ্রত হয়, যাহাতে তাহারা নিজ আত্মার মহিমা জানিতে পারে। এই কারণেই আমি অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া থাকি; আর আমি সাম্প্রদায়িক ভাবে উহা প্রচার করি না—সার্ব্বভৌম ও সর্ব্বসাধারণের গ্রাহ্য হেতুবাদ প্রদর্শন করিয়া আমি উহার প্রচার করিয়া থাকি।

আত্মবিশ্বাসই সর্ব্ববিধ উন্নতির মূল

এই অদ্বৈতবাদ এমন ভাবে প্রচার করা যাইতে পারে—যাহাতে দ্বৈতবাদী ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরও কোন আপত্তির কারণ থাকিবে না ;

অদ্বৈতবাদের সহিত অন্যান্য বাদের সামঞ্জস্য

আর এই সকল মতের সামঞ্জস্য সাধনও বড় কঠিন নহে। ভারতে এমন কোন ধর্ম্মপ্রণালী নাই যাহাতে বলে না যে, ভগবান্ সকলের ভিতরে রহিয়াছেন। আমাদের বেদান্তমতাবলম্বী বিভিন্ন বাদিগণ সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, জীবাত্মার পূর্ব্ব হইতেই পূর্ণ পবিত্রতা বীর্য্য ও পূর্ণত্ব অন্তর্নিহিত ! তবে কাহারও কাহারও মতে, এই পূর্ণত্ব, যেন কখন কখন সঙ্কুচিত হইয়া যায়, আবার অন্য সময়ে বিকাশপ্রাপ্ত হয়। তাহা হইলেও সেই পূর্ণত্ব আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অদ্বৈতবাদমতে—উহা সঙ্কুচিতও হয় না, বিকাশ প্রাপ্তও হয় না, তবে সময়ে সময়ে অপ্রকাশিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকে মাত্র। তাহা হইলেও কার্য্যতঃ দ্বৈতবাদের সহিত একরূপই দাঁড়াইল। একটি মত অপরটি অপেক্ষা অধিকতর ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু উভয় মতই কার্য্যতঃ প্রায় একই দাঁড়ায়। এই মূল তত্ত্বটির প্রচার জগতের পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; আর আমাদের এই মাতৃভূমিতে ইহার যতদূর অভাব, আর কোথাও তত নহে।

বন্ধুগণ, আমি তোমাদিগকে গোটাকতক কড়া কথা শুনাইতে চাই :—সংবাদপত্রে পড়া যায়—আমাদের একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে

আমাদের দুর্দ্দশার জন্য আমরাই দায়ী

কোন ইংরাজ খুন করিয়াছে, অথবা কাহার প্রতি অত্যন্ত অসদ্ব্যবহার করিয়াছে। অমনি সমগ্র দেশে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল—সংবাদপত্রে এই সংবাদ পড়িয়া

অশ্রু বিসর্জ্জন করিলাম, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আমার মনে প্রশ্নের উদয় হইল—এ সকলের জন্য দায়ী কে? যখন আমি একজন বেদান্তবাদী, তখন আমি নিজেকে এ প্রশ্ন না করিয়া থাকিতে পারি না। হিন্দুজাতি অন্তর্দৃষ্টিপরায়ণ; সে নিজের মধ্যেই সকল বিষয়ের কারণানুসন্ধান করে। আমি যখনই আমার মনকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করি—কে ইহার জন্য দায়ী?—তখন প্রত্যেক বারই আমি এই উত্তর পাইয়া থাকি যে, ইহার জন্য ইংরাজ দায়ী নহে; আমরাই আমাদের দুর্দ্দশা, অবনতি ও দুঃখকষ্টের জন্য দায়ী - আমরাই একমাত্র দায়ী।

আমাদের অভিজাত পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদের দেশের সাধারণ লোককে পদদলিত করিতে লাগিলেন—ক্রমশঃ তাহারা একেবারে অসহায় হইয়া পড়িল; এই অত্যাচারে এই দরিদ্র ব্যক্তিগণ—তাহারা যে মনুষ্য—তাহাও ক্রমশঃ ভুলিয়া গেল। শত শত শতাব্দী ধরিয়া তাহারা বাধ্য হইয়া কেবল কাঠ কাটিয়াছে, আর জল তুলিয়াছে।

আমরাই আমাদের দেশের নীচ-জাতিকে নীচ করিয়াছি

ক্রমশঃ তাহাদের মনে এই বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে যে, তাহারা গোলাম হইয়া জন্মিয়াছে—কাঠ কাটিবার ও জল তুলিবার জন্যই তাহাদের জন্ম। আর যদি কেহ তাহাদের প্রতি দয়াপ্রকাশক দুই একটা কথা বলিতে চায়,—তবে আমি দেখিতে পাই আধুনিক কালের শিক্ষিতাভিমানী আমাদের স্বজাতীয়গণ, এই পদদলিত জাতির উন্নতি-সাধনরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্মে সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন।

শুধু তাহাই নহে, আমি আরও দেখিতে পাই—উহারা

পাশ্চাত্যদেশের বংশানুক্রমিক সংক্রমণ ও তথাবিধ অন্যান্য কতকগুলি অকিঞ্চিৎকর মতসহায়ে এমন সকল পশু ও অনুরোচিত হেতুবাদ প্রদর্শন করিয়া থাকেন—যাহাতে দরিদ্রগণের উপর অত্যাচার করিবার ও উহাদিগকে আরও পশুপ্রকৃতি করিয়া ফেলিবার অধিকতর সুবিধা হয়। আমেরিকার ধর্ম্মমেলায় অন্যান্য ব্যক্তিদের সহিত একজন নিগ্রো যুবকও আসিয়াছিল, সে খাঁটি আফ্রিকার নিগ্রো। সে একটি সুন্দর বক্তৃতাও দিয়াছিল। আমার ঐ যুবকটির সম্বন্ধে কৌতূহল হইল, আমি তাহার সহিত মধ্যে মধ্যে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলাম কিন্তু তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারিলাম না। কিছুদিন পরে ইংলণ্ডে কয়েকটি আমেরিকানের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়; তাহারা আমাকে ঐ যুবকটির এইরূপ ইতিহাস প্রদান করিল—'এই যুবক আফ্রিকার মধ্যভাগস্থ জনৈক নিগ্রো দলপতির পুত্র; কোন কারণে অপর একজন দলপতি ইহার পিতার প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হয় এবং তাহাকে ও তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়া তাহাদের মাংস রন্ধন করিয়া খাইয়া ফেলে। সে এই বালকটিকেও হত্যা করিয়া খাইয়া ফেলিবার আদেশ দিয়াছিল। বালকটি কোনক্রমে পলায়ন করিয়া অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া শত শত ক্রোশ ভ্রমণের পর সমুদ্রতীরে উপস্থিত হয়; তথা হইতে একটি আমেরিকান্ জাহাজে করিয়া সে আমেরিকায় আসিয়াছে।' সেই বালকটি এমন সুন্দর বক্তৃতা করিল! এইরূপ ঘটনা দেখিয়া বংশানুক্রমিক-সংক্রমণমতে আর কিরূপে আস্থা থাকিতে পারে?

বংশানুক্রমিক সংক্রমণ (Hereditary transmission)—মত কি সম্পূর্ণ সত্য!

হে ব্রাহ্মণগণ! যদি বংশানুক্রমিক ভাবসংক্রমণ-নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণ বিদ্যাশিক্ষার অধিকতর উপযুক্ত হয়, তবে ব্রাহ্মণের শিক্ষায় অর্থব্যয় না করিয়া চণ্ডালজাতির শিক্ষায় সমুদয় অর্থ ব্যয় কর। দুর্ব্বলকে অগ্রে সাহায্য কর; কারণ, দুর্ব্বলের সাহায্য করাই অগ্রে আবশ্যক। যদি ব্রাহ্মণ বুদ্ধিমান্ হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তবে সে কোনরূপ সাহায্য ব্যতীতও শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। যদি অপর জাতি তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ না হয়, তবে তাহাদিগকেই কেবল শিক্ষা দিতে থাক—তাহাদিগেরই জন্য শিক্ষকসমূহ নিযুক্ত করিতে থাক। আমার ত ইহাই ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। অতএব এই দরিদ্র ব্যক্তিগণকে ভারতের এই পদদলিত সর্ব্বসাধারণকে তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সবলতা-দুর্ব্বলতার বিচার না করিয়া প্রত্যেক নরনারীকে প্রত্যেক বালকবালিকাকে শুনাও ও শিখাও যে, সবল-দুর্ব্বল, উচ্চ নীচনির্ব্বিশেষে সকলেরই ভিতর সেই অনন্ত আত্মা রহিয়াছেন —সুতরাং সকলেই মহৎ হইতে পারে, সকলেই সাধু হইতে পারে। সকলেরই সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে বল—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নি-বোধত' (কঠোপনিষৎ ১।৩।১৪)। উঠ, জাগো—যতদিন না চরমলক্ষ্যে পৌঁছিতেছ, ততদিন নিশ্চিন্ত থাকিও না। উঠ, জাগো —আপনাদিগকে দুর্ব্বল ভাবিয়া তোমরা যে মোহে আচ্ছন্ন হইয়া আছ—উহা দূর করিয়া দাও। কেহই প্রকৃতপক্ষে দুর্ব্বল নহে—আত্মা অনন্ত, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বজ্ঞ। উঠ, নিজের স্বরূপ প্রকাশিত কর—তোমার ভিতর যে ভগবান্

ব্রাহ্মণাপেক্ষা চণ্ডালের শিক্ষায় সমধিক যত্ন কর

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'

রহিয়াছেন, তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা কর, তাঁহাকে অস্বীকার করিও না। আমাদের জাতির ভিতর ঘোর আলস্য, দুর্ব্বলতা ও মোহ আসিয়া পড়িয়াছে। হে আধুনিক হিন্দুগণ, মোহজাল কাটাইয়া ফেল। ইহার উপায় তোমাদের শাস্ত্রেই রহিয়াছে। তোমরা নিজ নিজ স্বরূপের চিন্তা কর ও সর্ব্বসাধারণকে উহা উপদেশ কর। ঘোর মোহনিদ্রায় অভিভূত জীবাত্মার নিদ্রাভঙ্গ কর। আত্মা প্রবুদ্ধ হইলে শক্তি আসিবে, মহিমা আসিবে, সাধুত্ব আসিবে, পবিত্রতা আসিবে,—যাহা কিছু ভাল সকলই আসিবে। যদি গীতার মধ্যে কিছু আমার ভাল লাগে, তবে তাহা এই দুইটি শ্লোক—শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের সারস্বরূপ—মহাবলপ্রদ—

> সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
> বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥—১৩।২৭
> সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
> ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥—১৩।২৮

—বিনাশশীল সর্ব্বভূতের মধ্যে অবিনাশী পরমেশ্বরকে যিনি সমভাবে অবস্থিত দেখেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন। কারণ, ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া তিনি আত্মা দ্বারা আত্মার হিংসা করেন না, সুতরাং পরমগতি প্রাপ্ত হন।

আত্মার সর্ব্ব-ব্যাপিত্ব ও সর্ব্বভূতে সম-ভাবে অবস্থিতি —এই তত্ত্বদ্বয়ের প্রচারে সর্ব্ববিধ কল্যাণ

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বেদান্ততত্ত্ব প্রচারের দ্বারা এদেশে ও অন্যান্য দেশেও যথেষ্ট লোকহিতকর কার্য্যের প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে। এদেশে এবং অন্যত্র সমগ্র মনুষ্যজাতির দুঃখমোচন ও উন্নতিবিধানের জন্য পরমাত্মার সর্ব্বব্যাপিত্ব ও সর্ব্বত্র

সমভাবে অবস্থিতিরূপ অপূর্ব্ব তত্ত্বদ্বয়ের প্রচার করিতে হইবে। যেখানেই অন্যায় দেখা যায়, সেখানেই অজ্ঞান দেখা যায়। আমি আমার অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিয়াছি এবং আমাদের শাস্ত্রেও সে কথা বলিয়া থাকেন যে, ভেদবুদ্ধি হইতেই সমুদয় অশুভ, এবং অভেদবুদ্ধি হইলে—সকল বিভিন্নতার মধ্যে বাস্তবিক এক সত্তা রহিয়াছে, ইহা বিশ্বাস করিলে—সর্ব্ববিধ কল্যাণ হইয়া থাকে। ইহাই বেদান্তের মহোচ্চ আদর্শ।

তবে সকল বিষয়েই শুধু আদর্শে বিশ্বাস করা এক কথা, আর দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয় সেই আদর্শানুযায়ী পরিচালন করা আর এক কথা। একটি উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া দেওয়া বেশ কথা—কিন্তু ঐ আদর্শে পৌঁছিবার কার্য্যকর উপায় কৈ? এখানে স্বভাবতঃ সেই কঠিন প্রশ্নটি আসিয়া উপস্থিত হয়—যাহা আজ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া সর্ব্বসাধারণের মনে বিশেষভাবে জাগিতেছে,—সেই প্রশ্ন আর কিছুই নহে—জাতিভেদ ও সমাজ-সংস্কার বিষয়ক সেই পুরাতন সমস্যা। আমি সমাগত শ্রোতৃবর্গের নিকট খুলিয়া বলিতে চাই যে, আমি একজন জাতিভেদলোপকারী, অথবা কেবলমাত্র সমাজসংস্কারক নহি। জাতিভেদ বা সমাজসংস্কার বিষয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার কিছু করিবার নাই।

আমি সমাজ-সংস্কারক নহি—বিশ্বজনীন প্রেমের প্রচারক

তুমি যে কোন জাতি হও, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই,—তবে তাই বলিয়া তুমি অপর জাতীয় কাহাকেও ঘৃণা করিতে পার না। আমি কেবল 'সর্ব্বভূতে প্রেম কর'—এই তত্ত্ব প্রচার করিয়া থাকি; আর আমার এই উপদেশ—বিশ্বাত্মার

সর্ব্বব্যাপিত্ব ও সমত্বরূপ বেদান্তের সেই মহান্ তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রায় বিগত একশত বর্ষ ধরিয়া আমাদের দেশ সমাজ-সংস্কারকগণ ও তাঁহাদের নানাবিধ সমাজ-সংস্কারসম্বন্ধীয় প্রস্তাবে আচ্ছন্ন হইয়াছে। এই সংস্কারকগণের চরিত্রের বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলিবার নাই। ইহাদের অধিকাংশেরই উদ্দেশ্য খুব ভাল এবং কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদের উদ্দেশ্য অতি প্রশংসনীয়। কিন্তু ইহাও স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই শতবর্ষব্যাপী সমাজসংস্কার আন্দোলনের ফলে সমগ্র দেশে কোন স্থায়ী হিতসাধন হয় নাই। বক্তৃতামঞ্চ হইতে সহস্র সহস্র বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে—হিন্দুজাতি ও হিন্দু সভ্যতার মস্তকে অজস্র নিন্দাবাদ ও অভিশাপ বর্ষিত হইয়াছে,—কিন্তু তথাপি সমাজের বাস্তবিক কোন উপকার হয় নাই। ইহার কারণ কি? কারণ বাহির করা বড় কঠিন নহে। এই নিন্দাবাদ ও গালিবর্ষণ ইহার কারণ। প্রথমতঃ, আমি তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—আমাদিগকে আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব রক্ষা করিতে হইবে। আমি স্বীকার করি, অপর জাতিদের নিকট হইতে আমাদিগকে অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে হইবে; কিন্তু দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে যে, আমাদের অধিকাংশ আধুনিক সংস্কারই পাশ্চাত্য কার্য্য-প্রণালীর বিচারশূন্য অনুকরণ মাত্র। ভারতে ইহা দ্বারা কখনই কার্য্য হইবে না। এই কারণেই আমাদের বর্ত্তমান সংস্কার-আন্দোলনসমূহ দ্বারা কোন ফল হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, কাহারও

সংস্কারকগণের অকৃতকার্য্যতার কারণ—বিজাতীয় অনুকরণ ও বর্ত্তমান সমাজের উপর তীব্র গালিবর্ষণ

কল্যাণ-সাধন করিতে হইলে নিন্দা বা গালিবর্ষণের দ্বারা কোন কার্য্য হয় না। আমাদের সমাজে যে অনেক দোষ আছে, সামান্য বালকেও তাহা দেখিতে পাইতে পারে;—আর কোন্ সমাজেই বা দোষ নাই? হে আমার স্বদেশবাসিগণ! এই অবসরে তোমাদিগকে বলিয়া রাখি যে, আমি জগতের যে সকল জাতি দেখিয়াছি, সেই বিভিন্ন জাতিসমূহের তুলনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছি যে,—আমাদের জাতিই মোটের উপর অন্যান্য সকল জাতি অপেক্ষা অধিকতর নীতিপরায়ণ ও ধার্ম্মিক, এবং আমাদের সামাজিক বিধানগুলিই—তাহাদের উদ্দেশ্য ও কার্য্য-প্রণালী বিচার করিলে দেখা যায়—মানবজাতিকে সুখী করিবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযুক্ত। এই কারণেই আমি কোনরূপ সংস্কার চাহি না। আমার আদর্শ—জাতীয় পথে সমাজের উন্নতি, বিস্তৃতি ও পরিণতি। যখন আমি আমার দেশের প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করি, তখন সমগ্র জগতে আমি এমন দেশ দেখিতে পাই না—যাহা মানব মনের উন্নতি বিধানের জন্য এত করিয়াছে। এই কারণেই আমি আমার জাতিকে কোনরূপ নিন্দা বা গালাগালি দিই না। আমি আমার জাতিকে বলি,—'যাহা করিয়াছ, বেশ হইয়াছে; আরও ভাল করিবার চেষ্টা কর।' এদেশে প্রাচীন কালে অনেক বড় বড় কাজ হইয়াছে—কিন্তু মহত্তর কার্য্য করিবার এখনও যথেষ্ট সময় ও অবকাশ রহিয়াছে।

উপায়—জাতীয় ভাবে সমাজ গঠন

তোমরা নিশ্চয় জান—আমরা একস্থানে চুপ করিয়া থাকিতে পারি না। যদি একস্থানে বসিয়া থাকি, তবে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য্য। আমাদিগকে হয়

'এগিয়ে যাও'

সম্মুখে নয় পশ্চাতে যাইতে হইবে ;—হয় আমাদিগকে উন্নতি করিতে হইবে, নতুবা আমাদের অবনতি হইবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রাচীনকালে বড় বড় কার্য্য করিয়াছিলেন কিন্তু আমাদিগকে তাঁহাদের অপেক্ষা উচ্চতর জীবনের বিকাশ করিতে হইবে এবং তাঁহাদের অপেক্ষা মহত্তর কর্ম্মের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। এখন পশ্চাতে হটিয়া গিয়া অবনত হওয়া—ইহা কিরূপে হইতে পারে? তাহা হইতেই পারে না ; তাহা কখনই হইতে দেওয়া হইবে না। পশ্চাতে হটিলে জাতির অধঃপতন ও মৃত্যু হইবে ; অতএব 'অগ্রসর হও এবং মহত্তর কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান কর'—ইহাই তোমাদের নিকট আমার বক্তব্য।

আমি কোনরূপ সাময়িক সমাজসংস্কারের প্রচারক নহি। আমি সমাজের দোষ-সংশোধনের চেষ্টা করিতেছি না ; আমি তোমাদিগকে বলিতেছি—তোমরা অগ্রসর হও এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সমগ্র মানবজাতির উন্নতিবিধানের জন্য যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত কর। তোমাদের নিকট আমার কেবল ইহাই বক্তব্য যে, তোমরা সমগ্র মনুষ্যজাতির একত্ব ও মানবের স্বাভাবিক ঈশ্বরত্ব-ভাবরূপ বৈদান্তিক আদর্শ উত্তরোত্তর অধিকতর উপলব্ধি করিতে থাক। যদি আমার সময় থাকিত, তবে আমি তোমাদিগকে আনন্দের সহিত দেখাইয়া দিতাম যে, এক্ষণে আমাদিগকে যাহা যাহা করিতে হইবে—তাহার প্রত্যেকটি আমাদের

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের দ্বারা প্রবর্ত্তিত সামাজিক বিধান সকলের চরম পরিণতিতেই সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি

প্রাচীন স্মৃতিকারেরা সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্ব্বেই বলিয়া গিয়াছেন, এবং এক্ষণে আমাদের জাতীয় আচার-ব্যবহারে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও ঘটিবে, তাহাও তাঁহারা বাস্তবিকই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারাও জাতিভেদলোপকারী ছিলেন, তবে আধুনিকদিগের ন্যায় নহে। তাঁহারা জাতিভেদরাহিত্য অর্থে এই বুঝিতেন না যে, সহরের সব লোক মিলে একত্র মদ্যমাংস খাক্, অথবা যত আহাম্মক ও পাগল মিলে যখন যেখানে যা'কে ইচ্ছা বিবাহ করুক, আর দেশটাকে একটা পাগলা-গারদে পরিণত করুক, অথবা তাঁহারা ইহাও বিশ্বাস করিতেন না যে, বিধবাগণের পতির সংখ্যানুসারে কোন জাতির উন্নতির পরিমাণ করিতে হইবে। এরূপ করিয়াই অভ্যুদয়শালী হইয়াছে—এমন জাতি ত আমি আজ পর্য্যন্ত দেখি নাই।

হিন্দুসমাজের আদর্শ—ব্রাহ্মণ

ব্রাহ্মণই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আদর্শ ছিলেন। আমাদের সকল শাস্ত্রেই এই ব্রাহ্মণরূপ আদর্শচরিত্র উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাচার্য্যগণ পর্য্যন্ত নিজ পূর্ব্বপুরুষগণ যে উচ্চবংশীয় ছিলেন, ইহা প্রমাণ করিতে সহস্রমুদ্রা ব্যয় করিতেছেন, আর যতক্ষণ না তাঁহারা প্রমাণ করিতে পারিতেছেন যে, পর্ব্বতনিবাসী পথিকের সর্ব্বস্ব-লুণ্ঠনকারী, কোন মহা-অত্যাচারী ব্যক্তি তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন, ততক্ষণ তাঁহারা কিছুতেই শান্তি পাইতেছেন না। অপর দিকে আবার ভারতের বড় বড় রাজবংশধরগণ কৌপীনধারী, অরণ্য-নিবাসী, ফলমূলাহারী, বেদপাঠী কোন প্রাচীন ঋষি হইতে তদীয় বংশের উৎপত্তি—ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। এখানে যদি

তুমি কোন প্রাচীন ঋষিকে তোমার পূর্ব্বপুরুষরূপে প্রতিপন্ন করিতে পার, তবে তুমি উচ্চজাতীয় হইলে, নতুবা নহে। সুতরাং, আমাদের আভিজাত্যের আদর্শ অন্যান্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। আধ্যাত্মিক সাধনসম্পন্ন ও মহাত্যাগী ব্রাহ্মণই আমাদের আদর্শ। ব্রাহ্মণ আদর্শ আমি কি অর্থে বুঝিতেছি?—আদর্শ ব্রাহ্মণত্ব তাহাই যাহাতে সাংসারিকতা একেবারেই নাই এবং প্রকৃত জ্ঞান প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান। হিন্দুজাতির ইহাই আদর্শ। তোমরা কি শুন নাই যে, শাস্ত্রে লিখিত আছে—ব্রাহ্মণের পক্ষে কোন আইনই নাই, তিনি রাজার শাসনাধীন নহেন—তাঁহার বধদণ্ড নাই? একথা সম্পূর্ণ সত্য। স্বার্থপর অজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহা যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছে, সে ভাবে অবশ্য ইহা বুঝিও না; প্রকৃত মৌলিক বৈদান্তিক ভাবে ইহা বুঝিবার চেষ্টা কর। যদি ব্রাহ্মণ বলিতে এমন ব্যক্তিগণকে বুঝায়—যাঁহারা স্বার্থপরতাকে একেবারে নাশ করিয়াছেন, যাঁহাদের জীবন জ্ঞান ও প্রেম লাভ ও উহাদের বিস্তারেই নিযুক্ত,—যে দেশ কেবল এইরূপ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা—সৎস্বভাব, ধর্ম্মপরায়ণ নরনারীর দ্বারা—অধ্যুষিত—সে জাতি ও দেশ যে সর্ব্বপ্রকার বিধিনিষেধের অতীত হইবে, এ আর আশ্চর্য্য কথা কি। এবম্বিধ জনগণের শাসনের জন্য আর সৈন্যসামন্ত, পুলিস প্রভৃতির কি প্রয়োজন? তাঁহাদিগকে কাহারও শাসন করিবার কি প্রয়োজন? তাঁহাদের কোন প্রকার শাসন-তন্ত্রের অধীনে বাস করিবারই বা কি প্রয়োজন?

তাঁহারা সাধুপ্রকৃতি মহাত্মা—তাঁহারা ঈশ্বরের অন্তরঙ্গস্বরূপ। আর আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই—সত্যযুগে এই একমাত্র

ব্রাহ্মণ জাতিই ছিলেন। আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই—প্রথমে পৃথিবীর সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন; ক্রমে যতই তাঁহাদের অবনতি হইতে লাগিল, ততই তাঁহারা বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন;—আবার যখন যুগচক্র ঘুরিয়া সেই সত্যযুগের অভ্যুদয় হইবে, তখন আবার সকলেই ব্রাহ্মণ হইবেন। সম্প্রতি যুগচক্র ঘুরিয়া সত্যযুগ অভ্যুদয়ের সূচনা হইতেছে—আমি তোমাদের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি। সুতরাং উচ্চবর্ণকে নিম্ন করিয়া, আহার-বিহারে যথেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করিয়া, কিঞ্চিৎ ভোগ-সুখের জন্য স্ব স্ব বর্ণাশ্রমের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া, জাতিভেদ সমস্যার মীমাংসা হইবে না; পরন্তু আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই যদি বৈদান্তিক ধর্ম্মের নির্দ্দেশ পালন করে, প্রত্যেকেই যদি ধার্ম্মিক হইবার চেষ্টা করে, প্রত্যেকেই যদি আদর্শ ব্রাহ্মণ হয়—তবেই এই জাতিভেদ সমস্যার মীমাংসা হইবে। তোমরা আর্য্য, অনার্য্য, ঋষি, ব্রাহ্মণ, অথবা অতি নীচ অন্ত্যজ জাতি—যাহাই হও, ভারতভূমিনিবাসী সকলেরই প্রতি তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের এক মহান্ আদেশ রহিয়াছে। তোমাদের সকলের প্রতিই এই এক আদেশ;—সে আদেশ এই—'চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না—ক্রমাগত উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। উচ্চতম জাতি হইতে নিম্নতম পারিয়া (চণ্ডাল) পর্য্যন্ত সকলকেই আদর্শ ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টা করিতে হইবে।' বেদান্তের এই আদর্শ শুধু যে ভারতেই খাটিবে, তাহা নহে—সমগ্র জগৎকে এই আদর্শানুযায়ী গঠন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

সত্যযুগে এক-মাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ছিলেন

আবার সকল জাতিকে ব্রাহ্মণ হইতে হইবে

আমাদের জাতিভেদের ইহাই লক্ষ্য। ইহার উদ্দেশ্য—ধীরে ধীরে সমগ্র মানবজাতি যাহাতে আদর্শ ধার্ম্মিক—অর্থাৎ ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, শান্তি, উপাসনা ও ধ্যান পরায়ণ হয়। এই আদর্শ অবলম্বন করিলেই মানব জাতি ক্রমশঃ ঈশ্বরসাযুজ্য লাভ করিতে পারে।

শুধু ভারত নহে, সমগ্র জগৎকে এই আদর্শানুযায়ী গঠন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে

এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় কি? আমি তোমাদিগকে আবার স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, অভিশাপ, নিন্দা ও গালিবর্ষণের দ্বারা কোন সদুদ্দেশ্য সাধন হয় না। অনেক বর্ষ ধরিয়া ত ঐরূপ চেষ্টা হইয়াছে—কিন্তু তাহাতে কোন সুফল প্রসব করে নাই। কেবল ভালবাসা ও সহানুভূতি দ্বারাই সুফল প্রাপ্তির আশা করা যাইতে পারে। কি উপায়ে এই মহান্ উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে, ইহা একটি গুরুতর সমস্যা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমি যাহা যাহা করিতে চাই ও ঐ বিষয়ে দিন দিন আমার মনে যে সকল নূতন নূতন ভাবের উদয় হইতেছে, তাহা সমুদয় বিস্তারিতরূপে বলিতে গেলে আমাকে একাধিক বক্তৃতা দিতে হইবে। অতএব অদ্য আমি এই স্থলে বক্তৃতার উপসংহার করিব। কেবল, হে হিন্দুগণ! তোমাদিগকে ইহাই স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, আমাদের এই জাতীয় মহান্ অর্ণবপোত শত শত শতাব্দী ধরিয়া হিন্দুজাতিকে পারাপার করিতেছে। সম্ভবতঃ আজকাল উহাতে কয়েকটি ছিদ্র হইয়াছে,—হয়ত উহা কিঞ্চিৎ জীর্ণ হইয়াও পড়িয়াছে। যদি তাই হইয়া থাকে, তবে আমাদের ভারতমাতার সন্তান সকলেরই প্রাণপণে এই ছিদ্রসকল

জাতীয় অর্ণব-পোত

বন্ধ করিবার ও পোতের জীর্ণসংস্কারের চেষ্টা করা আবশ্যক। আমাদের স্বদেশবাসী সকলকে এই বিপদের কথা জানাইতে হইবে ;—তাহারা জাগ্রত হউক, তাহারা এদিকে মনঃসংযোগ করুক। আমি ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে লোকদিগকে ডাকিয়া, তাহাদিগকে জাগ্রত হইয়া নিজেদের অবস্থা বুঝিয়া ইতিকর্ত্তব্য সাধন করিতে আহ্বান করিব। মনে কর, লোকে আমার কথা অগ্রাহ্য করিল—তথাপি আমি তাহাদিগকে গালি বা অভিশাপ দিব না। আমাদের জাতি অতীত কালে মহৎ কর্ম্মসকল সম্পাদন করিয়াছে। যদি ভবিষ্যতে আমরা মহত্তর কার্য্য করিতে না পারি, তবে একত্রে শান্তিতে ডুবিয়া মরিব ;—ইহাতেই আমরা সান্ত্বনা লাভ করিব যে, আমরা একত্রে মিলিয়া মরিয়াছি। স্বদেশহিতৈষী হও—যে জাতি অতীত কালে আমাদের জন্য এত বড় বড় কাজ করিয়াছে, সেই জাতিকে প্রাণের সহিত ভালবাস। হে আমার স্বদেশবাসিগণ! আমি যতই আমাদের জাতির সহিত অপর জাতির তুলনা করি, ততই তোমাদের প্রতি আমার অধিকতর ভালবাসার সঞ্চার হয়। তোমরা শুদ্ধ, শান্ত, সৎস্বভাব। আর তোমরাই চিরকাল অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়াছ—এই মায়াময় জড়জগতের ইহাই মহা প্রহেলিকা। তা হউক, তোমরা উহা গ্রাহ্য করিও না—আখেরে আধ্যাত্মিকতার জয় হইবেই হইবে। এতদবসরে আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে, আমাদের কেবল দেশের নিন্দা করিলে চলিবে না। এই আমাদের পরম পবিত্র মাতৃভূমির বাত্যাহত কর্ম্মজীর্ণ আচার ও প্রথাসকলের নিন্দা করিও না; অতি কুসংস্কারপূর্ণ

ও অযৌক্তিক প্রথাসকলের বিরুদ্ধেও একটা নিন্দাসূচক কথা বলিও না—কারণ, সেগুলি দ্বারাও অতীতে আমাদের কিছু না কিছু কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। সর্ব্বদা মনে রাখিও, আমাদের সামাজিক প্রথাগুলির উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ, পৃথিবীর আর কোন দেশেরই তদ্রূপ নহে। আমি পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই জাতিভেদ দেখিয়াছি, কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ, অন্য কোথাও তদ্রূপ নহে। অতএব যখন জাতিভেদ অনিবার্য্য তখন অর্থগত জাতিভেদ অপেক্ষা পবিত্রতাসাধন ও আত্মত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত জাতিভেদ বরং ভাল বলিতে হইবে। অতএব নিন্দাবাদ একেবারে পরিত্যাগ কর। তোমাদের মুখ বন্ধ হউক, হৃদয় খুলিয়া যাক্। এই দেশ এবং সমগ্র জগতের উদ্ধার সাধন কর। তোমাদের প্রত্যেককেই ভাবিতে হইবে যে, সমুদয় ভার তোমারই উপর। বেদান্তের আলোক প্রত্যেক গৃহে লইয়া যাও, প্রত্যেক গৃহে বেদান্তের আদর্শানুযায়ী জীবন গঠিত হউক—প্রত্যেক জীবাত্মায় গূঢ়ভাবে যে ঈশ্বরত্ব অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, তাহাকে জাগ্রত কর। তাহা হইলেই—তোমার সফলতার পরিমাণ যতটুকুই হউক না কেন—তোমার মনে এই সন্তোষ আসিবে যে, তুমি মহাকার্য্যের জন্য জীবনযাপন করিয়াছ ও মহাকার্য্যে প্রাণ দিয়াছ। যেরূপেই হউক, এই মহাকার্য্য সাধিত হইলেই মানবজাতির ইহলোক ও পরলোকে কল্যাণ হইবে।

কুম্ভকোণম্ হইতে মাদ্রাজ যাইবার পথে পূর্ব্বের ন্যায় প্রায় সকল ষ্টেশনেই স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সমবেত জনতা

দেখা যাইতে লাগিল। বিশেষতঃ মায়াবরম্ ষ্টেশনে লোকসংখ্যা অতিশয় অধিক হইয়াছিল। তথায় তাঁহাকে ষ্টেশনে প্লাট্‌ফরমে এক অভিনন্দন প্রদত্ত হইল। স্বামিজী উহার উত্তরে বলিলেন,—তিনি এমন কিছু বড় কাজ করেন নাই;—অপর যে কেহ তাঁহা অপেক্ষা ভাল কাজ করিতে পারিতেন। তথাপি তাঁহারা যে তাঁহার এই ক্ষুদ্র কার্য্যেরও কৃতজ্ঞতাসহকারে অনুমোদন করিতেছেন, তাহাতে তিনি অতিশয় সুখী হইয়াছেন। তিনি বলিলেন, অন্য কোন সময়ে তিনি মায়াবরমে আসিবার চেষ্টা করিবেন। মহা উৎসাহধ্বনির মধ্যে ট্রেণ চলিয়া গেল।

মাদ্রাজ

মায়াবরম্ হইতে স্বামিজী মাদ্রাজে পৌছিলেন। যখন ট্রেণ মাদ্রাজে পৌছিল, তখন দেখা গেল, সহস্র সহস্র ব্যক্তি স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সমবেত হইয়াছে। এই সকল লোক স্বামিজীকে লইয়া তাঁহার গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল—রাস্তায় তাঁহার সম্মানার্থ স্থানে স্থানে ১৭টি বৃহৎ বৃহৎ তোরণ প্রস্তুত করা হইয়াছিল। খানিকটা আসিয়া গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া দেওয়া হইল। লোকেরাই গাড়ী টানিয়া স্বামিজীকে কার্ণান ক্যাস্‌ল নামক বৃহৎ প্রাসাদে লইয়া গেল। এই স্থানেই তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। স্বামিজী মাদ্রাজে যে দিন পৌছিলেন, তাহার পরবর্ত্তী রবিবারে মাদ্রাজ অভ্যর্থনা সমিতি স্বামিজীকে

এক অভিনন্দন প্রদান করিলেন। উহার সমগ্রটির বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল :—

মাদ্রাজ অভিনন্দন

পূজ্যপাদ স্বামিজী,

আমরা আপনার মাদ্রাজবাসী সহধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণের পক্ষ হইতে পাশ্চাত্যদেশে ধর্ম্মপ্রচারের পর এতদ্দেশে প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষে আপনাকে হৃদয়ের সহিত অভ্যর্থনা করিতেছি। অভিনন্দন করিতে হয় বলিয়া অথবা অপরের দেখাদেখি আমরা আপনাকে অভ্যর্থনা করিতেছি না। ঈশ্বরকৃপায় ভারতের প্রাচীন মহোচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শসমূহ জগতের সমক্ষে ঘোষণা করিয়া আপনি যে সত্যপ্রচাররূপ মহান্ কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে আমাদের হৃদয়ের ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যই আমাদের এই চেষ্টা। চিকাগোয় যখন ধর্ম্মমহাসভার আয়োজন হইল, তখন আমাদের কতকগুলি স্বদেশবাসীর স্বভাবতঃই এই আগ্রহ হইল যে, উক্ত মহাসভায় আমাদের এই মহান্ ও প্রাচীন ধর্ম্মও যেন উপযুক্তরূপে আলোচিত হয়—যেন মার্কিন জাতির ও তাহাদের সাহায্যে সমগ্র পাশ্চাত্য জাতির নিকট আমাদের ধর্ম্ম যথাযথরূপে ব্যাখ্যাত হয়। ঠিক এই সময়ে আপনার সহিত সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। আমরা তখনই সকল জাতির ইতিহাসে চিরকাল ধরিয়া যে সত্য প্রমাণিত হইয়াছে অর্থাৎ সময় হইলেই উপযুক্ত লোকের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহা আবার উপলব্ধি করিলাম। যখন

আপনি উক্ত ধর্ম্মমহাসভায় হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে যাইতে স্বীকার পাইলেন, তখন আপনার অপূর্ব্ব শক্তিসকলের পরিচয় পাইয়া আমাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিয়াছিলেন যে, উক্ত চিরস্মরণীয় ধর্ম্মসভায় (আপনার ন্যায়) হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধি অতি দক্ষতার সহিত উহার সমর্থন করিবেন। আপনি যেরূপ স্পষ্ট ভাষায়, বিশুদ্ধ ও প্রামাণিক-ভাবে হিন্দুধর্ম্মের সনাতন মতসমূহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে শুধু যে উক্ত মহাসভার সভ্যগণের হৃদয় বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু অনেক পাশ্চাত্য নরনারী উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ভারতীয় ধর্ম্মনির্ঝরিণীর অমরত্ব ও প্রেমরূপ সলিল পান করিলে তাঁহারা সতেজ হইতে পারেন ও সমগ্র মানবসমাজ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর, পূর্ণতর ও বিশুদ্ধতর উন্নতির ভাগী হইতে পারে, যাহা জগতে আর কখনও ঘটে নাই। ধর্ম্মসমন্বয়রূপ হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্বজ্ঞাপক মতটির প্রতি জগতের অন্যান্য মহান্ ধর্ম্মসমূহের প্রতিনিধিগণের মনোযোগ আকর্ষণ করাতে আমরা আপনার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। প্রকৃত শিক্ষিত ও সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের পক্ষে এখন আর এরূপ বলা সম্ভব নহে যে, সত্য ও পবিত্রতা কোন বিশেষ স্থানে বা সম্প্রদায়ে আবদ্ধ কিংবা উহা কোন বিশেষ মত বা সাধনপ্রণালীর একচেটিয়া অধিকার অথবা কোন বিশেষ মত বা দর্শন অন্য সকলগুলিকে নিরস্ত ও বিনষ্ট করিয়া স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত হইবে। আপনি ভগবদ্গীতার অন্তর্নিহিত মধুর সমন্বয়ভাব সম্যকরূপে প্রকাশ করিয়া আপনার অননুকরণীয় মধুর ভাষায় বলিয়াছেন—'সমগ্র ধর্ম্মজগৎ বিভিন্নপ্রকৃতি নরনারীর,

বিভিন্ন অবস্থাচক্রের মধ্য দিয়া একই লক্ষ্যের দিকে গতি মাত্র'। আপনার উপর অর্পিত এই পবিত্র ও মহান্ কার্য্যভার সমাপন করিয়াই যদি আপনি নিশ্চিন্ত হইতেন, তাহা হইলেও আপনার স্বধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণ আনন্দ ও ধন্যবাদ সহকারে আপনার কার্য্যের অসীম গুরুত্ব স্বীকার করিত। কিন্তু আপনি পাশ্চাত্যদেশে গিয়া ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মের প্রাচীন উপদেশকে ভিত্তি করিয়া সমগ্র মানবজাতির নিকট জ্ঞানালোক ও শান্তির সুসমাচার বহন করিয়াছেন। বেদান্তধর্ম্ম যে বিশেষভাবে যুক্তিসহ, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আপনি সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। কিন্তু আপনি আমাদের ধর্ম্ম ও দর্শন প্রচারের জন্য স্থায়ী বিভিন্ন শাখাবিশিষ্ট একটি কর্ম্মপ্রধান 'মিশন' প্রতিষ্ঠারূপ যে গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহার বিষয় উল্লেখ করিতে আমাদের বিশেষ আনন্দ বোধ হইতেছে। আপনি যে প্রাচীন আর্য্যগণের পবিত্র পথের অনুসরণ করিতেছেন, এবং যে মহান্ আচার্য্য আপনার জীবনে শক্তিসঞ্চার করিয়া উহার উদ্দেশ্যসমূহকে নিয়মিত করিয়াছেন, তাঁহারা যে উচ্চভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, আপনিও সেই উচ্চভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই এই মহান্ কার্য্যে আপনার সমগ্রশক্তি নিযুক্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। আশাকরি যেন ঈশ্বরকৃপায় আমরাও এই মহান্ কার্য্যে আপনার সহযোগী হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি। আমরা সেই সর্ব্ব-শক্তিমান্ ও পরম দয়াময় পরমেশ্বরের নিকট হৃদয়ের সহিত এই প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন আপনাকে দীর্ঘ জীবন ও পূর্ণ

শক্তি প্রদান করেন আর আপনার কার্য্যকে যেন সনাতন সত্যের শিরোভূষণের উপযুক্ত গৌরব ও সিদ্ধির মুকুট দানে আশীর্ব্বাদ করেন।

খেতড়ি মহারাজ * প্রদত্ত অভিনন্দন পত্র

পূজ্যপাদেষু,

আপনার নিরাপদে ভারতে আগমন ও মাদ্রাজে আপনার অভ্যর্থনার সংবাদ পাইয়া আমি যত অগ্রে সম্ভব, আপনার অভিনন্দন করিব, এই ইচ্ছাবশতঃ এই অবকাশে আপনার নিরাপদে আগমনে আমার পরম আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। পাশ্চাত্যদেশে মনীষিগণ এই বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন যে, বিজ্ঞান যে সকল স্থলে আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে, ধর্ম্ম গিয়া আর তাহাকে সকল স্থল হইতে হঠাইতে পারে নাই (যদিও বিজ্ঞান কখন প্রকৃত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় নাই)। সেই পাশ্চাত্যদেশে আপনার নিঃস্বার্থ পরিশ্রমে যে মহতী সফলতা লব্ধ হইয়াছে, তজ্জন্য এই অবকাশে আমি আমার আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। এই পবিত্র আর্য্যাবর্ত্তভূমি পরম সৌভাগ্যবশতঃই চিকাগোর ধর্ম্মমহাসভায় পাঠাইবার জন্য আপনার ন্যায় একজন মহাপুরুষকে উপযুক্ত

---

* রাজপুতনার অন্তর্গত, জয়পুর হইতে ৯০ মাইল দূরবর্ত্তী খেতড়ি নামক স্থানের রাজা অজিৎ সিং স্বামিজীর আমেরিকা যাত্রার পূর্ব্বেই তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। স্বামিজীর মাদ্রাজে আগমন সংবাদ পাইয়াই তিনি তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারি মুন্সি জগমোহন লালকে স্বামিজীর অভ্যর্থনার জন্য এই অভিনন্দনপত্রসহ মাদ্রাজে পাঠাইয়া দেন।

প্রতিনিধিরূপে পাইয়াছিল এবং পাশ্চাত্যদেশ যে জানিতে পারিয়াছে এখনও ভারতে আধ্যাত্মিকতার অফুরন্ত ভাণ্ডার রহিয়াছে, আপনার অসীম জ্ঞান এবং অপার উদ্যোগ ও উৎসাহই তাহার একমাত্র কারণ। আপনার কার্য্যের ফলে ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বেদান্তের সার্ব্বভৌম আলোকে জগতের বিভিন্ন আপাতবিরোধী ধর্ম্মমতসমূহের সামঞ্জস্য সাধন হইতে পারে; আর ইহাও আপনি স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, জগদ্বাসী সকলের এই তত্ত্বগুলি বুঝা এবং বুঝিয়া কার্য্যে পরিণত করা আবশ্যক যে—বহুত্বে একত্বই জগদ্রচনায় প্রকৃতির নিয়ম এবং বিভিন্ন ধর্ম্মের সমন্বয় ও ভ্রাতৃভাব এবং পরস্পর সহানুভূতি ও সহায়তা দ্বারাই মনুষ্যজাতির জীবনব্রত উদ্‌যাপিত ও চরমোদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। আপনার ন্যায় বিশুদ্ধস্বভাব মহাপুরুষের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে এবং আপনার মহান্ উপদেশাবলির জীবনপ্রদ শক্তিতে বর্ত্তমানযুগের লোক আমরা জগতের ইতিহাসে এক নূতন যুগের অভ্যুদয় দেখিয়া ধন্য হইয়াছি। আশা করি, এ যুগে গোঁড়ামি, ঘৃণা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর থাকিবে না; উহাদের পরিবর্ত্তে শান্তি, সহানুভূতি ও প্রেম মনুষ্যসমাজে রাজত্ব করিবে। আমি আমার প্রজাবর্গের সহিত একযোগে প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনার ও আপনার কার্য্যের উপর ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইতে থাকুক।

অভিনন্দন পত্রগুলি পাঠ হইবার পর স্বামিজী 'হল' হইতে উঠিয়া গিয়া পশ্চাদ্দেশে অবস্থিত একখানি গাড়ীর কোচবাক্সে আরোহণ করিলেন। অন্ততঃ দশ সহস্র লোক সমবেত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে সকলে স্বামিজীর বক্তৃতা শুনিতে না পাইয়া গাড়ীর

দিকে ঠেলিয়া আসিতে লাগিল। সুতরাং রীতিমত সভা হইবার কোন সম্ভাবনা রহিল না। যাহা হউক, স্বামিজী নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভবিষ্যতে তাঁহার অন্যান্য বক্তব্য ভাল করিয়া বলিবার ইচ্ছা রহিল।

মাদ্রাজ অভিনন্দনের উত্তর

ভদ্রমহোদয়গণ,

একটা কথা আছে—মানুষ নানাবিধ সঙ্কল্প করে, কিন্তু ঈশ্বরের বিধানে যাহা ঘটিবার ঘটিয়া থাকে। ব্যবস্থা হইয়াছিল যে, অভ্যর্থনা ইংরাজী ধরণে হইবে। কিন্তু এখানে ঈশ্বরের বিধানে কার্য্য হইতেছে—গীতার ধরণে আমি রথ হইতে ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে বক্তৃতা করিতেছি। অতএব এরূপ যে ঘটিল, তজ্জন্য আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি। ইহাতে বক্তৃতার জোর হইবে, আমি তোমাদিগকে যাহা বলিতে যাইতেছি, সেই কথাগুলির ভিতর একটা শক্তি আসিবে। আমি জানি না, আমার স্বর তোমাদের সকলের নিকট পৌছিবে কি না। তবে আমি যতদূর সম্ভব চেষ্টা করিব। ইহার পূর্ব্বে আর কখন আমার খোলা ময়দানে বড় সভায় বক্তৃতা করিবার সুযোগ হয় নাই। কলম্বো হইতে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত লোক আমার প্রতি যেরূপ অপূর্ব্ব সদয় ব্যবহার করিয়াছে, যেরূপ পরম আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে আমার অভ্যর্থনা করিয়াছে এবং সমগ্র ভারতবাসীই যেরূপ করিবে বলিয়া বোধ হইতেছে, আমি কল্পনায়ও এরূপ অভ্যর্থনা পাইবার আশা করি নাই। কিন্তু ইহাতে আমার কেবল আনন্দই হইতেছে;

কারণ, ইহা দ্বারা পূর্ব্বে বার বার আমার দ্বারা উক্ত সেই কথারই সত্যতা প্রমাণ হইতেছে যে, প্রত্যেক জাতিরই জীবনীশক্তি এক এক বিশেষ বিশেষ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক জাতিই বিশেষ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া থাকে আর ধর্ম্মই ভারতবাসীর সেই বিশেষত্ব। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে অন্যান্য অনেক কার্য্যের মধ্যে ধর্ম্ম একটি; প্রকৃতপক্ষে উহা জীবনের অতি ক্ষুদ্র অংশমাত্র অধিকার করিয়া থাকে।

ধর্ম্মই ভারতের জীবনীশক্তি

যথা,—ইংলণ্ডে ধর্ম্ম তাহাদের রাজনীতির অংশবিশেষ মাত্র। ইংলিশ-চার্চ্চ ইংলণ্ডের রাজবংশের অধিকারভুক্ত, সুতরাং ইংরাজেরা উহাতে বিশ্বাস করুক বা নাই করুক, উহা তাহাদের চার্চ্চ মনে করিয়া তাহারা উহার পোষকতা ও ব্যয়নির্ব্বাহাদি করিয়া থাকে। প্রত্যেক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারই উক্ত চার্চ্চের অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক, উহা ভদ্রতার পরিচায়ক। অন্যান্য দেশ সম্বন্ধেও তদ্রূপ। যেখানেই কোন প্রবল জাতীয় শক্তি দেখা যায়,—উহা হয় রাজনীতি বা কোনরূপ বিদ্যাচর্চ্চা বা সমরনীতি বা বাণিজ্যনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। আর যাহার উপর উহা প্রতিষ্ঠিত, তাহাতেই সেই জাতির প্রাণস্পন্দন অনুভূত হইয়া থাকে। সেইটিই তাহার মুখ্য জিনিষ —এতদ্ব্যতীত তাহাদের অনেক গৌণ পোষাকী জিনিষ আছে— ধর্ম্ম তাহাদের মধ্যে অন্যতম। এখানে—এই ভারতে—ধর্ম্ম জাতীয় হৃদয়ের মর্ম্মস্থলী। ঐ ভিত্তির উপরই জাতীয় প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত। রাজনীতি, প্রভুত্ব, এমন কি, বিদ্যাবুদ্ধির চর্চ্চাও এখানে গৌণমাত্র —ধর্ম্মই সুতরাং এখানকার একমাত্র কার্য্য—একমাত্র চিন্তা। ভারতীয় জনসাধারণ জগতের কোন সংবাদ রাখে না, শত শত বার

আমি এ কথা শুনিয়াছি,—কথা সত্য। কলম্বোয় যখন নামিলাম তখন দেখিলাম, ইউরোপে যে সকল গুরুতর রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, যথা মন্ত্রিসভার পতন প্রভৃতি বিষয়সম্বন্ধে সাধারণ লোক কোন সংবাদ রাখে না। তাহাদের মধ্যে একজনও সোসিয়ালিজম্ (Socialism) এনার্কিজম্ (Anarchism) * প্রভৃতি শব্দের এবং ইউরোপে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিশেষ বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, সেই সেই পরিবর্ত্তনজ্ঞাপক শব্দগুলির অর্থ কি তাহা জানে না। কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে চিকাগোর ধর্ম্মমহাসভায় একজন সন্ন্যাসী প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং তিনি কতকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছেন, একথা সিংহলের আবালবৃদ্ধবনিতা শুনিয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, তাহাদের সংবাদ সংগ্রহের বা সংবাদ সংগ্রহে আগ্রহের অভাব নাই, তবে সেই সংবাদ তাহাদের উপযোগী হওয়া চাই, তাহাদের জীবনযাত্রায় যে সকল বিষয় অত্যাবশ্যক, তদনুযায়ী কিছু হওয়া চাই। রাজনীতি প্রভৃতি বিষয় কখনও ভারতীয় জীবনের অত্যাবশ্যক বিষয় বলিয়া পরিগণিত হয় নাই, ধর্ম্ম অবলম্বনেই কেবল ভারত চিরকাল বাঁচিয়া আছে ও উন্নতি করিয়াছে এবং উহার সহায়তায়ই ভবিষ্যতে উহা জীবন ধারণ করিবে।

জগতের সকল জাতি দুইটি বড় বড় সমস্যার সমাধানে নিযুক্ত। ভারত উহার মধ্যে একটির মীমাংসায় এবং জগতের অন্যান্য সকল

---

* এনার্কিজম—সকল বিষয়েই কোন বাহ্য শাসনাধীনে না থাকিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অবলম্বন—এই সম্প্রদায়ের মূলমন্ত্র। যে কোন উপায়েই হউক ক্ষমতাশালী সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ সাধন এবং আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সকল বিষয়েই সকলের সমান অধিকার লাভ ইহাদের লক্ষ্য।

জাতি অপরটির মীমাংসায় নিযুক্ত। এখন প্রশ্ন এই—এই দুই পথের মধ্যে কোনটি জয়ী হইবে? কিসে জাতিবিশেষ দীর্ঘ জীবন লাভ করে, কিসেই বা অপর জাতি অতি শীঘ্র বিনাশ প্রাপ্ত হয়? জীবনসংগ্রামে প্রেমের জয় হইবে, না, ঘৃণার জয় হইবে? ভোগের জয় হইবে, না, ত্যাগের জয় হইবে? জড় জয়ী হইবে, না, চৈতন্য জয়ী হইবে? এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক যুগের অনেক পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যেমন সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, আমাদেরও সেই বিশ্বাস। কিংবদন্তীও যে অতীতের ঘনান্ধকার ভেদ করিতে অসমর্থ, সেই অতি প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের মহিমময় পূর্ব্বপুরুষগণ এই সমস্যাপূরণে অগ্রসর হইয়াছেন—তাঁহারা জগতের নিকট তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া, যদি কাহারও সাধ্য থাকে, উহার সত্যতা খণ্ডন করিতে আহ্বান করিয়াছেন। আমাদের সিদ্ধান্ত এই—ত্যাগ, প্রেম ও অপ্রতীকারই জগতে জয়ী হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ইন্দ্রিয়সুখের বাসনাত্যাগী জাতিই দীর্ঘজীবী হইতে পারে। ইহার প্রমাণস্বরূপ দেখ—ইতিহাস আজ প্রতি শতাব্দীতেই অসংখ্য নূতন নূতন জাতির উৎপত্তি ও বিনাশের কথা আমাদিগকে জানাইতেছে—শূন্য হইতে উহাদের উদ্ভব—কিছুদিনের জন্য পাপখেলা খেলিয়া আবার তাহারা শূন্যে বিলীন হইতেছে। কিন্তু এই মহান্ জাতি—অনেক দুরদৃষ্ট, বিপদ ও দুঃখের ভার সত্ত্বেও (যাহা জগতের অপর কোন জাতির মস্তকে পড়ে নাই) এখনও জীবিত রহিয়াছে; কারণ, এই জাতি ত্যাগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে—আর ত্যাগ ব্যতীত ধর্ম্ম কি করিয়া থাকিতে পারে?

ত্যাগ না ভোগ?

ইউরোপ এই সমস্যার অপর দিক্ মীমাংসার চেষ্টা করিতেছে—

মনুষ্য কতদূর ভোগ করিতে পারে—কোন উপায়ে—ভালমন্দ যে কোন উপায়ে—মানুষ কত অধিক ক্ষমতা লাভ করিতে পারে। নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, সহানুভূতিশূন্য প্রতিযোগিতাই ইউরোপের মূলমন্ত্র। আমরা কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম দ্বারা এই সমস্যার মীমাংসার চেষ্টা করিতেছি—এই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের দ্বারাই প্রতিযোগিতার নাশ হয়, উহাই উহার শক্তিকে খর্ব্ব করে, উহাই উহার নিষ্ঠুরতার হ্রাস করায়, উহার দ্বারাই এই রহস্যময় জীবনের মধ্য দিয়া মানবাত্মার গমনপথ সরল ও মসৃণ হইয়া থাকে।

প্রতিযোগিতা ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম

এই সময়ে এমন গোলযোগ হইতে লাগিল যে, কেহ আর স্বামিজীর কথা শুনিতে পায় না। সুতরাং তিনি এই বলিয়া বক্তৃতা শেষ করিলেন :—

বন্ধুগণ, আমি তোমাদের অদ্ভুত উৎসাহ দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম। মনে করিও না, আমি তোমাদের প্রতি কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হইতেছি। বরং তোমাদের উৎসাহ প্রকাশে আমি বড়ই সুখী হইতেছি, ইহাই চাই—প্রবল উৎসাহ। তবে ইহাকে স্থায়ী করিতে হইবে—সযত্নে ইহাকে রক্ষা করিতে হইবে। যেন এই উৎসাহাগ্নি কখনও নিবিয়া না যায়। আমাদিগকে ভারতে বড় বড় কাজ করিতে হইবে। তাহার জন্য আমি তোমাদের সাহায্য চাই। এইরূপ উৎসাহ আবশ্যক। আর সভার কার্য্য চলা অসম্ভব। তোমাদের সদয় ব্যবহার ও সোৎসাহ অভ্যর্থনার জন্য আমি তোমাদিগকে অগণ্য ধন্যবাদ দিতেছি। আমরা অন্য সময় ধীরে সুস্থিরে পরস্পর আমাদের চিন্তাবিনিময় করিব। বন্ধুগণ, এক্ষণে বিদায়।

স্থায়ী উৎসাহের প্রয়োজন

সকল দিকে তোমরা যাহাতে শুনিতে পাও, এইরূপ ভাবে বক্তৃতা করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং অদ্য অপরাহ্নে আমাকে দেখিয়াই তোমাদিগকে সন্তুষ্ট হইতে হইবে। বক্তৃতা সুবিধামত অন্য সময়ে—ভবিষ্যতে হইবে। তোমাদের সোৎসাহ অভ্যর্থনার জন্য আবার তোমাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।

স্বামিজী মাদ্রাজে আর পাঁচটি বক্তৃতা দেন—সকলগুলিরই একে একে বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল :—

আমার সমরনীতি

(মাদ্রাজের ভিক্টোরিয়া হলে প্রদত্ত)

সেদিন অতিরিক্ত ভিড়ের দরুন বক্তৃতা সমাপ্ত করিতে পারি নাই, সুতরাং আজ এই অবসরে আমি মাদ্রাজবাসিগণের নিকট বরাবর যে সদয় ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছি, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। অভিনন্দনপত্রসমূহে আমার প্রতি যে সকল সুন্দর সুন্দর বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার জন্য আমি কিরূপে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, তাহা জানি না, তবে আমি প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাকে উহাদের যোগ্য করেন, আর আমি যেন আমার সারা জীবন আমাদের ধর্ম্ম ও মাতৃভূমির সেবা করিতে পারি। প্রভু যেন আমাকে এই কার্য্যের যোগ্য করেন।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমার বোধ হয়, সকল দোষসত্ত্বেও আমার কিঞ্চিৎ সাহস আছে। ভারত হইতে পাশ্চাত্যদেশে আমার কিছু

বার্ত্তা বহন করিবার ছিল—আমি নির্ভীকচিত্তে মার্কিন ও ইংরাজ জাতির নিকট সেই বার্ত্তা বহন করিয়াছি। অদ্যকার বিষয় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আমি তোমাদের সকলের নিকট সাহসপূর্ব্বক গোটাকতক কথা বলিতে চাই। কিছুদিন হইতে কতকগুলি ব্যাপার এমন দাঁড়াইতেছে, যাহা আমার কার্য্যের উন্নতির বিশেষ বিঘ্ন ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছে। এমন কি, সম্ভব হইলে আমাকে একেবারে পিষিয়া ফেলিয়া আমার অস্তিত্ব উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এই সকল চেষ্টাই বিফল হইয়াছে—আর এইরূপ চেষ্টা চিরদিনই বিফল হইয়া থাকে। কিন্তু গত তিন বর্ষ হইতে দেখিতেছি, কতকগুলি ব্যক্তির আমার ও আমার কার্য্যসম্বন্ধে কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণা হইয়াছে। যতদিন আমি বিদেশে ছিলাম, ততদিন আমি চুপ করিয়াছিলাম, এমন কি, একটা কথাও বলি নাই। কিন্তু এক্ষণে আমার মাতৃভূমিতে দাঁড়াইয়া আমার এ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বুঝাইয়া বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। এ কথাগুলির কি ফল হইবে, তাহা আমি গ্রাহ্য করি না; এ কথাগুলি বলার দরুন তোমাদের হৃদয়ে কি ভাবের উদ্রেক হইবে তাহা আমি গ্রাহ্য করি না। আমি লোকের মতামত কমই গ্রাহ্য করিয়া থাকি। চার বৎসর পূর্ব্বে আমি দণ্ড-কমণ্ডলু হস্তে সন্ন্যাসী বেশে তোমাদের সহরে প্রবেশ করিয়াছিলাম—আমি সেই সন্ন্যাসীই আছি—সারা দুনিয়া আমার সাম্‌নে এখনও পড়িয়া আছে।

আমার বার্ত্তা-বহন

আর অধিক ভূমিকার প্রয়োজন নাই—আমি এক্ষণে আমার বক্তব্য বিষয় বলিতে আরম্ভ করিব। প্রথমতঃ, থিওজফিক্যাল

সোসাইটি (Theosophical Society) সম্বন্ধে আমার গুটিকতক কথা বলিবার আছে। ইহা বলাই বাহুল্য যে, উক্ত সোসাইটির দ্বারা ভারতে কিছু কাজ হইয়াছে। ইহার জন্য প্রত্যেক হিন্দুই ইহার নিকট, বিশেষতঃ মিসেস্ বেসান্তের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। মিসেস্ বেসান্ত সম্বন্ধে যদিও আমার অল্পই জানা আছে, তথাপি আমি যতটুকু জানি, তাহাতেই আমি নিশ্চিত বুঝিয়াছি যে, তিনি আমাদের মাতৃভূমির একজন অকপট শুভাকাঙ্ক্ষিনী আর তিনি সাধ্যানুসারে প্রাণপণে আমাদের দেশের উন্নতি বিধানের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ইহার জন্য প্রত্যেক যথার্থ ভারত সন্তান তাঁহার প্রতি অনন্ত কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ—এবং তাঁহার ও তৎসম্পর্কীয় সকলের উপরই ঈশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক। কিন্তু এ এক কথা আর থিওজফিষ্টদের সোসাইটিতে যোগ দেওয়া আর এক কথা। ভক্তিশ্রদ্ধা ভালবাসা এক কথা আর কোন ব্যক্তি যাহা কিছু বলিবে সমুদয় তর্কযুক্তি না করিয়া, বিচার না করিয়া, বিনা বিশ্লেষণে গিলিয়া ফেলা আর এক কথা। একটা কথা চারিদিকে প্রচারিত হইতেছে যে—আমি আমেরিকা ও ইংলণ্ডে যে সামান্য কার্য্য করিয়াছি, থিওজফিষ্টগণ তাহাতে আমার সহায়তা করিয়াছিলেন। আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি, এ কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। আমরা এই জগতে—উদার ভাব এবং মতভেদ সত্ত্বেও সহানুভূতিসম্বন্ধে অনেক লম্বা লম্বা কথা শুনিতে পাই। বেশ কথা, কিন্তু আমরা কার্য্যতঃ দেখিতে পাই, যতক্ষণ কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সব কথায় বিশ্বাস করে, ততক্ষণ সে ব্যক্তি

থিওজফিক্যাল সোসাইটি

তাহার সহিত সহানুভূতি করিয়া থাকে। যখনই সে তাহার সহিত কোন বিষয়ে ভিন্নমতাবলম্বী হইতে সাহসী হয়, তখনই সেই সহানুভূতি চলিয়া যায়, ভালবাসা উড়িয়া যায়।

আর কতকগুলি ব্যক্তি আছে, তাহাদের নিজেদের এক একটা স্বার্থ আছে। যদি কোন দেশে এমন কিছু ব্যাপার হয়, যাহাতে তাহাদের স্বার্থে ব্যাঘাত হয়, তবে তাহাদের ভিতর যতদূর সম্ভব, ঈর্ষা ও ঘৃণার আবির্ভাব হয়; তাহারা তখন কি করিবে, কিছুই ভাবিয়া পায় না। হিন্দুরা নিজেদের ঘর নিজেরা সাফ করিবার চেষ্টা করিতেছে তাহাতে খ্রীষ্টান মিশনারিগণের কি ক্ষতি? হিন্দুরা প্রাণপণে নিজেদের সংস্কারসাধনের চেষ্টা করিতেছে—তাহাতে ব্রাহ্মসমাজ ও অন্যান্য সংস্কারসভাসমূহের কি অনিষ্ট হইবে? হিন্দুদের সংস্কার চেষ্টার প্রতিদ্বন্দ্বী ইঁহারা কেন হইবেন? ইঁহারা কেন এই সকল আন্দোলনের প্রবলতম শত্রু হইয়া দাঁড়াইবেন? কেন?—আমি এই প্রশ্ন করিতেছি। আমার বোধ হয়, তাঁহাদের ঘৃণা ও ঈর্ষার পরিমাণ এত অধিক যে, এ বিষয়ে তাঁহাদের নিকট কোনরূপ প্রশ্ন করা সম্পূর্ণ নিরর্থক।

ব্রাহ্মসমাজ ও মিশনারি

এক্ষণে প্রথমে থিওজফিষ্টদের কথা বলি। আমি চার বৎসর পূর্ব্বে থিওজফিক্যাল সোসাইটির নেতার নিকট গমন করি—তখন আমি একজন দরিদ্র, অপরিচিত সন্ন্যাসী মাত্র—একজনও বন্ধুবান্ধব নাই—সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া—আমাকে আমেরিকায় যাইতে হইবে—কিন্তু কাহারও উপর কোন প্রকার পরিচয়পত্র নাই। আমি স্বভাবতঃই ভাবিয়াছিলাম, তিনি যখন, একজন

মার্কিনদেশবাসী এবং ভারতভক্ত, তখন তিনি সম্ভবতঃ আমায় আমেরিকার কাহারও নিকট পরিচয়পত্র দিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার নিকটে গিয়া ঐরূপ পরিচয়পত্র প্রার্থনা করাতে তাহার ফল এই হইল যে,—তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কি আমাদের সোসাইটিতে যোগদান করিবে?' আমি উত্তর দিলাম—'না, আমি কিরূপে আপনাদের সোসাইটিতে যোগ দিতে পারি? আমি আপনাদের অনেক মতই যে বিশ্বাস করি না।' 'তবে যাও, আমি তোমার জন্য কিছু করিতে পারিব না।' ইহাই কি আমার পথ করিয়া দেওয়া? আমার থিওজফিষ্ট বন্ধুগণ—যদি কেহ এখানে থাকেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ইহাই কি আমার পথ করিয়া দেওয়া? যাহা হউক, আমি মাদ্রাজের কয়েকটি বন্ধুর সাহায্যে আমেরিকায় পৌঁছিলাম। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এখানে উপস্থিত আছেন—কেবল একজনকে অনুপস্থিত দেখিতেছি—জজ সুব্রহ্মণ্য আয়ার। আর আমি এই ক্ষেত্রে উক্ত ভদ্র মহোদয়ের প্রতি আমার গভীরতম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি, তাঁহাতে প্রতিভাশালী পুরুষের অন্তর্দৃষ্টি বিদ্যমান, আর এ জীবনে ইঁহার ন্যায় বিশ্বাসী বন্ধু আমি পাই নাই—তিনি ভারতমাতার একজন যথার্থ সুসন্তান। যাহা হউক আমি আমেরিকায় যাইলাম। টাকা আমার নিকট অতি অল্প ছিল—আর ধর্ম্মমহাসভা বসিবার পূর্ব্বেই সমুদয় খরচ হইয়া গেল। এদিকে শীত আসিল। আমার কেবল পাতলা গ্রীষ্মোপযোগী বস্ত্র ছিল। একদিন আমার হাত হিমে আড়ষ্ট হইয়া গেল। এই ঘোরতর শীতপ্রধান দেশে আমি যে কি করিব,

থিওজফিক্যাল্ সোসাইটি

তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। কারণ, যদি আমি রাস্তায় ভিক্ষার বাহির হই, তাহার ফল এই হইবে যে, আমাকে জেলে পাঠাইয়া দিবে। তখন আমার নিকট শেষ সম্বল কয়েকটি ডলার মাত্র ছিল। আমি মাদ্রাজস্থ কয়েকটি বন্ধুর নিকট তার করিলাম। থিওজফিষ্টরা এই ব্যাপারটি জানিতে পারিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন লিখিয়াছিলেন—'শয়তানটা শীঘ্র মরিবে—ঈশ্বরেচ্ছায় বাঁচা গেল।' ইহাই কি আমার জন্য পথ করিয়া দেওয়া নাকি? আমি এখন এসব কথা বলিতাম না, কিন্তু হে আমার স্বদেশবাসিগণ, আপনারা জোর করিয়া ইহা বাহির করিলেন। আমি তিন বৎসর এ বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করি নাই। নীরবতাই আমার মূলমন্ত্র ছিল, কিন্তু আজ ইহা বাহির হইয়া পড়িল। শুধু তাহাই নহে। আমি ধর্ম্মমহাসভায় কয়েকজন থিওজফিষ্টকে দেখিলাম। আমি তাঁহাদের সহিত কথা কহিতে, তাঁহাদের সহিত মিশিতে চেষ্টা করিলাম। তাঁহারা প্রত্যেকেই যে অবজ্ঞাদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন, তাহা এখনও আমার স্মরণ আছে। তাঁহাদের সেই অবজ্ঞাদৃষ্টিতে যেন ইহাই প্রকাশ করিতে লাগিল যে, 'এ একটা ক্ষুদ্র কীট—এ আবার দেবতায় মধ্যে কিরূপে আসিল?' ইহাতেও আমার বড় পথ করিয়া দেওয়া হয় নাই—বলুন—হইয়াছিল কি? যাক, তারপর ধর্ম্মমহাসভায় আমার নামযশ হইল। তখন হইতে ভয়ানক কার্য্যের সূত্রপাত হইল। আমি যে সহরেই যাই, তথায়ই এই থিওজফিষ্টেরা আমাকে দাবাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মেম্বরগণকে আমার বক্তৃতা শুনিতে আসিতে নিষেধ করা হইত, আমার বক্তৃতা শুনিতে আসিলেই তাহারা সোসাইটির

সহানুভূতি হারাইবে। কারণ, ঐ সোসাইটির এসোটেরিক (গুপ্ত) বিভাগের মতই এই যে, যে কেহ উহাতে যোগ দিবে, তাহাকে কেবলমাত্র কুথুমি ও মোরিয়ার (তাঁহারা যাহাই হউন) নিকট হইতেই শিক্ষা লইতে হইবে। অবশ্য ইঁহারা অপ্রত্যক্ষ আর ইঁহাদের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি—মিঃ জজ ও মিসেস বেসান্ত। সুতরাং এসোটেরিক বিভাগে যোগ দেওয়ার অর্থ এই যে, নিজের স্বাধীন চিন্তা একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া সম্পূর্ণরূপে ইহাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করা। অবশ্য, আমি কখনই এরূপ করিতে পারিতাম না, আর যে ব্যক্তি এরূপ করে, তাহাকেও হিন্দু বলিতে পারি না। তারপর থিওজফিষ্টদের নিজেদের ভিতরই গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। পরলোকগত মিঃ জজের উপর আমার খুব শ্রদ্ধা আছে। তিনি একজন গুণবান্, সরল, অকপট প্রতিবাদী ছিলেন,—আর তিনিই থিওজফিষ্টদের উৎকৃষ্টতম প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁহার সহিত মিসেস্ বেসান্তের যে বিরোধ হইয়াছিল, তাহাতে আমার কোনরূপ রায় দিবার অধিকার নাই; কারণ, উভয়েই নিজ নিজ 'মহাত্মা'র বাক্যকে সত্য বলিয়া দাবী করিতেছেন। আর ইহার মধ্যে আশ্চর্য্যের বিষয় এইটুকু যে, উভয়েই একই মহাত্মাকে দাবী করিতেছেন। ঈশ্বর জানেন, সত্য কি। তিনিই একমাত্র বিচারক আর যেখানে উভয়ের পক্ষেই প্রমাণের ওজন সমান, সেখানে কাহারই একদিকে বা অন্যদিকে ঝুঁকিয়া রায় দিবার অধিকার নাই।

এইরূপে তাঁহারা দুই বৎসর ধরিয়া সমগ্র আমেরিকায় আমার জন্য পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন! তাহার পর তাঁহারা অপর বিরুদ্ধপক্ষ খ্রীষ্টান মিশনারিদের সহিত যোগদান করিলেন। এই শেষোক্তেরা

আমার বিরুদ্ধে এরূপ ভয়ানক মিথ্যা সংবাদ রটাইয়াছিল, যাহা কল্পনায়ও আনিতে পারা যায় না। তাহারা আমাকে প্রত্যেক বাড়ীহইতে তাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং যে কেহ আমার বন্ধু হইল, তাহাকেই আমার শত্রু করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা আমেরিকাবাসী সকলকে আমাকে লাথি মারিয়া তাড়াইয়া দিতে এবং অনশনে মারিয়া ফেলিতে বলিতে লাগিল; আর আমার বলিতে লজ্জাবোধ হইতেছে যে, আমার একজন স্বদেশবাসী ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন আর তিনি ভারতের সংস্কারকদলের একজন নেতা। ইনি প্রতিদিনই প্রচার করিতেছেন, খ্রীষ্ট ভারতে আসিয়াছেন। খ্রীষ্ট কি এইরূপেই ভারতে আসিবেন? ইহাই কি ভারতসংস্কারের উপায়? আমি ইঁহাকে অতি বাল্যকাল হইতেই জানিতাম, তিনি আমার একজন পরম বন্ধু ছিলেন। অনেক বর্ষ যাবৎ আমার সহিত আমার স্বদেশবাসীর সাক্ষাৎ হয় নাই, সুতরাং তাঁহাকে দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল, আমি যেন হাতে স্বর্গ পাইলাম। কিন্তু তাঁহারই নিকট আমি এই ব্যবহার পাইলাম! যেদিন ধর্ম্মমহাসভায় আমি প্রশংসা পাইলাম, যেদিন চিকাগোয় আমি লোকপ্রিয় হইলাম, সেই দিন হইতে তাঁহার সুর বদলাইয়া গেল এবং তিনি অপ্রকাশ্যে আমার অনিষ্টাচরণ করিতে, আমাকে অনশনে মারিয়া ফেলিতে, আমেরিকা হইতে লাথি মারিয়া তাড়াইতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করি, খ্রীষ্ট কি এইরূপেই ভারতে আসিবেন? জিজ্ঞাসা করি, বিশ বৎসর খ্রীষ্টের পদতলে বসিয়া কি তিনি এই শিক্ষা পাইয়াছেন? আমাদের

আমেরিকায় আমার বিরোধী দলের সহিত আমার জনৈক স্বদেশবাসীর যোগদান

বড় বড় সংস্কারকগণ যে বলিয়া থাকেন, খ্রীষ্টধর্ম্ম এবং খ্রীষ্টশক্তি ভারতবাসিগণের উন্নতি বিধান করিবে, তাহা কি এইরূপে হইবে? অবশ্য যদি উক্ত ভদ্রলোককে উহার দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যায়, তবে ইহার বড় আশা আছে বলিয়া বোধ হয় না।

শূদ্র ও সন্ন্যাস

আর এক কথা। আমি সমাজসংস্কারকগণের মুখপত্রে পড়িলাম যে,—তাঁহারা বলিতেছেন—আমি শূদ্র আর আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—শূদ্রের সন্ন্যাসী হইবার কি অধিকার আছে? ইহাতে আমার উত্তর এই—যদি তোমরা তোমাদের পুরাণ বিশ্বাস কর, তবে জানিও, আমি সেই মহাপুরুষের বংশধর, যাঁহার পদে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ 'যমায় ধর্ম্মরাজায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ'—মন্ত্র উচ্চারণসহকারে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন, আর যাঁহার বংশধরগণ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়। এই বাঙ্গালী সংস্কারকগণ জানিয়া রাখুন, আমার জাতি অন্যান্য নানা উপায়ে ভারতের সেবা ব্যতীত শত শত শতাব্দী ধরিয়া ভারতের অর্দ্ধাংশ শাসন করিয়াছিল। যদি আমার জাতিকে বাদ দেওয়া যায়, তবে ভারতের আধুনিক সভ্যতার আর কতটুকু অবশিষ্ট থাকে? কেবল বাঙ্গালা দেশেই আমার জাতি হইতে তাহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপ্রচারক সকলের অভ্যুদয় হইয়াছে। আমার জাতি হইতেই আজকালকার ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের অভ্যুদয় হইয়াছে। উক্ত সম্পাদকের আমাদের ইতিহাস কতকটা জানা উচিত ছিল। আমাদের তিন বর্ণ সম্বন্ধে তাঁহার কতকটা জানা উচিত ছিল; তাঁহার জানা উচিত ছিল যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিন বর্ণেরই সন্ন্যাসী হইবার

সমান অধিকার, ত্রৈবর্ণিকেরই বেদে সমান অধিকার। এসব কথা প্রসঙ্গক্রমে উপস্থিত হইল বলিয়াই বলিলাম। আমি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটি কেবল উদ্ধৃত করিয়াছি মাত্র, কিন্তু আমাকে শূদ্র বলিলে আমার বাস্তবিক কোন দুঃখ নাই। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ দরিদ্রগণের উপর যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই কিঞ্চিৎ প্রতিশোধস্বরূপ হইবে।

যদি আমি অতি নীচ চণ্ডাল হইতাম, তাহা হইলে আমার আরও অধিক আনন্দ হইত; কারণ, আমি যাঁহার শিষ্য তিনি একজন অতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইলেও এক নীচ জাতির গৃহ পরিষ্কার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সে ব্যক্তি অবশ্যই ইহাতে সম্মত হয় নাই—কি করিয়াই বা হইবে? ব্রাহ্মণ আবার সন্ন্যাসী—তিনি আসিয়া তাহার ঘর পরিষ্কার করিবেন—ইহাতে কি সে কখনও সম্মত হইতে পারে? সুতরাং ইনি গভীর রাত্রে অজ্ঞাতভাবে তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার পাইখানা পরিষ্কার করিতেন এবং তাঁহার বড় বড় চুল দিয়া সেই স্থান মুছিতেন। দিনের পর দিন তিনি এইরূপ করিতেন, যাহাতে তিনি আপনাকে সকলের দাস—সকলের সেবক করিতে পারেন। সেই ব্যক্তির শ্রীচরণ আমি মস্তকে ধারণ করিয়া আছি। তিনিই আমার আদর্শ—আমি সেই আদর্শ পুরুষের জীবন অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিব।

ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী ও চণ্ডাল

হিন্দুরা এইরূপেই তোমাদিগকে এবং সর্ব্বসাধারণকে উন্নত করিবার চেষ্টা করেন। এবং তাঁহারা ইহাতে বৈদেশিক ভাবের কিছুমাত্র সহায়তা গ্রহণ করেন না। বিশ বৎসর পাশ্চাত্য সভ্যতার

সংস্পর্শে আসিয়া এমন চরিত্র গঠিত হইয়াছে যে, কেবল বন্ধুর কিছু মানযশ হইয়াছে বলিয়া, সে তাহার অর্থোপার্জ্জনের বিঘ্নস্বরূপ দাঁড়াইয়াছে মনে করিয়া, বিদেশে তাহাকে অনাহারে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। আর খাঁটি, পুরানো, দিশী হিন্দুধর্ম্ম কিরূপে কার্য্য করে, অপরটি তাহার উদাহরণ। আমাদের সংস্কারকগণের মধ্যে কেহ সেই জীবন দেখান, নীচজাতির পাইখানা সাফ ও চুল দিয়া উহা মুছিয়া ফেলিতে প্রস্তুত হউন, তবেই আমি তাঁহার পদতলে বসিয়া উপদেশ গ্রহণ করিব, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে নহে। হাজার হাজার লম্বা কথার চেয়ে এতটুকু কাজের দাম ঢের বেশী।

খাঁটি হিন্দু ও সংস্কারক

এক্ষণে আমি মাদ্রাজের সংস্কারসভাসমূহের কথা বলিব। তাঁহারা আমার প্রতি বড়ই সদয় ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহারা আমার প্রতি অনেক মধুর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন এবং বাঙ্গালা দেশের ও মাদ্রাজের সংস্কারকগণের মধ্যে যে একটা প্রভেদ আছে, সেই বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, আর আমি এ বিষয়ে তাঁহাদের সহিত একমত। তোমাদের মধ্যে অনেকের নিশ্চিত স্মরণ আছে যে, তোমাদিগকে আমি অনেকবার বলিয়াছি—মাদ্রাজের এক্ষণে বড় সুন্দর অবস্থা। বাঙ্গালায় যেমন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলিয়াছে, এখানে তদ্রূপ হয় নাই। এখানে বরাবর ধীর অথচ সুনিশ্চিতভাবে সর্ব্ববিষয়েউন্নতি হইয়াছে, এখানে সমাজের ক্রমশঃ বিকাশ হইয়াছে, কোনরূপ প্রতিক্রিয়া হয় নাই। অনেক স্থলে এবং কতক পরিমাণে বাঙ্গালা দেশে পুনরুত্থান হইয়াছে বলা

মাদ্রাজের সংস্কারসমিতি-সমূহ

যাইতে পারে, কিন্তু মাদ্রাজে ধীরে ধীরে স্বাভাবিকভাবে উন্নতি হইতেছে। সুতরাং এখানকার সংস্কারকগণ যে উভয় জাতির প্রভেদ দেখান, সেই বিষয়ে আমি তাঁহাদের সহিত সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু আমার সহিত তাঁহাদের এক বিষয়ে প্রভেদ আছে—সেটি তাঁহারা বুঝেন না। আমার আশঙ্কা হয়, কতকগুলি সংস্কারসমিতি আমাকে ভয় দেখাইয়া তাঁহাদের সহিত যোগ দেওয়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের পক্ষে এরূপ চেষ্টা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে। যে ব্যক্তি চতুর্দ্দশ বৎসর ধরিয়া অনাহার-মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, যে ব্যক্তি এতদিন ধরিয়া কাল কি খাইবে কোথায় শুইবে, তাহার কিছু ঠিক ছিল না, তাহাকে এত সহজে ভয় দেখান যাইতে পারে না। যে ব্যক্তি একরূপ বিনা আচ্ছাদনে তাপমান যন্ত্রের শূন্য ডিগ্রির ৩০ ডিগ্রি নীচের শীতে বাস করিতে সাহসী হইয়াছিল, যাহার সেখানেও কাল কি খাইবে তাহার ঠিক ছিল না, তাহাকে ভারতে এত সহজে ভয় দেখান যাইতে পারে না। আমি তাঁহাদিগকে প্রথমেই বলিতে চাই যে, তাঁহারা জানিয়া রাখুন, আমার নিজের একটু দৃঢ়তা আছে, আমার নিজের একটু অভিজ্ঞতাও আছে, আর জগতের নিকট আমার কিছু বার্ত্তা বহন করিবার আছে; আমি নির্ভয়ে ও ভবিষ্যতের জন্য কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া সেই বার্ত্তা বহন করিব।

সংস্কারকগণকে আমি বলিতে চাই, আমি তাঁহাদের অপেক্ষা একজন বড় সংস্কারক। তাঁহারা একটু আধটু সংস্কার করিতে চান—আমি চাই আমূলসংস্কার। আমাদের প্রভেদ কেবল সংস্কারের প্রণালীতে। তাঁহাদের প্রণালী—ভাঙ্গিয়া চুরিয়া

ফেলা, আমার—সংগঠন। আমি আদেশ-তন্ত্র সংস্কারে বিশ্বাসী নহি, আমি স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী। আমি নিজেকে ঈশ্বরের স্থানে বসাইয়া সমাজকে 'এদিকে তোমায় চলিতে হইবে, ওদিকে নয়' বলিয়া আদেশ করিতে সাহস করি না। আমি কেবল সেই কাঠবিড়ালের মত হইতে চাই, যে রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের সময় তাহার যথাসাধ্য এক অঞ্জলি বালুকা বহন করিয়াই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিল,—ইহাই আমার ভাব। এই অদ্ভুত জাতীয় যন্ত্র শত শত শতাব্দী ধরিয়া কার্য্য করিয়া আসিতেছে—এই অদ্ভুত জাতীয়জীবননদী আমাদের সম্মুখে প্রবাহিত হইতেছে—কে জানে, কে সাহস করিয়া বলিতে পারে, এ ভাল কি মন্দ বা কিরূপে উহার গতি নিয়মিত হওয়া উচিত? সহস্র সহস্র ঘটনাচক্রে উহাকে এক বিশেষরূপে বেগবিশিষ্ট করিয়াছে, তাই সময়ে সময়ে উহা মৃদু ও সময়ে সময়ে দ্রুত গতিবিশিষ্ট হইতেছে। কে উহার গতি নিয়মিত করিতে সাহসী হইতে পারে? গীতার উপদেশানুসারে আমাদিগকে কেবল কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে, ফলাফলের দিকে দৃষ্টি একেবারে পরিত্যাগ করিয়া শান্তচিত্তে অবস্থান করিতে হইবে। উহার পুষ্টির জন্য যাহা আবশ্যক, তাহা উহাকে দিয়া যাও, কিন্তু উহা আপনার প্রকৃতি-অনুযায়ী আপনার দেহ গঠন করিয়া লইবে; কাহারও সাধ্য নাই—'এইরূপে তোমার দেহ গঠন কর' বলিয়া তাহাকে উপদেশ দিতে পারে।

আমার সংস্কার প্রণালী—নাশ নহে, সংগঠন

আমাদের সমাজে যথেষ্ট দোষ আছে। অন্যান্য সমাজেও তদ্রূপ। এখানে বিধবার অশ্রুপাতে কখন কখন ধরিত্রী আর্দ্র হইয়া

থাকে, সেখানে পাশ্চাত্য দেশের বায়ু—অনূঢ়া কুমারীগণের দীর্ঘনিঃশ্বাসবায়ুতে বিষাক্ত হইয়া আছে। এখানে জীবন দারিদ্র্যবিষে জর্জ্জরিত, তথায় বিলাসিতার অবসাদে সমগ্র জাতি জীবন্মৃতপ্রায়; এখানে লোক না খাইতে পাইয়া আত্মহত্যা করিতে যায়, তথায় আহার্য্যদ্রব্যের অতিরিক্ত প্রাচুর্য্যে তাহারা আত্মহত্যা করিয়া থাকে। দোষ সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। ইহা পুরাতন বাতরোগের মত। পা হইতে বাত দূর করিলে, মাথায় বাত ধরিল; মাথা হইতে উহা তাড়াইলে, তখন আবার উহা অন্যত্র আশ্রয় লইল। কেবল এখান হইতে ওখানে তাড়াইয়া লইয়া বেড়ান মাত্র—এই পর্য্যন্ত করা যায়। হে বালকগণ, অনিষ্টের মূলোচ্ছেদই প্রকৃত উপায়। আমাদের দর্শনশাস্ত্রে বলে, ভালমন্দ নিত্যসংযুক্ত, এক জিনিসেরই এপিট ওপিট। একটি লইলে আর একটিকে লইতেই হইবে। সমুদ্রে একটা ঢেউ উঠিল—বুঝিতে হইবে, কোথাও না কোথাও জল খানিকটা নামিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, সমুদয় জীবনই দুঃখময়। কাহাকেও না কাহাকেও হত্যা না করিয়া নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ পর্য্যন্ত অসম্ভব; এক টুকরা খাবার খাইতে হইলেওকাহাকেও না কাহাকেও বঞ্চিত করিতে হয়। ইহাই প্রকৃতির অকাট্য বিধান, ইহাই খাঁটি দার্শনিক সিদ্ধান্ত।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজ, উভয়েরই দোষগুণ বিদ্যমান

শুভাশুভ নিত্যসংযুক্ত

এই কারণে আমাদিগকে এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, সামাজিক ব্যাধির প্রতীকার বাহিরের চেষ্টা দ্বারা হইবে না, মনের উপর কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা যতই লম্বা লম্বা কথা

আওড়াই না কেন, বুঝিতে হইবে, সমাজের দোষসংশোধন করিতে হইলে প্রত্যক্ষভাবে উহার চেষ্টা না করিয়া শিক্ষা-দানের দ্বারা পরোক্ষভাবে উহার চেষ্টা করিতে হইবে। সমাজের দোষ সংশোধনসম্বন্ধে প্রথমে এই তত্ত্বটি বুঝিতে হইবে; এই তত্ত্ব বুঝিয়া আমাদের মনকে শান্ত করিতে হইবে, ইহা বুঝিয়া আমাদের রক্ত গরম হইতে দেওয়া হইবে না, আমাদিগকে উত্তেজনাশূন্য হইতে হইবে। আর জগতের ইতিহাসও আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে যে, যেখানেই এইরূপ উত্তেজনার সহায়তায় কোনরূপ সংস্কার করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহার এই মাত্র ফল হইয়াছে যে, যে উদ্দেশ্যে সংস্কার চেষ্টা, সেই উদ্দেশ্যই বিফল হইয়াছে। আমেরিকায় দাসব্যবসায় রহিত করিবার জন্য যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তদপেক্ষা মনুষ্যের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ঘোরতর আন্দোলন কল্পনা করা যাইতে পারে না—তোমাদের সকলেরই ঐ সম্বন্ধে জানা আছে। কিন্তু ইহার ফল কি হইয়াছে? দাসব্যবসায় রহিত হইবার পূর্ব্বে তাহাদের যে অবস্থা ছিল, তদপেক্ষা তাহাদের অবস্থা শতগুণ মন্দ হইয়াছে। দাসব্যবসায় রহিত হইবার পূর্ব্বে এই হতভাগ্য নিগ্রোগণ ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তিরূপে পরিগণিত ছিল—নিজ সম্পত্তির হানি আশঙ্কায় যাহাতে তাহারা দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য না হইয়া পড়ে, অধিকারিগণকে তাহা দেখিতে হইত। কিন্তু এখন তাহারা কাহারও সম্পত্তি নহে। তাহাদের জীবনের এখন কিছুমাত্র মূল্য নাই। এখন তাহাদিগকে সামান্য ছুতা করিয়া জীবন্ত পুড়াইয়া ফেলা হয়। তাহাদিগকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলা

সামাজিক ব্যাধির প্রতীকারোপায় শিক্ষা, —বলপূর্ব্বক সংস্কারচেষ্টা নহে

হয়; কিন্তু তাহাদের হত্যাকারীদের জন্য কোন আইন নাই; কারণ, তাহারা 'নিগার,' তাহারা মানুষ নহে, এমন কি, তাহারা পশুনামেরও যোগ্য নহে। আইনের দ্বারা অথবা প্রবল উত্তেজনা-পূর্ণ আন্দোলনের দ্বারা কোন সামাজিক দোষের প্রতীকার চেষ্টার ফল এই।

কোনরূপ কল্যাণ সাধনের জন্যও এইরূপ উত্তেজনাপ্রসূত আন্দোলনের বিরুদ্ধে ইতিহাসের এই সাক্ষ্য বিদ্যমান। আমি ইহা দেখিয়াছি, আমার নিজ অভিজ্ঞতা হইতে আমি ইহা শিখিয়াছি। এই কারণেই আমি এইরূপ দোষারোপকারী কোন সমিতির সহিত যোগ দিতে পারি না। দোষারোপ বা নিন্দাবাদের কি প্রয়োজন? সকল সমাজেই দোষ আছে; সকলেই তাহা জানে। আজকালকার ছোট ছেলে পর্য্যন্ত তাহা জানে। সে মঞ্চে দাঁড়াইয়া হিন্দুসমাজের গুরুতর দোষসমূহ সম্বন্ধে আমাদিগকে রীতিমত বক্তৃতা শুনাইয়া দিতে পারে। যে কোন অশিক্ষিত বৈদেশিক ব্যক্তি এক নিঃশ্বাসে ভূপ্রদক্ষিণ করিতে করিতে ভারতে আসিয়া পদার্পণ করেন, তিনিই তাড়াতাড়ি করিয়া রেলগাড়ী চাপিয়া ভারতবর্ষের মোটামুটী একটা ধারণা করিয়া লইয়া ভারতের ভয়াবহ অনিষ্টকর প্রথাবিষয়ে খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দিয়া থাকেন। আমরা তাঁহাদের কথা স্বীকার করিয়া থাকি। সকলেই দোষ দেখাইয়া দিতে পারে; কিন্তু তিনিই মানবজাতির যথার্থ বন্ধু, যিনি এই সমস্যা হইতে উত্তীর্ণ হইবার পথ দেখাইয়া দিতে পারেন। সেই জলমগ্ন বালক ও দার্শনিকের গল্পে,

দোষ দেখাইয়া দিবার লোক অনেক, প্রতীকার করিবার লোক কই?

দার্শনিক যখন বালককে গম্ভীরভাবে উপদেশ দিতেছিলেন, তখন সেই বালক যেমন বলিয়াছিল, 'অগ্রে আমাকে জল হইতে তুলুন, পরে আপনার উপদেশ শুনিব,' সেইরূপ এখন আমাদের দেশের লোক চীৎকার করিয়া বলিতেছে, 'আমরা যথেষ্ট বক্তৃতা শুনিয়াছি, যথেষ্ট সমাজ ঘুরিয়াছি, ঢের কাগজ পড়িয়াছি, এখন আমরা এমন লোক চাই, যিনি আমাদিগকে হাতে ধরিয়া এই মহাপঙ্ক হইতে টানিয়া তুলিতে পারেন। এমন লোক কোথায়? এমন লোক কোথায়, যিনি আমাদিগকে যথার্থ ভালবাসেন? এমন লোক কোথায়, যিনি আমাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন?' এইরূপ লোক চাই। এইখানেই আমার এই সকল সংস্কার-আন্দোলনসমূহের সহিত সম্পূর্ণ প্রভেদ। প্রায় শত বর্ষ ধরিয়া এই সংস্কার-আন্দোলন চলিতেছে। কিন্তু তদ্দ্বারা অতিশয় নিন্দা ও বিদ্বেষপূর্ণ সাহিত্যবিশেষের সৃষ্টি ব্যতীত কি কল্যাণ হইয়াছে? ঈশ্বরেচ্ছায় ইহা না হইলেই বড় ভাল ছিল। তাঁহারা প্রাচীন সমাজের কঠোর আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের উপর যথাসাধ্য দোষারোপ করিয়াছেন, তাঁহাদের তীব্র নিন্দাবাদ করিয়াছেন; শেষে প্রাচীন সমাজ তাঁহাদের সুর ধরিয়াছেন, তাঁহাদের ঢিল খাইয়া ইঁহারা পাটকেল মারিয়াছেন আর তাহার ফল এই হইয়াছে যে, সর্ব্বপ্রকার দেশীয় ভাষায় এমন এক সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাতে সমগ্র জাতির সমগ্র দেশের লজ্জিত হওয়া উচিত। ইহাই কি সংস্কার? ইহাই কি সমগ্র জাতির গৌরবের পথ? ইহা কাহার দোষ?

তাহার পর, আর একটি গুরুতর বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। এখানে—ভারতে, আমরা চিরকাল রাজশাসনাধীন

হইয়া কাটাইয়াছি—রাজারাই আমাদের জন্য চিরদিন বিধান প্রস্তুত করিয়াছেন। এখন সেই রাজারা নাই, এখন আর এ বিষয়ে অগ্রসর হইয়া পথ দেখাইবার কেহ নাই। গভর্ণমেণ্ট সাহস করেন না। গভর্ণমেণ্টকে সাধারণের মতামতের গতি দেখিয়া নিজ কার্য্যপ্রণালী স্থির করিতে হয়। কিন্তু নিজ সমস্যা পূরণে সমর্থ, সাধারণের কল্যাণকর, প্রবল সাধারণ মত গঠিত হইতে সময় লাগে—খুব দীর্ঘ সময় লাগে। এই মত গঠিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে। সুতরাং সমুদয় সমাজসংস্কার সমস্যাটি এই ভাবে দাঁড়ায়—সংস্কার যাহারা চায় তাহারা কোথায়? আগে তাহাদিগকে প্রস্তুত কর। সংস্কারপ্রার্থী লোক কই? অল্পসংখ্যক কয়েকটি লোকের কোন বিষয়, দোষ বলিয়া বোধ হইয়াছে, অধিকাংশ ব্যক্তি কিন্তু তাহা এখনও বুঝে নাই। এখন এই অল্পসংখ্যক ব্যক্তি যে জোর করিয়া অপর সকলের উপর নিজেদের মনোমত সংস্কার চালাইবার চেষ্টা করেন, ইহার ন্যায় প্রবল অত্যাচার জগতে আর নাই। অল্প কয়েকজন লোকের কতকগুলি বিষয় দোষ বোধ হইলেই তাহাতে সমগ্র জাতির হৃদয়কে স্পর্শ করে না। সমগ্র জাতি নড়েচড়ে না কেন? প্রথমে সমগ্র জাতিকে শিক্ষা দাও, ব্যবস্থাপ্রণয়নে সমর্থ একটি দল গঠন কর; বিধান আপনা আপনি আসিবে। প্রথমে যে শক্তিবলে, যাহার অনুমোদনে বিধান গঠিত হইবে, তাহার সৃষ্টি কর। এখন রাজারা নাই; যে নূতন শক্তিতে, যে

আমাদের এখন ব্যবস্থাপ্রণেতা স্বধর্ম্মাবলম্বী রাজা নাই, এখন লোকশক্তি গঠন আবশ্যক

নূতন সম্প্রদায়ের সম্মতিতে নূতন ব্যবস্থা প্রণীত হইবে, সে লোকশক্তি কোথায়? প্রথমে সেই লোকশক্তি গঠন কর। সুতরাং সমাজসংস্কারের জন্য প্রথম কর্ত্তব্য—লোকশিক্ষা। এই শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেই হইবে।

গত শতাব্দীতে যে সকল সংস্কারের জন্য আন্দোলন হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই পোষাকী ধরনের। এই সংস্কার চেষ্টাগুলি কেবল প্রথম দুই বর্ণকে স্পর্শ করে, অন্য বর্ণকে নহে। বিধবা বিবাহ আন্দোলনে শতকরা সত্তর জন ভারতীয় রমণীর কোন স্বার্থই নাই।

আমূল সংস্কার

আর এতদ্বিধ সকল আন্দোলনই সর্ব্বসাধারণকে বঞ্চিত করিয়া (এটি লক্ষ্য করিও) যে সকল ভারতীয় উচ্চবর্ণ শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহাদেরই জন্য। তাঁহারা নিজেদের ঘর সাফ করিতে এবং বৈদেশিকগণের নিকট আপনাদিগকে সুন্দর দেখাইতে কিছুমাত্র চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। ইহাকে ত সংস্কার বলা যাইতে পারে না। সংস্কার করিতে হইলে উপর উপর দেখিলে চলিবে না, ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে, মূলদেশ পর্য্যন্ত যাইতে হইবে। ইহাকেই আমি আমূল সংস্কার, প্রকৃত সংস্কার নাম দিয়া থাকি। মূলদেশে অগ্নিসংযোগ কর, অগ্নি ক্রমশঃ ঊর্দ্ধদেশে উঠিতে থাকুক, একটি অখণ্ড ভারতীয় জাতি গঠন করুক!

আর সমস্যা বড় সহজও নহে। ইহা অতি গুরুতর সমস্যা; সুতরাং ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। আর এটিও জানিয়া রাখিও যে, গত কয়েক শতাব্দী হইতেই এই সমস্যাসম্বন্ধে আমাদের দেশের মহাপুরুষগণ জ্ঞাত ছিলেন। আজকাল বিশেষতঃ

দাক্ষিণাত্যে, বৌদ্ধধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের অজ্ঞেয়বাদ সম্বন্ধে আলোচনা একটা প্রথাস্বরূপ দাঁড়াইয়াছে। তাহারা স্বপ্নেও কখন ভাবে না যে, আমাদের সমাজে যে সকল বিশেষ দোষ রহিয়াছে, তাহা বৌদ্ধধর্ম্মকৃত। বৌদ্ধধর্ম্ম আসিয়া আমাদিগকে উত্তরাধিকার স্বরূপ এই অবনতির ভাগী করিয়াছে। যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি ও অবনতির ইতিহাস কখনও পাঠ করেন নাই, তাঁহাদের লিখিত পুস্তকে তোমরা পাঠ করিয়া থাক যে, গৌতমবুদ্ধ-প্রচারিত অপূর্ব্ব নীতি ও তাঁহার লোকোত্তর চরিত্রগুণে বৌদ্ধধর্ম্ম এরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ভগবান্ বুদ্ধদেবের প্রতি আমার যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু আমার বাক্য অবহিত হইয়া শ্রবণ কর—বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার ততটা উহার মত বা উক্ত মহাপুরুষের চরিত্রগুণে হয় নাই—বৌদ্ধগণ যে সকল মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যে সকল প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সমগ্র জাতির সমক্ষে যে সকল আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ ধরিয়াছিলেন, তাহার দরুণ যতটা হইয়াছিল। এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারলাভ করে। এই সকল বৃহৎ বৃহৎ মন্দির ও আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াকলাপের নিকট নিজ নিজ গৃহে প্রতিষ্ঠিত হোমার্থ ক্ষুদ্র অগ্নিস্থানসমূহ দাঁড়াইতে পারিল না। পরিশেষে ঐ সকল ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান অতি বীভৎস আকার ধারণ করিল। উহা এরূপ ঘৃণিত ভাব ধারণ করিল যে, শ্রোতৃবর্গের নিকট আমি তাহা বলিতে অক্ষম। যাঁহারা ইহার সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নানাপ্রকার কারুকার্য্যপূর্ণ দাক্ষিণাত্যের বড় বড় মন্দির দেখিয়া আসিবেন।

আমরা বৌদ্ধগণের নিকট হইতে ইহাই মাত্র দায়স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। তৎপরে সেই মহান্ সংস্কারক শঙ্করাচার্য্য ও তদনুবর্ত্তি-গণের অভ্যুদয় হইল আর এই শত শত বর্ষ ধরিয়া, তাঁহার অভ্যুদয় হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বসাধারণকে ধীরে ধীরে সেই মৌলিক বিশুদ্ধ বৈদান্তিক ধর্ম্মে লইয়া আসিবার চেষ্টা হইতেছে। এই সংস্কারকগণ সমাজে যে যে দোষ ছিল, তৎসম্বন্ধে বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহারা সমাজকে নিন্দা করেন নাই। তাঁহারা একথা বলেন নাই: তোমাদের যা আছে, সব ভুল, তোমাদিগকে সব ফেলিয়া দিতে হইবে। তাহা কখনই হইতে পারিত না। আমি সম্প্রতি পড়িতেছিলাম—আমার বন্ধু ব্যারোজ সাহেব বলিতেছেন, ৩০০ বৎসরে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রীকধর্ম্মের রোমক প্রভাবকে একেবারে উল্টাইয়া দিয়াছিল। যিনি ইউরোপ, গ্রীস ও রোম দেখিয়াছেন, তিনি কখন একথা বলিতে পারেন না।

শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণের সংস্কার চেষ্টা তদানীন্তন সমাজসকলকে ধীরে ধীরে বৈদান্তিক ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী করিবার প্রয়াস

রোমক ও গ্রীকধর্ম্মের প্রভাব, এমন কি, প্রোটেষ্টাণ্ট দেশসমূহে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ রহিয়াছে। কেবল নাম বদলাইয়াছে মাত্র—প্রাচীন দেবগণই নূতন বেশে বিদ্যমান—কেবল নাম বদলান। দেবীগণ হইয়াছেন মেরি, দেবগণ হইয়াছেন সাধুগণ (Saints) এবং নূতন নূতন অনুষ্ঠান-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এমন কি, প্রাচীন উপাধি পণ্টিফেক্স্ ম্যাক্সিমাস* পর্য্যন্ত রহিয়াছে। সুতরাং একেবারে

* রোমকদিগের পুরোহিত বিদ্যালয়ের প্রধানাধ্যক্ষ এই নামে অভিহিত হইতেন। এই বাক্যের অর্থ প্রধান পুরোহিত। এখন পোপ এই নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

পরিবর্ত্তন হইতেই পারে না। এরূপ পরিবর্ত্তন বড় সহজ নহে— আর শঙ্করাচার্য্য ইহা জানিতেন, রামানুজও জানিতেন। এরূপ পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। সুতরাং তদানীন্তন প্রচলিত ধর্ম্মকে ধীরে ধীরে উচ্চতম আদর্শের অনুবর্ত্তী করা ব্যতীত তাঁহাদের আর কোন পথ ছিল না। যদি তাঁহারা অপর প্রণালী অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিতেন, অর্থাৎ যদি তাঁহারা একেবারে সব উল্টাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন, তবে তাঁহাদিগকে কপট হইতে হইত; কারণ, তাঁহাদের ধর্ম্মের প্রধান মতই ক্রমোন্নতিবাদ—এই সকল নানাবিধ সোপানের মধ্য দিয়া আত্মা তাঁহার উচ্চতম লক্ষ্যে পৌঁছিবেন— ইহাই তাঁহাদের মূল মত। সুতরাং এই সমুদয় সোপানগুলিই আবশ্যক ও আমাদের সহায়ক। আর কে এই সোপানগুলিকে নিন্দা করিতে সাহসী হইবে?

একেবারে পরিবর্ত্তন অসম্ভব

আজকাল ইহা একটি চলিত কথা দাঁড়াইয়াছে, আর সকলেই বিনা আপত্তিতে এটি স্বীকার করিয়া থাকেন যে, পৌত্তলিকতা দোষ। আমিও এক সময়ে এইরূপ ভাবিতাম, আর ইহার শাস্তিস্বরূপ আমাকে এমন এক ব্যক্তির পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইয়াছিল, যিনি পুতুলপূজা হইতে সব পাইয়াছিলেন। আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথা বলিতেছি। হিন্দুগণ, যদি পুতুলপূজা করিয়া এইরূপ রামকৃষ্ণ পরমহংস সকলের অভ্যুদয় হয়, তবে তোমরা কি চাও?—সংস্কারকগণের ধর্ম্ম চাও, না পুতুলপূজা চাও? আমি ইহার একটা উত্তর চাই। যদি পুতুলপূজা দ্বারা এইরূপ

পুতুলপূজা

রামকৃষ্ণ পরমহংস সকল সৃষ্টি করিতে পার, তবে আরও হাজার পুতুলের পূজা কর। সিদ্ধিদাতা তোমাদিগকে সিদ্ধি প্রদান করুন। যে কোন উপায়ে হউক, এইরূপ মহাত্মাসমূহের সৃষ্টি কর। আর পুতুলপূজাকে লোকে গালি দেয়! কেন? তাহা কেহই জানে না। কারণ, কয়েক সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে জনৈক য়াহুদী-বংশসম্ভূত ব্যক্তি পুতুলপূজাকে নিন্দা করিয়াছিলেন? অর্থাৎ তিনি নিজের পুতুল ছাড়া আর সকলের পুতুলকে নিন্দা করিয়াছিলেন। সেই য়াহুদী বলিয়াছিলেন, যদি কোন বিশেষ ভাব-প্রকাশক বা পরমসুন্দর মূর্ত্তি দ্বারা ঈশ্বরের ভাব প্রকাশ করা হয়, তবে তাহা ভয়ানক দোষ, উহা পাপ। কিন্তু যদি একটি সিন্দুকের দুইধারে দুইজন দেবদূত এবং উপরে মেঘ এইরূপে ঈশ্বরের ভাবপ্রকাশ করা হয়, তবে তাহা মহা পবিত্র। যদি ঈশ্বর ঘুঘুর রূপ ধারণ করিয়া আসেন, তবে তাহা মহা পবিত্র, কিন্তু যদি তিনি গাভীরূপ ধারণ করিয়া আসেন, তবে তাহা হিদেন্‌দের কুসংস্কার! উহা অধঃপাতে যাক।

দুনিয়ার ভাবই এই। সেইজন্যই কবি বলিয়াছেন, 'আমরা মর্ত্ত্যগণ কি নির্ব্বোধ!' এইজন্য পরস্পরকে পরস্পরের চক্ষে দেখা ও বিচার করা মহা কঠিন ব্যাপার। আর ইহাই মনুষ্যসমাজের উন্নতির এক মহান্ অন্তরায়স্বরূপ। ইহাই ঈর্ষা ও ঘৃণা, এবং বিবাদ ও দ্বন্দ্বের মূল। বালকগণ, অকালপক্ক শিশুগণ, তোমরা মাদ্রাজের বাহিরে কখনও যাও নাই; তোমরা সহস্র সহস্র প্রাচীন সংস্কার-নিয়ন্ত্রিত ত্রিশকোটি লোকের উপর আইন চালাইতে চাও—তোমাদের কি লজ্জা হয় না? এরূপ

আমরা অপরের দোষদর্শন করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে যাই, নিজেদের দোষ দেখি না

বিষম দোষ হইতে বিরত হও এবং অগ্রে আপনারা শিক্ষা কর। শ্রদ্ধাহীন বালকগণ, তোমরা কেবল কাগজে গোটা কতক লাইন আঁচড়াইতে পার আর কোন আহাম্মককে ধরিয়া উহা ছাপাইয়া দিতে পার বলিয়া আপনাদিগকে জগতের শিক্ষক, আপনাদিগকে ভারতের মুখপাত্র বলিয়া মনে করিতেছ? তাই না কি?

এই কারণে আমি মাদ্রাজের সংস্কারকগণকে এইটুকু বলিতে চাই যে, আমার তাঁহাদের প্রতি খুব শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আছে। তাঁহাদের বিশাল হৃদয়, তাঁহাদের স্বদেশপ্রীতি, দরিদ্র ও অত্যাচারপীড়িত জনগণের প্রতি তাঁহাদের ভালবাসার জন্য আমি তাঁহাদিগকে ভালবাসি। কিন্তু ভাই যেমন ভাইকে ভালবাসে অথচ তাহার দোষ দেখাইয়া দেয়, সেইরূপ ভাবে আমি তাঁহাদিগকে বলিতেছি—তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী ঠিক নহে। শতবর্ষ ধরিয়া এই প্রণালীতে কার্য্য করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। এক্ষণে আমাদিগকে অন্য কোন নূতন উপায়ে কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এইটুকুই আমার বক্তব্য।

সংস্কারকগণকে নূতন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে

ভারতে কি কখন সংস্কারকের অভাব হইয়াছিল? তোমরা ভারতের ইতিহাস পড়িয়াছ ত? রামানুজ কি ছিলেন? শঙ্কর? নানক? চৈতন্য? কবীর? দাদূ? এই যে বড় বড় ধর্ম্মাচার্য্যগণ ভারতগগনে অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রপ্রায় একে একে উদিত হইয়া আবার অস্ত গিয়াছেন, ইঁহারা কি ছিলেন? রামানুজের হৃদয় কি নীচ জাতির জন্য কাঁদে নাই? তিনি কি

সারাজীবন এমন কি পারিয়াদিগকে * পর্য্যন্ত নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন নাই? তিনি কি মুসলমানকে পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন নাই? নানক কি হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির সহিত সমানভাবে পরামর্শ ও সমাজের নূতন অবস্থা আনয়নে চেষ্টা করেন নাই? তাঁহারা সকলেই চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের কার্য্য এখনও চলিতেছে। তবে প্রভেদ এই;—তাঁহারা আধুনিক সংস্কারকগণের ন্যায় চীৎকার ও বাহ্যাড়ম্বর করিতেন না। আধুনিক সংস্কারকগণের ন্যায় তাঁহাদের মুখ হইতে কখন অভিশাপ উচ্চারিত হইত না, তাঁহাদের মুখ হইতে কেবল আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইত। তাঁহারা কখনও সমাজের উপর দোষারোপ করেন নাই। তাঁহারা লোকদিগকে বলিতেন, হিন্দু জাতিকে চিরকাল ধরিয়া ক্রমাগত উন্নতি করিতে হইবে। তাঁহারা অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতেন, হিন্দুগণ, তোমরা এতদিন যাহা করিয়াছ, তাহা ভালই হইয়াছে; কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ, আমাদিগকে আরও ভাল কাজ করিতে হইবে। তাঁহারা একথা বলেন নাই যে, তোমরা এতদিন মন্দ ছিলে, এক্ষণে তোমাদিগকে ভাল হইতে হইবে। তাঁহারা বলিতেন, তোমরা ভালই ছিলে, কিন্তু এক্ষণে তোমাদিগকে আরও ভাল হইতে হইবে।

প্রাচীন ও আধুনিক সংস্কারকে প্রভেদ

এই দুই প্রকার কথার ভিতর বিশেষ পার্থক্য আছে। আমাদিগকে আমাদের প্রকৃতি অনুযায়ী উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। বৈদেশিক সমাজসকল

জাতীয়ভাবে সমাজসংস্কার

* দাক্ষিণাত্যবাসী চণ্ডালবৎ নীচ জাতিবিশেষ।

আমাদিগকে জোর করিয়া যে প্রণালীতে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তদনুযায়ী কার্য্য করিতে চেষ্টা করা বৃথা। উহা অসম্ভব। আমাদিগকে যে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অপর জাতির ছায় গড়িতে পারা অসম্ভব, তজ্জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমি অপর জাতির সামাজিক প্রথার নিন্দা করিতেছি না। তাহাদের পক্ষে উহা ভাল হইলেও আমাদের পক্ষে নহে। তাহাদের পক্ষে যাহা অমৃত, আমাদের পক্ষে তাহা বিষবৎ হইতে পারে। প্রথমে এইটিই শিক্ষা করিতে হইবে। অপরবিধ বিজ্ঞান, অন্যবিধ পরম্পরাগত সংস্কার ও অন্যবিধ আচারে গঠিত হওয়াতে তাহাদের আধুনিক সামাজিক প্রথা-সকল একরূপ দাঁড়াইয়াছে। আমাদের পশ্চাতে আবার অন্যবিধ পরম্পরাগত সংস্কার এবং সহস্র সহস্র বর্ষের কর্ম্ম রহিয়াছে। সুতরাং আমরা স্বভাবতঃই আমাদের সংস্কারানুযায়ী চলিতে পারি—আর আমাদিগকে সেইরূপই করিতে হইবে।

তবে আমি কি প্রণালীতে কার্য্য করিব? আমি প্রাচীন মহান্ আচার্য্যগণের উপদেশ অনুসরণ করিতে চাই। আমি তাঁহাদের কার্য্যের সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি ও তাঁহারা কি প্রণালীতে কার্য্য করিয়াছিলেন, ঈশ্বরেচ্ছায় তাহা আবিষ্কার করিয়াছি। সেই মহাপুরুষগণ সমাজ-সমূহ সংগঠন করিয়াছিলেন। তাঁহারা উহাতে বিশেষ ভাবে শক্তি, পবিত্রতা ও জীবনীশক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা অতি অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিলেন। আমাদিগকেও অতি অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য করিতে হইবে। এক্ষণে অবস্থাচক্রের কিছু পরিবর্ত্তন

আমার কার্য্যপ্রণালী দেশকালোপযোগী যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া প্রাচীন আচার্য্যগণের কার্য্যপ্রণালী অনুসরণ

হইয়াছে, তজ্জন্য কার্য্যপ্রণালীর অতি সামান্য পরিবর্ত্তন করিতে হইবে মাত্র, আর কিছু নয়।

আমি দেখিতেছি, প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন, প্রত্যেক জাতিরও তেমন এক বিশেষ জীবনোদ্দেশ্য থাকে। উহাই তাহার জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ। উহাই যেন তাহার জীবনসঙ্গীতের প্রধান সুর, অন্যান্য সুর যেন সেই প্রধান সুরের সহিত সঙ্গত হইয়া ঐক্যতান উৎপাদন করিতেছে। কোন দেশের—যথা ইংলণ্ডের, জীবনীশক্তি রাজনৈতিক অধিকার। কলাবিদ্যার উন্নতিই হয় ত অপর কোন জাতির জীবনের মূল লক্ষ্য। ভারতে কিন্তু ধর্ম্মজীবনই জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ, উহাই যেন জাতীয় জীবনরূপ সঙ্গীতের প্রধান সুর। আর যদি কোন জাতি তাহার এই স্বাভাবিক জীবনীশক্তি, শত শত শতাব্দী ধরিয়া উহার যে দিকে বিশেষ গতি হইয়াছে, তাহাকে পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করে এবং যদি সে চেষ্টায় কৃতকার্য্য হয়, তবে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। সুতরাং যদি তোমরা ধর্ম্মকে কেন্দ্র না করিয়া, ধর্ম্মকেই জাতীয় জীবনের জীবনীশক্তি না করিয়া রাজনীতি, সমাজনীতি বা অপর কিছুকে উহার স্থলে বসাও, তবে তাহার ফল হইবে এই যে, তোমরা একেবারে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। যাহাতে এরূপ না ঘটে, তজ্জন্য তোমাদিগকে তোমাদের জীবনীশক্তিস্বরূপ ধর্ম্মের মধ্য দিয়া সকল কার্য্য করিতে হইবে। তোমাদের স্নায়ুতন্ত্রীসমূহ তোমাদের ধর্ম্মরূপ মেরুদণ্ডে দৃঢ়সম্বদ্ধ হইয়া তাহাদের সুর বাজাইতে থাকুক।

ধর্ম্মই ভারতের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপ

আমি দেখিয়াছি, সামাজিক জীবনের উপর ধর্ম্ম কিরূপ কার্য্য

করিবে,— ইহা না দেখাইয়া আমি আমেরিকায় ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারিতাম না। বেদান্তের দ্বারা কিরূপ অদ্ভুত রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন হইবে, ইহা না দেখাইয়া আমি ইংলণ্ডে ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারিতাম না। এইরূপে ভারতে সমাজসংস্কার প্রচার করিতে হইলে দেখাইতে হইবে, সেই নূতন সামাজিক প্রথা দ্বারা আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করিবার কি বিশেষ সাহায্য হইবে। রাজনীতি প্রচার করিতে হইলেও দেখাইতে হইবে, আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা আধ্যাত্মিক উন্নতি তদ্দ্বারা কতদূর পরিমাণে অধিক সিদ্ধ হইবে।

বিভিন্ন জাতির জাতীয় মূল-উদ্দেশ্য অনুসারে কার্য্য প্রণালীর তারতম্য

প্রত্যেক মানব এই জগতে আপন আপন পথ বাছিয়া লয়। প্রত্যেক জাতিরও তদ্রূপ। আমরা শত শত যুগ পূর্ব্বে আপনাদের পথ বাছিয়া লইয়াছি, এখন আমাদিগকে তদনুসারে চলিতেই হইবে। আর আমাদের নির্ব্বাচনকে বিশেষ মন্দ বলিতে পারা যায় না। জড়ের পরিবর্ত্তে চৈতন্য, মানুষের পরিবর্ত্তে ঈশ্বরচিন্তা করাকে কি বিশেষ মন্দ পথ বলিতে পার? তোমাদের মধ্যে সেই পরলোকে দৃঢ় বিশ্বাস, ইহলোকের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা, প্রবল ত্যাগশক্তি এবং ঈশ্বরে ও অবিনাশী আত্মায় দৃঢ় বিশ্বাস বিদ্যমান। কই, ইহা ত্যাগ কর দেখি? তোমরা কখনই ইহা ত্যাগ করিতে পার না। তোমরা জড়বাদী হইয়া কিছুদিন জড়বাদের কথা বলিয়া আমায় ধোঁকা লাগাইবার চেষ্টা করিতে পার কিন্তু আমি তোমাদের স্বভাব জানি। যাই তোমাদিগকে ধর্ম্মসম্বন্ধে একটু ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিব, অমনি তোমরা পরম আস্তিক হইলে। স্বভাব বদলাইবে কিরূপে? তোমরা যে ধর্ম্মগতপ্রাণ।

ধর্ম্মকে আমাদের জাতীয়জীবনের মেরুদণ্ড নির্ব্বাচন—কি মন্দ হইয়াছে?

এই কারণে ভারতে যে কোন প্রকার সংস্কার বা উন্নতি করিবার চেষ্টা করা হউক, প্রথমতঃ ধর্ম্মপ্রচার আবশ্যক। ভারতকে সামাজিক বা রাজনৈতিক ভাবের বন্যায় ভাসাইতে গেলে প্রথমে এদেশকে আধ্যাত্মিক ভাবের বন্যায় ভাসাইতে হইবে। প্রথমেই এইটি করা আবশ্যক।

প্রথম কার্য্য— ভারতে ধর্ম্মপ্রচার

প্রথমতঃই আমাদিগকে এই কার্য্যে মনোযোগী হইতে হইবে যে, আমাদের উপনিষদে, আমাদের পুরাণে, আমাদের অন্যান্য শাস্ত্রে যে সকল অপূর্ব্ব সত্য নিহিত আছে, তাহা ঐ সকল গ্রন্থ হইতে বাহির করিয়া, মঠসমূহ হইতে, অরণ্য হইতে, সম্প্রদায়বিশেষের অধিকার হইতে বাহির করিয়া সমগ্র ভারতভূমিতে ছড়াইতে হইবে, —যেন ঐ সকল শাস্ত্রনিহিত মহাবাক্যের ধ্বনি উত্তর হইতে দক্ষিণ, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম, হিমালয় হইতে কুমারিকা, সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত ছুটিতে থাকে। সকলকেই এই সকল শাস্ত্রনিহিত উপদেশ শুনাইতে হইবে; কারণ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, প্রথমে শ্রবণ, পরে মনন, তৎপরে নিদিধ্যাসন করা কর্ত্তব্য। প্রথমে লোকে শাস্ত্রবাক্যসকল শুনুক আর যে কোন ব্যক্তি লোককে তাহার নিজ শাস্ত্রের মহান্ সত্যসকল শুনাইতে সাহায্য করে, সে আজ এমন এক কর্ম্ম করিতেছে, অন্য কোন কর্ম্ম যাহার সদৃশ হইতে পারে না। মনু বলিয়াছেন, 'এই কলিযুগে একটি কর্ম্ম মানুষের করিবার আছে। আজকাল আর যজ্ঞ ও কঠোর তপস্যায় কোন ফল হয় না। এখন দানই একমাত্র কর্ম্ম।'*

---

* তপঃ পরং কৃতে যুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে॥
মনুসংহিতা—১ম অঃ, ৮৬ শ্লোক

দানের মধ্যে ধর্ম্মদান, আধ্যাত্মিক জ্ঞান দানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। দ্বিতীয় বিদ্যাদান, তৃতীয় প্রাণদান, চতুর্থ অন্নদান।

'দানমেকং কলৌ যুগে'

এই অপূর্ব্ব দানশীল হিন্দুজাতির দিকে দৃষ্টিপাত কর! এই দরিদ্র, অতি দরিদ্র দেশে লোকে কি পরিমাণ দান করে, লক্ষ্য কর। এখানে লোকে এরূপ আতিথেয় যে, যে কোন ব্যক্তি বিনাসম্বলে ভারতের উত্তর প্রান্ত হইতে দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আসিতে পারে। লোকে পরমাত্মীয়কে যেমন যত্নের সহিত নানা উপচারের দ্বারা সেবা করে, তদ্রূপ তিনি যেখানেই যাইবেন, লোকে সেই স্থানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তুসমূহের দ্বারা তাঁহার সেবা করিবে। এখানে কোথাও যতক্ষণ এক টুকরাও রুটি থাকিবে, ততক্ষণ কোন ভিক্ষুককেই না খাইয়া মরিতে হইবে না।

এই দানশীল দেশে আমাদিগকে প্রথম দুই প্রকার দানে সাহসপূর্ব্বক অগ্রসর হইতে হইবে। প্রথমতঃ আধ্যাত্মিক জ্ঞানবিস্তার। শুধু আবার এই জ্ঞানদান ভারতেই আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না—সমগ্র জগতে উহার বিস্তার করিতে হইবে। ইহাই বরাবর হইয়া আসিয়াছে।

ভারতেতর দেশে ধর্ম্মপ্রচার

যাঁহারা তোমাদিগকে বলেন, ভারতীয় চিন্তারাশি কখনও ভারতের বাহিরে যায় নাই, যাঁহারা তোমাদিগকে বলেন ভারতেতর দেশে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য আমিই প্রথম সন্ন্যাসী গিয়াছি, তাঁহারা তাঁহাদের নিজ জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে অভিজ্ঞ নহেন। এই ব্যাপার অনেকবার ঘটিয়াছে। যখনই জগতের প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই এই আধ্যাত্মিকতার চিত্তপ্রস্রবণ হইতে বন্যা যাইয়া

জগৎকে প্লাবিত করিয়াছে। অগণ্য সৈন্যদল লইয়া উচ্চরবে ভেরী বাজাইতে বাজাইতে রাজনৈতিক জ্ঞান বিস্তার করা যাইতে পারে; লৌকিক জ্ঞান বা সামাজিক জ্ঞান বিস্তার করিতে হইলেও তরবারি বা কামানের সাহায্যে উহা হইতে পারে; কিন্তু শিশির যেমন অশ্রুত ও অদৃশ্যভাবে পড়িলেও রাশি রাশি গোলাপকলিকে প্রস্ফুটিত করে, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক জ্ঞানদান নীরবেই, সকলের অজ্ঞাতভাবে হওয়াই সম্ভব। ভারত বার বার জগৎকে এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানরূপ উপহার দান করিয়াছে। যখনই কোন প্রবল দিগ্বিজয়ী জাতি উঠিয়া জগতের বিভিন্ন জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছে, যখনই তাহারা রাস্তাঘাট প্রস্তুত করিয়া দিয়া বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত সুগম করিয়া দিয়াছে, অমনি ভারত উঠিয়া সমগ্র জগতের উন্নতিকল্পে তাহার যাহা দিবার আছে, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জ্ঞান দিয়াছে। বুদ্ধদেব জন্মাইবার অনেকদিন পূর্ব্ব হইতেই ইহা ঘটিয়াছে। চীন, এসিয়ামাইনর ও মালয়দ্বীপপুঞ্জের মধ্যভাগে এখনও তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান। যখন সেই প্রবল গ্রীক দিগ্বিজয়ী তদানীন্তন পরিচিত জগতের সমগ্র অংশ একত্র গ্রথিত করিয়াছিলেন, তখনও এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল—তখনও ভারতীয় ধর্ম্ম সেই সকল স্থানে ছুটিয়াছিল। আর পাশ্চাত্যদেশ যে সভ্যতা লইয়া এখন গর্ব্ব করিয়া থাকে, তাহা সেই মহাবন্যার অবশিষ্ট চিহ্ন মাত্র। এক্ষণে আবার সেই সুযোগ উপস্থিত। ইংলণ্ডের শক্তিতে সমগ্র জগতের জাতিসমূহ একত্র গ্রথিত হইয়াছে, এরূপ আর পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। ইংরাজদের রাস্তা ও অন্যান্য যাতায়াত উপায়সকল জগতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত

বিস্তৃত হইয়াছে। আজ ইংরাজ-প্রতিভায় জগৎ অপূর্ব্বভাবে এক-সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। আজকাল যেরূপ বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্যকেন্দ্র-সমূহ স্থাপিত হইয়াছে, মানবজাতির ইতিহাসে পূর্ব্বে আর কখনও এরূপ হয় নাই। সুতরাং এই সুযোগে ভারত জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাত-সারে কালবিলম্ব না করিয়া উঠিয়া জগৎকে তাহার আধ্যাত্মিকতার উপহার দান করিয়াছে। এখন এই সকল পথ অবলম্বন করিয়া এই ভারতীয় ভাবরাশি সমগ্র জগতে বিস্তৃত হইতে থাকিবে। আমি যে আমেরিকায় গিয়াছিলাম, তাহা আমার ইচ্ছায় বা তোমাদের ইচ্ছায় হয় নাই। কিন্তু ভারতের ঈশ্বর, যিনি ইহার অদৃষ্ট নিয়মিত করিতে-ছেন, তিনিই আমায় পাঠাইয়াছেন এবং তিনিই এইরূপ শত শত ব্যক্তিকে জগতের সকল জাতির নিকট প্রেরণ করিবেন। পার্থিব কোন শক্তিই উহার প্রতিরোধে সমর্থ নহে। সুতরাং তোমাদিগকে ভারতেতর দেশেও ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে যাইতে হইবে। তোমাদের ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তোমাদিগকে ভারতের বাহিরে যাইতে হইবে, জগতের সকল জাতির নিকট, সকল ব্যক্তির নিকট উহা প্রচার করিতে হইবে। প্রথমেই এই ধর্ম্মপ্রচার আবশ্যক।

সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাদান

ধর্ম্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই লৌকিক বিদ্যা ও অন্যান্য বিদ্যা যাহা কিছু আবশ্যক তাহা আপনিই আসিবে। কিন্তু যদি ধর্ম্মকে বাদ দিয়া লৌকিক জ্ঞান বিস্তারের চেষ্টা কর, তবে তোমাদিগকে স্পষ্টই বলিতেছি, ভারতে তোমাদের এ চেষ্টা বৃথা হইবে—লোকের হৃদয়ে উহা প্রভাব বিস্তার করিবে না। এমন কি, এত বড় যে বৌদ্ধধর্ম্ম, তাহাও কতকটা এই কারণেই এখানে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। যদি ইহা

ফলপ্রসবে অকৃতকার্য্য হইয়া থাকে, তবে তুমি আমি কি করিতে পারি ?

হে বন্ধুগণ, এই হেতু আমার সঙ্কল্প এই যে, ভারতে আমি কতকগুলি শিক্ষালয় স্থাপন করিব—তাহাতে আমাদের যুবকগণ ভারতে ও ভারতবহির্ভূত দেশে আমাদের শাস্ত্রনিহিত সত্যসকলের প্রচারকার্য্যে শিক্ষিত হইবে। মানুষ চাই, মানুষ চাই ; আর সব হইয়া যাইবে। বীর্য্যবান্, সম্পূর্ণ অকপট, তেজস্বী, বিশ্বাসী যুবকগণের আবশ্যক। এইরূপ একশত যুবক হইলে সমগ্র জগতের ভাবস্রোত ফিরাইয়া দেওয়া যায়। অন্যান্য সকল জিনিসের অপেক্ষা ইচ্ছাশক্তির প্রভাব অধিক। ইচ্ছাশক্তির সমক্ষে আর সমস্তই নিঃশক্তি হইয়া যাইবে, কারণ, ঐ ইচ্ছাশক্তি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিতেছে। বিশুদ্ধ ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি—সর্ব্বশক্তিমান্। তোমরা কি ইহা বিশ্বাস কর না ? সকলের নিকট তোমাদের ধর্ম্মের মহান্ সত্যসমূহ প্রচার কর, প্রচার কর। জগৎ এই সকল সত্যের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

আচার্য্য-শিক্ষালয়

শত শত শতাব্দী ধরিয়া লোককে মানবের হীনত্বজ্ঞাপক মতবাদসমূহ শিখান হইয়াছে ; তাহাদিগকে শিখান হইয়াছে—তাহারা কিছুই নহে। সমগ্র জগতের সর্ব্বসাধারণকে চিরকাল বলা হইয়াছে—তোমরা মানুষ নও। শত শত শতাব্দী ধরিয়া তাহাদিগকে এইরূপে ভয় দেখান হইয়াছে—ক্রমশঃ তাহারা সত্যসত্যই পশুপদবীতে দাঁড়াইয়াছে। তাহাদিগকে কখন আত্মতত্ত্ব শুনিতে দেওয়া হয়

আত্মতত্ত্ব শ্রবণে হীন-ব্যক্তির মধ্যে শক্তির বিকাশ হইবে

নাই। তাহারা এক্ষণে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করুক—তাহারা জানুক যে, তাহাদের মধ্যে অতি নিম্নতর ব্যক্তির ভিতর পর্য্যন্ত আত্মা রহিয়াছেন—যাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, যাঁহাকে তরবারি ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না, যিনি অবিনাশী, অনাদি, অনন্ত, শুদ্ধস্বরূপ, সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বব্যাপী।

তাহারা নিজেদের প্রতি বিশ্বাসসম্পন্ন হউক। ইংরাজ জাতি ও তোমাদের মধ্যে কিসে এত প্রভেদ? তাহারা তাহাদের ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব, প্রবল কর্ত্তব্যজ্ঞান ইত্যাদি যাহাই বলুক না কেন, আমি জানিতে পারিয়াছি, কোন্ বিষয়ে উভয় জাতির মধ্যে প্রভেদ। প্রভেদ এই, ইংরাজ নিজের উপর বিশ্বাসী, তোমরা নহ। সে বিশ্বাস করে, সে যখন ইংরাজ, তখন সে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। এই বিশ্বাসবলে তাহার অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠেন, সে তখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। তোমাদিগকে লোকে বলিয়া আসিতেছে ও শিক্ষা দিতেছে যে, তোমাদের কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই—কাজেই তোমরা অকর্ম্মণ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছ। অতএব আপনাতে বিশ্বাসী হও।

ইংরাজ ও আমাদের প্রভেদ কিসে?—ইংরাজ বিশ্বাসী, আমরা অবিশ্বাসী

আমাদের এখন আবশ্যক—শক্তিসঞ্চার। আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি। সেইজন্যই আমাদের মধ্যে এই সকল গুপ্তবিদ্যা, রহস্যবিদ্যা, ভুতুড়েকাণ্ড সব আসিয়াছে। উহাদের মধ্যে অনেক মহান্ সত্য থাকিতে পারে, কিন্তু ঐগুলিতে আমাদিগকে প্রায়

অগ্রসর করে মাত্র, কিন্তু হৃদয়দ্বার দিয়াই মহাশক্তির প্রেরণা আসিয়া থাকে। প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে,—জগতের সকল রহস্যই প্রেমিকের নিকট উন্মুক্ত। হে ভাবী সংস্কারকগণ, হে ভাবী স্বদেশ-হিতৈষিগণ! তোমরা হৃদয়বান্ হও, প্রেমিক হও। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধরগণ পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ যে, কোটি কোটি লোক অনাহারে মরিতেছে এবং কোটি কোটি ব্যক্তি শত শত শতাব্দী ধরিয়া অর্দ্ধাশনে কাটাইতেছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারতগগনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে? তোমরা কি এই সকল ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ? এই ভাবনায় নিদ্রা কি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে—তোমাদের হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সহিত কি এই ভাবনা মিশিয়া গিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে? দেশের দুর্দ্দশার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে এবং ঐচিন্তায় বিভোর হইয়া তোমরা কি তোমাদের নামযশ, স্ত্রীপুত্র, বিষয়সম্পত্তি, এমন কি, শরীর পর্য্যন্ত ভুলিয়াছ? তোমাদের এরূপ হইয়াছে কি? যদি হইয়া থাকে, তবে বুঝিও, তোমরা প্রথম সোপানে—স্বদেশহিতৈষী হইবার প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ। তোমরা অনেকেই জান, আমেরিকায় ধর্ম্মমহাসভা হইয়াছিল বলিয়া আমি তথায় যাই নাই, দেশের জনসাধারণের

স্বদেশহিতৈষী হইতে গেলে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন—হৃদয়বত্তা, প্রতীকারের উপায় নির্দ্ধারণ ও দৃঢ়তা

দুর্দ্দশা প্রতীকারের জন্য আমার ঘাড়ে যেন একটা ভূত চাপিয়াছিল। আমি অনেক বর্ষ ধরিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে ঘুরিয়াছি, কিন্তু আমার স্বদেশবাসীর জন্য কার্য্য করিবার কোন সুযোগ পাই নাই। সেই জন্যই আমি আমেরিকায় গিয়াছিলাম। তখন তোমাদের মধ্যে যাহারা আমাকে জানিতে, তাহারা অবশ্য একথা জান। ধর্ম্মমহাসভা ফভা হল না হল কে তা নিয়ে মাথা ঘামায়? এখানে আমার নিজের রক্তমাংসরূপ জনসাধারণ দিন দিন ডুবিতেছে, তাহাদের খবর নেয় কে? ইহাই স্বদেশহিতৈষী হইবার প্রথম সোপান।

মানিলাম, তোমরা দেশের দুর্দ্দশার কথা প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই দুর্দ্দশা প্রতীকারের কোন (২) উপায় স্থির করিয়াছ কি? কেবল বৃথাবাক্যে শক্তিক্ষয় না করিয়া কোন কার্য্যকর পথ বাহির করিয়াছ কি? লোককে গালি না দিয়া তাহাদের কোন যথার্থ সাহায্য করিতে পার কি? স্বদেশবাসীর এই জীবন্মৃত অবস্থা অপনোদনের জন্য তাহাদের এই ঘোর দুঃখে কিছু সান্ত্বনাবাক্য শুনাইতে পার কি?—কিন্তু ইহাতেও হইল না। তোমরা কি পর্ব্বতপ্রায় বিঘ্নবাধাকে তুচ্ছ করিয়া কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছ? যদি সমগ্র জগৎ তরবারিহস্তে তোমাদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়, তথাপি তোমরা যাহা সত্য ঠাওরাইয়াছ, তাহাই করিয়া যাইতে পার? যদি তোমাদের স্ত্রীপুত্র তোমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, যদি তোমাদের ধন মান সব যায়, তথাপি কি তোমরা উহা ধরিয়া থাকিতে পার? রাজা ভর্ত্তৃহরি যেমন বলিয়াছেন,—"নীতিনিপুণ ব্যক্তিগণ নিন্দাই করুন বা স্তবই করুন, লক্ষ্মীদেবী গৃহে আসুন

বা যথা ইচ্ছা চলিয়া যান, মৃত্যু আজই হউক বা যুগান্তরেই হউক, তিনি ধীর, যিনি সত্য হইতে এক বিন্দুও বিচলিত না হন।"* সেইরূপ নিজ পথ হইতে বিচলিত না হইয়া তোমরা কি তোমাদের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে পার? তোমাদের কি এইরূপ (৩) দৃঢ়তা আছে? যদি এই তিনটি জিনিস তোমাদের থাকে, তবে তোমরা প্রত্যেকেই অলৌকিক কার্য্য সাধন করিতে পার। তোমাদের সংবাদপত্রে লিখিবার অথবা বক্তৃতা দিয়া বেড়াইবার প্রয়োজন হইবে না। তোমাদের মুখ এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতিঃ ধারণ করিবে। তোমরা যদি পর্ব্বতের গুহায় যাইয়া বাস কর, তথাপি তোমাদের চিন্তারাশি ঐ পর্ব্বতপ্রাচীর পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া বাহির হইবে। হয়ত শত শত বর্ষ ধরিয়া উহা কোন আশ্রয় না পাইয়া সূক্ষ্মাকারে সমগ্র জগতে ভ্রমণ করিবে। কিন্তু একদিন না একদিন উহা কোন না কোন মস্তিষ্ক আশ্রয় করিবেই করিবে। তখন সেই চিন্তানুযায়ী কার্য্য হইতে থাকিবে। অকপটতা, সাধু অভিসন্ধি ও চিন্তার শক্তি অসামান্য।

জাতীয় অর্ণবপোত

আর এক কথা—আমার আশঙ্কা হইতেছে, তোমাদের বিলম্ব হইতেছে—হে আমার স্বদেশবাসিগণ, হে আমার বন্ধুগণ, হে আমার সন্তানগণ, এই জাতীয় অর্ণব-পোত লক্ষ লক্ষ মানবাত্মাকে জীবন-নদীতে পারাপার

* নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্।
অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ ॥ ৭৪ ॥ নীতিশতক।

করিতেছে। ইহার সহায়তায় অনেক শতাব্দী ধরিয়া লক্ষ লক্ষ মানব জীবননদীর অপর পারে অমৃতধামে নীত হইয়াছে। আজ হয়ত তোমাদের নিজ দোষেই উহাতে দুই একটা ছিদ্র হইয়াছে, উহা একটু খারাপও হইয়া গিয়াছে। তোমরা কি এখন উহার নিন্দা করিবে? জগতের সকল জিনিস অপেক্ষা যে জিনিস আমাদের অধিক কাজে আসিয়াছে, এখন কি তাহার উপর অভিশাপ বর্ষণ করা উচিত? যদি এই জাতীয় অর্ণবপোতে—আমাদের এই সমাজে—ছিদ্র হইয়া থাকে, আমরা ত এই সমাজেরই সন্তান। আমাদিগকেই গিয়া উহা বন্ধ করিতে হইবে। যদি আমরা তাহা করিতে না পারি, তবে আনন্দের সহিত আমাদের হৃদয়ের শোণিত দিয়াও উহার চেষ্টা করিতে হইবে, অন্যথা মরিতে হইবে। আমরা আমাদের মস্তিষ্করূপ কাষ্ঠখণ্ডসমূহ দ্বারা ঐ অর্ণবপোতের ছিদ্রসকল বন্ধ করিব, কিন্তু উহাকে কখনই নিন্দা করিব না। এই সমাজের বিরুদ্ধে একটা কর্কশ কথা বলিও না। আমি ইহার অতীত মহত্ত্বের জন্য উহাকে ভালবাসি। আমি তোমাদের সকলকে ভালবাসি, কারণ, তোমরা দেবগণের বংশধর, তোমরা মহা-মহিমান্বিত পূর্ব্বপুরুষগণের সন্তান। তোমাদের সর্ব্বপ্রকারে কল্যাণ হউক। তোমাদিগকে নিন্দা করিব বা গালি দিব?—কখনই নয়। হে আমার সন্তানগণ, আমি তোমাদের নিকট আমার সমুদয় উদ্দেশ্য বলিতে আসিয়াছি। যদি তোমরা শুন, আমি তোমাদের সঙ্গে কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি। যদি না শুন, এমন কি, আমাকে পদাঘাত করিয়া ভারতভূমি হইতে তাড়াইয়া দাও, তথাপি আমি তোমাদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিব—আমরা

সকলেডুবিতেছি। এই কারণেই আমি তোমাদের ভিতর তোমাদেরই একজন হইয়া তোমাদের সঙ্গে মিশিতে আসিয়াছি। আর যদি আমাদিগকে ডুবিতে হয়, তবে আমরা সকলে যেন এক সঙ্গে ডুবি, কিন্তু কাহারও প্রতি যেন কটূক্তি প্রয়োগ না করি।

ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্য্যকারিতা

আমাদের জাতি ও ধর্ম্মের অভিধানস্বরূপ একটি শব্দ খুব চলিত হইয়া পড়িয়াছে। আমি 'হিন্দু' শব্দটি লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিতেছি। বেদান্তধর্ম্ম বলিতে আমি কি লক্ষ্য করিয়া থাকি, তাহা বুঝাইবার জন্য উক্ত শব্দটির অর্থ ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। প্রাচীন পারসীকগণ সিন্ধুনদকে 'হিন্দু' বলিতেন। সংস্কৃত ভাষায় যেখানে 'স' আছে, প্রাচীন পারসীক ভাষায় তাহাই 'হ' রূপে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে সিন্ধু হইতে 'হিন্দু' হইল। আর তোমরা সকলেই জান, গ্রীকগণ 'স' উচ্চারণ করিতে পারিত না; সুতরাং তাহারা একেবারে 'স'টিকে উড়াইয়া দিল—এইরূপে আমরা 'ইণ্ডিয়ান' নামে পরিচিত হইলাম। এক্ষণে কথা এই, প্রাচীনকালে এ শব্দের অর্থ যাহাই থাকুক, উহা সিন্ধুনদের পরপারবাসিগণকেই বুঝাক বা যাহাই হউক, বর্ত্তমানকালে উক্ত শব্দের আর কোন সার্থকতা নাই; কারণ, এখন আর সিন্ধুনদের পরপারবাসী সকলে একধর্ম্মাবলম্বী নহে। এখানে এখন আসল হিন্দু, মুসলমান, পারসী, খ্রীষ্টিয়ান এবং অল্পসংখ্যক বৌদ্ধ ও জৈনও বাস করিতেছেন। 'হিন্দু' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলে ইঁহাদের সকলকেই হিন্দু বলিতে হয়, কিন্তু

হিন্দু কে?

ধর্ম্ম হিসাবে ইঁহাদের সকলকে হিন্দু বলা চলে না। আর আমাদের ধর্ম্ম যেন নানা ধর্ম্মমত, নানা ভাব এবং নানাবিধ অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপের সমষ্টিস্বরূপ—এই সব একসঙ্গে রহিয়াছে কিন্তু ইহাদের একটা সাধারণ নাম নাই, ইহাদের একটা মণ্ডলী-বন্ধন নাই, ইহাদের একটা চার্চ্চ নাই। এই কারণে আমাদের ধর্ম্মের একটি সাধারণ বা সর্ব্ববাদিসম্মত নাম দেওয়া বড় কঠিন। বোধ হয়, এই একটিমাত্র বিষয়ে আমাদের সকল সম্প্রদায় একমত যে, আমরা সকলেই আমাদের শাস্ত্র—বেদে বিশ্বাসী। এটি বোধ হয় নিশ্চিত যে, যে ব্যক্তি বেদের সর্ব্বোচ্চ প্রামাণ্য অস্বীকার করে, তাহার নিজেকে হিন্দু বলিবার অধিকার নাই।

তোমরা সকলেই জান, এই বেদসমূহ দুই ভাগে বিভক্ত—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ডে নানাবিধ যাগযজ্ঞ ও অনুষ্ঠান-পদ্ধতি আছে—উহাদের মধ্যে অধিকাংশই আজকাল চলিত নাই।

হিন্দু ও বৈদান্তিক

জ্ঞানকাণ্ডে বেদের আধ্যাত্মিক উপদেশসমূহ লিপিবদ্ধ—উহা 'উপনিষদ্' বা 'বেদান্ত' নামে পরিচিত। আর দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বা অদ্বৈতবাদী সকল আচার্য্য ও দার্শনিকগণই উহাকেই উচ্চতম প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় সকল দর্শন ও সকল সম্প্রদায়কেই দেখাইতে হয় যে, তাঁহার দর্শন বা সম্প্রদায় উপনিষদ্‌রূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি কেহ না দেখাইতে পারেন, তবে সেই দর্শন বা সম্প্রদায় শিষ্টাচারবহির্ভূত বলিয়া পরিগণিত হইবে। সুতরাং বর্ত্তমান কালে সমগ্র ভারতের হিন্দুকে যদি কোন সাধারণ নামে পরিচিত করিতে হয়, তবে

তাহাদিগকে সম্ভবতঃ 'বৈদান্তিক' বা 'বৈদিক' এই দুইটির মধ্যে যাহা তোমাদের ইচ্ছা বলিলেই ঠিক বলা হয়। আর আমি বৈদান্তিক ও বেদান্ত শব্দদ্বয় ঐ অর্থেই সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকি।

আমি আর একটু স্পষ্ট করিয়া এইটি বুঝাইতে চাই; কারণ ইদানীং অনেকের পক্ষে বেদান্তদর্শনের 'অদ্বৈত' ব্যাখ্যাকেই 'বেদান্ত' শব্দের সহিত সমানার্থকরূপে প্রয়োগ করা একটা চলিত প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা সকলেই জানি, উপনিষদ্‌কে ভিত্তি করিয়া যে সকল বিভিন্ন দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছে, অদ্বৈতবাদ তাহাদের অন্যতম মাত্র। অদ্বৈতবাদীদের উপনিষদের উপর যতটা শ্রদ্ধা ভক্তি আছে, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদেরও ততটা আছে এবং অদ্বৈতবাদীরা তাঁহাদের দর্শন বেদান্তপ্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যতটা দাবী করেন, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরাও ততটাই করিয়া থাকেন। দ্বৈতবাদী ও ভারতীয় অন্যান্য সম্প্রদায়সকলও এইরূপ করিয়া থাকেন। ইহা সত্ত্বেও সাধারণ লোকের মনে 'বৈদান্তিক' ও 'অদ্বৈতবাদী' সমানার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং সম্ভবতঃ ইহার কিছু কারণও আছে। যদিও বেদই আমাদের প্রধান শাস্ত্র, তথাপি বেদের পরবর্ত্তী স্মৃতি ও পুরাণও—যে সকলে বেদেরই মত বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত ও নানাবিধ দৃষ্টান্ত দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে—আমাদের শাস্ত্র; এগুলি অবশ্য বেদের ন্যায় প্রামাণ্য নহে। আর ইহাও শাস্ত্রবিধান যে, যেখানে শ্রুতি এবং পুরাণ ও স্মৃতির মধ্যে কোন বিরোধ হইবে, সেখানে শ্রুতির মত গ্রাহ্য করিতে হইবে

বৈদান্তিক ও অদ্বৈতবাদী কি সমানার্থক?

এবং স্মৃতির মতকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। এক্ষণে আমরা দেখিতে পাই, অদ্বৈতকেশরী শঙ্করাচার্য্য ও তন্মতাবলম্বী আচার্য্যগণের ব্যাখ্যায় অধিক পরিমাণে উপনিষদ্ প্রমাণস্বরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। কেবল যেখানে এমন বিষয়ের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইয়াছে, যাহা শ্রুতিতে কোনরূপে পাইবার আশা করা যায় না, এইরূপ অল্পস্থলেই কেবল স্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। অন্যান্য বাদিগণ কিন্তু শ্রুতি অপেক্ষা স্মৃতির উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করিয়াছেন আর যতই আমরা অধিকতর দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়সমূহের পর্য্যালোচনা করি, ততই দেখিতে পাই, তাঁহাদের উদ্ধৃত স্মৃতিবাক্য শ্রুতির তুলনায় এত অধিক যে বৈদান্তিকের নিকট তাহা আশা করা উচিত নয়। বোধ হয়, ইঁহারা স্মৃতি পুরাণাদি প্রমাণের উপর এত অধিক নির্ভর করিয়াছিলেন বলিয়া অদ্বৈতবাদীই খাঁটি বৈদান্তিক বলিয়া ক্রমশঃ পরিগণিত হইয়াছেন।

'বেদ' নামধেয় অনাদি অনন্ত জ্ঞানরাশি—ভারতীয় সর্ব্ববিধ ধর্ম্মমত, এমন কি, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মেরও মূলভিত্তি

যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বেই ইহা দেখিয়াছি যে, বেদান্ত শব্দে ভারতীয় সমগ্র ধর্ম্মসমষ্টি বুঝিতে হইবে। আর ইহা যখন বেদ, তখন সর্ব্ববাদি-সম্মতিক্রমে ইহা আমাদের প্রাচীনতম গ্রন্থ। অবশ্য আধুনিক পণ্ডিতগণের মত যাহাই হউক, হিন্দুরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নন যে, বেদের কতকাংশ এক সময়ে এবং কতকাংশ অন্য সময়ে লিখিত হইয়াছে। তাঁহারা অবশ্য এখনও দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, সমগ্র বেদ এক সময়েই উৎপন্ন হইয়াছিল অথবা (যদি আমার এরূপ ভাষা প্রয়োগে কেহ আপত্তি

-না করেন) উহারা কখনই সৃষ্ট হয় নাই, উহারা চিরকাল সৃষ্টি-কর্ত্তার মনে বর্ত্তমান ছিল। 'বেদান্ত' শব্দে আমি সেই অনাদি অনন্ত জ্ঞানরাশিকেই লক্ষ্য করিতেছি। ভারতের দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ সকলই উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। সম্ভবতঃ আমরা বৌদ্ধধর্ম্ম, এমন কি, জৈনধর্ম্মের অংশবিশেষ গ্রহণ করিতে পারি—যদি উক্ত ধর্ম্মাবলম্বিগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের মধ্যে আসিতে সম্মত হন। আমাদের হৃদয় ত যথেষ্ট প্রশস্ত—আমরা ত তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত—তাঁহারাই আসিতে অসম্মত। আমরা তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে অনায়াসে প্রস্তুত; কারণ, বিশিষ্টরূপে বিশ্লেষণ করিলে তোমরা দেখিবে যে, বৌদ্ধধর্ম্মের সারভাগ ঐ সকল উপনিষদ্ হইতেই গৃহীত; এমন কি, বৌদ্ধধর্ম্মের নীতি—তথাকথিত অদ্ভুত ও মহান্ নীতিতত্ত্ব —কোন না কোন উপনিষদে অবিকল বর্ত্তমান। এইরূপ জৈনদেরও ভাল ভাল মতগুলি সব উপনিষদে রহিয়াছে, কেবল উহাদের বকামিগুলা নাই। পরবর্ত্তী কালে ভারতীয় ধর্ম্মচিন্তার যে সকল পরিণতি হইয়াছে, উপনিষদে তাহাদেরও বীজ আমরা দেখিতে পাই। সময়ে সময়ে বিনা হেতুবাদে এরূপ অভিযোগ করা হইয়া থাকে যে, উপনিষদে 'ভক্তি'র আদর্শ নাই। যাঁহারা উপনিষদ্ বিশিষ্টরূপে অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তাঁহারা জানেন, এ অভিযোগ একেবারে সত্য নহে। প্রত্যেক উপনিষদেই অনুসন্ধান করিলে যথেষ্ট ভক্তির কথা পাওয়া যায়। তবে অন্যান্য অনেক বিষয় যাহা পরবর্ত্তী কালে পুরাণ ও অন্যান্য স্মৃতিতে বিশেষরূপে পরিণত হইয়া ফুলফলশোভিত মহীরুহাকার ধারণ করিয়াছে

উপনিষদে সেইগুলি বীজভাবে মাত্র বর্ত্তমান। উপনিষদে যেন উহারা চিত্রের প্রথম রেখাপাতরূপে, অথবা কঙ্কালরূপে বর্ত্তমান। কোন না কোন পুরাণে ঐ চিত্রগুলি পরিস্ফুট করা হইয়াছে, কঙ্কালসমূহে মাংসশোণিত সংযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এমন কোন সুপরিণত ভারতীয় আদর্শ নাই, যাহার বীজ সেই সর্ব্বভাবের খনিস্বরূপ উপনিষদে না পাওয়া যায়। বিশিষ্টরূপ উপনিষদ্বিদ্যাহীন কতকগুলি ব্যক্তি—ভক্তিবাদ বিদেশাগত, এইটি প্রমাণ করিবার হাস্যাস্পদ চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তোমরা সকলেই জান, তাঁহাদের সমুদয় চেষ্টা বিফল হইয়াছে। তোমাদের যতটুকু ভক্তির প্রয়োজন, সবই উপনিষদের কথা কি, সংহিতায় পর্য্যন্ত রহিয়াছে —উপাসনা, প্রেম, ভক্তিতত্ত্বের যাহা কিছু আবশ্যক, সবই রহিয়াছে; কেবল ভক্তির আদর্শ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতেছে। সংহিতাভাগে স্থানে স্থানে ভীতি-প্রসূত ধর্ম্মের চিহ্ন পাওয়া যায়। সংহিতাভাগে স্থানে স্থানে দেখা যায়, উপাসক, বরুণ বা অন্য কোন দেবতার সম্মুখে ভয়ে কাঁপিতেছে। স্থানে স্থানে দেখা যায়, তাহারা আপনাদিগকে পাপী ভাবিয়া অতিশয় যন্ত্রণা পাইতেছে, কিন্তু উপনিষদে এ সকল বর্ণনার স্থান নাই। উপনিষদে ভয়ের ধর্ম্ম নাই; উপনিষদের ধর্ম্ম—প্রেমের, উপনিষদের ধর্ম্ম—জ্ঞানের।

এই উপনিষৎসমূহই আমাদের শাস্ত্র। এইগুলি বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আর আমি তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পরবর্ত্তী পৌরাণিক শাস্ত্র ও বেদের মধ্যে যেখানেই প্রভেদ লক্ষিত হইবে, সেখানেই পুরাণের মত অগ্রাহ্য করিয়া বেদের মত গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু

শাস্ত্র ও দেশাচার

কার্য্যতঃ আমরা দেখিতে পাই, আমরা শতকরা নব্বই জন পৌরাণিক আর বাকি শতকরা দশ জন বৈদিক—তাহাও হয় কি না সন্দেহ। আরও আমরা দেখিতে পাই, আমাদের মধ্যে নানাবিধ অতিশয় বিরোধী আচারসকল বিদ্যমান—দেখিতে পাই, আমাদের সমাজে এমন ধর্ম্মমতসমূহ রহিয়াছে, হিন্দুশাস্ত্রে যাহাদের কোন প্রমাণ নাই। আর শাস্ত্রপাঠে আমরা দেখিতে পাই ও দেখিয়া আশ্চর্য্য হই যে, আমাদের দেশে অনেক স্থলে এমন সকল প্রথা প্রচলিত যাহাদের প্রমাণ বেদ, স্মৃতি, পুরাণে কুত্রাপি নাই—সেগুলি কেবল বিশেষ বিশেষ দেশাচারমাত্র। তথাপি প্রত্যেক অজ্ঞ গ্রামবাসীই মনে করে যদি তাহার গ্রাম্য আচারটি উঠিয়া যায় তাহা হইলে সে আর হিন্দু থাকিবে না। তাহার মনে বৈদান্তিক ধর্ম্ম ও এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশাচার অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। শাস্ত্র পাঠ করিয়াও সে বুঝিতে পারে না যে, সে যাহা করিয়াছে, তাহাতে শাস্ত্রের সম্মতি নাই। তাহার পক্ষে ইহা বুঝা বড় কঠিন হইয়া উঠে যে, ঐ সকল আচার পরিত্যাগ করিলে তাহার কিছুই ক্ষতি হইবে না, বরং তাহাতে সে পূর্ব্বাপেক্ষা মানুষের মত মানুষ হইবে। দ্বিতীয়তঃ, আর এক মুশকিল আছে—আমাদের শাস্ত্র অতি বৃহৎ ও অসংখ্য। পতঞ্জলি প্রণীত মহাভাষ্য নামক শব্দবিদ্যাশাস্ত্রে পাঠ করা যায় যে, সামবেদের সহস্র শাখা ছিল। সে সকল গেল কোথায় কেহই তাহা জানে না। প্রত্যেক বেদসম্বন্ধেই তদ্রূপ। এই সকল গ্রন্থের অধিকাংশ লোপ পাইয়াছে, সামান্য অংশই আমাদের নিকট বর্ত্তমান। এক এক ঋষি পরিবার এক এক শাখার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই

সকল পরিবারের মধ্যে অধিকাংশেরই হয় স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বংশ লোপ হইয়াছে, অথবা বৈদেশিক অত্যাচারে বা অন্য কারণে তাহাদের বিনাশ ঘটিয়াছে। আর তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা যে বেদশাখাবিশেষ রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও লোপ পাইয়াছে। এই বিষয়টি আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক; কারণ, যাহারা কিছু নূতন বিষয় প্রচার করিতে অথবা বেদের বিরোধী কোন বিষয় সমর্থন করিতে চায়, তাহাদের পক্ষে এই যুক্তিটিই চরম অবলম্বনস্বরূপ দাঁড়ায়। যখনই ভারতে শ্রুতি ও দেশাচার লইয়া তর্ক উপস্থিত হয় এবং যখনই ইহা দেখাইয়া দেওয়া হয় যে, এই দেশাচারটি শ্রুতিবিরুদ্ধ তখন অপর পক্ষ এই উত্তর দিয়া থাকে যে, না—উহা শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে, উহা শ্রুতির সেই সকল শাখায় ছিল, যেগুলি এক্ষণে লোপ পাইয়াছে। ঐ প্রথাটিও বেদসম্মত। শাস্ত্রের এই সকল নানাবিধ টীকা টিপ্পনীর ভিতর কোন সাধারণ সূত্র বাহির করা অবশ্যই বিশেষ কঠিন। কিন্তু আমরা ইহা সহজেই বুঝিতে পারি যে, এই সকল নানাবিধ বিভাগ ও উপবিভাগের মধ্যে একটি সাধারণ ভিত্তি নিশ্চিতই আছে। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ নিশ্চিত কোন সাধারণ আদর্শে নির্ম্মিত হইয়াছে। আমরা যাহাকে আমাদের ধর্ম্ম বলি, সেই আপাতবিশৃঙ্খল মতসমষ্টির নিশ্চিত কোন সাধারণ ভিত্তি আছে। তাহা না হইলে উহা এতদিন দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিত না।

বেদের লুপ্ত শাখাসমূহ ও দেশাচার

আবার আমাদের ভাষ্যকারদিগের ভাষ্য আলোচনা করিতে গেলে আর এক গোল উপস্থিত হয়। অদ্বৈতবাদী ভাষ্যকার যখন অদ্বৈতপর শ্রুত্যংশের ব্যাখ্যা করেন, তখন তিনি উহার

সোজাসুজি অর্থ করেন; কিন্তু তিনিই আবার যখন দ্বৈতপর শ্রুত্যংশের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি উহার শব্দার্থের ব্যত্যয় ঘটাইয়া উহা হইতে অদ্ভুত অদ্ভুত অর্থ বাহির করেন। ভাষ্যকার নিজ মনোমত অর্থ বাহির করিবার জন্য সময়ে সময়ে 'অজা' (জন্মরহিত) শব্দের অর্থ ছাগী করিয়াছেন—কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! দ্বৈতবাদী ভাষ্যকারেরাও এইরূপ, এমন কি ইহা অপেক্ষা বিকৃতভাবে শ্রুতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেখানে যেখানে তাঁহারা দ্বৈতপর শ্রুতি পাইয়াছেন, সেগুলি যথাযথ রাখিয়া দিয়াছেন, কিন্তু যেখানেই অদ্বৈতবাদের কথা আসিয়াছে, সেইখানেই তাঁহারা সেই সকল শ্রুত্যংশের যথেচ্ছ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সংস্কৃত ভাষা এত জটিল, বৈদিক সংস্কৃত এত প্রাচীন, সংস্কৃত শব্দশাস্ত্র এত সুপরিণত যে, একটি শব্দের অর্থ লইয়া যুগযুগান্তর ধরিয়া তর্ক চলিতে পারে। কোন পণ্ডিতের যদি খেয়াল হয়, তবে তিনি যে কোন ব্যক্তির প্রলাপোক্তিকেও যুক্তিবলে এবং শাস্ত্র ও ব্যাকরণের নিয়ম উদ্ধৃত করিয়া শুদ্ধসংস্কৃত করিয়া তুলিতে পারেন। উপনিষদ্ বুঝিবার পক্ষে এই সকল বাধাবিঘ্ন আছে। বিধাতার ইচ্ছায় আমি এমন এক ব্যক্তির সহবাসের সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম, যিনি একদিকে যেমন ঘোর দ্বৈতবাদী, তেমনি অপরদিকে ঘোর অদ্বৈতবাদী ছিলেন; যিনি একদিকে যেমন পরম ভক্ত, অপরদিকে তেমনি পরম জ্ঞানী ছিলেন। এই ব্যক্তির শিক্ষাফলেই আমি প্রথম উপনিষদ্ ও অন্যান্য শাস্ত্র কেবল অন্ধভাবে ভাষ্যকারদিগের

বেদব্যাখ্যায় ভাষ্যকারদিগের মতভেদ

মদীয় আচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মত সমন্বয়

অনুসরণ না করিয়া স্বাধীনভাবে উৎকৃষ্টতররূপে বুঝিতে শিখিয়াছি। আর আমি এ বিষয়ে যৎসামান্য যাহা অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, এই সকল শাস্ত্রবাক্য পরস্পর বিরোধী নহে। সুতরাং আমাদের শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। শ্রুতিবাক্যগুলি অতি মনোরম, অতি অদ্ভুত আর উহারা পরস্পর বিরোধী নহে, উহাদের মধ্যে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বিদ্যমান, একটি তত্ত্ব যেন অপরটির সোপানস্বরূপ। আমি এই সকল উপনিষদেই একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি যে, প্রথমে দ্বৈতভাবের কথা, উপাসনা প্রভৃতি আরম্ভ হইয়াছে, শেষে অপূর্ব্ব অদ্বৈতভাবের উচ্ছ্বাসে উহা সমাপ্ত হইয়াছে।

দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের সমন্বয়

সুতরাং এক্ষণে এই ব্যক্তির জীবনের আলোকে আমি দেখিতেছি যে, দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীর পরস্পর বিবাদ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। উভয়েরই জাতীয় জীবনে বিশেষ স্থান আছে। দ্বৈতবাদী থাকিবেই—অদ্বৈতবাদীর ন্যায় দ্বৈতবাদীরও জাতীয় ধর্ম্মজীবনে বিশেষ স্থান আছে। একটি ব্যতীত অপরটি থাকিতে পারে না, একটি অপরটির পরিণতিস্বরূপ; একটি যেন গৃহ, অপরটি ছাদস্বরূপ। একটি যেন মূল, অপরটি ফলস্বরূপ।

উপনিষদের অপূর্ব্ব ভাষা

আর উপনিষদের শব্দার্থের বিপর্য্যয় করিবার চেষ্টা আমার নিকট অতিশয় হাস্যাস্পদ বলিয়া বোধ হয়; কারণ, আমি দেখিতে পাই, উহার ভাষাই অপূর্ব্ব। শ্রেষ্ঠতম দর্শনরূপে উহার গৌরব ছাড়িয়া দিলেও, মানবজাতির মুক্তিপথপ্রদর্শক ধর্ম্মবিজ্ঞানরূপে উহার অদ্ভুত

গৌরব ছাড়িয়া দিলেও, ঔপনিষৎ সাহিত্যে যেমন মহান্ ভাবের অতি অপূর্ব্ব চিত্র আছে, জগতে আর কুত্রাপি তদ্রূপ নাই। এখানেই মনুষ্যমনের সেই প্রবল বিশেষত্ব, সেই অন্তর্দ্দৃষ্টিপরায়ণ হিন্দুমনের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

পাশ্চাত্য কাব্য ও বেদসংহিতায় মহান্ ভাবের বর্ণনা

অন্যান্য সকল জাতির ভিতরেই এই মহান্ ভাবের চিত্র অঙ্কিত করিবার চেষ্টা দেখা যায়; কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিবে, তাহারা বাহ্য প্রকৃতির মহান্ ভাবকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ মিল্টন, দান্তে, হোমার বা অন্য যে কোন পাশ্চাত্য কবির কাব্য পর্য্যালোচনা করা যাউক,—তাঁহাদের কাব্যে স্থানে স্থানে মহত্ত্ব-ভাবব্যঞ্জক অপূর্ব্ব শ্লোকাবলী দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তথায় সর্ব্বত্রই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনার চেষ্টা—বহিঃপ্রকৃতির বিশালভাব, দেশকালের অনন্ত ভাবের বর্ণনা। আমরা বেদের সংহিতাভাগেও এই চেষ্টা দেখিতে পাই। সৃষ্টি প্রভৃতি বর্ণনাত্মক কতকগুলি অপূর্ব্ব ঋঙ্‌মন্ত্রে বাহ্য প্রকৃতির মহান্‌ভাব, দেশকালের অনন্তত্ব, যতদুর উচ্চভাষায় সম্ভব বর্ণনা করা হইয়াছে; কিন্তু তাঁহারা যেন শীঘ্রই দেখিতে পাইলেন যে, এ উপায়ে অনন্তস্বরূপকে ধরিতে পারা যায় না; বুঝিলেন, তাঁহাদের মনের যে সকল ভাব তাঁহারা ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, অনন্ত দেশ, অনন্ত বিস্তার ও অনন্ত বাহ্যপ্রকৃতিও তাহাদিগের প্রকাশে অক্ষম। তখন তাঁহারা জগৎ-সমস্যা ব্যাখ্যার জন্য অন্য পথ ধরিলেন।

উপনিষদের ভাষা নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিল,—উপনিষদের ভাষা

একরূপ নাস্তি ভাবদ্যোতক, স্থানে স্থানে অস্ফুট, যেন উহা তোমাকে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু অর্দ্ধ পথে গিয়াই ক্ষান্ত হইল, কেবল তোমাকে এক অগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় বস্তু উদ্দেশে দেখাইয়া দিল, তথাপি তোমার সেই বস্তুর অস্তিত্ব-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ রহিল না। জগতে এমন কবিতা কোথায়, যাহার সহিত এই শ্লোকের তুলনা হইতে পারে ?

উপনিষদের ভাষা নাস্তি ভাবদ্যোতক

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।

কঠোপনিষদ্—২।২।১৫

তথায় সূর্য্য কিরণ দেয় না, চন্দ্র-তারাও নহে, এই বিদ্যুৎও সেই স্থানকে আলোকিত করিতে পারে না, এই সামান্য অগ্নির আর কথা কি ?

জগতের আর কোথায়, সমগ্র জগতের সমগ্র দার্শনিক ভাবের সম্পূর্ণতর চিত্র পাইবে ? হিন্দুজাতির সমগ্র চিন্তার, মানব জাতির মোক্ষাকাঙ্ক্ষার সমগ্র কল্পনার সারাংশ যেরূপ অদ্ভুত ভাষায় চিত্রিত হইয়াছে, যেরূপ অপূর্ব্ব রূপকে বর্ণিত হইয়াছে এরূপ আর কোথায় পাইবে ?

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥ ১
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ ২

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥৩
মুণ্ডকোপনিষদ্—৩।১

একই বৃক্ষের উপর দুইটি সুন্দরপক্ষযুক্ত পক্ষী রহিয়াছে—উভয়েই পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন ; তন্মধ্যে একটি সেই বৃক্ষের ফল খাইতেছে, অপরটি না খাইয়া স্থিরভাবে নীরবে বসিয়া আছে। নিম্নশাখায় উপবিষ্ট পক্ষী কখন মিষ্ট কখন বা কটু ফল ভোজন করিতেছে,—এবং সেই কারণে কখন সুখী, কখন বা দুঃখী হইতেছে, কিন্তু উপরিস্থ শাখায় উপবিষ্ট পক্ষী স্থির গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট—সে ভালমন্দ কোন ফলই খাইতেছে না—সে সুখদুঃখ উভয়েই উদাসীন—নিজ মহিমায় মগ্ন হইয়া অবস্থিত।

উপনিষদের আরম্ভ দ্বৈতবাদে—সমাপ্তি অদ্বৈতে, উদাহরণ—জীবাত্মা ও পরমাত্মা পক্ষীদ্বয়

এই পক্ষীদ্বয়—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। মানুষ ইহজীবনের স্বাদু অস্বাদু ফল ভোজন করিতেছে—সে কাঞ্চনের অন্বেষণে মত্ত—সে ইন্দ্রিয়ের পশ্চাৎ ধাবমান, সংসারের ক্ষণিক বৃথা সুখের জন্য মরিয়া হইয়া পাগলের মত ছুটিতেছে। অন্য আর এক স্থলে উপনিষদ্ সারথি ও তাহার অসংযত দুই অশ্বের সঙ্গে মানবের এই ইন্দ্রিয়সুখান্বেষণের তুলনা করিয়াছেন। মানুষ এইরূপে জীবনের বৃথা সুখানুসন্ধানচেষ্টায় ছুটিতেছে। জীবনের উষাকালে মানুষ কত সোনার স্বপন দেখিয়া থাকে। কিন্তু শীঘ্রই সে বুঝিতে পারে, সেগুলি স্বপ্নমাত্র—বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে সে তাহার অতীত কর্ম্মসমূহেরই রোমন্থন করিতে থাকে, পুনরাবৃত্তি করিতে থাকে, কিন্তু কিসে এই ঘোর সংসারজাল হইতে বাহির

হইবে, তাহার কিছু উপায় খুঁজিয়া পায় না। মানুষের ইহাই নিয়তি। কিন্তু সকল মানবেরই জীবনে সময়ে সময়ে এমন মাহেন্দ্রক্ষণ আসিয়া থাকে,—গভীরতম শোকে, এমন কি গভীরতম আনন্দের সময় মানুষের এমন মাহেন্দ্রক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয় যখন সেই সূর্য্যালোকাবরোধকারী মেঘের খানিকটা যেন ক্ষণকালের জন্য সরিয়া যায়। তখন আমরা আমাদের এই সীমাবদ্ধ ভাব সত্ত্বেও ক্ষণকালের জন্য সেই সর্ব্বাতীত সত্ত্বার চকিতবৎ দর্শনলাভ করি—দূরে দূরে—পঞ্চেন্দ্রিয়াবদ্ধ জীবনের অনেক পশ্চাতে—দূরে দূরে—এই সংসারের ব্যর্থ ভোগ—ইহার সুখদুঃখ হইতে অনেক দূরে; দূরে দূরে—প্রকৃতির পরপারে—ইহলোকে বা পরলোকে আমরা যে সুখ ভোগের কল্পনা করিয়া থাকি, তাহা হইতে বহু দূরে, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা, প্রজৈষণা হইতে বহু দূরে। তখন মানুষ ক্ষণিকের জন্য দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া স্থিরভাব অবলম্বন করে—সে তখন বৃক্ষের উপরিভাগে অবস্থিত অপর পক্ষীকে শান্ত ও মহিমময় অবলোকন করে—সে দেখে, তিনি স্বাদু অস্বাদু কোন ফল ভোজন করিতেছেন না—তিনি নিজ মহিমায় নিজে বিভোর, আত্মতৃপ্ত—যেমন গীতায় উক্ত হইয়াছে :—

> যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
> আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥ ৩।১৭

যিনি আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত ও আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার আর কি কার্য্য অবশিষ্ট থাকে? তিনি আর কেন বৃথাকার্য্য করিয়া সময় কাটাইবেন?

একবার চকিতভাবে ব্রহ্মদর্শনের পর আবার সে ভুলিয়া যায়,

আবার সংসারবৃক্ষে স্বাদু অস্বাদু ফল ভোজন করিতে থাকে—আর তখন তাহার কিছুমাত্র স্মরণ থাকে না। আবার হয়ত কিছুদিন পরে সে আর একবার পূর্ব্বের স্থায় ব্রহ্মের চকিত দর্শন লাভ করে এবং যতই ঘা খায়, ততই সেই নিম্নশাখাবলম্বী পক্ষী উপরিস্থ পক্ষীর নিকটস্থ হইতে থাকে। যদি সে সৌভাগ্যক্রমে ক্রমাগত সংসারের তীব্র আঘাত পায়, তবে সে তাহার সঙ্গী, তাহার প্রাণ, তাহার সখা সেই অপর পক্ষীর ক্রমশঃ সমীপবর্ত্তী হইতে থাকে। আর যতই সে অধিকতর নিকটবর্ত্তী হয়, ততই দেখে, সেই উপরিস্থ পক্ষীর দেহের জ্যোতিঃ আসিয়া তাহার পক্ষের চতুর্দ্দিকে খেলা করিতেছে। আরও যত সমীপবর্ত্তী হয়, ততই তাহার রূপান্তর হইতে থাকে। ক্রমশঃ সে যতই নিকট হইতে নিকটতর হইতে থাকে, ততই দেখে, সে যেন ক্রমশঃ মিলাইয়া যাইতেছে, অবশেষে তাহার সম্পূর্ণ তিরোভাব ঘটে। তখন সে বুঝিতে পারে, তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব কোন কালে ছিল না, সে সেই সঞ্চরণশীল পত্ররাশির ভিতর শান্ত ও গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট অপর পক্ষীর প্রতিবিম্ব মাত্র। —তখন সে জানিতে পারে, সে স্বয়ংই সেই উপরিস্থ পক্ষী, সে সদাকাল শান্তভাবে অবস্থিত ছিল—তাহারই সেই মহিমা। তখন আর কোন ভয় থাকে না; তখন সে সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইয়া ধীর শান্তভাবে অবস্থান করে। এই রূপকে উপনিষদ্ দ্বৈতভাব হইতে আরম্ভ করিয়া চূড়ান্ত অদ্বৈতভাবে লইয়া যাইতেছেন।

উপনিষদের এই অপূর্ব্ব কবিত্ব, মহত্ত্বের চিত্র, মহোচ্চ ভাবসমূহ দেখাইবার জন্য শত শত উদাহরণ প্রযুক্ত হইতে পারে

কিন্তু এই বক্তৃতায় আমাদের আর তাহার সময় নাই। তবে আর একটি কথা বলিব ;—উপনিষদের ভাষা, ভাব সকলেরই ভিতর কোন কুটিল ভাব নাই, উহার প্রত্যেক কথাই তরবারিফলকের ন্যায়, হাতুড়ির ঘায়ের মত সাক্ষাৎভাবে হৃদয়ে আঘাত করিয়া থাকে। উহাদের অর্থ বুঝিতে কিছুমাত্র ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই—সেই সঙ্গীতের প্রত্যেক সুরটিরই একটা জোর আছে, প্রত্যেকটিই তাহার সম্পূর্ণ ভাব হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দিয়া যায়। কোন ঘোরফের নাই, একটিও অসম্বদ্ধ প্রলাপ নাই, একটিও জটিল বাক্য নাই, যাহাতে মাথা গুলাইয়া যায়। উহাতে অবনতির চিহ্নমাত্র নাই, বেশী রূপকবর্ণনার চেষ্টা নাই। বিশেষণের পর বিশেষণ দিয়া ক্রমাগত ভাবটিকে জটিলতর করা হইল, প্রকৃত বিষয়টি একেবারে চাপা পড়িল,—মাথা গুলাইয়া গেল—তখন সেই শাস্ত্ররূপ গোলকধাঁধার বাহিরে যাইবার আর উপায় রহিল না—উপনিষদে এরূপ চেষ্টার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। যদি ইহা মানবপ্রণীত হয়, তবে ইহা এমন এক জাতির সাহিত্য, যাহা তখনও তাহার জাতীয় তেজবীর্য্য একবিন্দুও হারায় নাই। ইহার প্রতি পৃষ্ঠা আমাদিগকে তেজবীর্য্যের কথা বলিয়া থাকে।

উপনিষদের ভাষায় আর এক বিশেষত্ব—উহাতে ঘোর-ফের নাই

এই বিষয়টি বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে—সমগ্র জীবনে আমি এই মহাশিক্ষা পাইয়াছি—উপনিষদ্ বলিতেছেন, হে মানব, তেজস্বী হও, দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ কর। মানব কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করে, মানবের দুর্ব্বলতা কি নাই? উপনিষদ্ বলেন, আছে বটে,

কিন্তু অধিকতর দুর্ব্বলতা দ্বারা কি এই দুর্ব্বলতা দূর হইবে? ময়লা দিয়া কি ময়লা দূর হইবে? পাপের দ্বারা কি পাপ দূর হইবে? উপনিষদ্ বলিতেছেন, হে মানব, তেজস্বী হও, তেজস্বী হও, উঠিয়া দাঁড়াও, বীর্য্য অবলম্বন কর! জগতের সাহিত্যের মধ্যে কেবল ইহাতেই 'অভীঃ'—'ভয়শূন্য' এইশব্দ বার বার ব্যবহৃত হইয়াছে—আর কোন শাস্ত্রে ঈশ্বর বা মানবের প্রতি 'অভীঃ'—'ভয়শূন্য' এই বিশেষণ প্রযুক্ত হয় নাই। 'অভীঃ'—'ভয়শূন্য' হও—আর আমার মনশ্চক্ষের সমক্ষে সুদূর অতীত হইতে সেই পাশ্চাত্যদেশীয় সম্রাট্ আলেক্জাণ্ডারের চিত্র উদিত হইতেছে—আমি যেন দেখিতেছি—সেই দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাট্ সিন্ধুনদের তটে দাঁড়াইয়া অরণ্যবাসী, শিলাখণ্ডোপবিষ্ট, সম্পূর্ণ উলঙ্গ, স্থবির, আমাদেরই জনৈক সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ করিতেছেন,—সম্রাট্ সন্ন্যাসীর অপূর্ব্বজ্ঞানে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে অর্থমানের প্রলোভন দেখাইয়া গ্রীসদেশে আসিতে আহ্বান করিতেছেন। সন্ন্যাসী অর্থমানাদি প্রলোভনের কথা শুনিয়া হাস্যসহকারে গ্রীস যাইতে অস্বীকৃত হইলেন; তখন সম্রাট্ নিজ রাজপ্রতাপ প্রকাশ করিয়া বলেন, 'যদি আপনি না আসেন, আমি আপনাকে মারিয়া ফেলিব।' তখন সন্ন্যাসী উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, 'তুমি এখন যেরূপ বলিলে, জীবনে এরূপ মিথ্যা কথা আর কখনও বল নাই। আমায় মারে কে? জড়জগতের সম্রাট্, তুমি আমায় মারিবে? তাহা কখনই হইতে পারে না! আমি চৈতন্যস্বরূপ, অজ ও অক্ষয়। আমি কখন জন্মাই নাই, কখন মরিবও না!

উপনিষদের উপদেশ—ভয়শূন্য হও, তেজস্বী হও

সন্ন্যাসী ও দিগ্বিজয়ী আলেক্জাণ্ডার

আমি অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজ্ঞ! তুমি বালক, তুমি আমায় মারিবে?' ইহাই প্রকৃত তেজ, ইহাই প্রকৃত বীর্য্য।

আর হে বন্ধুগণ, হে স্বদেশবাসিগণ, আমি যতই উপনিষদ্ পাঠ করি, ততই আমি তোমাদের জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া থাকি; কারণ, উপনিষদুক্ত এই তেজস্বিতাই আমাদের বিশেষভাবে জীবনে পরিণত করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। শক্তি, শক্তি—ইহাই আমাদের চাই; আমাদের শক্তির বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কে আমাদিগকে শক্তি দিবে? আমাদিগকে দুর্ব্বল করিবার সহস্র সহস্র বিষয় আছে, গল্প আমরা যথেষ্ট শিখিয়াছি। আমাদের প্রত্যেক পুরাণে এত গল্প আছে, যাহাতে জগতে যত পুস্তকালয় আছে, তাহার তিন চতুর্থাংশ পূর্ণ হইতে পারে—এ সকলই আমাদের আছে। যাহা কিছু আমাদের জাতিকে দুর্ব্বল করিতে পারে, তাহা আমাদের বিগত সহস্র বর্ষ ধরিয়া রহিয়াছে। বোধ হয় যেন বিগত সহস্র বর্ষ ধরিয়া আমাদের জাতীয় জীবনের ইহাই একমাত্র লক্ষ্য ছিল যে, কিরূপে আমাদিগকে দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর করিয়া ফেলিবে। অবশেষে আমরা প্রকৃতপক্ষে কীটতুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছি—এখন যাহার ইচ্ছা সেই আমাদিগকে মাড়াইয়া যাইতেছে। হে বন্ধুগণ, তোমাদের সহিত আমার শোণিত সম্বন্ধে সম্বন্ধ, তোমাদের জীবনমরণে আমার জীবনমরণ। আমি তোমাদিগকে পূর্ব্বোক্ত কারণসমূহের জন্য বলিতেছি, আমাদের আবশ্যক শক্তি, শক্তি—কেবল শক্তি। আর উপনিষৎসমূহ শক্তির বৃহৎ আকরস্বরূপ। উপনিষদ্ যে শক্তিসঞ্চারে

পুরাণের গল্প ছাড়িয়া উপনিষদের তেজ অবলম্বন কর

সমর্থ, তাহাতে উহা সমগ্র জগৎকে তেজস্বী করিতে পারে। উহার দ্বারা সমগ্র জগৎকে পুনরুজ্জীবিত এবং শক্তি ও বীর্য্যশালী করিতে পারা যায়। সকল জাতির, সকল মতের, সকল সম্প্রদায়ের দুর্ব্বল, দুঃখী, পদদলিতগণকে উহা উচ্চরবে আহ্বান করিয়া নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া মুক্ত হইতে বলে। মুক্তি বা স্বাধীনতা—দৈহিক স্বাধীনতা, মানসিক স্বাধীনতা, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা, ইহাই উপনিষদের মূলমন্ত্র। জগতের মধ্যে ইহাই একমাত্র শাস্ত্র, যাহাতে উদ্ধারের (Salvation) কথা বলে না, মুক্তির কথা বলে। প্রকৃত বন্ধন হইতে মুক্ত হও, দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত হও।

আর উপনিষদ্ তোমায় ইহাও দেখাইয়া দেয় যে, ঐ মুক্তি তোমার মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান। এই মতটি উপনিষদের আর এক বিশেষত্ব। তুমি দ্বৈতবাদী—তা হউক; কিন্তু তোমাকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, আত্মা স্বভাবতঃই পূর্ণস্বরূপ। কেবল কতকগুলি কার্য্যের দ্বারা উহা সঙ্কুচিত হইয়াছে মাত্র। আধুনিক পরিণামবাদীরা (Evolutionists) যাহাকে ক্রমবিকাশ (Evolution) ও ক্রমসঙ্কোচ (Atavism) বলিয়া থাকেন, রামানুজেরও সঙ্কোচ বিকাশের মত তদ্রূপ! আত্মা তাঁহার স্বাভাবিক পূর্ণতা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া যেন সঙ্কোচ প্রাপ্ত হন, তাঁহার শক্তিসমূহ অব্যক্তভাব ধারণ করে; সৎকর্ম্ম ও সৎচিন্তা দ্বারা উহা পুনরায় বিকাশপ্রাপ্ত হয় এবং তখনই উহার স্বাভাবিক পূর্ণতা প্রকটিত হইয়া পড়ে। অদ্বৈতবাদীর সহিত দ্বৈতবাদীর প্রভেদ এইটুকু যে,

আত্মার স্বরূপাবস্থা, ঐ বিষয়ে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদীর ঐক্যমত

দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদীর প্রভেদ—

অদ্বৈতবাদী প্রকৃতির পরিণাম মানেন, আত্মার নহে

অদ্বৈতবাদী প্রকৃতির পরিণাম স্বীকার করেন, আত্মার নহে। মনে কর, একটি যবনিকা রহিয়াছে, আর ঐ যবনিকাটিতে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। আমি ঐ যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া এই মহতী জনতাকে দেখিতেছি। আমি প্রথমে কেবল কতকগুলি অল্প-মাত্র মুখ দেখিতে পাইব। মনে কর, ছিদ্রটি বাড়িতে লাগিল; ছিদ্রটি যতই বাড়িতে থাকিবে, ততই আমি এই সমবেত ব্যক্তিদিগের অধিকসংখ্যককে দেখিতে পাইব। শেষে ছিদ্রটি বাড়িয়া যবনিকা ও ছিদ্র এক হইয়া যাইবে। তখন তোমাদের ও আমার মধ্যে কোন ব্যবধান থাকিবে না। এস্থলে তোমাদের বা আমার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই। যাহা কিছু পরিবর্ত্তন কেবল যবনিকাটিতে ঘটিয়াছে। তোমরা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একরূপই ছিলে, কেবল যবনিকাটির পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। পরিণামসম্বন্ধে অদ্বৈতবাদীর ইহাই মত—প্রকৃতির পরিণাম ও আভ্যন্তরীণ আত্মার স্বরূপাভিব্যক্তি। আত্মা কোনরূপে সঙ্কোচপ্রাপ্ত হইতে পারে না! উহা অপরিণামী ও অনন্ত। উহা যেন মায়ারূপ অবগুণ্ঠনে আবৃত হইয়াছিল—যতই এই মায়াবরণ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হয়, ততই আত্মার জন্মগত স্বাভাবিক মহিমার আবির্ভাব হয় এবং ক্রমশঃ উহা অধিকতর অভিব্যক্ত হইতে থাকে।

এই মহান্ তত্ত্বটি জগৎ ভারতের নিকট শিখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তাহারা যাহাই বলুক, তাহারা যতই আপনাদের গরিমা প্রকাশের চেষ্টা করুক, ক্রমশঃ যতদিন যাইবে, তাহারা বুঝিবে যে, এই তত্ত্ব স্বীকার না করিয়া কোন সমাজই টিকিতে

পারে না। তোমরা কি দেখিতেছ না, সকল বিষয়েই কিরূপ গুরুতর পরিবর্ত্তন হইতেছে? তোমরা কি দেখিতেছ না, পূর্ব্বে সবই স্বভাবতঃই মন্দ বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রথা ছিল, কিন্তু এক্ষণে উহা স্বভাবতঃ ভাল বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে? কি শিক্ষাপ্রণালীতে, কি অপরাধিগণের শাস্তিবিধানে, কি উন্মত্ত চিকিৎসায়, এমন কি, সাধারণ ব্যাধির চিকিৎসায় পর্য্যন্ত প্রাচীন নিয়ম ছিল—সবই স্বভাবতঃ মন্দ বলিয়া ধরিয়া লওয়া। আধুনিক নিয়ম কি? আধুনিক বিধান বলে, শরীর স্বভাবতঃই সুস্থ; উহা নিজ প্রকৃতি-বশে ব্যাধির উপশম করিয়া থাকে। ঔষধ বড় জোর শরীরের মধ্যে সার পদার্থসমূহের সঞ্চয়ে সাহায্য করিতে পারে। অপরাধীদের সম্বন্ধে এই নব বিধান কি বলে? নূতন বিধান স্বীকার করিয়া থাকে যে, কোন অপরাধী ব্যক্তি যতই হীন হউক, তথাপি তাহার মধ্যে যে ঈশ্বরত্ব রহিয়াছে, তাহার কখন পরিবর্ত্তন হয় না, সুতরাং অপরাধিগণের প্রতি আমাদের তদ্রূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এখন পূর্ব্বের ভাব সব বদলাইয়া যাইতেছে। এখন কারাগারকে অনেকস্থলে সংশোধনাগার বলা হয়। সব বিষয়েই এরূপ ঘটিয়াছে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে—প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরই ঈশ্বরত্ব বর্ত্তমান—এই ভারতীয় ভাব ভারতের অন্যান্য দেশে পর্য্যন্ত নানা ভাবে ব্যক্ত হইতেছে। আর কেবল তোমাদের শাস্ত্রেই ইহার ব্যাখ্যা রহিয়াছে; তাহাদিগকে ঐ ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতেই হইবে। মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহারে গুরুতর পরিবর্ত্তন আসিবে, আর মানুষের কেবল দোষপ্রদর্শনরূপ সেকেলে

আত্মা স্বভাবতঃই পূর্ণস্বরূপ—এই মতবাদের কার্য্যকারিতা

ভাব উঠিয়া যাইবে। এই শতাব্দীর মধ্যেই ঐ ভাব লোপ পাইবে। এখন লোকে আপনাদিগকে গালিমন্দ করিতে পারে। 'জগতে পাপ নাই,' আমি এই ঘোর পৈশাচিক তত্ত্ব প্রচার করিয়া থাকি—এই বলিয়া জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত লোকে আমাকে গালি দিয়াছে। ভাল কথা, কিন্তু এক্ষণে যাঁহারা আমায় গালি দিতেছে, তাঁহাদেরই বংশধরগণ, আমি অধর্ম্মের প্রচার করি নাই, ধর্ম্মেরই প্রচার করিয়াছি বলিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবে। আমি অজ্ঞানান্ধকার বিস্তার না করিয়া জ্ঞানালোক বিস্তারে চেষ্টা করিতেছি বলিয়া গৌরব অনুভব করিয়া থাকি।

জগৎ আমাদের উপনিষদ্ হইতে আর এক মহান্ উপদেশ লাভ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে—সমগ্র জগতের অখণ্ডত্ব।

উপনিষদ্ হইতে জগৎ আর এক তত্ত্ব শিখিবে—সমগ্র জগতের অখণ্ডত্ব

অতি প্রাচীন কালে এক বস্তুতে আর এক বস্তুতে যে পার্থক্য বিবেচিত হইত, এখন অতি শীঘ্র শীঘ্র তাহা চলিয়া যাইতেছে। তাড়িত ও বাষ্পবল জগতের বিভিন্ন অংশকে পরস্পরের সহিত পরিচয় করাইয়া দিতেছে। তাহার ফলস্বরূপ, আমরা হিন্দুগণ এক্ষণে আর আমাদের দেশ ছাড়া সব দেশ কেবল ভূতপ্রেত, রাক্ষসপিশাচে পূর্ণ দেখি না, এবং খৃষ্টিয়ান দেশের লোকেরাও বলেন না ভারতে কেবল নরমাংসভোজী ও অসভ্যগণের বাস। আমাদের দেশ হইতে বাহির হইয়া গিয়া দেখিতে পাই, আমাদেরই ভ্রাতা সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার দৃঢ় বাহু প্রসারণ করিয়া দিতেছেন, আর মুখে উৎসাহ দিতেছেন। বরং সময়ে সময়ে অপরদেশে আমাদের নিজ দেশ হইতে এরূপ লোক অধিক দেখা যায়

তাহারাও যখন এখানে আসে, তাহারাও এখানে তাহাদেরই মত ভ্রাতৃভাব, উৎসাহবাক্য ও সহানুভূতি পাইয়া থাকে। আমাদের উপনিষদ্ ঠিকই বলিয়াছেন—অজ্ঞানই সর্ব্বপ্রকার দুঃখের কারণ। সামাজিক বা আধ্যাত্মিক, আমাদের জীবনের যে কোন বিষয়ে খাটাইয়া দেখা যায়, তাহাতেই উহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বোধ হয়। অজ্ঞানেই আমরা পরস্পরকে ঘৃণা করিয়া থাকি, পরস্পর পরস্পরকে জানি না বলিয়াই আমাদের পরস্পরে ভালবাসা নাই। যখনই আমরা পরস্পরে ঠিক ঠিক পরিচিত হই, তখনই আমাদের মধ্যে প্রেমের উদয় হইয়া থাকে। প্রেমের উদয় হইবেই—কারণ, আমরা কি সকলেই এক আত্মস্বরূপ নহি? সুতরাং আমরা দেখিতে পাই, চেষ্টা না করিলেও আমাদের সকলের একত্বভাব স্বভাবতঃই আসিয়া থাকে। এমন কি, রাজনীতি ও সমাজনীতি ক্ষেত্রেও যে সকল সমস্যা বিংশ বর্ষ পূর্ব্বে কেবল জাতীয় সমস্যা ছিল, এখন আর জাতীয় ভিত্তিতে তাহাদের মীমাংসা করা যায় না। উক্ত সমস্যাগুলি ক্রমশঃ বিপুলাবয়ব হইতেছে, বিশাল আকার ধারণ করিতেছে। আন্তর্জ্জাতিক ভিত্তিরূপ প্রশস্ততর ভূমি হইতেই কেবল উহাদের মীমাংসা করা যাইতে পারে। আন্তর্জ্জাতিক সংহতি! আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘ! আন্তর্জ্জাতিক বিধান!—ইহাই আজ-কালকার মূলমন্ত্রস্বরূপ! সকলের ভিতর একত্বভাব কিরূপ বিস্তৃত হইতেছে, ইহাই তাহার প্রমাণ। বিজ্ঞানেও জড়তত্ত্বসম্বন্ধে এইরূপ সার্ব্বভৌমিক ভাবই এখন আবিষ্কৃত হইতেছে। এখন তোমরা সমগ্র জড়বস্তুকে, সমগ্র জগৎকে এক অখণ্ড বস্তুরূপে, এক বৃহৎ জড়সমুদ্ররূপে বর্ণনা করিয়া থাক—তুমি, আমি, চন্দ্রসূর্য্য, এমন কি

আর যাহা কিছু, সবই এই মহান্ সমুদ্রের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত্তের নামমাত্র, আর কিছু নহে। মানসিক দৃষ্টিতে দেখিতে উহা এক অনন্ত চিন্তাসমুদ্ররূপে প্রতীত হয়; তুমি আমি সেই চিন্তাসমুদ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত্তস্বরূপ আর আত্মদৃষ্টিতে দেখিলে সমগ্র জগৎ এক অচল, অপরিণামী সত্তা অর্থাৎ আত্মা বলিয়া প্রতীত হয়। নীতির জন্যও জগৎ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে—তাহাও আমাদের গ্রন্থে রহিয়াছে। নীতিতত্ত্বের ভিত্তি সম্বন্ধেও জগৎ জানিতে ব্যাকুল—তাহাও তাহারা আমাদের শাস্ত্র হইতেই পাইবে।

ভারতে আমাদের কি প্রয়োজন? যদি বৈদেশিকগণের এই সকল বিষয়ের প্রয়োজন থাকে, তবে আমাদের ঐগুলির বিশ গুণ প্রয়োজন আছে। কারণ, আমাদের উপনিষদ্ যতই বড় হউক, অন্যান্য জাতির সহিত তুলনায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিগণ যতই বড় হউন, আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি, আমরা দুর্ব্বল, অতি দুর্ব্বল। প্রথমতঃ,—আমাদের শারীরিক দৌর্ব্বল্য—এই শারীরিক দৌর্ব্বল্য আমাদের অন্ততঃ একতৃতীয়াংশ দুঃখের কারণ। আমরা অলস; আমরা কার্য্য করিতে পারি না; আমরা একসঙ্গে মিলিতে পারি না; আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসি না; আমরা ঘোর স্বার্থপর; আমরা তিন জন এক সঙ্গে মিলিলেই পরস্পরকে ঘৃণা করিয়া থাকি, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা করিয়া থাকি। আমাদের এখন এই অবস্থা—আমরা অতিশয় বিশৃঙ্খলভাবাপন্ন, ঘোর স্বার্থপর হইয়া

আমাদের হীনতার প্রধান কারণ, শারীরিক দৌর্ব্বল্য

পড়িয়াছি—শত শত শতাব্দী ধরিয়া এই লইয়া বিবাদ করিতেছি যে, তিলক ধারণ এইভাবে করিতে হইবে, কি ঐ ভাবে। অমুক ব্যক্তিকে দেখিলে আমার খাওয়া নষ্ট হইবে কি না, এতদ্বিধ গুরুতর সমস্যা-সমূহের উপর বড় বড় বই লিখিতেছি। যে জাতির মস্তিষ্কের সমুদয় শক্তি এইরূপ অপূর্ব্ব সুন্দর সুন্দর সমস্যার গবেষণায় নিযুক্ত, তাহা এখন যে অবস্থায় রহিয়াছে, তদপেক্ষা তাহার আর কি উন্নতির আশা করা যাইতে পারে? আর আমাদের লজ্জাও হয় না! হাঁ, কখন কখন হয় বটে, কিন্তু আমরা যাহা ভাবি, তাহা করিতে পারি না।—আমরা ভাবি অনেক জিনিস, কিন্তু কার্য্যে পরিণত করি না। এইরূপে তোতা পাখীর মত চিন্তা আমাদের অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে—আচরণে আমরা পশ্চাৎপদ। ইহার কারণ কি? শারীরিক দুর্ব্বলতাই ইহার কারণ। দুর্ব্বল মস্তিষ্ক কিছু করিতে পারে না; আমাদিগকে উহা বদলাইয়া সবল-মস্তিষ্ক হইতে হইবে—আমাদের যুবকগণকে প্রথমতঃ সবল হইতে হইবে, ধর্ম্ম পরে আসিবে। হে আমার যুবক বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও —ইহাই তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ। গীতা পাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের অধিকতর সমীপবর্ত্তী হইবে। আমাকে অতি সাহসপূর্ব্বক একথাগুলি বলিতে হইতেছে; কিন্তু না বলিলেই নয়। আমি তোমাদিগকে ভালবাসি। আমি জানি, জুতা কোন খানে পায়ে লাগিতেছে। আমার যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে। তোমাদের বলি, তোমাদের শরীর একটু শক্ত হইলে তোমরা গীতা অপেক্ষাকৃত ভাল বুঝিবে। তোমাদের রক্ত একটু তাজা হইলে

গীতা ও ফুটবল

তোমরা শ্রীকৃষ্ণের মহতী প্রতিভা ও মহান্ বীর্য্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। যখন তোমাদের শরীর তোমাদের পায়ের উপর দৃঢ়ভাবে অবস্থিত হইবে, যখন তোমরা আপনাদিগকে মানুষ বলিয়া জানিবে, তখনই তোমরা উপনিষদ্ ও আত্মার মহিমা ভাল করিয়া বুঝিবে। এইরূপে বেদান্ত আমাদের কাজে লাগাইতে হইবে। লোকে অনেক সময় আমার অদ্বৈতবাদ প্রচারে বিরক্ত হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ বা অন্য কোন বাদ প্রচার করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমাদের এখন কেবল আবশ্যক—আত্মার এই অপূর্ব্বতত্ত্ব, উহার অনন্ত শক্তি, অনন্ত বীর্য্য, অনন্ত শুদ্ধত্ব ও অনন্ত পূর্ণতার তত্ত্ব অবগত হওয়া।

যদি আমার একটি ছেলে থাকিত, তবে সে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র আমি তাহাকে বলিতে আরম্ভ করিতাম, 'ত্বমসি নিরঞ্জনঃ'। তোমরা অবশ্যই পুরাণে রাজ্ঞী মদালসার সেই সুন্দর উপাখ্যান পাঠ করিয়াছ। তাঁহার সন্তান হইবামাত্র তিনি তাহাকে স্বহস্তে দোলায় স্থাপন করিয়া দোল দিতে দিতে তাহার নিকট গাহিতে আরম্ভ করিলেন, 'ত্বমসি নিরঞ্জনঃ'। এই উপাখ্যানের মধ্যে মহান্ সত্য নিহিত রহিয়াছে। তুমি আপনাকে মহান্ বলিয়া উপলব্ধি কর, তুমি মহান্ হইবে। সকলেই জিজ্ঞাসা করিতেছে, আমি সমস্ত জগৎ ঘুরিয়া কি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলাম? ইংরাজ পাপ, পাপী ইত্যাদি লইয়া অনেক কথা বলিয়া থাকে আর বাস্তবিক যদি সকল ইংরাজ আপনাদিগকে পাপী বলিয়া বিশ্বাস করিত, তবে আফ্রিকার মধ্যভাগনিবাসী নিগ্রোদের অবস্থার সহিত তাহাদের কোন পার্থক্য

'ত্বমসি নিরঞ্জনঃ'

থাকিত না। ঈশ্বরেচ্ছায় সে একথা বিশ্বাস করে না, বরং বিশ্বাস করে, সে জগতের অধীশ্বর হইয়া জন্মিয়াছে, সে আপনার মহত্ত্বে বিশ্বাসী ; সে বিশ্বাস করে, সে সব করিতে পারে, ইচ্ছা হইলে সে সূর্য্যলোকে চন্দ্রলোকে যাইতে পারে; তাহাতেই সে বড় হইয়াছে। যদি সে তাহার পুরোহিতদের বাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়া বিশ্বাস করিত যে, সে একজন ক্ষুদ্র হতভাগ্য পাপী মাত্র, অনন্ত কাল ধরিয়া তাহাকে নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইবে, তবে আজ তাহাকে যেরূপ দেখিতেছ, সেরূপ বড় সে কখন হইত না। এইরূপ আমি প্রত্যেক জাতির ভিতরই দেখিতে পাই, তাহাদের পুরোহিতেরা যাহাই বলুক এবং তাহারা যতই কুসংস্কারাচ্ছন্ন হউক, তাহাদের আভ্যন্তরীণ ব্রহ্মভাব কখন বিলুপ্ত হইবে না, উহা ফুটিয়া উঠিবেই উঠিবে। আমরা বিশ্বাস হারাইয়াছি। তোমরা কি আমার কথায় বিশ্বাস করিবে?—আমরা ইংরাজ নরনারী অপেক্ষা কম বিশ্বাসী, সহস্রগুণে কম বিশ্বাসী। আমাকে স্পষ্ট কথা বলিতে হইতেছে, কিন্তু না বলিয়া উপায় নাই। তোমরা কি দেখিতেছ না, ইংরাজ নরনারী যখন আমাদের ধর্ম্মতত্ত্ব একটু আধটু বুঝিতে পারে, তখন তাহারা যেন উহা লইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠে, আর যদিও উহারা রাজার জাতি, তথাপি তাহাদের স্বদেশীয় লোকের উপহাস ও বিদ্রূপ উপেক্ষা করিয়া ভারতে আমাদের ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়া থাকে? তোমাদের মধ্যে কয়জন এরূপ করিতে পার? এই কথাটি কেবল ভাবিয়া দেখ। আর করিতে পার না কেন? তোমরা কি জান না বলিয়া করিতে

ইংরাজেরা বড় কিসে? তাহাদের আত্মবিশ্বাসের জোরে

পার না ?—তাহা নয়, তাহাদের অপেক্ষা তোমরা বেশী জান, তাই তোমরা কাজে করিতে পার না। তোমাদের পক্ষে যতটা জানিলে কল্যাণ, তাহা অপেক্ষা তোমরা বেশী জান ; ইহাই তোমাদের মুশকিল। তোমাদের রক্ত কলুষিত, তোমাদের মস্তিষ্ক আবিল, তোমাদের শরীর দুর্ব্বল। শরীরটাকে বদলাইয়া ফেল, শরীরটা বদলাইতে হইবে। শারীরিক দৌর্ব্বল্যই সকল অনিষ্টের মূল, আর কিছু নহে। গত কয়েক শত বর্ষ ধরিয়া তোমরা নানাবিধ সংস্কার, আদর্শ প্রভৃতির কথা কহিয়াছ, কিন্তু কাজের সময় আর তোমাদের টিকি দেখিতে পাওয়া যায় না। ক্রমশঃ তোমাদের আচরণে সমগ্র জগৎ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, আর সংস্কার নামটা পর্য্যন্ত সমগ্র জগতের উপহাসের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার কারণ কি ? তোমাদের জ্ঞানের কি কিছু কম্‌তি আছে ? জ্ঞানের কম্‌তি কোথায় ? তোমরা যে অতিরিক্ত জ্ঞানী ! সকল অনিষ্টের মূল কারণ এই যে, তোমরা দুর্ব্বল, দুর্ব্বল, অতি দুর্ব্বল, তোমাদের শরীর দুর্ব্বল, মন দুর্ব্বল, তোমাদের আত্মবিশ্বাস একেবারেই নাই। শত শত শতাব্দী ধরিয়া অভিজাত জাতি, রাজা ও বৈদেশিকেরা তোমাদের উপর অত্যাচার করিয়া তোমাদিগকে পিষিয়া ফেলিয়াছে ; হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের স্বজন তোমাদের সব বল হরণ করিয়াছে। তোমরা এক্ষণে পদদলিত ভগ্নদেহ, মেরুদণ্ডহীন কীটের ন্যায় হইয়াছ। কে আমাদিগকে এক্ষণে বল দিবে ? আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, আমাদের চাই এক্ষণে বল, চাই এক্ষণে বীর্য্য।

তোমরা জান বেশী, কিন্তু শারীরিক দৌর্ব্বল্যহেতু তোমাদের কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই

এই বীর্য্যলাভের প্রথম উপায়—উপনিষদে বিশ্বাসী হওয়া ও বিশ্বাস করা যে, 'আমি আত্মা! আমায় তরবারি ছেদন করিতে পারে না, কোন যন্ত্র আমাকে ভেদ করিতে পারে না, অগ্নি আমায় দগ্ধ করিতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না; আমি সর্ব্বশক্তিমান্! আমি সর্ব্বজ্ঞ!' অতএব এই আশাপ্রদ, পরিত্রাণপ্রদ বাক্যগুলি সর্ব্বদা উচ্চারণ কর। বলিও না—আমরা দুর্ব্বল। আমরা সব করিতে পারি। আমরা কি না করিতে পারি? আমাদের দ্বারা সবই হইতে পারে। আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে সেই মহিমময় আত্মা রহিয়াছেন। উহাতে বিশ্বাসী হইতে হইবে। নচিকেতার ন্যায় বিশ্বাসী হও। নচিকেতার পিতা যখন যজ্ঞ করিতেছিলেন, তখন নচিকেতার ভিতর শ্রদ্ধা প্রবেশ করিল। আমার ইচ্ছা—তোমাদের প্রত্যেকের ভিতর সেই শ্রদ্ধা আবির্ভূত হউক, তোমাদের প্রত্যেকেই বীরদর্পে দণ্ডায়মান হইয়া ইঙ্গিতে জগৎ-পরিচালনকারী মহামনীষাসম্পন্ন মহাপুরুষ হও, সর্ব্বপ্রকারে অনন্ত ঈশ্বরতুল্য হও; আমি তোমাদের সকলকেই এইরূপ দেখিতে চাই। উপনিষদ্ হইতে তোমরা এইরূপ শক্তিলাভ করিবে, উহা হইতে তোমরা এই বিশ্বাস পাইবে। এই সব উপনিষদে রহিয়াছে।

উপায়—উপনিষদুক্ত আত্মতত্ত্বে বিশ্বাস

এঁ্যা, এ যে শুধু সন্ন্যাসীর জন্য, এ যে রহস্য-বিদ্যা! প্রাচীন-কালে অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীরাই কেবল উপনিষদের চর্চ্চা করিতেন। শঙ্কর একটু সদয় হইয়া বলিলেন, গৃহস্থেরাও উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিতে পারে; ইহাতে তাঁহাদের কল্যাণই হইবে, কোন অনিষ্ট হইবে না। তবু লোকের মন হইতে এ সংস্কার এখনও যায় না যে,

উপনিষদে কেবল বনজঙ্গলের কথাই আছে। আমি তোমাদিগকে সেদিনই বলিয়াছি, যিনি স্বয়ং বেদের প্রকাশ, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাই বেদের একমাত্র টীকা—একমাত্র প্রামাণ্য টীকাস্বরূপ গীতা একবার চিরকালের মত কৃত হইয়াছে। ইহার উপর আর কোন টীকা টিপ্পনী চলিতে পারে না। এই গীতায় বেদান্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে। তুমি যে কার্য্যই কর না কেন, তোমার পক্ষে বেদান্তের প্রয়োজন। বেদান্তের এই সকল মহান্ তত্ত্ব কেবল অরণ্যে বা গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকিবে না; বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটীরে, মৎস্যজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে সর্ব্বত্র এই সকল তত্ত্ব আলোচিত ও কার্য্যে পরিণত হইবে। প্রত্যেক নরনারী, প্রত্যেক বালকবালিকা, যে যে কার্য্য করুক না কেন, যে যে অবস্থায় অবস্থিত থাকুক না কেন, সর্ব্বত্র বেদান্তের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক।

উপনিষদ্ কি কেবল সন্ন্যাসীর জন্য ?

আর ভয়ের কোন কারণ নাই। উপনিষদ্ নিহিত তত্ত্বাবলী জেলেমালা প্রভৃতি ইতর সাধারণে কিরূপে কার্য্যে পরিণত করিবে? ইহার উপায় শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে—অনন্ত পথ আছে—ধর্ম্ম অনন্ত, ধর্ম্মের গণ্ডি ছাড়াইয়া কেহ যাইতে পারে না। আর তুমি যাহা করিতেছ তোমার পক্ষে তাহাই অতি উত্তম। অতি স্বল্প কর্ম্মও যথাযথ ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে তাহা হইতে অদ্ভুত ফল লাভ হয়; অতএব যে যতটুকু পারে, করুক। মৎস্যজীবী যদি আপনাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল মৎস্যজীবী হইবে; বিদ্যার্থী যদি আপনাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা

সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বেদান্ত-জ্ঞান বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা ও উহার কার্য্যকারিতা

করে, তবে সে একজন শ্রেষ্ঠ বিদ্যার্থী হইবে। উকিল যদি আপনাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল উকিল হইবে। এইরূপ অন্যান্য সকলের সম্বন্ধেই জানিতে হইবে।

আর ইহার ফল এই হইবে যে, জাতিবিভাগ অনন্তকালের জন্য থাকিয়া যাইবে। সমাজের প্রকৃতিই এই,—বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া। তবে চলিয়া যাইবে কি? বিশেষ বিশেষ অধিকারগুলি আর থাকিবে না। জাতিবিভাগ প্রাকৃতিক নিয়ম। সামাজিক জীবনে আমি কোন বিশেষ কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারি, তুমি অপর কার্য্য করিতে পার। তুমি না হয় একটা দেশ শাসন করিতে পার, আমি এক-জোড়া ছেঁড়া জুঁতা সারিতে পারি। কিন্তু তা বলিয়া তুমি আমা অপেক্ষা বড় হইতে পার না। —তুমি কি আমার জুতা সারিয়া দিতে পার? আমি কি দেশ শাসন করিতে পারি? এই কার্য্যবিভাগ স্বাভাবিক। আমি জুতা সেলাই করিতে পটু, তুমি বেদপাঠে পটু। তা বলিয়া তুমি আমার মাথায় পা দিতে পার না, তুমি খুন করিলে তোমার প্রশংসা করিতে হইবে, আর আমি একটা আম চুরি করিলে আমার ফাঁসি দিতে হইবে, এরূপ হইতে পারে না। এই অধিকার-তারতম্য উঠিয়া যাইবে। জাতিবিভাগ ভাল জিনিস। জীবন-সমস্যা সমাধানের ইহাই একমাত্র স্বাভাবিক উপায়। লোকে আপনাদিগের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ করিবে; ইহা অতিক্রম করিবার উপায় নাই। যেখানেই যাও, জাতিবিভাগ থাকিবেই। কিন্তু তাহার অর্থ

বেদান্তপ্রচারের দ্বারা জাতি-বিভাগ অনন্তকালের জন্য থাকিয়া যাইবে, বিশেষ বিশেষ অধিকারগুলি কেবল নষ্ট হইবে

ইহা নহে যে, এই অধিকার তারতম্যগুলিও থাকিবে। এগুলিকে সমূলে নির্ম্মূল করিতে হইবে। যদি জেলেকে বেদান্ত শিখাও, সে বলিবে, তুমিও যেমন আমিও তেমন, তুমি না হয় দার্শনিক, আমি না হয় মৎস্যজীবী। কিন্তু তোমার ভিতর যে ঈশ্বর আছেন, আমার ভিতরও সে ঈশ্বর আছেন, আর ইহাই আমরা চাই—কাহারও কোন বিশেষ অধিকার নাই, অথচ প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতি করিবার সমান সুবিধা।

সকল ব্যক্তিকেই তাহার আভ্যন্তর ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দাও। প্রত্যেকে নিজেই নিজের মুক্তিসাধন করিবে। উন্নতির জন্য প্রথম প্রয়োজন—স্বাধীনতা। যদি তোমাদের মধ্যে কেহ একথা বলিতে সাহসী হয় যে, আমি অমুক রমণী বা অমুক ছেলেটির মুক্তি দিয়া দিব, তবে উহা অতি অন্যায় কথা, অত্যন্ত ভুল কথা বলিতে হইবে। আমি বারংবার পৃষ্ট হইয়াছি, আপনি বিধবাদিগের ও সমগ্র রমণীজাতির উন্নতির উপায় সম্বন্ধে কি মনে করেন? আমি এ প্রশ্নের এই শেষ উত্তর দিতেছি —আমি কি বিধবা যে, আমাকে এই বাজে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমি কি স্ত্রীলোক যে, আমাকে বারংবার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ? তুমি কে হে, গায়ে পড়িয়া নারীজাতির সমস্যাসমাধানে আগুয়ান হইতেছ? তুমি প্রত্যেক বিধবা ও প্রত্যেক রমণীর ভাগ্যবিধাতা সাক্ষাৎ ভগবান্ না-কি? তফাৎ! উহারা আপনাদের সমস্যা আপনারাই পূরণ করিবে। কি আপদ, যথেচ্ছাচারী অত্যাচারিগণ, তোমরা ভাবিতেছ, তোমরা সকলের জন্য সব করিতে

আমরা জগতের সাহায্য করিতে পারি না, সেবায় আমাদের অধিকার

পার! যাও, তফাৎ হও। ভগবান্ সকলকে দেখিবেন। তুমি কে যে, তুমি আপনাকে সর্ব্বজ্ঞ মনে করিয়া লইয়াছ? হে নাস্তিকগণ, তোমরা খোদার উপর খোদকারি করিতে সাহস কর কিসে? কারণ, হে নাস্তিকগণ, তোমরা কি জান না, সকল আত্মাই পরমাত্মাস্বরূপ? নিজের চরকায় তেল দাও, তোমার নিজের ঘাড়ে এক বোঝা কর্ম্ম রহিয়াছে। হে নাস্তিকগণ, তোমাদের সমগ্র জাতি তোমাকে গাছে তুলিয়া দিতে পারে, সমাজ তোমাকে হাতেতালি দিয়া আকাশে তুলিয়া দিতে পারে, আহাম্মকেরা তোমার সুখ্যাতি করিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর নিদ্রিত নহেন; তিনি তোমাকে ধরিয়া ফেলিবেন আর ইহলোকে বা পরলোকে তুমি নিশ্চিত শাস্তি পাইবে। অতএব প্রত্যেক নরনারীকে, সকলকেই ঈশ্বরদৃষ্টিতে দেখিতে থাক। তুমি কাহাকেও সাহায্য করিতে পার না, তুমি কেবল সেবা করিতে পার। প্রভুর সন্তানদিগকে, যদি সৌভাগ্য হয়, তবে স্বয়ং প্রভুকে সেবা কর। যদি প্রভুর অনুগ্রহে তাঁহার কোন সন্তানের সেবা করিতে পার, তবে তুমি ধন্য হইবে। নিজেকে একটা কেষ্টবিষ্টু ভাবিও না। তুমি ধন্য যে, তুমি সেবা করিবার অধিকার পাইয়াছ, অপরে পায় নাই। অতএব তফাৎ, কেহই তোমার সাহায্য প্রার্থনা করে না। উহা তোমার পূজাস্বরূপ। আমি কতকগুলি দরিদ্র ব্যক্তিকে দেখিতেছি, আমার নিজ মুক্তির জন্য আমি তাহাদের নিকট যাইয়া তাহাদের পূজা করিব; ঈশ্বর সেখানে রহিয়াছেন। কতকগুলি ব্যক্তি যে দুঃখ ভুগিতেছে, সে তোমার আমার মুক্তির জন্য—যাহাতে আমরা রোগী, পাগল, কুষ্ঠী, পাপী প্রভৃতি রূপধারী প্রভুর পূজা করিতে পারি। আমার কথাগুলি বড় কঠিন হইতেছে, কিন্তু আমাকে ইহা বলিতেই হইবে,

কারণ, তোমার আমার জীবনের ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য যে আমরা প্রভুকে এই সকল বিভিন্নরূপে সেবা করিতে পারি। কাহারও কল্যাণ করিতে পার, এ ধারণা ছাড়িয়া দাও। তবে যেমন বীজকে জল, মৃত্তিকা, বায়ু প্রভৃতি তাহার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি যোগাইয়া দিলে উহা নিজ প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী যাহা কিছু আবশ্যক গ্রহণ করে ও নিজের স্বভাবানুযায়ী বাড়িতে থাকে, তুমি সেই ভাবে অপরের কল্যাণ সাধন করিতে পার।

জগতে জ্ঞানালোক বিস্তার কর; আলোক! আলোক লইয়া এস। প্রত্যেক ব্যক্তি জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হউক; যতক্ষণ না সকলেই ভগবানের নিকট পৌঁছায়, ততক্ষণ যেন তোমাদের কার্য্য শেষ না হয়। দরিদ্রের নিকট জ্ঞানালোক বিস্তার কর, ধনীদের নিকট আরও অধিক আলো লইয়া এস, কারণ, দরিদ্র অপেক্ষা ধনীদের অধিক আলোর প্রয়োজন। অশিক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট আলোক লইয়া এস, শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট আরও অধিক আলো, কারণ, আজকাল শিক্ষাভিমান বড়ই প্রবল। এইরূপে সকলের নিকট আলোক বিস্তার কর, অবশিষ্ট যাহা কিছু সেই প্রভু করিবেন, কারণ, সেই ভগবানই বলিয়াছেন,—

জগতের সর্ব্বত্র জ্ঞানালোক বিস্তার কর

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥

গীতা—২।৪৭

কর্ম্মেই তোমার অধিকার, ফলে নহে; তুমি এমন ভাবে কর্ম্ম

করিও না, যাহাতে তাহার ফল তোমায় ভোগ করিতে হয়; অথচ কর্ম্মত্যাগে যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।

যিনি শত শত যুগ পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগকে এইরূপ মহোচ্চ তত্ত্বসমূহ শিখাইয়াছেন, তিনি যেন আমাদিগকে তাঁহার আদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তিলাভে সাহায্য করেন।

ভারতীয় মহাপুরুষগণ

ভারতীয় মহাপুরুষগণের কথা বলিতে গিয়া আমার মনে সেই প্রাচীনকালের কথা উদিত হইতেছে, ইতিহাস যে কালের কোন ঘটনার উল্লেখ করে না এবং কিংবদন্তী যে সুদূর অতীতের ঘনান্ধকার হইতে রহস্য উদ্ঘাটনের বৃথা চেষ্টা করিয়া থাকে। ভারতে অসংখ্য মহাপুরুষ জন্মিয়া গিয়াছেন—বাস্তবিক হিন্দুজাতি সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া অসংখ্য মহাপুরুষ প্রসব ব্যতীত আর কিছুই করে নাই। সুতরাং আমি তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কয়েকজন যুগপ্রবর্ত্তনকারী আচার্য্যের কথা অর্থাৎ আমি তাঁহাদের চরিত্র আলোচনা করিয়া যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাই তোমাদের নিকট বলিব। প্রথমতঃ আমাদের শাস্ত্রসম্বন্ধে আমাদের কিছু বুঝা আবশ্যক। আমাদের শাস্ত্রে দ্বিবিধ সত্যের বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রথম সনাতন সত্য; দ্বিতীয় প্রকারটি প্রথমোক্তের ন্যায় ততদূর প্রামাণ্য না হইলেও বিশেষ বিশেষ দেশকালপাত্রে প্রযুজ্য। জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ এবং উহাদের পরস্পর সম্বন্ধের বিষয় শ্রুতি বা বেদে লিপিবদ্ধ আছে। দ্বিতীয় প্রকার সত্য,—স্মৃতি, যথা মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতায়, এবং পুরাণে ও তন্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। এগুলির প্রামাণ্য শ্রুতির অধীন, কারণ, স্মৃতি যদি শ্রুতির বিরোধী হয়, তবে শ্রুতিকেই সে স্থলে মানিতে হইবে। ইহাই শাস্ত্রবিধান। তাৎপর্য্য এই যে শ্রুতিতে জীবাত্মার নিয়তি ও তাহার চরম লক্ষ্য বিষয়ক

সনাতন সত্য ও যুগধর্ম্ম

মুখ্য তত্ত্বসমূহের সম্পূর্ণ বর্ণনা আছে, কেবল গৌণ বিষয়গুলি —যাহা উহাদের বিস্তার, তাহাই বিশেষভাবে বর্ণনা করা স্মৃতি ও পুরাণের কার্য্য। সাধারণ ভাবে উপদেশ দিতে হইলে শ্রুতিই পর্য্যাপ্ত; ধর্ম্মজীবন যাপনের সার তত্ত্বসম্বন্ধে শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট উপদেশের অধিক আর কিছু বলা যাইতে পারে না, আর কিছু জানিবার নাই। এবিষয়ে যাহা কিছু প্রয়োজন, সবই শ্রুতিতে আছে; জীবাত্মার সিদ্ধিলাভের জন্য যে সকল উপদেশের প্রয়োজন, শ্রুতিতে তাহা সম্পূর্ণরূপে কথিত হইয়াছে। কেবল বিশেষ বিশেষ অবস্থার বিশেষ বিশেষ বিধান শ্রুতিতে নাই; স্মৃতি বিভিন্ন সময়ের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। শ্রুতির আর একটি বিশেষত্ব আছে। যে সকল মহাপুরুষ শ্রুতিতে বিভিন্ন সত্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, (ইঁহাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই অধিক, তবে কয়েকজন নারীরও উল্লেখ দেখা যায়) তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে, যথা তাঁহাদের জন্মের সন তারিখ প্রভৃতি বিষয়সম্বন্ধে, আমরা অতি সামান্যই জানিতে পারি; কিন্তু তাঁহাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিন্তা (তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ আবিষ্ক্রিয়া বলিলেই ভাল হয়) আমাদের দেশের ধর্ম্মসাহিত্যরূপ বেদে লিপিবদ্ধ ও রক্ষিত আছে। স্মৃতিতে কিন্তু মহাপুরুষগণের জীবনী ও কার্য্য-কলাপই বিশেষভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। স্মৃতিতেই আমরা প্রথমে অদ্ভুত, মহাশক্তিশালী, মনোহরচরিত্র, ইঙ্গিতে সমগ্র জগতের পরিচালক মহাপুরুষগণের পরিচয় পাইয়া থাকি—তাঁহাদের চরিত্র এতদূর উন্নত যে, তাঁহাদের উপদেশাবলীও যেন তাহার নিকট ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়।

আমাদের ধর্ম্মের এই বিশেষত্বটি আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, আমাদের ধর্ম্মে যে ঈশ্বরের উপদেশ আছে, তিনি নির্গুণ অথচ সগুণ। উহাতে ব্যক্তিগত সম্বন্ধরহিত অনন্ত সনাতন তত্ত্বসমূহের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য ব্যক্তি অর্থাৎ অবতারের উপদেশ আছে। কিন্তু শ্রুতি বা বেদই আমাদের ধর্ম্মের মূল—উহাতে কেবল সনাতনতত্ত্বের উপদেশ; বড় বড় অবতার, আচার্য্য ও মহাপুরুষগণের বিষয় সমস্তই স্মৃতি ও পুরাণে আছে। আর ইহাও লক্ষ্য করিও যে, কেবল আমাদের ধর্ম্ম ছাড়া জগতের অন্যান্য সকল ধর্ম্মই কোন বিশেষ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের জীবনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে সম্বদ্ধ। খৃষ্টধর্ম্ম খৃষ্টের, মুসলমানধর্ম্ম মহম্মদের, বৌদ্ধধর্ম্ম বুদ্ধের, জৈনধর্ম্ম জিনগণের এবং অন্যান্য ধর্ম্ম অন্যান্য বক্তিগণের জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ঐ সকল ধর্ম্মে ঐ মহাপুরুষগণের জীবনের তথাকথিত ঐতিহাসিক প্রমাণ লইয়া যে যথেষ্ট বিবাদ হইয়া থাকে তাহা স্বাভাবিক। যদি কখন এই প্রাচীন মহাপুরুষগণের অস্তিত্ব বিষয়ে ঐতিহাসিক প্রমাণ দুর্ব্বল হয়, তবে তাঁহাদের ধর্ম্মরূপ অট্টালিকা পড়িয়া গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবেই যাইবে। আমাদের ধর্ম্ম ব্যক্তিবিশেষের জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া সনাতন তত্ত্বসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া আমরা এই বিপদ্ এড়াইয়াছি। কোন মহাপুরুষ, এমন কি, কোন অবতার বলিয়া গিয়াছেন বলিয়াই যে, তোমরা তোমাদের ধর্ম্ম মানিয়া চল, তাহা নহে। কৃষ্ণের বচনে বেদের প্রামাণ্য

হিন্দু ও অন্যান্য ধর্ম্মের প্রভেদ ; অন্যান্য ধর্ম্ম ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি সনাতন সত্য

সিদ্ধ হয় না, কিন্তু বেদানুগত বলিয়াই কৃষ্ণবাক্যের প্রামাণ্য। কৃষ্ণের মাহাত্ম্য এই যে, বেদের প্রচারক যত হইয়াছেন, তন্মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অন্যান্য অবতার ও সমুদয় মহাপুরুষ সম্বন্ধেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। আমরা গোড়াতেই একথা স্বীকার করিয়া লই যে, মানুষের পূর্ণতা লাভের জন্য, তাহার মুক্তির জন্য, যাহা কিছু আবশ্যক সবই বেদে কথিত হইয়াছে। নূতন কিছু আর আবিষ্কার হইতে পারে না। তোমরা কখনই সকল জ্ঞানের চরম লক্ষ্যস্বরূপ পূর্ণ একত্বের অধিক অগ্রসর হইতে পার না। বেদ অনেক দিন পূর্ব্বেই এই পূর্ণ একত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহা হইতে অধিক অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। যখনই 'তত্ত্বমসি' আবিষ্কৃত হইল, তখনই আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পূর্ণ হইল; এই 'তত্ত্বমসি' বেদে রহিয়াছে। বাকি রহিল কেবল বিভিন্ন দেশকাল-পাত্র অনুসারে সময়ে সময়ে লোকশিক্ষা। এই প্রাচীন সনাতন পথে জনগণকে পরিচালনা করা—ইহাই বাকি রহিল; সেইজন্যই সময়ে সময়ে বিভিন্ন মহাপুরুষ ও আচার্য্যগণের অভ্যুদয় হইয়া থাকে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের সেই সর্ব্বজনপরিজ্ঞাত বাণীতে এই তত্ত্বটি যেরূপ পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে কথিত হইয়াছে, আর কুত্রাপি তদ্রূপ হয় নাই।

'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥' ইত্যাদি—৪।৭

'যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি আপনাকে সৃষ্টি করিয়া থাকি। অধর্ম্মের নাশের জন্য আমি সময়ে সময়ে অবিভূর্ত হইয়া থাকি।' ইত্যাদি—ইহাই ভারতীয় ধারণা।

ইহা হইতে কি দাঁড়াইতেছে? দাঁড়াইতেছে এই যে, একদিকে এক সনাতন তত্ত্বসমূহ রহিয়াছে। ঐগুলি স্বতঃপ্রমাণ, উহারা কোন-রূপ যুক্তির উপর পর্য্যন্ত নির্ভর করে না— ঋষিগণের (তাঁহারা যতই বড় হউন) বা অবতারগণের (তাঁহারা যতই মহিমাসম্পন্ন হউন) বাক্যের উপর নির্ভর করা ত দূরের কথা। আমরা এখানে একথা বলিতে পারি যে, অন্যান্য দেশ হইতে ভারতীয় চিন্তার এই বিশেষত্ব আছে বলিয়া আমরা বেদান্তকেই একমাত্র সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম বলিয়া দাবি করিতে পারি, বেদান্তই জগতের একমাত্র বর্ত্তমান সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না, উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমূহই শিক্ষা দিয়া থাকে; কোন ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ধর্ম্ম, জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না। আমাদের দেশেই আমরা দেখিতে পাই, এখানে কত কত মহাপুরুষ হইয়া গিয়াছেন। আমরা একটা ক্ষুদ্র শহরেই দেখিতে পাই, সেই শহরের বিভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন শত শত লোককে আপনাদের আদর্শ করিয়া থাকে। সুতরাং মহম্মদ, বুদ্ধ বা খৃষ্ট এরূপ কোন এক ব্যক্তি কিরূপে সমগ্র জগতের একমাত্র আদর্শস্বরূপ হইতে পারেন? অথবা সেই এক ব্যক্তির বাক্য-প্রমাণেই বা সমগ্র নীতিবিদ্যা, আধ্যাত্মিকতত্ত্ব ও ধর্ম্মকে সত্য বলিয়া কিরূপে স্বীকার করা যায়? বৈদান্তিক ধর্ম্মে এরূপ কোন ব্যক্তিবিশেষের বাক্যকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিবার আবশ্যক হয় না। মানবের সনাতন প্রকৃতিই ইহার প্রমাণ, ইহার নীতিতত্ত্ব মানবজাতির সনাতন আধ্যাত্মিক

হিন্দুধর্ম্মই একমাত্র সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম কেন?

১৭

একত্বরূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ; এই একত্ব চেষ্টা করিয়া লাভ করিবার নয়, উহা পূর্ব্ব হইতেই লব্ধ !

অন্যদিকে আবার আমাদের ঋষিরা অতিপ্রাচীন কাল হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, জগতের অধিকাংশ লোকই কোন না কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর না করিয়া থাকিতে পারে না। কোন না কোন আকারে লোকে একজন ব্যক্তিবিশেষরূপ ঈশ্বর করিয়া লয়। যে বুদ্ধদেব ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া গেলেন, তাঁহার দেহত্যাগের পর পঞ্চাশ বর্ষ যাইতে না যাইতেই তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে ঈশ্বর করিয়া তুলিল। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের প্রয়োজন আছে। আর আমরা জানি, ঈশ্বরের বৃথা কল্পনা হইতে (অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ কাল্পনিক ঈশ্বর মানবের উপাসনার অযোগ্য) শ্রেষ্ঠতর জীবন্ত ঈশ্বরসকল এই পৃথিবীতে সময়ে সময়ে আমাদের মধ্যেই আবির্ভূত হইয়া বাস করিয়া থাকেন। কোনরূপ কাল্পনিক ঈশ্বর হইতে, আমাদের কল্পনাসৃষ্ট কোন বস্তু হইতে, অর্থাৎ আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে যতটা ধারণা করিতে পারি, তাহা হইতে, তাঁহারা অধিকতর পূজার যোগ্য। ঈশ্বর সম্বন্ধে তুমি আমি যতটা ধারণা করিতে পারি, তাহা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ অনেক বড়। আমরা আমাদের মনে যতদূর উচ্চ আদর্শের চিন্তা করিতে পারি, বুদ্ধ তদপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ, জীবন্ত আদর্শ। সেই জন্যই সর্ব্বপ্রকার কাল্পনিক দেবতাকেও পদচ্যুত করিয়া তাঁহারা চিরকাল মানবের পূজা পাইয়া

অপরদিকে শাস্ত্রকারগণ ঐতিহাসিক আদর্শের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করিয়াছিলেন

আসিয়াছেন। আমাদের ঋষিরা ইহা জানিতেন; সেইজন্য তাঁহারা ভারতবাসী সকলের পক্ষে এই মহাপুরুষগণের—এই অবতার-গণের পূজার পথ খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, যিনি আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবতার, তিনি আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিয়া গিয়াছেন,—

'যদ্ যদ্‌বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥' গীতা ১০।৪১

অর্থাৎ 'মানুষের মধ্য দিয়া যেখানেই অদ্ভুত আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ হয়, জানিও আমি সেখানে বর্ত্তমান; আমা হইতেই এই আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে।'

ইহা দ্বারা হিন্দুগণের পক্ষে সকল দেশের সকল অবতারকে উপাসনা করিবার দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। হিন্দু যে কোন দেশের যে কোন সাধু মহাত্মার পূজা করিতে পারে। আমরা কার্য্যতঃও দেখিতে পাই, আমরা অনেক সময় খৃষ্টানদের চার্চ্চে ও মুসলমানদের মসজিদে গিয়া উপাসনা করিয়া থাকি। ইহা ভালই বলিতে হইবে। কেন আমরা এরূপ উপাসনা না করিব? আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের ধর্ম্ম সার্ব্বভৌম। উহা এত উদার, এত প্রশস্ত যে, উহা সর্ব্বপ্রকার আদর্শকেই সাদরে গ্রহণ করিতে পারে; জগতে যতপ্রকার ধর্ম্মের আদর্শ আছে, তাহাদিগকে এখনই গ্রহণ করা যাইতে পারে, আর ভবিষ্যতে যে সকল বিভিন্ন আদর্শ আসিবে, তাহাদের জন্য আমরা ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিতে পারি। সেগুলিকেও ঐরূপে গ্রহণ করিতে হইবে,

সকল দেশের সকল ধর্ম্মের সকল অবতারই হিন্দুর উপাস্য

বৈদান্তিক ধর্ম্মই তাঁহার অনন্ত বাহু প্রসারিত করিয়া সকল গুলিকেই আলিঙ্গন করিয়া লইবেন।

ঈশ্বরাবতার সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি ধারণা এই। ইঁহাদের অপেক্ষা একটু নিম্নশ্রেণীর আর এক প্রকার মহাপুরুষ আছেন; বেদে 'ঋষি' শব্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, আর আজকাল ইহা একটি চলিত শব্দ হইয়া পড়িয়াছে—ঋষিবাক্যের বিশেষ প্রামাণ্য। আমাদিগকে ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। ঋষি অর্থে মন্ত্রদ্রষ্টা অর্থাৎ যিনি কোন তত্ত্বের সাক্ষাৎকার করিয়াছেন। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল যে, ধর্ম্মের প্রমাণ কি? বহিরিন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যে ধর্ম্মের সত্যতা প্রমাণিত হয় না, ইহা অতি প্রাচীন কাল হইতেই ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন।

ঋষি অর্থাৎ যিনি ধর্ম্মকে সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন।

'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ॥' ২।৪

—তৈত্তিরীয় উপনিষদ্।

অর্থাৎ 'মনের সহিত বাক্য, যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে ফিরিয়া আসে।'

'ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ ॥' ইত্যাদি ১।৩।

—কেন উপনিষদ্।

'যেখানে চক্ষু যাইতে পারে না, বাক্যও যাইতে পারে না, মনও নহে।' ইত্যাদি।

শত শত যুগ ধরিয়া ঋষিরা এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। বাহ্য প্রকৃতি আমাদিগকে আত্মার অস্তিত্ব, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, অনন্ত

জীবন, মানবের চরম লক্ষ্য প্রভৃতি বিষয়ে কোন উত্তর দিতে অক্ষম। এই মনের সর্ব্বদা পরিণাম হইতেছে, সর্ব্বদাই যেন উহার প্রবাহ চলিয়াছে, উহা সসীম, উহা যেন খণ্ড খণ্ড ভাবে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া রহিয়াছে। উহা কিরূপে সেই অনন্ত, অপরিবর্ত্তনীয়, অখণ্ড, অবিভাজ্য, সনাতন বস্তুর সংবাদ দিবে? কখনই দিতে পারে না। আর যখনই মানবজাতি চৈতন্যহীন জড় হইতে এই সকল প্রশ্নের উত্তর লাভ করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছে, ইতিহাসই জানেন, তাহার ফল কিরূপ অশুভ হইয়াছে। তবে ঐ বেদোক্ত জ্ঞান কোথা হইতে আসিল? ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইলে ঐ জ্ঞান লাভ হয়। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এই জ্ঞান লাভ হয় না,—ইন্দ্রিয়জ্ঞানই কি মানুষের সর্ব্বস্ব? কে ইহা বলিতে সাহসী হইবে? আমাদের জীবনে— আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনে এমন মুহূর্ত্তসকল আসিয়া থাকে, হয়ত আমাদের সম্মুখেই আমাদের কোন প্রিয়জনের মৃত্যু হইল অথবা আমরা অন্য কোনরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইলাম, অথবা অতিশয় আনন্দের কারণ হইল—এই সকল অবস্থায় সময়ে সময়ে মনটা যেন একেবারে স্থির হইয়া যায়। অনেক সময়ে অনেক অবস্থায় এমন ঘটে যে, মনটা স্থির হইয়া গিয়া ক্ষণকালের জন্য উহার প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পায়। তখন সে সেই অনন্তের একটু আভাস পায়, তখন আমাদের সম্মুখে এমন এক বস্তু প্রকাশিত হয় যেখানে মন বা বাক্য কিছুই যাইতে পারে না। সাধারণ লোকের জীবনেই সময়ে সময়ে এইরূপ ঘটিয়া থাকে ; অভ্যাসের দ্বারা এই অবস্থাকে প্রগাঢ়, স্থায়ী ও সম্পূর্ণ করিতে হইবে। মানব শত শত যুগ পূর্ব্বে আবিষ্কার করিয়াছিল যে, আত্মা ইন্দ্রিয় দ্বারা

বদ্ধ বা সীমাবদ্ধ নহে ; শুধু তাহাই নহে, উহা জ্ঞানের দ্বারাও সীমাবদ্ধ নহে ! আমাদের বুঝিতে হইবে যে, জ্ঞান সেই আত্মারূপ অনন্ত শৃঙ্খলের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। সত্তা জ্ঞানের সহিত অভিন্ন নহে, জ্ঞান সত্তার একটি অংশবিশেষ মাত্র। ঋষিরা জ্ঞানের অতীত ভূমিতে নির্ভীকভাবে আত্মানুসন্ধান করিয়াছেন। জ্ঞান পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা সীমাবদ্ধ। আধ্যাত্মিক জগতের সত্যলাভ করিতে হইলে মানুষকে উহার অতীত প্রদেশ, ইন্দ্রিয়ের বাহিরে যাইতেই হইবে। আর এখনও এমন ব্যক্তি সকল আছেন, যাঁহারা পঞ্চেন্দ্রিয়ের সীমার বহির্দ্দেশে যাইতে সক্ষম। ইঁহাদিগকে ঋষি বলে ; কারণ ইঁহারা আধ্যাত্মিক সত্যসমূহের সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। সুতরাং আমার সম্মুখস্থ এই টেবিলটিকে যেমন আমি প্রত্যক্ষ প্রমাণে জানিয়া থাকি, বেদনিহিত সত্যসমূহের প্রমাণও তদ্রূপ প্রত্যক্ষানুভূতি। টেবিলটিকে আমরা ইন্দ্রিয়যোগে উপলব্ধি করিয়া থাকি, আর আধ্যাত্মিক সত্যসমূহও জীবাত্মার জ্ঞানাতীত অবস্থায় সাক্ষাৎকৃত হইয়া থাকে। এই ঋষিত্ব লাভ দেশ কাল লিঙ্গ বা জাতিবিশেষের উপর নির্ভর করে না। বাৎস্যায়ন অকুতোভয়ে বলিয়াছিলেন যে, এই ঋষিত্ব ঋষির বংশধরগণের, আর্য্য অনার্য্য এমন কি ম্লেচ্ছগণের পর্য্যন্ত সাধারণ সম্পত্তি।

বেদের ঋষিত্ব বলিতে ইহাই বুঝায় ; আমাদিগকে ভারতীয় ধর্ম্মের এই আদর্শকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, আর আমি ইচ্ছা করি যে, জগতের অন্যান্য জাতিরাও এই আদর্শটিকে বুঝিয়া স্মরণ রাখিবেন, কারণ, তাহা হইলে বিভিন্ন ধর্ম্মে বিবাদ বিসম্বাদ কমিয়া যাইবে। শাস্ত্রপাঠে ধর্ম্মলাভ হয় না ; অথবা মতমতান্তরের

দ্বারা বা বচনে, এমন কি তর্কবুক্তি বিচারের দ্বারাও ধর্ম্মলাভ হয় না। ধর্ম্ম সাক্ষাৎকার করিতে হইবে—ঋষি হইতে হইবে। বন্ধুগণ, যতদিন না তোমাদের প্রত্যেকেই ঋষি হইতেছ, যতদিন না আধ্যাত্মিক সত্য সাক্ষাৎকার করিতেছ, ততদিন তোমাদের ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হয় নাই জানিবে। যতদিন না তোমাদের এই জ্ঞানাতীত অবস্থা খুলিয়া যায়, ততদিন ধর্ম্ম কেবল কথার কথা মাত্র, ততদিন কেবল ধর্ম্মলাভের জন্য প্রস্তুত হইতেছ মাত্র, ততদিন তোমরা পরের মুখে ঝাল খাইতেছ মাত্র। এক সময়ে বুদ্ধদেবের সহিত কতকগুলি ব্রাহ্মণের তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। সেই সময়ে তিনি একটি অতি সুন্দর কথা বলিয়াছিলেন —তাহা এখানে বেশ খাটে। ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধদেবের নিকট যাইয়া ব্রহ্মের স্বরূপসম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হন। সেই মহাপুরুষ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনারা কি ব্রহ্মকে দেখিয়াছেন?' তাঁহারা বলিলেন, 'না, আমরা দেখি নাই।' বুদ্ধদেব আবার তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, 'আপনাদের পিতৃগণ কি তাঁহাকে দেখিয়াছেন?' 'না, তাঁহারাও দেখেন নাই।' 'আপনাদের পিতামহগণ?' 'আমাদের বোধ হয়, তাঁহারাও তাঁহাকে দেখেন নাই।' তখন বুদ্ধদেব বলিলেন, 'বন্ধুগণ, আপনাদের পিতৃপিতামহগণও যাঁহাকে দেখেন নাই, এমন পুরুষসম্বন্ধে আপনারা কিরূপে বিচার দ্বারা পরস্পরকে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন?' সমগ্র জগৎ ইহাই করিতেছে। বেদান্তের ভাষায় আমাদিগকেও বলিতে হইবে—

ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে ঋষি হইতে হইবে—বুদ্ধদেব ও ব্রাহ্মণগণ

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ॥' ১।২।২৩
—কঠোপনিষৎ।

'বাগাড়ম্বর দ্বারা সেই আত্মাকে লাভ করা যায় না, প্রবল মেধা দ্বারাও তাঁহাকে লাভ করা যায় না, এমন কি, বেদপাঠের দ্বারাও নয়।'

জগতের সমগ্র জাতিকে বেদের ভাষায় আমাদিগকে বলিতে হইবে, তোমাদের বিবাদ বিসম্বাদ বৃথা; তোমরা যে ঈশ্বরকে প্রচার করিতে চাও, তাঁহাকে দেখিয়াছ কি? যদি না দেখিয়া থাক, তবে বৃথাই তোমার প্রচার; তুমি কি বলিতেছ, তাহাই তুমি জান না; আর যদি তুমি ঈশ্বরকে দেখিয়া থাক, তুমি আর বিবাদ করিবে না, তোমার মুখ অদ্য শ্রী ধারণ করিবে। এক প্রাচীন ঋষি তাঁহার পুত্রকে ব্রহ্মজ্ঞানলাভার্থ গুরুগৃহে প্রেরণ করেন। যখন সে ফিরিল, পিতা জিজ্ঞাসিলেন, 'তুমি কি শিখিলে? পুত্র উত্তর দিল, সে নানা বিদ্যা শিখিয়াছে। পিতা বলিলেন, 'তোমার কিছুই হয় নাই; যাও, আবার গুরুগৃহে যাও।' পুত্র আবার গুরুগৃহে গেল; ফিরিয়া আসিলে পিতা আবার সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। পুত্র পুনরায় সেই সকল বিদ্যার কথাই বলিল। তাহাকে আর একবার গুরুগৃহে যাইতে হইল। এবার যখন সে ফিরিল, তখন তাহার মুখের শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে। তখন পিতা বলিলেন, 'বৎস, অদ্য তোমার মুখ ব্রহ্মবিদের ন্যায় উদ্ভাসিত দেখিতেছি।' যখন তুমি ঈশ্বরকে জানিবে, তখন তোমার মুখশ্রী,

প্রত্যেক হিন্দুকেই ঋষিত্ব লাভ করিতে হইবে। —পিতাপুত্র-সংবাদ

স্বর, তোমার সমগ্র আকৃতিই পরিবর্তিত হইবে। তুমি তখন মানবজাতির পক্ষে এক মহাকল্যাণস্বরূপ হইবে! ঋষি হইলে তাঁহার শক্তি কেহ প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। ইহাই ঋষিত্ব এবং ইহাই আমাদের ধর্মের আদর্শ। অবশিষ্ট যাহা কিছু—এই সকল বচন, যুক্তি বিচার দর্শন, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, এমন কি, বেদ পর্য্যন্ত—এই ঋষিত্ব লাভের জন্য প্রস্তুত হওয়া মাত্র, ওগুলি গৌণমাত্র। ঋষিত্ব লাভই মুখ্য। 'বেদ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষাদি সব গৌণ; তাহাই চরম জ্ঞান যাহা দ্বারা আমরা সেই অপরিণামী বস্তুর সাক্ষাৎকার করিতে পারি।' যাঁহারা সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, তাঁহারাই বৈদিক ঋষি। ঋষি অর্থে আমরা এক শ্রেণীর বিশেষ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে বুঝিয়া থাকি। যথার্থ হিন্দুপদবাচ্য হইতে গেলে আমাদের প্রত্যেককেই আমাদের জীবনের কোন না কোন অবস্থায় এই ঋষিত্ব লাভ করিতে হইবে আর ঋষিত্ব লাভই হিন্দুর মুক্তি। কতকগুলি মতবাদে বিশ্বাস, সহস্র সহস্র মন্দির দর্শন বা জগতের যত নদী আছে, সবগুলিতে স্নান করিলে হিন্দুর মতে মুক্তি হইবে না। ঋষি হইলে, মন্ত্রদ্রষ্টা হইলেই তবে মুক্তিলাভ হইবে।

পরবর্ত্তী সময়ের কথা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, এ সময়ে সমগ্র জগৎ-আলোড়নকারী মহাপুরুষগণ, শ্রেষ্ঠ অবতারগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অবতারগণের সংখ্যা অনেক। ভাগবতের মতে অবতার অসংখ্য; তন্মধ্যে রাম ও কৃষ্ণই ভারতে বিশেষভাবে পূজিত হইয়া থাকেন। মহর্ষি বাল্মীকি এই প্রাচীন বীরযুগের আদর্শ, সত্যপরায়ণতা ও সমগ্র নীতিতত্ত্বের সাকার

মূর্ত্তিস্বরূপ, আদর্শ তনয়, আদর্শ পতি, আদর্শ পিতা, সর্ব্বোপরি আদর্শ রাজা রামচন্দ্রের চরিত্র চিত্রিত করিয়া আমাদের সমক্ষে স্থাপিত করিয়াছেন। এই মহাকবি যে ভাষায় রাম-চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন তদপেক্ষা শুদ্ধতর, মধুরতর, অথচ সরলতর ভাষা আর হইতে পারে না। আর সীতার কথা কি বলিব! তোমরা জগতের প্রাচীন সাহিত্য সমগ্র অধ্যয়ন করিয়া নিঃশেষ করিতে পার, আর আমি তোমাদিগকে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, জগতের ভাবী সাহিত্যসমূহও নিঃশেষ করিতে পার, কিন্তু আর একটি সীতার চরিত্র বাহির করিতে পারিবে না। সীতাচরিত্র অসাধারণ; ঐ চরিত্র ঐ একবার মাত্রই চিত্রিত হইয়াছে। আর কখনও হয় নাই, হইবেও না। রাম হয়ত অনেক-গুলিই হইয়াছেন, কিন্তু সীতা আর হয় নাই। ভারতীয় রমণী-গণের যেরূপ হওয়া উচিত, সীতা তাহার আদর্শ; রমণীচরিত্রের যত প্রকার ভারতীয় আদর্শ আছে, সবই এক সীতাচরিত্রেরই আশ্রিত; আর সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত ভূমিতে এই সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া তিনি এখানকার আবালবৃদ্ধবনিতার পূজা পাইয়া আসিতেছেন। মহা-মহিমময়ী সীতা, স্বয়ং শুদ্ধা হইতেও শুদ্ধতরা, সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত আদর্শ সীতা চিরকালই এইরূপ পূজা পাইবেন। যিনি বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রদর্শন না করিয়া সেই মহাদুঃখের জীবন যাপন করিয়াছিলেন, সেই নিত্যসাধ্বী নিত্যবিশুদ্ধস্বভাবা আদর্শ পত্নী সীতা, সেই নর-লোকের, এমন কি, দেবলোকের পর্য্যন্ত আদর্শীভূতা মহনীয়চরিত্রা সীতা চিরদিনই আমাদের জাতীয় দেবতারূপে বর্ত্তমান থাকিবেন।

ভগবান রামচন্দ্র

আদর্শ হিন্দুনারী সীতাদেবী

আমরা সকলেই তাঁহার চরিত্র বিশেষরূপে জানি, সুতরাং উহার বিশেষ বর্ণনার আবশ্যক করে না। আমাদের সব পুরাণ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, এমন কি, আমাদের বেদ পর্য্যন্ত লোপ পাইতে পারে, আমাদের সংস্কৃত ভাষা পর্য্যন্ত চিরদিনের জন্য কালস্রোতে বিলুপ্ত হইতে পারে, কিন্তু আমার বাক্য অবহিত হইয়া শ্রবণ কর, যতদিন পর্য্যন্ত ভারতে অতিশয় গ্রাম্যভাষাভাষী পাঁচজন হিন্দুও থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত সীতার উপাখ্যান থাকিবে। সীতা আমাদের জাতির মজ্জায় মজ্জায় প্রবিষ্টা হইয়াছেন, প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর শোণিতে সীতা বিরাজমানা। আমরা সকলেই সীতার সন্তান। আমাদের নারীগণকে আধুনিক ভাবে গঠিত করিবার যে সকল চেষ্টা হইতেছে, যদি সে সকল চেষ্টার মধ্যে তাহাদিগকে সীতাচরিত্রের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা থাকে, তবে সেগুলি বিফল হইবে। আর প্রত্যহই আমরা ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতেছি। ভারতীয় নারীগণকে সীতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আপনাদের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই ভারতীয় নারীর উন্নতির একমাত্র পথ।

তারপর তাঁহার কথা আলোচনা করা যাউক, যিনি নানাভাবে পূজিত হইয়া থাকেন—যিনি আবালবৃদ্ধবনিতা ভারতবাসী সকলেরই পরমপ্রিয় ইষ্টদেবতা। আমি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই একথা বলিতেছি, ভাগবৎকার যাঁহাকে অবতার বলিয়াই তৃপ্ত হন নাই, বলিয়াছেন—

গীতায় সাকার মূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ

'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।'

১।৩।২৮

'অন্যান্য অবতার সেই ভগবানের অংশ ও কলাস্বরূপ, কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।'

আর যখন আমরা তাঁহার বিবিধভাবসমন্বিত চরিত্রের বিষয় আলোচনা করি, তখন তাঁহার প্রতি যে এরূপ বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা কিছু আশ্চর্য্য বোধ হয় না। তিনি একাধারে অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী ও অদ্ভুত গৃহী ছিলেন; তাঁহার মধ্যে অত্যদ্ভুত রজঃশক্তির বিকাশ দেখা গিয়াছিল, অথচ তাঁহার অদ্ভুত ত্যাগ ছিল। গীতা পাঠ না করিলে কৃষ্ণচরিত্র কখনই বুঝা যাইতে পারে না; কারণ তিনি তাঁহার নিজ উপদেশের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ-স্বরূপ ছিলেন। সকল অবতারই, যাহা তাঁহারা প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, তাহার জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ ছিলেন। গীতার প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ চিরজীবন সেই ভগবদ্গীতার সাকার বিগ্রহস্বরূপ বর্ত্তমান ছিলেন, তিনি অনাসক্তির মহদ্দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিলেন। তিনি অনেককে রাজা করিলেন, কিন্তু স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিলেন না; সেই সমগ্র ভারতের নেতা, যাঁহার বাক্যে রাজগণ নিজ নিজ সিংহাসন ছাড়িয়া ভূপতিত হইতেন, তিনি রাজা হইতে ইচ্ছা করেন নাই। তিনি বাল্যকালে যেমন সরলভাবে গোপীদের সহিত ক্রীড়া করিতেন, জীবনের অন্য অবস্থায়ও তাঁহার সেই সরল ভাবের ব্যত্যয় হয় নাই।

তাঁহারজীবনেরসেইচিরস্মরণীয়অধ্যায়েরকথামনে পড়িতেছে, যাহা অতি দুর্ব্বোধ্য। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কেহ পূর্ণ ব্রহ্মচারী ও পবিত্র-স্বভাব হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত নয়। সেই প্রেমের অত্যদ্ভুত বিকাশ—যাহা সেই বৃন্দাবনের

মধুর লীলায় রূপকভাবে বর্ণিত হইয়াছে; প্রেমমদিরা পানে যে একেবারে উন্মত্ত হইয়াছে, সে ব্যতীত আর কেহ তাহা বুঝিতে অক্ষম। কে সে গোপীদের প্রেমজনিত বিরহযন্ত্রণার ভাব বুঝিতে সক্ষম, যে প্রেম প্রেমের চরম আদর্শ স্বরূপ, যে প্রেম আর কিছু চাহে না, যে প্রেম স্বর্গ পর্য্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করে না, যে প্রেম ইহলোক পরলোকের কোন বস্তু কামনা করে না! আর হে বন্ধুগণ, এই গোপীপ্রেম দ্বারাই সগুণ নির্গুণ ঈশ্বরবাদের একমাত্র সামঞ্জস্য সাধন হইয়াছে। আমরা জানি, মানুষ সগুণ ঈশ্বর হইতে উচ্চতর ধারণা করিতে অক্ষম। আমরা ইহাও জানি, দার্শনিক দৃষ্টিতে সমগ্র জগদ্ব্যাপী—সমগ্র জগৎ যাঁহার বিকাশমাত্র—সেই নির্গুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসই স্বাভাবিক। এদিকে আমাদের প্রাণ একটা সাকার বস্তু চায়, এমন বস্তু চায়, যাহা আমরা ধরিতে পারি, যাঁহার পাদপদ্মে প্রাণ ঢালিয়া দিতে পারি। সুতরাং সগুণ ঈশ্বরই মানবস্বভাবের চূড়ান্ত ধারণা। কিন্তু যুক্তি এই ধারণায় সন্তুষ্ট হইতে পারে না। এই সেই অতি প্রাচীন, প্রাচীনতম সমস্যা —যাহা ব্রহ্মসূত্রে বিচারিত হইয়াছে, যাহা লইয়া বনবাসকালে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের সহিত বিচার করিয়াছিলেন—যদি একজন সগুণ, সম্পূর্ণ দয়াময়, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর থাকেন, তবে এই নরকবৎ সংসারের অস্তিত্ব কেন? কেন তিনি ইহা সৃষ্টি করিলেন? তাঁহাকে একজন মহাপক্ষপাতী ঈশ্বর বলিতে হইবে। ইহার কোনরূপ মীমাংসাই হয় নাই; কেবল গোপীপ্রেমসম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা পড়িয়া থাক, তাহাতেই ইহার মীমাংসা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীপ্রেম

সগুণ ও নির্গুণ ঈশ্বরবাদের সামঞ্জস্য গোপীপ্রেমে

কৃষ্ণের প্রতি কোন বিশেষণ প্রয়োগ করিতে তাহারা চাহিত না; তিনি যে সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি যে সর্ব্বশক্তিমান্ তাহা তাহারা জানিতে চাহিত না। তাহারা কেবল বুঝিত তিনি প্রেমময়; ইহাই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট। গোপীরা কৃষ্ণকে কেবল বৃন্দাবনের কৃষ্ণ বলিয়া বুঝিত। সেই বহু অনীকিনীর নেতা, রাজাধিরাজ কৃষ্ণ তাহাদের নিকট বরাবর সেই রাখালবালকই ছিলেন।

'ন ধনং ন জনং ন কবিতাং সুন্দরীং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতু ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥'

'হে জগদীশ, আমি ধন জন কবিতা বা সুন্দরী—কিছুই প্রার্থনা করি না; হে ঈশ্বর, তোমার প্রতি জন্মে জন্মে যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।' ধর্ম্মের ইতিহাসে ইহা এক নূতন অধ্যায়—এই অহৈতুকী ভক্তি, এই নিষ্কাম কর্ম্ম; আর মানুষের ইতিহাসে ভারতক্ষেত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবতার কৃষ্ণের মুখ হইতে সর্ব্বপ্রথম এই তত্ত্ব নির্গত হইয়াছে। ভয়ের ধর্ম্ম, কামনার ধর্ম্ম চিরদিনের জন্য চলিয়া গেল; আর মনুষ্যহৃদয়ের স্বাভাবিক নরকভীতি ও স্বর্গসুখভোগেচ্ছা সত্ত্বেও এই অহৈতুকী ভক্তি ও নিষ্কাম কর্ম্মরূপ শ্রেষ্ঠতম আদর্শের অভ্যুদয় হইল।

এ প্রেমের মহিমা আর কি বলিব? এইমাত্র তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, গোপীপ্রেম উপলব্ধি করা বড়ই কঠিন। আমাদের মধ্যেও এমন নির্ব্বোধের অসদ্ভাব নাই, যাহারা শ্রীকৃষ্ণের জীবনের এই অতি অপূর্ব্ব অংশের অদ্ভুত তাৎপর্য্য বুঝিতে অক্ষম। আমি আবার বলিতেছি, আমাদের সহিতই শোণিত-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ অশুদ্ধাত্মা

অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির গোপীপ্রেম চর্চ্চায় অনধিকার

নির্ব্বোধ অনেক আছে, তাহারা গোপী প্রেমের নাম শুনিলে যেন উহাকে অতি অপবিত্র ব্যাপার ভাবিয়া ভয়ে দশহাত পিছাইয়া যায়। তাহাদিগকে আমি কেবল এইটুকু বলিতে চাই, আপনার মনকে আগে বিশুদ্ধ কর, আর তোমাদিগকে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যিনি এই অদ্ভুত গোপীপ্রেম বর্ণন করিয়াছেন, তিনি আর কেহই নহেন, সেই আজন্মশুদ্ধ ব্যাসতনয় শুক। যতদিন হৃদয়ে স্বার্থপরতা থাকে, ততদিন ভগবৎপ্রেম অসম্ভব। উহা কেবল দোকানদারী; আমি তোমায় কিছু দিতেছি, প্রভু তুমি আমায় কিছু দাও। আর ভগবান্ বলিতেছেন, যদি তুমি এরূপ না কর, তাহা হইলে তুমি মরিলে তোমায় দেখিয়া লইব। চিরকাল আমি তোমায় দগ্ধে মারব। সকাম ব্যক্তির ঈশ্বরধারণা এইরূপ। যতদিন মাথায় এই সব ভাব থাকে, ততদিন গোপীদের প্রেমজনিত বিরহের উন্মত্ততা লোকে কি করিয়া বুঝিবে?

'সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্।' ১০।৩১।১৪

—শ্রীমদ্ভাগবত।

'একবার, একবারমাত্র যদি সেই অধরের মধুর চুম্বন লাভ করা যায়, যাহাকে তুমি একবার চুম্বন করিয়াছ, চিরকাল ধরিয়া তোমার জন্য তাহার পিপাসা বাড়িতে থাকে, তাহার সকল দুঃখ চলিয়া যায়, তখন আমাদের অন্যান্য সকল বিষয়ে আসক্তি চলিয়া যায়, কেবল তুমিই তখন একমাত্র প্রীতির বস্তু হও।'

প্রথমে এই কাঞ্চন, নাম যশ, এই ক্ষুদ্র মিথ্যা সংসারের প্রতি আসক্তি ছাড় দেখি। তখনই—কেবল তখনই তোমরা

গোপীপ্রেম কি তাহা বুঝিবে। উহা এত বিশুদ্ধ জিনিস যে, সর্ব্বত্যাগ না হইলে উহা বুঝিবার চেষ্টা করাই উচিত নয়। যতদিন পর্য্যন্ত না আত্মা সম্পূর্ণ পবিত্র হয়, ততদিন উহা বুঝিবার চেষ্টা বৃথা। প্রতি মুহূর্ত্তে যাহাদের হৃদয়ে কামকাঞ্চনযশোলিপ্সার বুদ্বুদ উঠিতেছে, তাহারাই আবার গোপীপ্রেম বুঝিতে ও উহার সমালোচনা করিতে যায়! কৃষ্ণ অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্যই যে এই গোপীপ্রেম শিক্ষা। এমন কি দর্শনশাস্ত্রশিরোমণি গীতা পর্য্যন্ত সেই অপূর্ব্ব প্রেমোন্মত্ততার নিকট দাঁড়াইতে পারে না।

গীতোক্ত উপদেশেরও উপরে গোপীপ্রেমের স্থান; কেবল ত্যাগীর উহাতে অধিকার

কারণ গীতায় সাধককে ধীরে ধীরে সেই চরম লক্ষ্য মুক্তি সাধনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু এই গোপীপ্রেমে ঈশ্বর-রসাস্বাদের উন্মত্ততা, ঘোর প্রেমোন্মত্ততা মাত্র বিদ্যমান; এখানে গুরু শিষ্য শাস্ত্র উপদেশ ঈশ্বর স্বর্গ সব একাকার, ভয়ের ধর্ম্মের চিহ্ন মাত্র নাই, সব গিয়াছে—আছে কেবল প্রেমোন্মত্ততা। তখন সংসারের আর কিছু মনে থাকে না, ভক্ত তখন সংসারে সেই কৃষ্ণ—একমাত্র সেই কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না, তখন তিনি সর্ব্বপ্রাণীতে কৃষ্ণ দর্শন করেন, তাঁহার নিজের মুখ পর্য্যন্ত তখন কৃষ্ণের ন্যায় দেখায়, তাঁহার আত্মা তখন, কৃষ্ণবর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া যায়। মহানুভব কৃষ্ণের ঈদৃশ মহিমা।

কৃষ্ণজীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবান্তর কথা লইয়া সময় বৃথা ব্যয় করিও না; তদীয় জীবনের মুখ্য অংশ যাহা, তাহাই অবলম্বন কর। কৃষ্ণের জীবনচরিতে হয়ত অনেক ঐতিহাসিক গলদ

বাহির হইতে পারে, অনেক বিষয় হয়ত প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এ সবই সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ সময়ে সমাজে যে এক অপূর্ব্ব নূতন ভাবের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহার অবশ্যই ভিত্তি ছিল! অন্য যে কোনও মহাপুরুষের জীবন আলোচনা করিলেই দেখিতে পাই যে, তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কতকগুলি ভাবের প্রতিধ্বনি মাত্র; আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি তাঁহার নিজ দেশে, এমন কি, সেই সময়ে যে সকল শিক্ষা প্রচলিত ছিল, শুদ্ধ তাহাই মাত্র প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এমন কি, সেই মহাপুরুষ আদৌ ছিলেন কি না, সেই সম্বন্ধেই গুরুতর সন্দেহ থাকিতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণের উপদেশ বলিয়া কথিত এই নিষ্কাম কর্ম্ম ও নিষ্কাম প্রেমতত্ত্ব জগতে অভিনব মৌলিক আবিষ্ক্রিয়া নহে, ইহা প্রমাণ কর দেখি? যদি না পার তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কোনও এক ব্যক্তি নিশ্চয়ই এই তত্ত্বগুলি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। ঐ তত্ত্বগুলি অপর কোনও ব্যক্তির নিকট হইতে গৃহীত বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না। কারণ, কৃষ্ণের আবির্ভাব কালে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ঐ তত্ত্ব প্রচারিত ছিল বলিয়া জানা যায় না। ভগবান্ কৃষ্ণই ইহার প্রথম প্রচারক, তাঁহার শিষ্য বেদব্যাস উক্ত তত্ত্ব জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিলেন। মানবভাষায় এরূপ শ্রেষ্ঠতম আদর্শ আর কখনও চিত্রিত হয় নাই। আমরা তাঁহার গ্রন্থে গোপীজনবল্লভ সেই বৃন্দাবনের রাখালরাজ হইতে আর কোনও উচ্চতর আদর্শ পাই না। যখন তোমাদের মস্তিষ্কে এই

কৃষ্ণোপদেশের অভিনবত্ব ও কৃষ্ণের ঐতিহাসিকত্ব

উন্মত্ততা প্রবিষ্ট হইবে, যখন তোমরা মহাভাগা গোপীগণের ভাব বুঝিবে, তখনই তোমরা প্রেম কি বস্তু জানিতে পারিবে। যখন সমগ্র জগৎ তোমাদের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইবে যখন তোমাদের হৃদয়ে অন্য কোন কামনা থাকিবে না, যখন তোমাদের সম্পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি হইবে, আর কোনও লক্ষ্য থাকিবে না, এমন কি যখন তোমাদের সত্যানুসন্ধানস্পৃহা পর্য্যন্ত থাকিবে না, তখনই তোমাদের হৃদয়ে সেই প্রেমোন্মত্ততার আবির্ভাব হইবে, তখনই তোমরা গোপীদের অহেতুক প্রেমের শক্তি বুঝিবে। ইহাই লক্ষ্য। যখন এই প্রেম পাইলে, তখন সব পাইলে।

এইবার আমরা একটু নিম্নস্তরে নামিয়া গীতাপ্রচারক শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে আলোচনা করিব। ভারতে এখন অনেকের মধ্যে একটা চেষ্টা দেখা যায়; সেটা যেন ঘোড়াতে গাড়ী জোড়ার মত। আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণা—কৃষ্ণ গোপীদের সহিত প্রেমলীলা করিয়াছেন, এটা যেন কি এক রকম। সাহেবেরাও ইহা বড় পছন্দ করে না। অমুক পণ্ডিত এই গোপীপ্রেমটাকে বড় সুবিধা মনে করেন না। তবে আর কি? গোপীদের যমুনার জলে ভাসিয়ে দাও! সাহেবদের অনুমোদিত না হইলে কৃষ্ণ টিকেন কি করিয়া? কখনই টিকিতে পারেন না! মহাভারতে দু এক স্থল—সেগুলিও বড় উল্লেখযোগ্য স্থল নহে—ছাড়া গোপীদের প্রসঙ্গই নাই। কেবল দ্রৌপদীর স্তবের মধ্যে এবং শিশুপালবধে শিশুপালের বক্তৃতায় বৃন্দাবনের কথা আছে মাত্র।

গীতাপ্রচারক শ্রীকৃষ্ণ

এগুলি সব প্রক্ষিপ্ত। সাহেবেরা যাহা না চায়, সব উড়াইয়া

দিতে হইবে। গোপীদের কথা, এমন কি, কৃষ্ণের কথা পর্য্যন্ত প্রক্ষিপ্ত। যে সকল ব্যক্তি এইরূপ ঘোরতর বণিগ্‌বৃত্ত, যাহাদের ধর্ম্মের আদর্শ পর্য্যন্ত ব্যবসাদারীতে দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের সকলেরই মনোভাব এই যে, তাহারা ইহলোকে কিছু করিয়া স্বর্গে যাইবে। ব্যবসাদার সুদের সুদ তস্য সুদ চাহিয়া থাকে, তাহারা এখানে এমন কিছু পুণ্য সঞ্চয় করিয়া যাইতে চায়, যাহার ফলে স্বর্গে গিয়া সুখভোগ করিবে! ইহাদের ধর্ম্মপ্রণালীতে অবশ্য গোপীদের স্থান নাই।

আমরা এখন সেই আদর্শ-প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণের কথা ছাড়িয়া একটু নিম্নস্তরে নামিয়া গীতাপ্রচারক শ্রীকৃষ্ণের কথা আলোচনা করিব। এখানেও আমরা দেখিতে পাই, গীতার ন্যায় বেদের ভাষ্য আর কখনও হয় নাই, হইবেও না। শ্রুতি বা উপনিষদের তাৎপর্য্য বুঝা বড় কঠিন; কারণ, নানা ভাষ্যকার সকলেই নিজ নিজ মতানুযায়ী উহা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অবশেষে যিনি স্বয়ং শ্রুতির বক্তা, সেই ভগবান্ নিজে আসিয়া গীতার প্রচারকরূপে শ্রুতির অর্থ বুঝাইলেন, আর আজ ভারতে সেই ব্যাখ্যা-প্রণালীর যেরূপ প্রয়োজন—সমগ্র জগতে ইহার যেরূপ প্রয়োজন, আর কিছুরই তত নহে। আশ্চর্য্যের বিষয়, পরবর্ত্তী শাস্ত্রব্যাখ্যাতাগণ, এমন কি গীতার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া পর্য্যন্ত অনেক সময়ে ভগবদুক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য ধরিতে পারেন নাই। গীতাতে কি দেখিতে পাওয়া যায় এবং আধুনিক ভাষ্যকারগণের ভিতরই বা কি

গীতাই শ্রুতির একমাত্র প্রামাণিক ভাষ্য, অন্যান্য শ্রুতিভাষ্যে ও গীতায় প্রভেদ—গীতায় সর্ব্বমতসমন্বয়

দেখিতে পাওয়া যায়? একজন অদ্বৈতবাদী ভাষ্যকার কোন উপনিষদের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন; তাহার ভিতর অনেক দ্বৈতভাবাত্মক বাক্য রহিয়াছে; তিনি কোনরূপে সেগুলিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নিজের মনোগত অর্থ তাহা হইতে বাহির করিলেন। আবার দ্বৈতবাদী ভাষ্যকারও অদ্বৈতবাদাত্মক বাক্যগুলি লইয়া তাহা হইতে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দ্বৈত অর্থ করিলেন। কিন্তু গীতায় শ্রুতির তাৎপর্য্য এরূপ বিকৃত করিবার চেষ্টা নাই। ভগবান্ বলিতেছেন, এগুলি সব সত্য; জীবাত্মা ধীরে ধীরে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর সোপানে আরোহণ করিতেছেন, এইরূপে ক্রমশঃ তিনি সেই চরম লক্ষ্য অনন্ত পূর্ণস্বরূপে উপনীত হন। গীতাতে এই ভাবে বেদের তাৎপর্য্য বিবৃত হইয়াছে, এমন কি, কর্ম্মকাণ্ড পর্য্যন্ত গীতায় স্বীকৃত হইয়াছে আর ইহা দেখান হইয়াছে যে, যদিও কর্ম্মকাণ্ড সাক্ষাদ্‌ভাবে মুক্তির সাধন নহে, গৌণভাবে মুক্তির সাধন, তথাপি উহা সত্য; মূর্ত্তিপূজাও সত্য, সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপও সত্য, কেবল একটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে—চিত্তশুদ্ধি। যদি হৃদয় শুদ্ধ ও অকপট হয়, তবেই উপাসনা সত্য হয় ও আমাদিগকে চরম লক্ষ্যে লইয়া যায়, আর এই সব বিভিন্ন উপাসনাপ্রণালীই সত্য, কারণ, সত্য না হইলে কেন সেগুলির সৃষ্টি হইল? আধুনিক অনেক ব্যক্তির মত —বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় কতকগুলি কপট ও দুষ্ট লোকের কৃত; তাহারা কিছু অর্থলালসায় এই সকল ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে। এ কথা একেবারে ভুল। তাঁহাদের ব্যাখ্যা আপাতদৃষ্টিতে যতই

বিভিন্ন প্রকার সাধনপ্রণালীর প্রয়োজনীয়তা

যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হউক না কেন, উহা সত্য নহে, ঐগুলি ঐরূপে সৃষ্ট হয় নাই। জীবাত্মার স্বাভাবিক প্রয়োজনে ঐগুলির অভ্যুদয় হইয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীর মানবের ধর্ম্মপিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য সেগুলির অভ্যুদয় হইয়াছে, সুতরাং তোমাদের উহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া কোন ফল নাই। যে দিন সেই প্রয়োজন আর থাকিবে না, সে দিন সেই প্রয়োজনের অভাবের সহিত সেগুলিও লোপ পাইবে আর যতদিন এই প্রয়োজন থাকিবে, ততদিন তোমরা যতই উহাদের তীব্র সমালোচনা কর না কেন, যতই উহাদের বিরুদ্ধে প্রচার কর না কেন, ওগুলি অবশ্যই বিদ্যমান থাকিবে। তরবারি বন্দুকের সাহায্যে জগৎকে রক্তস্রোতে ভাসাইয়া দিতে পার, কিন্তু যতদিন প্রতিমার প্রয়োজন থাকিবে, ততদিন প্রতিমাপূজা থাকিবেই থাকিবে। এই বিভিন্ন অনুষ্ঠান-পদ্ধতি ও ধর্ম্মের বিভিন্ন সোপান সকল অবশ্যই থাকিবে আর আমরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ বুঝিতে পারিতেছি, সেগুলির কি প্রয়োজন।

শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবের কিছুকাল পরেই ভারতেতিহাসের এক শোচনীয় অধ্যায় আরম্ভ হইল। আমরা গীতাতেই সম্প্রদায়-সমূহের বিরোধকোলাহলের দূরশ্রুত ধ্বনি শুনিয়া থাকি, আর সেই সামঞ্জস্যের অদ্ভুত উপদেষ্টা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মাঝে পড়িয়া বিরোধ ভঞ্জন করিয়া দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—

'ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।' গীতা—৭।৭

'যেমন সূত্রে মণিগণ গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ আমাতেই সমস্ত ওতপ্রোত ভাবে রহিয়াছে।'

আমরা সাম্প্রদায়িক বিরোধের দূরশ্রুত অস্ফুটধ্বনি তখন হইতেই শুনিতে পাই। সম্ভবতঃ ভগবানের উপদেশে এই বিরোধ কিছুকাল মন্দীভূত হইয়া সমন্বয় ও শান্তি আসিয়াছিল; কিন্তু আবার এ বিরোধ বাধিয়া উঠিল। শুধু ধর্ম্মমত লইয়া নহে, সম্ভবতঃ জাতি লইয়া এ বিবাদ চলিয়াছিল—আমাদের সমাজের দুইটি প্রবল অঙ্গ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইয়াছিল। আর সহস্র বর্ষ ধরিয়া যে মহান্ তরঙ্গ সমগ্র ভারতকে বন্যায় ভাসাইয়াছিল, তাহার সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় আমরা আর এক মহামহিমময় মূর্ত্তি দেখিয়া থাকি। তিনি আর কেহই নহেন, আমাদেরই গৌতম শাক্যমুনি। তোমরা সকলেই তাঁহার উপদেশ ও প্রচারকার্য্যের বিষয় অবগত আছ। আমরা তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করিয়া থাকি, জগৎ এত বড় নির্ভীক নীতিতত্ত্বের প্রচারক আর দেখে নাই। তিনি কর্ম্মযোগীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই কৃষ্ণই যেন নিজেরই শিষ্যরূপে তাঁহার নিজ মতগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আবির্ভূত হইলেন। আবার সেই বাণী আবির্ভূতা হইল, যাহা গীতায় শিক্ষা দিয়াছিল,—

কর্ম্মযোগিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বুদ্ধদেব

'স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।' ২।৪০

'এই ধর্ম্মের অতি সামান্য অনুষ্ঠান করিলেও মহাভয় হইতে রক্ষা করে।'

'স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্।' ৯।৩২

'স্ত্রী, বৈশ্য, এমন কি, শূদ্রগণ পর্য্যন্ত পরমগতি প্রাপ্ত হয়।'

গীতার বাক্যসমূহ, শ্রীকৃষ্ণের বজ্রগম্ভীর মহতী বাণী, সকলের বন্ধন,

সকলের শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেয়, সকলেরই সেই পরম পদ লাভের অধিকার ঘোষণা করে।

'ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ।' গী ৫।১৯

'যাঁহাদের মন সাম্যভাবে অবস্থিত, তাঁহারা এখানেই সংসার জয় করিয়াছেন। ব্রহ্ম সমভাবাপন্ন ও নির্দ্দোষ, সুতরাং তাঁহারা ব্রহ্মে অবস্থিত।'

'সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥' গী১৩।২৮

'পরমেশ্বরকে সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া তিনি আপনার দ্বারা আর আপনার হিংসা করেন না, সুতরাং পরমগতি লাভ করেন।'

এই গীতার উপদেশের জীবন্ত উদাহরণরূপে, উহার এক বিন্দুও অন্ততঃ যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয় এইজন্য সেই গীতা-উপদেষ্টাই অন্যরূপে আবার মর্ত্ত্যধামে আসিলেন। ইনিই শাক্যমুনি। ইনি দুঃখী দরিদ্রদের উপদেশ দিতে লাগিলেন, ইনি যাহাতে সর্ব্বসাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারেন, তজ্জন্য দেবভাষা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ লোকের ভাষায় উপদেশ দিতে লাগিলেন, ইনি রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া দুঃখী দরিদ্র পতিত ভিক্ষুকদের সঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন, ইনি দ্বিতীয় রামের ন্যায় চণ্ডালকে বক্ষে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন।

ভগবান্ বুদ্ধদেব কৃষ্ণকর্ত্তৃক গীতায় উক্ত কর্ম্মযোগ জীবনে দেখাইতে আসিয়াছিলেন

তোমরা সকলেই তাঁহার মহান্ চরিত্র ও অদ্ভুত প্রচার-কার্য্যের বিষয় অবগত আছ। কিন্তু এই প্রচার কার্য্যের মধ্যে একটা বিষম ত্রুটী ছিল, তাহার জন্য আজ পর্য্যন্ত আমরা ভুগিতেছি। ভগবান বুদ্ধের কোন দোষ নাই, তাঁহার চরিত্র পরম বিশুদ্ধ ও মহামহিমময়। দুঃখের বিষয়, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের দ্বারা যে সকল বিভিন্ন অসভ্য ও অশিক্ষিত মানবজাতি আর্য্য সমাজে প্রবেশ করিতে লাগিল, তাহারা বুদ্ধদেব প্রচারিত উচ্চ আদর্শগুলি ঠিক ঠিক লইতে পারিল না। এই সকল জাতির নানাবিধ কুসংস্কার এবং বীভৎস উপাসনা পদ্ধতি ছিল, তাহারা দলে দলে আর্য্যসমাজে প্রবেশ করিতে লাগিল। কিছুদিনের জন্য বোধ হইল তাহারা সভ্য হইয়াছে, কিন্তু এক শতাব্দী যাইতে না যাইতে তাহারা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের সর্প ভূত প্রভৃতির উপাসনা সমাজে চালাইতে লাগিল। এইরূপে সমগ্র ভারত কুসংস্কারের পূর্ণ লীলাক্ষেত্র হইয়া ঘোর অবনতি প্রাপ্ত হইল। প্রথম বৌদ্ধগণ প্রাণিহিংসাকে নিন্দা করিতে গিয়া বৈদিক যজ্ঞসমূহের ঘোর বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল। তখন প্রত্যেক গৃহে এই সকল যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। প্রত্যেক গৃহে যজ্ঞার্থ অগ্নি প্রজ্বলিত হইত, যজ্ঞাদির আর বিশেষ কিছু আড়ম্বর ছিল না। বৌদ্ধদের প্রচারে এই যজ্ঞগুলি লোপ পাইল, তৎস্থলে বড় বড় ঐশ্বর্য্যশালী মন্দির, আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানপদ্ধতি, আড়ম্বরপ্রিয় পুরোহিতদল এবং বর্ত্তমান কালে ভারতে আর যাহা কিছু দেখিতেছ, সমুদয়ের

বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি—ভারতীয় সামাজিক জীবনে উহার ঘোরতর কুফল

আবির্ভাব হইল। যাঁহাদের নিকট অধিক তথ্যসংগ্রহের আশা করা যায়, এরূপ কতকগুলি আধুনিক ব্যক্তির গ্রন্থে পড়া যায়, বুদ্ধ ব্রাহ্মণদের পুতুলপূজা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। আমি উহা পড়িয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। তাহারা জানে না যে, বৌদ্ধধর্ম্মই ভারতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও প্রতিমাপূজার সৃষ্টি করিয়াছিল। দুই এক বৎসর পূর্ব্বে একজন রুশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি যীশুখ্রীষ্টের একখানি অদ্ভুত জীবনচরিত পাইয়াছেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন। তিনি সেই পুস্তকখানির একস্থলে বলিতেছেন, খ্রীষ্ট ব্রাহ্মণদের নিকট ধর্ম্মশিক্ষার্থ জগন্নাথের মন্দিরে গমন করেন, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্কীর্ণতা ও মূর্ত্তিপূজায় বিরক্ত হইয়া তথা হইতে তিব্বতের লামাদের নিকট ধর্ম্মশিক্ষার্থ গমন করেন এবং তাঁহাদের উপদেশে সিদ্ধ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যাঁহারা ভারতেতিহাসের কিছুমাত্র জানেন, তাঁহাদের নিকট পূর্ব্বোক্ত কথাটিতেই পুস্তকখানি যে আগা-গোড়া জুয়াচুরি তাহা ধরা পড়িয়া যায়। কারণ, জগন্নাথ-মন্দির একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির। আমরা ঐটি এবং অন্যান্য বৌদ্ধ মন্দিরকে হিন্দু মন্দির করিয়া লইয়াছি। এইরূপ ব্যাপার আমাদিগকে এখনও অনেক করিতে হইবে। ইহাই জগন্নাথের ইতিহাস, আর সে সময়ে তথায় একজনও ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তথাপি বলা হইতেছে, যীশুখ্রীষ্ট তথায় ব্রাহ্মণদের নিকট উপদেশ লইবার জন্য আসিয়াছিলেন! আমাদের রুশীয় দিগ্‌গজ প্রত্নতাত্ত্বিক এই কথা বলিতেছেন! পূর্ব্বোক্ত কারণে বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বপ্রাণীতে দয়া, উহার

রুশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রকাশিত যীশুখ্রীষ্টের জীবনী—তাঁহার ভারতাগমন বিষয়ক উপন্যাস

অপূর্ব্ব নীতিতত্ত্ব ও নিত্য আত্মার অস্তিত্ব লইয়া চুলচেরা বিচার-সত্ত্বেও সমগ্র বৌদ্ধধর্ম্মরূপ প্রাসাদ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়িয়া গেল আর চূর্ণ হইবার পর যে ভগ্নাবশেষ রহিল, তাহা অতি বীভৎস। বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির ফলে যে বীভৎস ব্যাপারসমূহের আবির্ভাব হইল, তাহা বর্ণনা করিবার আমার সময়ও নাই, প্রবৃত্তিও নাই। অতি বীভৎস অনুষ্ঠানপদ্ধতিসমূহ, অতি ভয়ানক ও অশ্লীল গ্রন্থ—যাহা মানুষের হাত দিয়া আর কখন বাহির হয় নাই বা মানবমস্তিষ্ক যাহা আর কখন কল্পনা করেন নাই—অতি ভীষণ পাশব অনুষ্ঠানপদ্ধতি—যাহা আর কখন ধর্ম্মের নামে চলে নাই—এ সবই অবনত বৌদ্ধধর্ম্মের সৃষ্টি।

কিন্তু ভারতের জীবনীশক্তি তখনও নষ্ট হয় নাই, তাই আবার ভগবানের আবির্ভাব হইল। যিনি বলিয়াছিলেন, যখনই ধর্ম্মের গ্লানি হয়, তখনই আমি আসিয়া থাকি, তিনি আবার আবির্ভূত হইলেন। এবার দাক্ষিণাত্যে ভগবানের আবির্ভাব হইল। সেই ব্রাহ্মণযুবক যাঁহার সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, ষোড়শ বর্ষে তাঁহার সকল গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হইয়াছিল, সেই অদ্ভুত প্রতিভাশালী শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয় হইল। এই ষোড়শবর্ষীয় বালকের লেখায় আধুনিক সভ্য জগৎ বিস্মিত হইয়া আছে আর তিনি স্বয়ংও অদ্ভুত শক্তিশালী লোক ছিলেন। তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সমগ্র ভারতকে তাহার প্রাচীন বিশুদ্ধমার্গে লইয়া যাইতে হইবে; কিন্তু এই কার্য্য যে কি কঠিন ও বৃহৎ ব্যাপার ছিল, তাহা ভাবিয়া দেখ। সে সময়ে ভারতের অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে তোমাদিগকে কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি।

জ্ঞানাবতার ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য

তোমরা যে এই সকল ভীষণ আচারের সংস্কারে অগ্রসর হইতেছ, তাহা সেই অধঃপতনের যুগ হইতে আসিয়াছে। তাতার, বেলুচী প্রভৃতি ভয়ানক জাতিসকল ভারতে আসিয়া বৌদ্ধ হইয়া আমাদের সহিত মিশিয়া গেল। তাহারা তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জাতীয় আচারসকলও লইয়া আসিল। এইরূপে আমাদের জাতীয় জীবন অতি ভয়ানক পাশবিক আচারসঙ্কুল হইয়া দাঁড়াইল। উক্ত ব্রাহ্মণযুবক বৌদ্ধদের নিকট হইতে ইহাই দায়স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আর সেই সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে এই অবনত বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে বেদান্তের পুনর্ব্বিজয় চলিতেছে, এখনও একার্য্য চলিতেছে, এখনও উহা শেষ হয় নাই। মহাদার্শনিক শঙ্কর আসিয়া দেখাইলেন, বৌদ্ধধর্ম্ম ও বেদান্তের সারাংশে বিশেষ প্রভেদ নাই। তবে বুদ্ধদেবের শিষ্যপ্রশিষ্যগণ তাঁহাদের আচার্য্যের উপদেশের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া নিজেরা হীনাবস্থা এবং আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া নাস্তিক হইয়াছিল ;— শঙ্কর ইহাই দেখাইলেন ; তখন সকল বৌদ্ধই তাহাদের প্রাচীন ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা এই সকল অনুষ্ঠান-পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। সেগুলির সম্বন্ধে কি হইবে, এই এক মহাসমস্যা উপস্থিত হইল।

তখন মহানুভব রামানুজের অভ্যুদয় হইল। শঙ্কর মহামনীষী ছিলেন বটে, কিন্তু বোধ হয়, তাঁহার হৃদয় রামানুজের ন্যায় প্রশস্ত ছিল না। রামানুজের হৃদয় শঙ্কর হইতে প্রশস্ততর ছিল। পতিতের দুঃখে তাঁহার হৃদয় কাঁদিল, তিনি তাহাদের দুঃখ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিলেন। কালে যে সকল নূতন নূতন অনুষ্ঠানপদ্ধতি

দাঁড়াইয়াছিল; তিনি সেগুলি লইয়া যথাসাধ্য তাহাদের সংস্কার করিলেন এবং নূতন নূতন অনুষ্ঠানপদ্ধতি, নূতন নূতন উপাসনা প্রণালী সৃষ্টি করিয়া যাহাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক, তাহাদিগকে ঐ সকল উপদেশ করিতে লাগিলেন। অথচ তিনি ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলের পক্ষে উচ্চতম আধ্যাত্মিক উপাসনার পথ উন্মুক্ত রাখিলেন। এইরূপে রামানুজের কার্য্য চলিল। তাঁহার কার্য্যের প্রভাব চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল, আর্য্যাবর্ত্তে উহার তরঙ্গ লাগিল। তথায় কয়েক জন আচার্য্য উক্তভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন; কিন্তু ইহা অনেক দিন পরে মুসলমান-শাসনকালে সঙ্ঘটিত হয়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক এই সকল আর্য্যাবর্ত্তবাসী আচার্য্যগণের মধ্যে চৈতন্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রামানুজের সময় হইতে ধর্ম্মপ্রচারে একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করিও;—তখন হইতে সর্ব্বসাধারণের জন্য ধর্ম্মের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হয়। শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণের যেমন ইহা মূলমন্ত্র ছিল, রামানুজের পরবর্ত্তী আচার্য্যগণেরও তদ্রূপ ইহা মূলমন্ত্রস্বরূপ হইল। আমি জানি না, লোকে শঙ্করকে অনুদার-মতাবলম্বী বলিয়া বর্ণনা করে কেন। তাঁহার লিখিত গ্রন্থে আমি এমন কিছু দেখিতে পাই নাই, যাহাতে তাঁহার সঙ্কীর্ণত্বের পরিচয় প্রদান করে। ভগবান্ বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী যেমন তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্যবর্গ দ্বারা বিকৃত হইয়াছে, সেইরূপ শঙ্করাচার্য্যের উপদেশাবলীর উপর যে সঙ্কীর্ণতারূপ দোষারোপ করা হয়, তাহাতে খুব সম্ভবতঃ শঙ্করের কোন দোষ নাই, তাঁহার শিষ্যদের বুঝিবার অক্ষমতার দরুণই এ দোষ সম্ভবতঃ শঙ্করে আরোপিত হইয়া থাকে।

ভগবান্ রামানুজাচার্য্য

আমি এক্ষণে এই আর্য্যাবর্ত্তনিবাসী ভগবান্ শ্রীচৈতন্যের বিষয় কিছু উল্লেখ করিয়া এই বক্তৃতা শেষ করিব। তিনি গোপীদের প্রেমোন্মত্ত ভাবের আদর্শ ছিলেন। চৈতন্যদেব স্বয়ং একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তখনকার এক খুব পণ্ডিতবংশে তাঁহার জন্ম হয়, তিনি ন্যায়ের অধ্যাপক হইয়া বাগ্‌যুদ্ধে লোককে পরাস্ত করিতেন,—ইহাই তিনি অতি বাল্যাবস্থা হইতে জীবনের উচ্চতম আদর্শ বলিয়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। কোন মহাজনের কৃপায় এই ব্যক্তির সারাজীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল; তখন

প্রেমাবতার ভগবান্ শ্রীচৈতন্য

তিনি বাদ বিবাদ, তর্ক, ন্যায়ের অধ্যাপকতা সবই পরিত্যাগ করিলেন। জগতে যত বড় বড় ভক্তির আচার্য্য হইয়াছেন, এই প্রেমোন্মাদ চৈতন্য তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার ভক্তির তরঙ্গ সমগ্র বঙ্গদেশে প্রবাহিত হইল, সকলের প্রাণে শান্তি দিল। তাঁহার প্রেমের সীমা ছিল না। সাধু পাপী, হিন্দু মুসলমান, পবিত্র অপবিত্র, বেশ্যা পতিত সকলেই তাঁহার প্রেমের ভাগী ছিল, সকলকেই তিনি দয়া করিতেন, এবং যদিও তৎপ্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় ঘোরতর অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে (যেমন কালপ্রভাবে সবই অবনতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে), তথাপি আজ পর্য্যন্ত উহা দরিদ্র, দুর্ব্বল, জাতিচ্যুত, পতিত, কোন সমাজে যাহার স্থান নাই, এইরূপ সকল ব্যক্তির আশ্রয়স্থল। কিন্তু আমাকে সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতে হইবে যে, দার্শনিক সম্প্রদায়সমূহে আমরা অদ্ভুত উদার ভাব দেখিতে পাই। শঙ্করমতাবলম্বী কেহই এ কথা স্বীকার করিবে না যে, ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বাস্তবিক পক্ষে কোন

ভেদ আছে। এদিকে কিন্তু জাতিভেদসম্বন্ধে তিনি অতিশয় সঙ্কীর্ণতার পোষকতা করিতেন। প্রত্যেক বৈষ্ণবাচার্য্যের ভিতরেই আবার আমরা জাতিভেদ বিষয়ে অদ্ভুত উদারতা দেখিতে পাই, কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহাদের মত অতি সঙ্কীর্ণ।

একজনের ছিল অদ্ভুত মস্তিষ্ক, অপরের বিশাল হৃদয়। এক্ষণে এমন এক ব্যক্তির জন্মের সময় হইয়াছিল, যাঁহাতে একাধারে হৃদয় ও মস্তিষ্ক, উভয় বিরাজমান থাকিবে, যিনি একাধারে শঙ্করের অদ্ভুত মস্তিষ্ক এবং চৈতন্যের অদ্ভুত বিশাল অনন্ত হৃদয়ের অধিকারী হইবেন, যিনি দেখিবেন—সকল সম্প্রদায় এক আত্মা, এক ঈশ্বরের শক্তিতে অনুপ্রাণিত, ও প্রত্যেক প্রাণীতে সেই ঈশ্বর বিদ্যমান, যাঁহার হৃদয় ভারতান্তর্গত বা ভারতবহির্ভূত দরিদ্র দুর্ব্বল পতিত সকলের জন্য কাঁদিবে, অথচ যাঁহার বিশাল বুদ্ধি এমন মহৎ তত্ত্ব-সকলের উদ্ভাবন করিবে, যাহাতে ভারতান্তর্গত বা ভারতবহির্ভূত সকল বিরোধী সম্প্রদায়ের সমন্বয় সাধন করিবে ও এইরূপ অদ্ভুত সমন্বয় সাধন করিয়া হৃদয় ও মস্তিষ্কের সামঞ্জস্যভাবে উন্নতিসাধক সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের প্রকাশ করিবে। এইরূপ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আমি অনেক বর্ষ ধরিয়া তাঁহার চরণতলে বসিয়া শিক্ষালাভের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। এইরূপ একজন ব্যক্তির জন্মিবার সময় হইয়াছিল, প্রয়োজন হইয়াছিল, আর অদ্ভুত ব্যাপার এই, তাঁহার সমগ্র জীবনের কার্য্য এমন এক শহরের নিকট অনুষ্ঠিত হয় যাহা পাশ্চাত্যভাবে উন্মত্ত হইয়াছিল, ভারতের অন্যান্য শহর অপেক্ষা যাহা অধিক পরিমাণে

জ্ঞান-ভক্তি-সমন্বয়াচার্য্য ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ

সাহেবীভাবাপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার পুঁথিগত বিদ্যা কিছুমাত্র ছিল না, এরূপ মহামনীষাসম্পন্ন হইয়াও তিনি নিজের নামটা পর্য্যন্ত লিখিতে পারিতেন না, কিন্তু প্রত্যেকে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় উপাধিধারী পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখিয়া একজন মহামনীষী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। তিনি এক অদ্ভুত লোক ছিলেন। সে অনেক কথা, অদ্য রাত্রে তোমাদিগের নিকট তাঁহার কথা কিছু বলিবার সময় নাই। সুতরাং আমাকে ভারতীয় সকল মহাপুরুষের পূর্ণপ্রকাশস্বরূপ যুগাচার্য্য মহাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণের নামমাত্র উল্লেখ করিয়াই অদ্য ক্ষান্ত হইতে হইবে; যাঁহার উপদেশ আজকাল আমাদের বিশেষ কল্যাণপ্রদ। ঐ ব্যক্তির ভিতর যে ঈশ্বরীয় শক্তি খেলা করিত, সেটি লক্ষ্য করিও। দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান, বঙ্গদেশের সুদূর অজ্ঞাত অপরিচিত কোন পল্লীতে ইঁহার জন্ম। আজ ইউরোপ আমেরিকায় সহস্র সহস্র ব্যক্তি সত্য সত্যই ফুলচন্দন দিয়া তাঁহার পূজা করিতেছে এবং পরে আরও সহস্র সহস্র লোক করিবে। ঈশ্বরেচ্ছা কে বুঝিতে পারে? হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা যদি ইহাতে বিধাতার হস্ত না দেখিতে পাও, তবে তোমরা অন্ধ, নিশ্চিত জন্মান্ধ; যদি সময় আসে, যদি তোমাদের সহিত আলোচনা করিবার আর কখনও অবকাশ হয়, তবে তোমাদিগকে ইঁহার বিষয় আরও বিস্তারিতভাবে বলিব; এখন কেবল এইটুকু মাত্র বলিতে চাই, যদি আমার জীবনে একটি সত্য বলিয়া থাকি, তবে সে তাঁহার—তাঁহারই বাক্য; আর যদি এমন অনেক কথা বলিয়া থাকি, যাহা অসত্য, ভ্রমাত্মক, যাহা মানবজাতির কল্যাণকর নহে, সেগুলি সবই আমার, তৎসমুদয়ের জন্য আমিই সম্পূর্ণ দায়ী।

আমাদের উপস্থিত কর্ত্তব্য

[এই বক্তৃতা ট্রিপ্লিকেন সাহিত্য সমিতিতে প্রদত্ত হয়। স্বামিজীর আমেরিকা গমনের পূর্ব্বে এই সমিতির সভ্যগণের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহাদের সহিত স্বামিজীর নানাবিষয়ে আলোচনা হওয়াতে ক্রমশঃ মাদ্রাজবাসীরা স্বামিজীর অদ্ভুত ক্ষমতাবলীর পরিচয় পায় এবং অবশেষে তাঁহাদের চেষ্টায়ই তিনি চিকাগোর ধর্ম্মমহাসভায় হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হন। এই সকল কারণে এই বক্তৃতাটি বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য।]

জগৎ যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই দিন দিন জীবন-সমস্যা গভীরতর ও প্রশস্ততর হইতেছে। অতি প্রাচীনকালে যখন সমগ্র জগতের অখণ্ডত্বরূপ বৈদান্তিক সত্য প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তখন হইতেই উন্নতির মূলমন্ত্র ও সার তত্ত্ব প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। সমগ্র জগৎকে নিজের সঙ্গে না টানিয়া জগতের একটি পরমাণু পর্য্যন্ত চলিতে পারে না। সমগ্র জগৎকে সঙ্গে সঙ্গে উন্নতিপথে অগ্রসর না করাইয়া জগতের কোন স্থানে কোনরূপ উন্নতি সম্ভবপর নহে। আর প্রতিদিনই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতররূপে বুঝা যাইতেছে যে, শুধু জাতীয় বা কোন সঙ্কীর্ণ ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া কোন সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে না। যে কোন বিষয় যে কোন ভাব হউক, উহাকে উদার হইতে উদারতর হইতে হইবে,

জীবনসমস্যার সার্ব্বভৌম মীমাংসা

যতক্ষণ না উহা সার্ব্বভৌম হইয়া দাঁড়ায়; যে কোন আকাঙ্ক্ষাই হউক না, উহাকে ক্রমশঃ এমন বাড়াইতে হইবে, যাহাতে উহা সমগ্র মানবজাতিকে, শুধু তাহাই নহে, সমগ্র প্রাণিজগৎকে পর্য্যন্ত নিজ সীমার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে, প্রাচীনকালে আমাদের দেশ যে মহত্ত্বপদবীতে আরূঢ় ছিল, গত কয়েক শতাব্দী হইতে আর তাহা নাই। আর যদি আমরা, এই অবনতি কিসে হইল, তাহার কারণানুসন্ধান করি, তবে দেখিতে পাই, আমাদের দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতা, আমাদের কার্য্যক্ষেত্রের সঙ্কোচ ইহার অন্যতম কারণ।

জগতে দুইটি আশ্চর্য্য জাতি হইয়া গিয়াছেন। এক মূল জাতি হইতে উৎপন্ন কিন্তু বিভিন্ন দেশকালঘটনাচক্রে স্থাপিত; নিজ নিজ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট পন্থায় জীবন-সমস্যার সমাধানে নিযুক্ত দুইটি প্রাচীন জাতি ছিলেন—আমরা প্রাচীন হিন্দু ও প্রাচীন গ্রীক জাতির কথা বলিতেছি। উত্তরে হিমাচলের হিমশিখরসীমাবদ্ধ, জগতের প্রান্তবৎ প্রতীয়মান অনন্ত অরণ্যানী ও সমতলে প্রবহমান-সমুদ্র-সদৃশ সুস্বাদুসলিলা স্রোতস্বতীবেষ্টিত ভারতীয় আর্য্যের মন সহজেই অন্তর্ম্মুখ হইল। আর্য্যজাতি স্বভাবতঃই অন্তর্ম্মুখ, আবার চতুর্দ্দিকে এই সকল মহান্ ভাবোদ্দীপক দৃশ্যাবলীতে পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহাদের সূক্ষ্মভাবগ্রাহী

গ্রীক ও হিন্দু

মস্তিষ্ক স্বভাববশেই অন্তস্তত্ত্বানুসন্ধানপরায়ণ হইল, স্বচিত্তের বিশ্লেষণ ভারতীয় আর্য্যের প্রধান লক্ষ্য হইল। অপর দিকে গ্রীক জাতি জগতের এমন এক স্থানে বাস করিল, যেখানে গাম্ভীর্য্য অপেক্ষা সৌন্দর্য্যের অধিক সমাবেশ,—গ্রীক দ্বীপপুঞ্জের

অন্তর্ব্বর্ত্তী সুন্দর দ্বীপসমূহ—চতুর্দ্দিকস্থ প্রকৃতি নিরাভরণা কিন্তু হাস্যময়ী—তাহার মন সহজেই বহির্ম্মুখ হইল, উহা বাহ্য জগতের বিশ্লেষণপরায়ণ হইল আর উহার ফলস্বরূপ আমরা দেখিতে পাই, ভারত হইতে সর্ব্বপ্রকার বিশ্লেষণাত্মক এবং গ্রীস হইতে শ্রেণীবিভাগাত্মক বিজ্ঞানসমূহের উদ্ভব।

হিন্দু মন নিজ বিশিষ্ট পথে চলিয়া অতি অদ্ভুত ফল প্রসব করিয়াছিল। এখনও হিন্দুদের যেরূপ বিচারশক্তি আছে, ভারতীয় মস্তিষ্ক .এখনও যে প্রকার শক্তির আধার, তাহার সহিত অন্য কোনও জাতির তুলনা হয় না। আর আমরা সকলেই জানি, আমাদের বালকগণ অন্য যে কোনও দেশের বালকগণের সহিত প্রতিযোগিতায় সর্ব্বদাই জয়ী হইয়া থাকে; কিন্তু তথাপি যখন, সম্ভবতঃ মুসলমানদিগের ভারতবিজয়ের দুই এক শতাব্দী পূর্ব্বে জাতীয় শক্তি অন্তর্হিত হইল, তখন এই জাতীয় বিশেষত্বটিকে লইয়া এত বাড়াবাড়ি করা হইল যে, উহা অবনত ভাব প্রাপ্ত হইল। আর আমরা ভারতীয় শিল্প, সঙ্গীত, বিজ্ঞান, সকল বিষয়েই এই অবনতির কিছু কিছু চিহ্ন দেখিতে পাই। শিল্পের আর সেই উদার ধারণা রহিল না, ভাবের উচ্চতা ও বিভিন্ন অঙ্গের সামঞ্জস্যের চেষ্টা আর রহিল না। সকল বিষয়েই ভয়ানক অলঙ্কারপ্রিয়তার আবির্ভাব হইল, সম জাতির মৌলিকতা যেন অন্তর্হিত হইল। সঙ্গীতে, প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীতের আর হৃদয়োন্মাদী গভীর ভাব রহিল না, পূর্ব্বে যেরূপ প্রত্যেক সুর স্বতন্ত্ররূপে আপন আপন পায়ে দাঁড়াইয়া থাকিত

মুসলমানগণ কর্ত্তৃক ভারতবিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে হিন্দুজাতির অবনতি

অথচ অপূর্ব্ব ঐক্যতানের সৃষ্টি করিত, তাহা আর রহিল না, সব সুরগুলি যে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য হারাইল! আমাদের সমগ্র আধুনিক সঙ্গীত নানাবিধ সুরের তালখিচুড়িস্বরূপ কতকগুলি মিশ্রসুরের বিশৃঙ্খল সমষ্টিস্বরূপ দাঁড়াইয়াছে; ইহাই সঙ্গীত শাস্ত্রের অবনতির চিহ্নস্বরূপ। তোমাদের ভাবরাজ্যসম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়সমূহের বিশ্লেষণ করিলেও এইরূপ অলঙ্কারপ্রিয়তার প্রাচুর্য্য ও মৌলিকতার অভাব দেখিতে পাইবে, আর তোমাদের বিশেষ কার্য্যক্ষেত্রস্বরূপ ধর্ম্মেও অতি ঘোর অবনতি প্রবেশ করিয়াছিল। যে জাতি শত শত বর্ষ ধরিয়া এক গ্লাস জল 'ডান হাতে খাব কি বাঁ হাতে খাব,' এইরূপ গুরুতর সমস্যাসমূহের বিচারে ব্যস্ত রহিয়াছে, সেই জাতির নিকট আর কি আশা করিতে পার? যে দেশের বড় বড় মাথাগুলি শত শত বর্ষ ধরিয়া এই স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচারে ব্যস্ত, সেই জাতির অবনতি যে চরম সীমায় দাঁড়াইয়াছে, তাহা কি আর বলিতে হইবে? বেদান্তের তত্ত্বসমূহ, জগতে প্রচারিত ঈশ্বর ও আত্মাসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে মহত্তম ও উজ্জ্বলতম সিদ্ধান্তসমূহ নষ্টপ্রায় হইল, গভীর অরণ্যে কতিপয় মাত্র সন্ন্যাসী দ্বারা রক্ষিত হইয়া লুক্কায়িত রহিল, অবশিষ্ট সকলে কেবল খাদ্যাখাদ্য স্পৃশ্যাস্পৃশ্য প্রভৃতি গুরুতর প্রশ্নসমূহের সিদ্ধান্তে নিযুক্ত রহিল। মুসলমানগণ ভারত বিজয় করিয়া, অবশ্য তাহারা যাহা জানিত, এমন অনেক ভাল বিষয় শিখাইয়াছিল। কারণ, জগতের হীনতম ব্যক্তিও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে কিছু না কিছু শিখাইতে পারে, কিন্তু তাহারা আমাদের জাতির ভিতর শক্তি সঞ্চার করিতে পারিল না।

অবশেষে আমাদের শুভাদৃষ্টেই হউক বা দুরদৃষ্টক্রমেই হউক, ইংরাজ ভারত জয় করিল। অবশ্য পরদেশবিজয় কখনই শুভফলপ্রসূ নহে; বৈদেশিক শাসন কখনই কল্যাণকর নহে। তবে অশুভের মধ্য দিয়াও কখন কখন শুভ সংঘটিত হইয়া থাকে। ইংরাজের ভারতবিজয়ে এই বিশেষ শুভ ফল সংঘটিত হইয়াছে,— ইংলণ্ড ও সমগ্র ইউরোপ সভ্যতার জন্য গ্রীসের নিকট ঋণী। ইউরোপের সকল ভাবের মধ্য দিয়া যেন গ্রীসের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। উহার প্রত্যেক গৃহে, বাড়ীর প্রত্যেক আসবাবটিতে পর্য্যন্ত যেন গ্রীসের ছাপ দেওয়া। ইউরোপের বিজ্ঞান শিল্প সবই গ্রীসের ছায়া। আজ ভারত-ক্ষেত্রে সেই প্রাচীন গ্রীক ও প্রাচীন হিন্দু একত্রে মিলিত হইয়াছেন। এইরূপে ধীর ও নিস্তব্ধভাবে একটা পরিবর্ত্তন আসিতেছে, আর আমরা চতুর্দ্দিকে যে উদার জীবনপ্রদ পুনরুত্থানের আন্দোলন দেখিতেছি, তাহা এই সকল বিভিন্ন ভাবের একত্র সংমিশ্রণের ফল। আমাদের মানব-জীবনসম্বন্ধীয় ধারণা প্রশস্ততর হইতেছে। আমরা উদারভাবে সহৃদয়তা ও সহানুভূতির সহিত মানবজীবনের সমস্যাসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে শিখিতেছি, আর যদিও আমরা প্রথমে একটু ভুলে পড়িয়া আমাদের ভাবগুলিকে একটু সঙ্কীর্ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু আমরা এখন বুঝিতেছি যে, চতুর্দ্দিকে যে সকল সহৃদয় ভাবসমূহ দেখা যাইতেছে ও জীবনের এই প্রশস্ততর ধারণাসমূহ, আমাদেরই প্রাচীন শাস্ত্রনিবদ্ধ উপদেশের স্বাভাবিক পরিণতি-স্বরূপ। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অতি প্রাচীনকালেই যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার

ইংরাজ কর্ত্তৃক ভারতবিজয়ের শুভফল

করিয়াছিলেন, সেই ভাবগুলি যদি ঠিক ঠিক কার্য্যে পরিণত করা যায়, তবে আমরা উদার না হইয়া থাকিতে পারি না। আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট সকল বিষয়েরই লক্ষ্য—নিজ ক্ষুদ্র গণ্ডি হইতে বাহির হইয়া সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া পরস্পরে ভাব আদান প্রদান করিয়া উদার হইতে উদারতর হওয়া—ক্রমশঃ সার্ব্বভৌম ভাবে উপনীত হওয়া। কিন্তু আমরা শাস্ত্রোপদেশ না মানিয়া ক্রমশঃ আপনাদিগকে সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর করিয়া ফেলিতেছি, আমাদিগকে শুকাইয়া ফেলিতেছি। আমাদের উন্নতির পথে কতকগুলি বিঘ্ন আছে, তন্মধ্যে 'আমরাই জগতের একমাত্র শ্রেষ্ঠজাতি'—এই গোঁড়ামি একটি। ভারতকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া থাকি, স্বদেশের কল্যাণের জন্য আমি সদাই বদ্ধপরিকর, আমাদের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষগণকে আমি বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকি; তথাপি জগৎ হইতে যে আমাদিগকে অনেক জিনিস শিখিতে হইবে, এ ধারণা ত্যাগ করিতে আমি অক্ষম। আমাদিগকে শিক্ষাগ্রহণের জন্য সকলের পদতলে বসিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে, কারণ, এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিও যে, সকলেই আমাদিগকে মহৎ মহৎ শিক্ষা দান করিতে পারে। আমাদের সেই শ্রেষ্ঠ স্মৃতিকার মনু মহারাজ বলিয়াছেন—

'শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥' ২।২৩৮

অর্থাৎ 'শ্রদ্ধাবান্ হইয়া নীচ জাতির নিকট হইতেও হিতকর বিদ্যা গ্রহণ করিবে, আর অতি অন্ত্যজ ব্যক্তির নিকট হইতেও সেবাদ্বারা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম শিক্ষা করিবে।' ইত্যাদি।

সুতরাং যদি আমরা মনুর উপযুক্ত বংশধর হই, তবে তাঁহার আদেশ আমাদিগকে অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে, যে কোন ব্যক্তি আমাদিগকে শিক্ষা দিতে সমর্থ, তাহার নিকট হইতেই ঐহিক বা পারমার্থিক বিষয়ে শিক্ষা লইতে প্রস্তুত হইতে হইবে।

পক্ষান্তরে আমাদিগকে ভুলিলে চলিবে না যে, আমাদিগেরও জগৎকে বিশেষ কিছু শিক্ষা দিবার আছে। ভারতেতর দেশসমূহের সহিত আমাদিগকে সংস্রব না রাখিলে চলিবে না। আমরা যে এক-সময়ে তাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহা আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতামাত্র, আর তাহারই শাস্তিস্বরূপ আমরা সহস্র বর্ষ ধরিয়া দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ রহিয়াছি। আমরা যে অপরাপর জাতির সহিত আমাদের তুলনা করিবার জন্য বিদেশে যাই নাই, আমরা যে জগতের গতি লক্ষ্য করিয়া চলিতে শিখি নাই, ইহাই ভারতীয় মনের অবনতির এক প্রধান কারণ। আমরা যথেষ্ট শাস্তি পাইয়াছি, আর যেন আমরা ভ্রমে না পড়ি। ভারতবাসীর ভারতবহির্ভূত প্রদেশে গমন অনুচিত, এ সকল আহাম্মকের কথা, ছেলেমানুষী মাত্র। এ সকল ধারণাকে সমূলে নির্ম্মুল করিতে হইবে। তোমরা যতই ভারত হইতে বাহির হইয়া জগতের অন্যান্য জাতিদিগের মধ্যে ভ্রমণ করিবে, ততই তোমাদের এবং তোমাদের দেশের কল্যাণ। তোমরা পূর্ব্ব হইতেই,—শত শত শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই—যদি ইহা করিতে, তবে তোমরা আজ, যে কোন জাতি তোমাদের উপর প্রভুত্ব করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, তাহারই পদানত হইতে না। জীবনের প্রথম সুস্পষ্ট চিহ্ন—

বিদেশে ধর্ম্মপ্রচার ও বিদেশীর সহিত মেলা-মেশা অবশ্য কর্ত্তব্য

বিস্তার। যদি তোমরা বাঁচিতে চাও, তবে তোমাদিগকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডি ছাড়াইতে হইবে। যে মুহূর্ত্তে তোমাদের বিস্তার বন্ধ হইবে, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই জানিতে হইবে, মৃত্যু তোমাদিগকে ঘিরিয়াছে, বিপদ্ তোমাদের সম্মুখে। আমি ইউরোপ আমেরিকায় গিয়াছিলাম, তোমরাও সহৃদয়ভাবে ইহার উল্লেখ করিয়াছ। আমাকে যাইতে হইয়াছিল, কারণ এই বিস্তৃতিই জাতীয় জীবনের পুনরভ্যুদয়ের প্রথম চিহ্ন। এই পুনরভ্যুদয়শীল জাতীয় জীবন ভিতরে ভিতরে বিস্তার প্রাপ্ত হইয়া আমাকে যেন দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিল, আর সহস্র সহস্র ব্যক্তিও এইরূপে নিক্ষিপ্ত হইবে। আমার কথা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর, যদি এই জাতি আদৌ বাঁচিয়া থাকে, তবে ইহা হইবেই হইবে। সুতরাং এই বিস্তার জাতীয় জীবনের পুনরভ্যুদয়ের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ আর এই বিস্তারের সহিত মানুষের সমগ্র জ্ঞানসমষ্টিতে আমাদের যাহা দিবার আছে, সমগ্র জগতের উন্নতিবিধানে আমাদের যেটুকু দেয় ভাগ আছে, তাহাও ভারতেতর জগতে যাইতেছে।

আর, ইহা কিছু নূতন ব্যাপারও নহে। তোমাদের মধ্যে যাহারা মনে কর, হিন্দুরা চিরকাল ধরিয়া তাহাদের দেশের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ আছে, তাহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, তোমরা তোমাদের প্রাচীন শাস্ত্র পড় নাই; তোমরা তোমাদের জাতীয় ইতিহাস ঠিক ঠিক অধ্যয়ন কর নাই। যে কোন জাতিই হউক, তাহাকে বাঁচিতে হইলে তাহাকে কিছু দিতেই হইবে। প্রাণ দিলে প্রাণ পাইবে, প্রতিগ্রহ করিলেই উহার মূল্যস্বরূপ অপর সকলকে কিছু

বিদেশগমন হিন্দুর পক্ষে কিছু নূতন ব্যাপার নহে

দিতে হইবে। এত সহস্র বর্ষ ধরিয়া আমরা জীবিত রহিয়াছি—একথা ত আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এখন যদি আমরা কিরূপে এতদিন জীবিত রহিয়াছি, এই সমস্যার সমাধান করিতে হয়, তবে স্বীকার করিতেই হইবে যে, অজ্ঞ ব্যক্তিগণ যাহাই ভাবুক, আমরা চিরকালই জগৎকে কিছু না কিছু দিয়া আসিতেছি।

তবে ভারতের দান—ধর্ম্ম, দার্শনিক জ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা, আর ধর্ম্মজ্ঞান বিস্তার করিতে, ধর্ম্মপ্রচারের পথ পরিষ্কার করিতে সৈন্য-দলের প্রয়োজন হয় না। জ্ঞান ও দার্শনিক তত্ত্বকে শোণিতপ্রবাহের উপর দিয়া বহন করিতে হয় না। জ্ঞান ও দার্শনিক তত্ত্ব রক্তাক্ত নরদেহের উপর দিয়া সদাপটে গমন করে না, উহারা শান্তি ও প্রেমের পক্ষভরে শান্তভাবে আগমন করিয়া থাকে আর তাহাই বরাবর হইয়াছে। অতএব ইহা দেখা গেল, ভারতকেও বরাবর জগৎকে কিছু না কিছু দিতে হইয়াছে। লণ্ডনস্থ জনৈকা যুবতী আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'তোমরা হিন্দুরা কি করিয়াছ? তোমরা একটি জাতিকেও কখন জয় কর নাই!' ইংরাজ জাতির পক্ষে—বীর, সাহসী, ক্ষত্রিয়প্রকৃতি ইংরাজ জাতির পক্ষে—এ কথা শোভা পায়,—তাহাদের পক্ষে একজন অপরকে জয় করিতে পারিলে তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবস্বরূপ বিবেচিত হয়। তাহাদের দৃষ্টি হইতে ইহা সত্য বটে, কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে ইহার ঠিক বিপরীত। যখন আমি আমার মনকে জিজ্ঞাসা করি, ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি, আমি তাহার এই উত্তর পাই যে 'ইহার কারণ

ভারতের দান—ধর্ম্মদান

এই যে, আমরা কখন অপর জাতিকে জয় করি নাই।' ইহাই আমাদের মহা গৌরব। তোমরা আজকাল সর্ব্বদাই 'আমাদের ধর্ম্ম পরধর্ম্মবিজয়ে সচেষ্ট নহে' বলিয়া উহার নিন্দা শুনিতে পাও,—আর আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি, এমন ব্যক্তিগণের নিকট শুনিতে পাও, যাহাদের নিকট অধিকতর জ্ঞানের আশা করা যায়। আমার মনে হয়, আমাদের ধর্ম্ম যে অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে সত্যের অধিকতর নিকটবর্ত্তী, ইহাই তাহার একটি প্রধান যুক্তি। আমাদের ধর্ম্ম কখনই অপর ধর্ম্ম বিজয়ে প্রবৃত্ত হয় নাই, উহা কখনই রক্তপাত করে নাই, উহা সর্ব্বদাই আশীর্ব্বাণী ও শান্তিবাক্য উচ্চারণ করিয়াছে; সকলকে উহা প্রেম ও সহানুভূতির কথাই বলিয়াছে। এখানেই,—কেবল এখানেই পরধর্ম্মে বিদ্বেষরাহিত্যসম্বন্ধীয় ভাবসমূহ প্রথম প্রচারিত হয়; কেবল এইখানেই এই পরধর্ম্মসহিষ্ণুতা ও সহানুভূতির ভাব কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। অন্যান্য দেশে উহা কেবল মতবাদে মাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছে। এখানে,—কেবল এখানেই হিন্দুরা মুসলমানদের জন্য মস্‌জিদ ও খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য চার্চ্চ নির্ম্মাণ করিয়া দেয়।

হিন্দুগণ নীরব ও শান্তভাবে উহা দান করিয়াছেন

অতএব, হে ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা বুঝিতেছেন, আমরা আমাদের ভাব জগতে অনেকবার বহন করিয়াছি, কিন্তু অতি ধীরে, নিস্তব্ধ ও অজ্ঞাতভাবে। ভারতের সকল বিষয়ই এইরূপ। ভারতীয় চিন্তার একটি লক্ষণ উহার শান্তভাব, উহার নীরবত্ব। আবার উহার পশ্চাতে যে প্রবল শক্তি রহিয়াছে, তাহাকে বলবাচক কোন নামে অভিহিত করা যায় না। উহাকে ভারতীয় চিন্তারাশির নীরব মোহিনী শক্তি বলা যাইতে পারে। কোন

বৈদেশিক যদি আমাদের সাহিত্য অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়, প্রথমতঃ উহা তাহার অতিশয় বিরক্তিকর লাগে ; উহাতে হয়ত তাহার সাহিত্যের ন্যায় উদ্দীপনা নাই, তীব্রগতি নাই, যাহাতে সে সহজেই মাতিয়া উঠিবে। ইউরোপের বিয়োগান্ত নাটকাবলীর সহিত আমাদের নাটকগুলির তুলনা কর। পাশ্চাত্য নাটকগুলি ঘটনাবৈচিত্র্যে পূর্ণ, উহাতে ক্ষণকালের জন্য তোমায় উদ্দীপিত করে, কিন্তু যাই শেষ হইয়া যায়, তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া আসে, সবই তোমার মস্তিষ্ক হইতে চলিয়া যায়। ভারতীয় বিয়োগান্ত নাটকগুলি যেন ঐন্দ্রজালিকের শক্তিস্বরূপ, উহা ধীর নিস্তব্ধভাবে কার্য্য করে, কিন্তু একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে উহাদের প্রভাব তোমার উপর বিস্তৃত হইতে থাকিবে, তুমি আর কোথায় যাইবে ? তুমি বাঁধা পড়িলে ; আর যে কোন ব্যক্তিই আমাদের সাহিত্য স্পর্শ করিতে সাহসী হইয়াছে, সেই উহার বন্ধন অনুভব করিয়াছে, সেই উহার সহিত চিরপ্রেমে বাঁধা পড়িয়াছে।

যেমন শিশিরবিন্দু নিস্তব্ধ অদৃশ্য ও অশ্রুতভাবে পড়িলে অতি সুন্দর গোলাপকলিকে প্রস্ফুটিত করে, সমগ্র জগতের চিন্তারাশিতে ভারতের দান তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। নীরবে, অজ্ঞাতসারে অথচ অদম্য মহাশক্তিবলে উহা সমগ্র জগতের চিন্তারাশিতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, তথাপি কেহই জানে না, কখন এরূপ করিল। আমার নিকট একবার কথাপ্রসঙ্গে কেহ বলিয়াছিল, 'ভারতীয় কোন প্রাচীন গ্রন্থকারের নাম আবিষ্কার করা কি কঠিন ব্যাপার !' ঐ কথায় আমি উত্তর দিই, 'ইহাই ভারতের ভাবসঙ্গত।' তাঁহারা আধুনিক

ভারতীয় গ্রন্থকারগণ অজ্ঞাতনামা

গ্রন্থকারগণের ন্যায় ছিলেন না—যাঁহারা অন্যান্য গ্রন্থকারগণের নিকট তাঁহাদের গ্রন্থের শতকরা নব্বই ভাগ চুরি করিয়াছেন, শতকরা দশভাগ মাত্র তাঁহাদের নিজেদের, কিন্তু তাঁহারা গ্রন্থারম্ভে একটি ভূমিকা লিখিয়া পাঠককে বলিতে ভুলেন নাই যে, 'এই সকল মতামতের জন্য আমিই দায়ী।'

যে সকল মহামনীষিগণ মানবজাতির হৃদয়ে গুরুতর তত্ত্বসমূহের ভার দিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা গ্রন্থ লিখিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন, গ্রন্থে নিজেদের নাম পর্য্যন্ত দেন নাই, তাঁহারা সমাজকে তাঁহাদের গ্রন্থরাশি উপহার দিয়া নীরবে দেহত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের দর্শনকার বা পুরাণকারগণের নাম কে জানে? তাঁহারা সকলেই ব্যাস, কপিল প্রভৃতি উপাধিমাত্র দ্বারা পরিচিত। তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত সন্তান। তাঁহারাই যথার্থ গীতার অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণের সেই মহান্ উপদেশ—

'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।' ২।৪৭

'কর্ম্মেই তোমার অধিকার, ফলে কখনই নহে,' জীবনে পালন করিয়া গিয়াছেন।

ভদ্রমহোদয়গণ, ভারত এইরূপে সমগ্র জগতের উপর কার্য্য করিতেছে। তবে ইহাতেও একটি বিষয়ের অপেক্ষা আছে। বাণিজ্যদ্রব্য যেমন কোন ব্যক্তিবিশেষের নির্ম্মিত পথ দিয়াই একস্থান হইতে অপর স্থানে যাইতে পারে, ভাবরাশি সম্বন্ধেও তদ্রূপ। ভাবরাশি একদেশ হইতে অপর দেশে যাইবার পূর্ব্বে উহার যাইবার পথ প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক আর জগতের ইতিহাসে যখনই কোন মহা দিগ্বিজয়ী জাতি উঠিয়া জগতের বিভিন্ন প্রদেশকে

এক সূত্রে গাঁথিয়াছে, তখনই এই মার্গাবলম্বনে ভারতের চিন্তারাশি প্রবাহিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক জাতির শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়াছে। যতই দিন যাইতেছে, ততই প্রমাণরাশি সঞ্চিত হইতেছে যে, বৌদ্ধদের জন্মগ্রহণেরও পূর্ব্বে ভারতীয় চিন্তা সমগ্র জগতে প্রবেশ করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেই বেদান্ত চীন, পারস্য, ও পূর্ব্ব দ্বীপপুঞ্জে প্রবেশ করিয়াছিল। পুনরায় যখন মহতী গ্রীক শক্তি প্রাচ্য জগতে সমুদয় অংশকে একসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিল, তখন আবার তথায় ভারতীয় চিন্তারাশি প্রবাহিত হইয়াছিল, আর গ্রীষ্টধর্ম্ম ও উহারা এতৎসংসৃষ্ট যে সভ্যতার গর্ব্ব করিয়া থাকে তাহাও ভারতীয় চিন্তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমরা সেই ধর্ম্মের উপাসক, বৌদ্ধধর্ম্ম (উহার সমুদয় মহত্ত্ব সত্ত্বেও) যাহার বিদ্রোহী সন্তান এবং গ্রীষ্টধর্ম্ম অতি নগণ্য অনুকরণ মাত্র। আবার যুগচক্র ফিরিয়াছে, আবার এইরূপ সময় আসিয়াছে। ইংলণ্ডের দোর্দ্দণ্ড শক্তিতে জগতের বিভিন্ন ভাগকে আবার একত্র করিয়াছে। রোমক রথ্যানিচয়ের ন্যায় ইংরাজের রাস্তা কেবল স্থলে হইয়া সন্তুষ্ট নহে, উহা অতলস্পর্শ সমুদ্রের প্রত্যেক অংশ দিয়া পর্য্যন্ত ছুটিয়াছে। ইংলণ্ডের রথ্যানিচয় সমুদ্র হইতে সমুদ্রান্তরে ছুটিয়াছে। জগতের প্রত্যেক অংশ অন্য সকল অংশের সহিত একত্রীভূত হইয়াছে আর তাড়িত নব-নিযুক্ত দূতরূপে উহার অত্যদ্ভুত অংশ অভিনয় করিতেছে। এই সমস্ত অনুকূল অবস্থা পাইয়া ভারত আবার জাগিতেছে এবং জগতের উন্নতি ও সভ্যতাসমষ্টিতে উহার যাহা দিবার আছে, তাহা

বৈদেশিক দিগ্বিজয় যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দিয়া ভারতের ধর্ম্মপ্রভাব বিস্তারের সহায়ক

দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার ফলস্বরূপ প্রকৃতি যেন আমার জোর করিয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ধর্ম্মপ্রচারে প্রেরণ করিয়াছিল। আমাদের প্রত্যেকেরই আশা করা উচিত ছিল যে, ইহার সময় আসিয়াছে। সকল দিকেই শুভ চিহ্ন দেখা যাইতেছে আর ভারতীয় দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাবরাশি যাইয়া আবার সমগ্র জগৎকে জয় করিবে। সুতরাং আমাদের জীবন সমস্যা ক্রমশঃ বৃহত্তর আকার ধারণ করিতেছে। আমাদিগকে শুধু যে আমাদের নিজ দেশকে জাগাইতে হইবে, তাহা নহে, ইহা ত অতি সামান্য কথা; আমি একজন কল্পনাপ্রিয় ভাবুক ব্যক্তি, আমার ধারণা এই,—হিন্দুজাতি সমগ্র জগৎ বিজয় করিবে।

বিদেশে ধর্ম্মপ্রচারের দ্বারাই দেশের অধিকতর কল্যাণের সম্ভাবনা

জগতে অনেক বড় বড় দিগ্বিজয়ী জাতি হইয়া গিয়াছে। আমরাও বরাবর দিগ্বিজয়ী। আমাদের দিগ্বিজয়ের উপাখ্যান ভারতের সেই মহাসম্রাট্ অশোক, ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার দিগ্বিজয়রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার ভারতকে জগৎ জয় করিতে হইবে। ইহাই আমার জীবনস্বপ্ন আর আমি ইচ্ছা করি, তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই, যাহারা আমার কথা শুনিতেছ, সকলের মনে এই কল্পনা জাগ্রত হউক; আর যতদিন না তোমরা উহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছ, ততদিন যেন তোমাদের কার্য্যের বিরাম না হয়। লোকে তোমায় রোজ বলিবে, আগে নিজের ঘর সামলাও, পরে বিদেশে প্রচারকার্য্যে যাইও। কিন্তু আমি তোমাদিগকে অতি স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি, যখনই তোমরা অপরের জন্য কার্য্য কর তখনই তোমরা সর্ব্বোত্তম কার্য্য করিয়া থাক।

যখনই তোমরা অপরের জন্য কার্য্য করিয়া থাক, বৈদেশিক ভাষায় সমুদ্রের পারে তোমাদের ভাব বিস্তারের চেষ্টা কর, তখনই তোমরা নিজের জন্য সর্ব্বোত্তম কার্য্য করিতেছ, আর উপস্থিত সভা হইতেই প্রমাণ হইতেছে, তোমাদের চিন্তারাশি দ্বারা অপরদেশে জ্ঞানালোক বিস্তারের চেষ্টা করিলে তাহা কিরূপে তোমাদেরই সাহায্য করিয়া থাকে। যদি আমি ভারতেই আমার কার্য্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ রাখিতাম, তাহা হইলে ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় যাওয়ার দরুণ যে ফল হইয়াছে, তাহার এক-চতুর্থাংশও হইত না। ইহাই আমাদের সম্মুখে মহান্ আদর্শ আর প্রত্যেককেই ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। ভারতের দ্বারা সমস্ত জগতের বিজয়—ইহার কমে কিছুতেই নহে, আর আমাদের সকলকে ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, ইহার জন্য প্রাণপণ করিতে হইবে। বৈদেশিকগণ আসিয়া উহাদের সৈন্যদল দ্বারা ভারত প্লাবিত করিয়া দিক্—কুছ পরোয়া নেই—ওঠ ভারত, তোমার আধ্যাত্মিকতা দ্বারা জগৎ জয় করিয়া ফেল। আহা, এই দেশেই এ কথা প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল, ঘৃণা দ্বারা ঘৃণাকে জয় করা যায় না, প্রেমের দ্বারা বিদ্বেষকে জয় করা যায়; আমাদিগকে তাহাই করিতে হইবে। জড়বাদ ও উহার আনুষঙ্গিক দুঃখনিচয়কে জড়বাদ দ্বারা জয় করা যায় না। যখন একদল সৈন্য অপর দলকে বাহুবলে জয় করিবার চেষ্টা করে, তখন তাহারা মানবজাতিকে পশুতে পরিণত করে আর ক্রমশঃ ঐরূপ পশুসংখ্যা বাড়াইতে থাকে। আধ্যাত্মিকতা অবশ্যই পাশ্চাত্যদেশ জয় করিবে। ধীরে ধীরে তাহারা বুঝিতেছে যে, এক জাতিরূপে তাহারা যদি যাইতে চায় তবে তাহাদিগকে আধ্যাত্মিকভাবসম্পন্ন হইতে হইবে। তাহারা উহার জন্য অপেক্ষা

করিতেছে, তাহারা উহার জন্য উৎসুক হইয়া আছে। কোথা হইতে উহা আসিবে? ভারতীয় মহান্ ঋষিগণের ভাবরাশি বহন করিয়া জগতের প্রত্যেক দেশে যাইতে প্রস্তুত লোক কোথায়? এই মঙ্গলবার্ত্তা যাহাতে জগতের প্রত্যেক গলিতে ঘুঁজিতে পৌঁছে তাহার জন্য সর্ব্বত্যাগ করিতে প্রস্তুত লোক কোথায়? সত্যপ্রচারে সাহায্যের জন্য এইরূপ বীরহৃদয় ব্যক্তিগণের প্রয়োজন। বিদেশে গিয়া বেদান্তের এই মহান্ সত্যসমূহ প্রচারের জন্য বীরহৃদয় কর্ম্মিগণের প্রয়োজন। জগতে ইহার প্রয়োজন হইয়াছে, ইহা না হইলে জগৎ বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। সমুদয় পাশ্চাত্য জগৎ যেন একটি আগ্নেয়গিরির উপর অবস্থিত রহিয়াছে, কালই ইহা ফাটিয়া উহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারে। উহারা জগতের সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু কোথাও শান্তি পায় নাই। উহারা সুখের পেয়ালা প্রাণ ভরিয়া পান করিয়াছে, কিন্তু উহাতে তৃপ্তি পায় নাই। এখন এমন কাজ করিবার সময় যাহাতে ভারতের আধ্যাত্মিক ভাবসমূহ পশ্চাত্য প্রদেশের ভিতর গভীরভাবে প্রবেশ করিতে পারে। অতএব, হে মান্দ্রাজবাসী যুবকগণ, আমি তোমাদিগকে ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে বলিতেছি। আমাদিগকে বিদেশে যাইতে হইবে, আধ্যাত্মিকতা ও দার্শনিক চিন্তা সহায়ে আমাদিগকে জগৎ জয় করিতে হইবে; ইহা ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই, এই করিতে হইবে, নতুবা মৃত্যু নিশ্চিত। জাতীয় জীবনকে—একদিন যে জাতীয় জীবন সতেজ ছিল তাহাকে—পুনরায় সতেজ করিতে গেলে ভারতীয় চিন্তারাশি দ্বারা জগৎ জয় করিতে হইবে।

পক্ষান্তরে আমাদিগকে ইহাও ভুলিলে চলিবে না যে, আধ্যাত্মিক চিন্তা দ্বারা জগৎ বিজয় বলিতে আমি জীবনপ্রদ তত্ত্বসমূহের প্রচারকেই লক্ষ্য করিতেছি, শত শত শতাব্দী ধরিয়া আমরা যে শত শত কুসংস্কারকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছি, সে গুলি নহে। ঐ আগাছাগুলিকে এই ভারতভূমি হইতে পর্য্যন্ত উপড়াইয়া ফেলিয়া দিতে হইবে, যাহাতে উহারা একেবারে মরিয়া যায়। ঐ গুলি জাতীয় অবনতির কারণ স্বরূপ, ঐগুলি হইতেই মস্তিষ্কের নির্ব্বীর্য্যতা আসিয়া থাকে। আমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে, যেন আমাদের মস্তিষ্ক উচ্চ ও মহৎ চিন্তায় অক্ষম হইয়া না পড়ে, উহা যেন মৌলিকতা না হারায়, উহা যেন নিস্তেজ হইয়া না যায়, উহা যেন ধর্ম্মের নামে সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুসংস্কারে আপনাকে বিনাক্ত করিয়া না ফেলে। আমাদের এখানে—এই ভারতে কতকগুলি বিপদ আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, উহাদের মধ্যে এক দিকে ঘোর জড়বাদ অপরদিকে উহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ঘোর কুসংস্কার ; উভয় হইতেই আমাদিগকে বাঁচাইয়া চলিতে হইবে। একদিকে পাশ্চাত্যজ্ঞানমদিরাপানে মত্ত হইয়া আজকাল কতকগুলি ব্যক্তি মনে করিতেছে, তাহারা সব জানে। তাহারা প্রাচীন ঋষিগণের কথায় উপহাস করিয়া থাকে। তাহাদের নিকট হিন্দুজাতির সমুদয় চিন্তা কেবল কতকগুলি রাবিশ-মাল মাত্র, হিন্দু দর্শন কেবল শিশুর অস্ফুট বাণী মাত্র এবং হিন্দুধর্ম্ম নির্ব্বোধের কুসংস্কারমাত্র! অপরদিকে আবার কতকগুলি শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন কিন্তু তাঁহাদের মাথাটা একটু চিড়-খাওয়া, তাঁহারা আবার

ধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলির প্রচার আবশ্যক—অবান্তর কুসংস্কারগুলি নহে

উহাদের সম্পূর্ণ বিপরীত ; তাঁহারা সব ঘটনাকেই একটা শুভ বা অশুভ লক্ষণরূপে দেখিয়া থাকেন। তিনি যে জাতিবিশেষের অন্তর্ভুক্ত, তাঁহার বিশেষ জাতীয় দেবতার অথবা তাঁহার গ্রামের যাহা কিছু কুসংস্কার আছে, তাহার দার্শনিক, আধ্যাত্মিক এবং সর্ব্বপ্রকার ছেলেমানুষী ব্যাখ্যা করিতে তিনি প্রস্তুত। তাঁহার নিকট তাঁহার মতে প্রত্যেক গ্রাম্য কুসংস্কারটিই বেদবাণীর তুল্য এবং তাঁহার মতে সেইগুলির প্রতিপালনের উপর জাতীয় জীবন নির্ভর করিতেছে। এইগুলি হইতে তোমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে।

ঋষি এবং গুপ্ত তত্ত্ব ও গুপ্ত সমিতি

আমি বরং তোমাদের প্রত্যেককে ঘোর নাস্তিক দেখিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু কুসংস্কারগ্রস্ত নির্ব্বোধ দেখিতে ইচ্ছা করি না ; কারণ নাস্তিকের বরং জীবন আছে, তাহার কিছু হইবার আশা আছে, সে মৃত নহে। কিন্তু যদি কুসংস্কার ঢোকে, তবে মাথা একেবারে যায়, মস্তিষ্ক নির্ব্বীর্য্য হইয়া যায় ; মৃত্যুকীট সেই জীবন্ত শরীরে প্রবেশ করে। এই দুইটিই পরিত্যাগ করিতে হইবে। নির্ভীক সাহসী লোক—ইহাই আমরা চাই। আমরা চাই, রক্ত তাজা হউক, স্নায়ু সতেজ হউক, পেশী লৌহদৃঢ় হউক। মস্তিষ্কের নির্ব্বীর্য্যতা-সম্পাদন, দৌর্ব্বল্যজনক ভাবের দরকার নাই। সেগুলি পরিত্যাগ কর। সর্ব্বপ্রকার গুপ্তভাবের দিকে ঝোঁক পরিত্যাগ কর। ধর্ম্মে কোন গুপ্তভাব নাই। বেদান্ত বা বেদ সংহিতা বা পুরাণে কি কোন গুপ্তভাব আছে ? প্রাচীন ঋষিগণ তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচারার্থ কোথায় কি গুপ্ত সমিতিসমূহ স্থাপন করিয়াছিলেন ? তাঁহাদের আবিষ্কৃত মহান্ সত্যসমূহ সমগ্র জগতে

দিবার জন্য তাঁহারা কোথায় কি হাতের সাফাই, কৌশল প্রভৃতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহা কোথাও লিপিবদ্ধ পাইয়াছ কি? গুপ্ত ভাব লইয়া নাড়াচাড়া ও কুসংস্কার সর্ব্বদাই দুর্ব্বলতার চিহ্নস্বরূপ, উহা সর্ব্বদাই অবনতি ও মৃত্যুর চিহ্নস্বরূপ। অতএব উহা হইতে সাবধান হও, তেজস্বী হও, নিজের পায়ের উপর নিজে দাঁড়াও। সংসারে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার আছে। আমাদের প্রকৃতির ধারণা যতদূর, সেই হিসাবে উহাদিগকে অতিপ্রকৃতি বলিতে পারি, কিন্তু উহাদের কোনটি গুপ্ত নহে। ধর্ম্মের সত্যসমূহ গুপ্ত, অথবা উহারা হিমালয়ের হৈমচূড়ায় অবস্থিত গুপ্ত সমিতিসমূহের একচেটিয়া সম্পত্তি, এ কথা ভারতভূমিতে কখনই প্রচারিত হয় নাই। আমি হিমালয়ে গিয়াছিলাম; তোমরা যাও নাই। তোমাদের দেশ হইতে উহা অনেক শত মাইল দূরবর্ত্তী। আমি একজন সন্ন্যাসী, গত চতুর্দ্দশ বর্ষ ধরিয়া পদব্রজে চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছি; আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, এইরূপ গুপ্ত সমিতিসমূহ কোথাও নাই। এই সকল কুসংস্কারের পশ্চাৎ ধাবমান হইও না। তোমাদের এবং তোমাদের সমগ্র জাতির পক্ষে বরং ঘোর নাস্তিক হওয়া ভাল, কারণ, নাস্তিক হইলে অন্ততঃ তোমাদের একটু তেজ থাকিবে, কিন্তু এইরূপ কুসংস্কারসম্পন্ন হওয়া অবনতি ও মৃত্যুস্বরূপ। অন্য বিষয়ে সতেজমস্তিষ্ক ব্যক্তিগণ এই সকল কুসংস্কার লইয়া তাহাদের সময় নষ্ট করে, জগতের ঘোরতর কুসংস্কারসমূহের রূপক ব্যাখ্যা করিতে সময় নষ্ট করে, ইহা সমগ্র মানবজাতির পক্ষে ঘোরতর লজ্জার বিষয়।

সকল বিষয় ব্যাখ্যার চেষ্টা করিও না

সাহসী হও, সব বিষয় ব্যাখ্যার চেষ্টা করিও না। প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের অনেক কুসংস্কার আছে, আমাদের শরীরে অনেক কাল দাগ—অনেক ক্ষত আছে, ঐগুলিকে একেবারে তুলিয়া ফেলিতে হইবে, কাটিয়া দিতে হইবে, নষ্ট করিতে হইবে। কিন্তু তাহাতে আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের আধ্যাত্মিকতা, আমাদের জাতীয় জীবন কিছুমাত্র নষ্ট হইবে না। ধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলি ইহাতে অক্ষত থাকিবে; আর যতই এই কাল দাগগুলি মুছিয়া যাইবে, ততই মূলতত্ত্বগুলি আরও উজ্জ্বলভাবে, সতেজে প্রকাশিত হইবে। ঐ তত্ত্বগুলিকে ধরিয়া থাক।

হিন্দুধর্ম্মই একমাত্র সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম কেন?

তোমরা শুনিয়াছ, জগতের প্রত্যেক ধর্ম্মই আপনাকে সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম বলিয়া দাবি করিয়া থাকে। প্রথমতঃ আমি বলিতে চাই যে, সম্ভবতঃ কোন ধর্ম্মই কোন কালে সার্ব্বভৌম ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইবে না; কিন্তু যদি কোন ধর্ম্মের এই দাবি করিবার অধিকার থাকে, তবে আমাদের ধর্ম্মই কেবল এই নামের যোগ্য হইতে পারে, অপর কোন ধর্ম্ম নহে; কারণ অন্যান্য সকল ধর্ম্মই কোন ব্যক্তিবিশেষ অথবা ব্যক্তিগণের উপর নির্ভর করে। অন্যান্য সকল ধর্ম্মই কোন তথাকথিত ঐতিহাসিক ব্যক্তির জীবনের সহিত জড়িত। উহারা মনে করে, ঐ ঐতিহাসিকতা তাহাদের ধর্ম্মের দৃঢ়তাবিধায়ক, কিন্তু বাস্তবিক যাহাকে তাহারা সবলতা মনে করে, তাহাই প্রকৃতপক্ষে দুর্ব্বলতা, কারণ যদি সে ব্যক্তির ঐতিহাসিকতা অপ্রমাণ করা যায়, তবে তাহাদের ধর্ম্মরূপ প্রাসাদ একেবারে ভূমিসাৎ হইয়া পড়ে।

ঐ ধর্ম্মসংস্থাপক বড় বড় মহাপুরুষগণের জীবনের অর্দ্ধেক ঘটনা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধেকে বিশেষরূপে সন্দেহ উত্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং যে সকল সত্যের কেবল তাঁহাদের কথার উপর প্রামাণ্য ছিল, সেগুলি আবার শূন্যে বিলীন হইবার উপক্রম হইয়াছে। আমাদের ধর্ম্মে যদিও মহাপুরুষের সংখ্যা যথেষ্ট, কিন্তু আমাদের ধর্ম্মের সত্যসকল তাঁহাদের কথার উপর নির্ভর করে না। কৃষ্ণ—কৃষ্ণ বলিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য নহে, তিনি বেদান্তের একজন মহান্ আচার্য্য বলিয়াই তাঁহার মাহাত্ম্য। যদি তিনি তাহা না হইতেন, তবে বুদ্ধদেবের নামের ন্যায় তাঁহার নামও ভারত হইতে একেবারে লোপ পাইত।

হিন্দুগণ ব্যক্তিবিশেষের মতানুযায়ী নহেন, ধর্ম্মের মূল সত্যগুলির উপাসক

সুতরাং আমরা চিরকালই ব্যক্তিবিশেষের মতানুযায়ী নহি, আমরা ধর্ম্মের তত্ত্বগুলির উপাসক। ব্যক্তিগণ সেই তত্ত্বসমূহের সাকার মূর্ত্তিস্বরূপ—উদাহরণস্বরূপ। যদি ঐ তত্ত্বগুলি অবিকৃত থাকে, তবে শত সহস্র মহা-পুরুষের, শত সহস্র বুদ্ধের অভ্যুদয় হইবে। কিন্তু যদি ঐ তত্ত্বগুলির লোপ হয়, যদি ঐগুলি ভুলিয়া যাওয়া যায়, আর সমস্ত জাতীয় জীবন তথাকথিত কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তির মতানুযায়ী হইয়া চলিতে যায়, তবে সেই ধর্ম্মের অবনতি অনিবার্য্য, সেই ধর্ম্মের বিপদ অবশ্যম্ভাবী। কেবল আমাদের ধর্ম্মই কোন ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তিসমূহের জীবনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত নহে, উহা তত্ত্বসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত। অপর দিকে, আবার উহাতে লক্ষ লক্ষ অবতার, মহাপুরুষের স্থান হইতে পারে। নূতন অবতার বা নূতন মহাপুরুষেরও আমাদের ধর্ম্মে স্থান হইতে পারে, কিন্তু

তাঁহাদের প্রত্যেককেই সেই তত্ত্বসমূহের জীবন্ত উদাহরণ স্বরূপ হইতে হইবে। এইটি ভুলিলে চলিবে না। আমাদের ধর্ম্মের এই তত্ত্বগুলি অবিকৃতভাবে রহিয়াছে আর এইগুলিতে যাহাতে কালে মালিন্য ও ধূলি সঞ্চিত হইয়া না পড়ে তজ্জন্য আমাদের সকলকে সারা জীবন চেষ্টা করিতে হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয়, আমাদের ঘোর জাতীয় অবনতি ঘটিলেও বেদান্তের এই তত্ত্বগুলি কখনই মলিন হয় নাই। অতি দুষ্ট ব্যক্তিও উহাদিগকে দূষিত করিতে সাহসী হয় নাই। আমাদের শাস্ত্রসমূহ জগতের মধ্যে অন্যান্য শাস্ত্র অপেক্ষা উত্তমভাবে রক্ষিত হইয়াছে। অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত তুলনায় উহাতে প্রক্ষিপ্ত অংশ, মূলের বিকৃতি অথবা ভাবের বিপর্য্যয় নাই বলিলেই হয়। প্রথমেও যেমন ছিল, ঠিক সেই ভাবেই উহা রহিয়াছে, এবং জীবাত্মাকে সেই আদর্শের দিকে পরিচালিত করিতেছে।

বিভিন্ন ভাষ্যকারগণ উহার ভাষ্য করিয়াছেন, অনেক মহান্ আচার্য্যগণ উহা প্রচার করিয়াছেন, এবং উহাদের উপর ভিত্তি করিয়া সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছেন, আর তোমরা দেখিবে, এই বেদগ্রন্থে এমন অনেকগুলি তত্ত্ব আছে, যেগুলি আপাতদৃষ্টিতে বিরোধী বলিয়া প্রতীত হয়। কতকগুলি শ্লোক সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদাত্মক, অপরগুলি আবার সম্পূর্ণ অদ্বৈতভাবদ্যোতক। দ্বৈতবাদী ভাষ্যকার দ্বৈতবাদ ছাড়া আর কিছুই বুঝিতে পারেন না, সুতরাং তিনি অদ্বৈত শ্লোকগুলি একেবারে চাপা দিয়া যাইতে চান। দ্বৈতবাদী ধর্ম্মাচার্য্য ও পুরোহিতগণ সকলেই দ্বৈত-ভাবে উহাদের ব্যাখ্যা করিতে চান। অদ্বৈতবাদী ভাষ্যকারগণও

দ্বৈত শ্লোকগুলিকে তদ্রূপ অদ্বৈতপক্ষে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহা ত বেদের দোষ নহে। সমগ্র বেদই দ্বৈতভাবের কথা বলিতেছে, এটি প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা মূর্খোচিত কার্য্য। আবার সমগ্র বেদ অদ্বৈতভাবসমর্থক, ইহা প্রমাণের চেষ্টাও তদনুরূপ মূর্খোচিত। বেদ দ্বৈত অদ্বৈত উভয়ই। আমরা নূতন নূতন ভাবের আলোকে ইহা আজকাল অপেক্ষাকৃত ভালরূপে বুঝিতে পারিতেছি। এই সকল বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও ধারণার দ্বারা পরিশেষে এই চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এই সকলগুলিই মনের ক্রমোন্নতির জন্য প্রয়োজন আর তজ্জন্যই বেদ উহাদের উপদেশ দিয়াছেন। সমগ্র মানবজাতির প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া বেদ সেই উচ্চতম লক্ষ্যে পৌঁছিবার বিভিন্ন সোপানাবলী দেখাইয়াছেন। সেগুলি যে পরস্পর বিরোধী তাহা নহে; বেদ বালকবৎ নির্ব্বোধ মানবগণকে মোহিত করিবার জন্য ওসকল বৃথাবাক্য প্রয়োগ করেন নাই।

ভাষ্যকারগণের বেদব্যাখ্যায় মতভেদ

কিন্তু উহাদের প্রয়োজন আছে। শুধু বালকগণের জন্য নহে, অনেক বয়স্ক ব্যক্তিগণের জন্যও বটে। যতদিন আমাদের শরীর আছে, যতদিন এই শরীরকে আত্মা বলিয়া ভ্রম হইতেছে, যতদিন আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়বদ্ধ, যতদিন আমরা এই স্থূলজগৎ দেখিতেছি, ততদিন আমাদিগকে ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর বা সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ, মহামনীষী রামানুজ প্রমাণ করিয়াছেন, ঈশ্বর, জীব, জগৎ এই তিনটির মধ্যে

দেহবুদ্ধি-বর্ত্তমানে সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করিতেই হইবে

একটি স্বীকার করিলে অপরগুলিও স্বীকার করিতেই হইবে। ইহা এড়াইবার জো নাই। সুতরাং যতদিন তোমরা বাহ্য জগৎ দেখিতেছ, ততদিন জীবাত্মা ও ঈশ্বর অস্বীকার করা ঘোর বাতুলতা মাত্র।

দেহাদিভাব-লোপে অদ্বৈতানুভূতি

তবে মহাপুরুষগণের জীবনে কখন কখন এমন সময় আসিতে পারে, যখন জীবাত্মা তাহার সমুদয় বন্ধন অতিক্রম করিয়া যায়, যখন সে প্রকৃতির পারে চলিয়া যায়; সেই সর্ব্বাতীত প্রদেশে চলিয়া যায়, যাহার সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন,—

'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।' তৈঃ ২।৯
'ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ।' কেন ১।৩
'নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।' কেন ২।২

'মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে।' 'সেখানে চক্ষুও যায় না, বাক্যও যায় না, মনও যায় না।' 'আমি তাঁহাকে জানি, ইহা মনে করি না; জানি না, ইহাও মনে করি না।'

তখনই জীবাত্মা সমুদয় বন্ধন অতিক্রম করে; তখনই—কেবল তখনই তাহার হৃদয়ে অদ্বৈতবাদের মূলতত্ত্ব—আমি ও সমগ্র জগৎ এক, আমি ও ব্রহ্ম এক—উদিত হয়।

আর এই সিদ্ধান্ত যে শুদ্ধ জ্ঞান ও দর্শন দ্বারাই লব্ধ হইয়াছে, তাহা নহে; আমরা প্রেমবলেও ইহার কতকটা আভাস পাইতে পারি। তোমরা ভাগবতে পড়িয়াছ, গোপীগণমধ্য হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে তাঁহার বিরহে বিলাপ করিতে করিতে তাঁহার ভাবনা তাহাদের মনে এরূপ প্রবল হইল যে, তাহাদের

প্রত্যেকেই নিজ দেহ বিস্মৃত হইল, তাহারা আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানে তাঁহার ন্যায় বেশভূষা করিয়া তাঁহার লীলার অনুকরণে প্রবৃত্ত হইল। সুতরাং বুঝিতেছি, প্রেম-বলেও এই একত্বানুভূতি আসিয়া থাকে। একজন প্রাচীন পারস্যদেশীয় সুফির একটি কবিতায় এইরূপ ভাবের কথা আছে :—আমি প্রেমাস্পদের নিকট গেলাম —দেখিলাম, তাঁহার গৃহদ্বার রুদ্ধ। আমি দ্বারে করাঘাত করিলাম, ভিতর হইতে একটি স্বর বলিল, 'কেও?' আমি উত্তর দিলাম, 'আমি।' দ্বার খুলিল না। আমি দ্বিতীয়বার আসিলাম, দ্বারে আঘাত করিলাম। সেই স্বর আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'কেও?' আমি আবার উত্তর দিলাম, 'আমি অমুক।' তথাপি দ্বার খুলিল না। তৃতীয়বার আসিলাম, সেই স্বর আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'কেও?' তখন আমি উত্তর দিলাম, 'হে প্রিয়তম, আমিই তুমি, তুমিই আমি।' তখন দ্বার খুলিল।

প্রেমবলেও অদ্বৈতানুভূতি সম্ভব

সুতরাং আমাদিগকে বুঝিতে হইবে ব্রহ্মানুভূতির বিভিন্ন সোপান আছে, আর যদিও প্রাচীন ভাষ্যকারগণের মধ্যে (যাঁহাদিগকে আমাদের শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা উচিত) বিবাদ হইয়া থাকে, তথাপি আমাদের বিবাদ করিবার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ, জ্ঞানের ইতি করা যায় না। প্রাচীনকালে বা বর্ত্তমানকালে সর্ব্বজ্ঞত্ব কাহারও একচেটিয়া অধিকার নহে। যদি অতীত কালে ঋষি মহাপুরুষ হইয়া থাকেন, নিশ্চিত জানিও, বর্ত্তমানকালেও অনেক ঋষির অভ্যুদয় হইবে;

বিভিন্ন মত ব্রহ্মানুভূতির বিভিন্ন উপায় ও সোপানমাত্র এবং সকলেরই উহাতে অধিকার আছে

যদি প্রাচীনকালে ব্যাস বাল্মীকি শঙ্করাচার্য্যগণের অভ্যুদয় হইয়া থাকে, তবে তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই এক একজন শঙ্করাচার্য্য হইতে পারিবে না কেন? আমাদের ধর্ম্মের এই বিশেষত্বটিও আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। অন্যান্য শাস্ত্রেও প্রত্যাদিষ্ট পুরুষগণের বাক্যই শাস্ত্রের প্রমাণস্বরূপ কথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এইরূপ পুরুষের সংখ্যা তাঁহাদের মতে এক দুই অথবা অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি। তাঁহারাই সর্ব্বসাধারণের জন্য ঐ সত্যের প্রচার করিয়াছেন, আমাদের সকলকেই তাঁহাদের কথা মানিতে হইবে। নাজরথীয় যীশুর মধ্যে সত্যের প্রকাশ হইয়াছিল; আমাদের সকলকে উহাই মানিয়া লইতে হইবে, আমরা আর বেশী কিছু জানি না। কিন্তু আমাদের ধর্ম্মে বলে— মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের ভিতর সেই সত্যের আবির্ভাব হইয়াছিল— একজন দুইজন নহে, অনেকের উপর ঐ সত্যের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এই মন্ত্রদ্রষ্টা অর্থে মন্ত্র অর্থাৎ তত্ত্বসমূহের সাক্ষাৎকর্ত্তা—কেবল বাক্যবাগীশ, শাস্ত্রপাঠী, পণ্ডিত বা শব্দবিৎ নহে,—তত্ত্বসাক্ষাৎকর্ত্তা।

> 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
> ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন॥' কঠ ১।২।২৩

'বহু বাক্যব্যয় দ্বারা, অথবা মেধা দ্বারা, এমন কি বেদপাঠ দ্বারাও আত্মাকে লাভ করা যায় না।'

বেদ নিজে একথা বলিতেছেন। তোমরা কি অন্য কোন শাস্ত্রে এরূপ নির্ভীক বাণী শুনিতে পাও—বেদপাঠের

দ্বারা পর্য্যন্ত আত্মাকে লাভ করা যায় না ? হৃদয় খুলিয়া তাঁহাকে প্রাণভরিয়া ডাকিতে হইবে। তীর্থ বা মন্দিরাদিতে গেলে, তিলক ধারণ করিলে অথবা বস্ত্রবিশেষ পরিলে ধর্ম্ম হয় না। তুমি গায়ে চিত্র বিচিত্র করিয়া চিতা-বাঘটি সাজিয়া বসিয়া থাকিতে পার, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত না তোমার হৃদয় খুলিতেছে, যতদিন পর্য্যন্ত না ভগবানকে উপলব্ধি করিতেছ ততদিন সব বৃথা। হৃদয় যদি রঙে, তবে আর বাহিরের রঙের আবশ্যক করে না। ধর্ম্মকে সাক্ষাৎ করিলেই তবে কাজ হইবে। বাহিরের রঙ, আড়ম্বরাদি যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের ধর্ম্মজীবনে সাহায্য করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেগুলির উপযোগিতা আছে, তত-ক্ষণ পর্য্যন্ত সেগুলি থাকুক, ক্ষতি নাই; কিন্তু সেগুলি আবার অনেক সময় শুধু অনুষ্ঠানমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া যায়; তখন তাহারা ধর্ম্ম-জীবনে সাহায্য না করিয়া বরং বিঘ্ন করে; লোকে এই বাহ্য অনুষ্ঠান গুলির সহিত ধর্ম্মকে সমানার্থ করিয়া বসে। তখন মন্দিরে যাওয়া ও পুরোহিতকে কিছু দেওয়া ধর্ম্মজীবনের সহিত সমান হইয়া দাঁড়ায়; এইগুলি অনিষ্টকর; ইহা যাহাতে নিবারণ হয়, তাহা করা উচিত। আমাদের শাস্ত্র বার বার বলিতেছেন, ধর্ম্ম কখনও বহিরিন্দ্রিয়ের জ্ঞানের দ্বারা লাভ হইতে পারে না। তাহাই ধর্ম্ম, যাহা আমাদিগকে সেই অক্ষর পুরুষের সাক্ষাৎকার করায়; আর এই ধর্ম্ম সকলেরই জন্য। যিনি সেই অতীন্দ্রিয় সত্যের সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, যিনি আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, যিনি ভগবানকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন—তাঁহাকে সর্ব্বভূতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনিই ঋষি হইয়াছেন। সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে যিনি

ধর্ম্ম বাহিরে নহে, ভিতরে

এইরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিও যেমন ঋষি, সহস্র বর্ষ পরেও যিনি উপলব্ধি করিবেন, তিনিও তদ্রূপ ঋষি। আর যতদিন না তোমরা ঋষি হইতেছ, ততদিন তোমাদের ধর্ম্মজীবন লাভ হইবে না। তখনই তোমাদের প্রকৃত ধর্ম্ম আরম্ভ হইবে ; এখন কেবল প্রস্তুত হইতেছ মাত্র, তখনই তোমাদের ভিতর ধর্ম্মের প্রকাশ হইবে, এখন কেবল মানসিক ব্যায়াম ও শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ মাত্র। অতএব আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমাদের ধর্ম্ম স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন, যে কেহ মুক্তিলাভ করিতে চায়, তাহাকেই এই ঋষিত্ব লাভ করিতে হইবে, মন্ত্রদ্রষ্টা হইতে হইবে, ঈশ্বর দর্শন করিতে হইবে। ইহাই মুক্তি।

আর যদি ইহাই আমাদের শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হয়, তবে বুঝা যাইতেছে যে, আমরা নিজে নিজেই অতি সহজে আমাদের শাস্ত্র বুঝিতে পারিব, নিজেরাই উহার অর্থ বুঝিতে পারিব, উহার মধ্য হইতে যেটুকু আমাদের প্রয়োজন, তাহাই গ্রহণ করিতে পারিব, নিজে নিজেই সত্য বুঝিতে পারিব। ইহাই করিতে হইবে। আবার আমাদিগকে প্রাচীন ঋষিগণকে, তাঁহারা যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্য সম্মান দেখাইতে হইবে। এই প্রাচীনগণ মহাপুরুষ ছিলেন, কিন্তু আমরা আরও বড় হইতে চাই।

তোমাদের নিজেদের ভিতরেই সব রহিয়াছে—কেবল উহাকে ব্যক্ত কর

তাঁহারা অতীতকালে বড় বড় কাজ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদিগকে তাঁহাদের অপেক্ষাও বড় বড় কাজ করিতে হইবে। প্রাচীনভারতে শত শত ঋষি ছিলেন, এখন লক্ষ লক্ষ ঋষি হইবেন, নিশ্চিত হইবেন। আর তোমাদের প্রত্যেকেই

যতই শীঘ্র ইহা বিশ্বাস করিবে, ভারতের পক্ষে ও সমগ্র জগতের পক্ষে ততই কল্যাণ! তোমরা যাহা বিশ্বাস করিবে তোমরা তাহাই হইবে। তোমরা যদি আপনাদিগকে অকুতোভয় বলিয়া বিশ্বাস কর, তবে তোমরাও অকুতোভয় হইবে। যদি তোমরা আপনাদিগকে সাধু বলিয়া বিশ্বাস কর, কালই তোমরা সাধুরূপে পরিণত হইবে। কিছুতেই তোমাদিগকে বাধা দিতে পারিবে না। কারণ, আমাদের আপাতবিরোধী সম্প্রদায় সকলের ভিতর যদি একটি সাধারণ মত থাকে, তবে তাহা এই যে, আত্মার মধ্যে প্রথম হইতে মহিমা, তেজ ও পবিত্রতা রহিয়াছে। কেবল রামানুজের মতে আত্মা সময়ে সময়ে সঙ্কুচিত হন ও সময়ে সময়ে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আর শঙ্করের মতে ঐ সঙ্কোচ ও বিকাশ ভ্রম মাত্র। এ প্রভেদ থাকুক, কিন্তু সকলেই ত স্বীকার করিতেছে, ব্যক্তই হউক, আর অব্যক্তই হউক, যে কোন আকারে হউক ঐ শক্তি রহিয়াছে আর যত শীঘ্র উহা বিশ্বাস করা যায়, ততই তোমাদের কল্যাণ। সব শক্তি তোমাদের ভিতর রহিয়াছে। তোমরা সব করিতে পার। উহা বিশ্বাস কর। বিশ্বাস করিও না— তোমরা দুর্ব্বল। আজ কাল আমরা যেমন আপনাদিগকে আধপাগলা বলিয়া মনে করি, সেরূপ বিশ্বাস করিও না। তোমরা এমন কি, অপরের সাহায্য ব্যতীতও সব করিতে পার। সব শক্তি তোমাদের ভিতর রহিয়াছে; উঠিয়া দাঁড়াও এবং তোমাদের ভিতর যে অধীশ্বরত্ব লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহাকে প্রকাশ কর।

ভারতের ভবিষ্যৎ

[মাদ্রাজের এই শেষ বক্তৃতাটি একটি বৃহৎ তাঁবুর মধ্যে প্রদত্ত হয়—প্রায় চারি সহস্র ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল]

এই সেই প্রাচীনভূমি, অন্যান্য দেশে যাইবার পূর্ব্বেই তত্ত্বজ্ঞান যে স্থানকে নিজ প্রিয় বাসভূমিরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন ; এই সেই ভারতভূমি, যে ভূমির আধ্যাত্মিক-প্রবাহ জড়রাজ্যে সাগর-সদৃশ প্রবহমান স্রোতস্বতীসমূহের তুল্য, যেখানে অনন্ত হিমালয় স্তরে স্তরে উত্থিত হইয়া হিমশিখররাজি দ্বারা যেন স্বর্গ-রাজ্যের রহস্যনিচয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। এই সেই ভারত, যে ভারতভূমির মৃত্তিকা শ্রেষ্ঠতম ঋষিমুনিগণের চরণরজে পবিত্রীকৃত হইয়াছে। এইখানেই সর্ব্বপ্রথম অন্তর্জ্জগতের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা হইয়াছিল, এইখানেই মানবমন নিজ স্বরূপানুসন্ধানে প্রথম অগ্রসর হইয়াছিল। এইখানেই জীবাত্মার অমরত্ব, অন্তর্য্যামী ঈশ্বর এবং জগৎপ্রপঞ্চে ও মানবে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত পরমাত্মা-সম্বন্ধীয় মতবাদের প্রথম উদ্ভব। ধর্ম্ম ও দর্শনের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ-সকল এইখানেই চরম পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সেই ভূমি, যেখান হইতে ধর্ম্ম ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহ বন্যাকারে প্রবাহিত হইয়া সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করিয়াছে, আর এখান হইতেই আবার তদ্রূপ তরঙ্গের অভ্যুদয় হইয়া নিস্তেজ জাতিসমূহের ভিতর জীবন

প্রাচীন ভারত

ও তেজ সঞ্চার করিবে। এই সেই ভারত, যাহা শত শত শতাব্দীর অত্যাচার, শত শত বৈদেশিক আক্রমণ, শত শত প্রকার রীতিনীতির বিপর্য্যয় সহিয়াও অক্ষুণ্ণ আছে। এই সেই ভূমি, যাহা নিজ অবিনাশী বীর্য্য ও জীবন লইয়া পর্ব্বত হইতেও দৃঢ়তর ভাবে এখনও দণ্ডায়মান। আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট আত্মা যেমন অনাদি অনন্ত ও অমৃতস্বরূপ, আমাদের এই ভারতভূমির জীবনও তদ্রূপ। আর আমরা এই দেশের সন্তান।

অতীত গৌরবের চিন্তা ভাবী কার্য্যের উত্তেজক

হে ভারতসন্তানগণ, আমি তোমাদিগকে আজ কতকগুলি কাজের কথা বলিতে আসিয়াছি আর ভারতভূমির পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করাইয়া দিবার উদ্দেশ্য—কেবল তোমাদিগকে প্রকৃত পথে কার্য্যের আহ্বান করা ব্যতীত ইহা আর কিছু নহে। আমাকে লোকে অনেকবার বলিয়াছে, পূর্ব্ব গৌরব স্মরণে কেবল মনের অবনতি হয় মাত্র, উহাতে কোন ফলোদয় হয় না, সুতরাং আমাদিগকে ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে। সত্য কথা। কিন্তু ইহাও বুঝিতে হইবে, অতীতের গর্ভেই ভবিষ্যতের জন্ম। অতএব যতদূর পার, পশ্চাদ্দৃষ্টি কর, পশ্চাতে যে অনন্ত নির্ঝরিণী প্রবাহিত, প্রাণ ভরিয়া আকণ্ঠ তাহার সলিল পান কর, তারপর সম্মুখ-সম্প্রসারিত দৃষ্টি লইয়া সম্মুখে অগ্রসর হও এবং ভারত প্রাচীনকালে যতদূর উচ্চ গৌরবশিখরে আরূঢ় হইয়াছিল, তাহাকে তদপেক্ষা উচ্চতর, উজ্জ্বলতর, মহত্তর, মহিমাশালী করিবার চেষ্টা কর। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মহাপুরুষ ছিলেন। আমাদিগকে প্রথমে ইহা জানিতে হইবে। আমাদিগকে প্রথমে জানিতে

হইবে, আমরা কি উপাদানে গঠিত, কোন্ রক্ত আমাদের ধমনীতে প্রবহমান। তারপর সেই পূর্ব্বপুরুষগণ হইতে প্রাপ্ত শোণিতে বিশ্বাসী হইয়া, তাঁহাদের সেই অতীত কার্য্যে বিশ্বাসী হইয়া, সেই বিশ্বাসবলে, সেই অতীত মহত্ত্বের জলন্ত ধারণা হইতেই পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠতর নূতন ভারত গঠন করিতে হইবে। অবশ্য মধ্যে মধ্যে এখানে অবনতির যুগ আসিয়াছে। আমি উহা বড় ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনি না; আমরা সকলেই সে কথা জানি—উহারও আবশ্যকতা ছিল। এক প্রকাণ্ড মহীরুহ হইতে সুন্দর সুপক্ক ফল জন্মিল, সেই ফল মাটিতে পড়িয়া পচিল, তাহা হইতে আবার অঙ্কুর জন্মিয়া হয়ত প্রথম বৃক্ষ হইতেও মহত্তর বৃক্ষের উদ্ভব হইল। এইরূপ, যে অবনতির যুগের মধ্য দিয়া আমাদিগকে আসিতে হইয়াছে, তাহারও প্রয়োজনীয়তা ছিল। সেই অবনতি হইতেই ভাবী ভারতের অভ্যুদয় হইতেছে। এখনই উহার অঙ্কুর দেখা যাইতেছে, উহার নবপল্লব বাহির হইয়াছে—এক মহান্ প্রকাণ্ড 'উৰ্দ্ধমূলম্' বৃক্ষ উদ্গত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, আর আমি অদ্য তাহারই সম্বন্ধে তোমাদিগকে বলিতে অগ্রসর হইয়াছি।

এদেশের সমস্যা অন্যান্য দেশ হইতে জটিলতর

অন্যান্য দেশের সমস্যাসমূহ হইতে এদেশের সমস্যা জটিলতর, গুরুতর। জাতীয় অবান্তর বিভাগ, ধর্ম্ম, ভাষা, শাসন প্রণালী—এই সমুদয় লইয়াই একটি জাতি গঠিত। যদি একটি একটি করিয়া জাতি লইয়া এই জাতির সহিত তুলনা করা যায়, তবে দেখা যাইবে, অন্যান্য জাতি যে যে উপাদানে গঠিত, তাহা অপেক্ষাকৃত

অল্পসংখ্যক। আর্য্য, দ্রাবিড়ী, তাতার, তুর্ক, মোগল, ইউরোপীয় —যেন জগতের সকল জাতির শোণিত এদেশে রহিয়াছে। এখানে নানা ভাষার অপূর্ব্ব সমাবেশ—আর আচার ব্যবহারে দুইটি ভারতীয় শাখাজাতির যে প্রভেদ, ইউরোপীয় ও প্রাচ্য জাতির মধ্যেও তত প্রভেদ নাই। কেবল আমাদের পবিত্র পরম্পরাগত উপদেশ, আমাদের ধর্ম্মই আমাদের সম্মিলন ভূমি—ঐ ভিত্তিতেই আমাদিগকে জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইবে। ইউরোপে রাজনীতিই জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি। এসিয়ায় কিন্তু ধর্ম্মই ঐ ঐক্যের মূল। অতএব ভাবী ভারত গঠনে ধর্ম্মের ঐক্যসাধন অনিবার্য্যরূপে প্রয়োজন। এই ভারতভূমির পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম, উত্তর হইতে দক্ষিণ সর্ব্বত্র এক ধর্ম্ম সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। এক ধর্ম্ম—এ কথা আমি কি অর্থে ব্যবহার করিতেছি? খ্রীষ্টান, মুসলমান বা বৌদ্ধগণের ভিতর যে হিসাবে এক ধর্ম্ম বিদ্যমান, আমি সে হিসাবে 'এক ধর্ম্ম' কথা ব্যবহার করিতেছি না। আমরা জানি, আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তসমূহ যতই বিভিন্ন হউক, উহাদের যতই বিভিন্ন দাবি থাকুক, তথাপি কতকগুলি সিদ্ধান্ত এমন আছে যাহাতে সকল সম্প্রদায়ই একমত। অতএব আমাদের সম্প্রদায়-সমূহের এইরূপ কতকগুলি সাধারণ সিদ্ধান্ত আছে আর ঐগুলি স্বীকার করিবার পর আমাদের ধর্ম্ম, সকল সম্প্রদায় ও সকল ব্যক্তিকে বিভিন্ন ভাব পোষণ করিবার ইচ্ছামত চিন্তা ও কার্য্যের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়া থাকে। আমরা সকলেই

ধর্ম্মই এই জটিল সমস্যার মীমাংসক

বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ঐক্যসাধন আবশ্যক

ইহা জানি, অন্ততঃ আমাদের মধ্যে যাঁহারা একটু চিন্তাশীল, তাঁহারাই ইহা জানেন। আর আমরা চাই—আমাদের ধর্ম্মের এই জীবনপ্রদ সাধারণ তত্ত্বসমূহ সকলের নিকট, এই দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের নিকট প্রচারিত হউক, সকলে সেইগুলি জানুক, বুঝুক আর নিজেদের জীবনে পরিণত করিবার চেষ্টা করুক। সুতরাং ইহাই আমাদের প্রথম কার্য্য। আমরা দেখিতে পাই—এসিয়ায়, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে, জাতি, ভাষা, সমাজ-সম্বন্ধীয় সমুদয় বাধা ধর্ম্মের সম্মিলনকারিণী শক্তির নিকট উড়িয়া যায়। আমরা জানি, ভারতবাসীর ধারণা—আধ্যাত্মিক আদর্শ হইতে উচ্চতর আদর্শ আর কিছু নাই—ইহাই ভারতীয় জীবনের মূলমন্ত্র, আর ইহাও আমরা জানি, আমরা স্বল্পতম বাধার পথেই কার্য্য করিতে সমর্থ।

সর্ব্বসাধারণে ধর্ম্মপ্রচারই জাতীয় সম্মিলনের প্রথম পন্থা

ধর্ম্ম যে সর্ব্বোচ্চ আদর্শ, ইহা ত সত্যই, কিন্তু আমি এখানে সে কথা বলিতেছি না ; আমি বলিতেছি,—ভারতের পক্ষে কার্য্য করিবার ইহাই একমাত্র উপায়,—প্রথমে ধর্ম্মের দিক্‌টা দৃঢ় না করিয়া এখানে অন্য কোন বিষয় চেষ্টা করিতে গেলে তাহার ফলে সর্ব্বনাশ হইবে। সুতরাং ভারতীয় বিভিন্ন ধর্ম্মের সম্মিলনই ভবিষ্যৎ ভারতের প্রথম সেতু-স্বরূপ, যুগযুগান্তর ধরিয়া অবস্থিত এই ভারতক্ষেত্ররূপ মহাচল হইতে উহাই প্রথম সোপানস্বরূপ খোদিত করিতে হইবে। আমাদিগকে জানিতে হইবে যে,—দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী, শৈব, বৈষ্ণব, পাশুপত

ধর্ম্মের সাধারণ তত্ত্বসমূহের উপর বিশ্বাসী হইয়া বিরোধ পরিহার কর্ত্তব্য

প্রভৃতি আমাদের সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুর মধ্যেই কতকগুলি সাধারণ ভাব আছে; আর আমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য, আমাদের জাতির কল্যাণের জন্য আমাদিগকে পরস্পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া বিবাদ ও পরস্পর ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিবার সময় আসিয়াছে। নিশ্চিত জানিও, এই সকল বিবাদ সম্পূর্ণ ভুল, আমাদের শাস্ত্র ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া থাকে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের উহা সম্পূর্ণ অননুমোদিত, আর যাঁহাদের বংশধর বলিয়া আমরা দাবি করিয়া থাকি, যাঁহাদের রক্ত আমাদের শিরায় শিরায় প্রবহমান, সেই মহাপুরুষগণ তাঁহাদের সন্তানগণের অতি সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া এইরূপ বিবাদকে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

ধর্ম্মের উন্নতিতে অন্যান্য উন্নতি—রক্ত বিশুদ্ধ হইলে সে শরীরে রোগ প্রবেশ করিতে পারে না

ধর্ম্মের এইরূপ সম্মিলন সাধন হইলে সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। যদি রক্ত তাজা ও পরিষ্কার হয়, সে দেহে কোন রোগজীবাণু বাস করিতে পারে না। ধর্ম্মই আমাদের শোণিতস্বরূপ। যদি সেই রক্তপ্রবাহ চলাচলের কোন বাধা না থাকে, যদি উহা বিশুদ্ধ ও সতেজ হয়, তবে সকল বিষয়েই কল্যাণ হইবে। যদি এ রক্ত বিশুদ্ধ হয়, তবে রাজনৈতিক, সামাজিক বা অন্য কোনরূপ বাহ্য দোষ, এমন কি, আমাদের দেশের ঘোর দারিদ্র্যদোষ—সবই সংশোধিত হইয়া যাইবে। কারণ, যদি রোগজীবাণুই শরীর হইতে পরিত্যক্ত হইল, তখন আর সেই রক্তে অন্য কিছু বাহ্য বস্তু কি করিয়া প্রবেশ করিবে? আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের একটি উপমা লইলে বলা যায়, রোগ

হইতে হইলে দুইটি জিনিসের প্রয়োজন :—বাহিরের কোন বিষাক্ত জীবাণু এবং সেই শরীরের অবস্থাবিশেষ। যতক্ষণ না দেহ রোগজীবাণুকে অন্মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয়, যতদিন না দেহের জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া রোগজীবাণু প্রবেশের ও তদ্বৃদ্ধির অনুকূল হয়, ততদিন জগতের কোন জীবাণুর শক্তি নাই যে শরীরে রোগ উৎপাদন করিতে পারে। বাস্তবিক প্রত্যেকের শরীরের মধ্য দিয়া লক্ষ লক্ষ জীবাণু ক্রমাগত গতায়াত করিতেছে; যতদিন শরীর সতেজ থাকে, ততদিন উহা ঐগুলির অস্তিত্বই বুঝিতে পারে না। কেবল যখন শরীর দুর্ব্বল হয়, তখনই ঐ অণুগুলি শরীরে প্রবেশ করিয়া রোগ উৎপাদন করে। জাতীয় জীবন সম্বন্ধে ঠিক তদ্রূপ। যখনই জাতীয় শরীর দুর্ব্বল হয়, তখনই সেই জাতির রাজনৈতিক, সামাজিক, মানসিক ও শিক্ষাসম্বন্ধীয় সমুদয় বিষয়েই সর্ব্বপ্রকার রোগাণু প্রবেশ করে ও রোগ উৎপাদন করে। অতএব ইহার প্রতীকারের জন্য রোগের মূল কারণ কি দেখিতে হইবে এবং রক্তের সর্ব্ববিধ মলিনতা দূর করিতে হইবে। একমাত্র কর্ত্তব্য হইবে—লোকের মধ্যে শক্তি সঞ্চার, রক্তকে বিশুদ্ধ করা, শরীরকে সতেজ করা, যাহাতে উহা সর্ব্ব প্রকার বাহ্য বিষের দেহপ্রবেশ প্রতিরোধ ও ভিতরের বিষকে বাহির করিয়া দিতে পারে। আর আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, আমাদের ধর্ম্মই আমাদের তেজ, বীর্য্য, এমন কি, জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি।

আমি এক্ষণে এ বিচার করিতে যাইতেছি না যে, ধর্ম্ম সত্য কি মিথ্যা; আমি বিচার করিতে যাইতেছি না যে, ধর্ম্মই আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তিস্থাপন পরিণামে আমাদের কল্যাণকর বা

অকল্যাণকর হইবে; কিন্তু ভালই হউক, মন্দই হউক, ধর্ম্মে আমাদের জাতীয় ভিত্তি রহিয়াছে, তোমরা উহা ছাড়াইতে পার না, চিরকালের জন্য উহাই তোমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি-স্বরূপ রহিয়াছে, সুতরাং আমাদের ধর্ম্মে আমার যেমন বিশ্বাস আছে, তোমাদের যদি তদ্রূপ না-ও থাকে তথাপি তোমাদিগকে এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকিতেই হইবে। তোমরা এই ধর্ম্মবন্ধনে চিরাবদ্ধ; যদি উহা পরিত্যাগ কর, তবে তোমরা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। ইহাই আমাদের জাতির জীবনস্বরূপ, ইহাকে দৃঢ় করিতে হইবে। তোমরা যে শত শত শতাব্দীর অত্যাচার সহ্য করিয়া এখনও অক্ষতভাবে দাঁড়াইয়া আছ, তাহার কারণ তোমরা উহা সযত্নে রক্ষা করিয়াছ, উহার জন্য অন্য সকল স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছ। তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এই ধর্ম্মরক্ষার জন্য সকলই সাহসপূর্ব্বক সহিয়াছিলেন, এমন কি, মৃত্যুকে পর্য্যন্ত আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত ছিলেন।

বৈদেশিক দিগ্বিজয়ী আসিয়া মন্দিরের পর মন্দির ভগ্ন করিয়াছে—কিন্তু এই অত্যাচারস্রোত যাই একটু বন্ধ হইয়াছে, আবার সেইস্থলে মন্দিরের চূড়া উঠিয়াছে। অনেক গ্রন্থপাঠে যাহা না শিখিতে পার, গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরের মত দাক্ষিণাত্যের অনেক প্রাচীন মন্দির তোমাদিগকে তাহা হইতে অনেক অধিক জ্ঞান শিখাইতে পারে, তোমাদের জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে গভীরতর অন্তর্দ্দৃষ্টি দিতে পারে। লক্ষ্য করিয়া দেখ, উক্ত মন্দির শত শত আক্রমণের ও শত শত পুনরভ্যুদয়ের চিহ্ন ধারণ করিয়া আছে—বার

প্রাচীন মন্দিরসমূহ মহাশিক্ষার আকর

বার নষ্ট হইতেছে আবার সেই ভগ্নাবশেষ উত্থিত হইয়া নূতন জীবনলাভ করিয়া পূর্ব্বেরই ন্যায় অচল অটল ভাবে বিরাজ করিতেছে।

সুতরাং এখানেই, এই ধর্ম্মেই আমাদের জাতীয় মন, জাতীয় প্রাণপ্রবাহ দেখিতে পাইবে। ইহার অনুসরণ কর, তোমরা মহত্ত্বপদবীতে আরূঢ় হইবে। উহা পরিত্যাগ কর, তোমাদের মৃত্যু নিশ্চয়। এই জাতীয় জীবন প্রবাহের বিরুদ্ধে যাইতে চেষ্টা করিলে তাহার একমাত্র পরিণাম হইবে বিনাশ—আমি অবশ্য একথা বলিতেছি না যে, আর কিছু প্রয়োজন নাই। আমি এ কথা বলিতেছি না যে, রাজনৈতিক বা সামাজিক উন্নতির কোন প্রয়োজন নাই—আমার এইটুকু মাত্র বক্তব্য—আর আমার ইচ্ছা, তোমরা ইহা ভুলিও না যে ঐগুলি গৌণমাত্র, ধর্ম্মই মুখ্য। ভারতবাসী প্রথম চায় ধর্ম্ম, তারপর চায় অন্যান্য বস্তু। ঐ ধর্ম্মভাবকে বিশেষরূপে জাগাইতে হইবে।

ধর্ম্মত্যাগে বিনাশ

কিরূপে উহা সাধিত হইবে? আমি তোমাদের নিকট আমার সমুদয় কার্য্যপ্রণালী বলিব। আমেরিকা যাইবার জন্য মাদ্রাজ ছাড়িবার অনেক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই আমার মনে এই সঙ্কল্পগুলি ছিল আর আমি যে আমেরিকা ও ইংলণ্ডে গিয়াছিলাম, তাহার কারণ ইহাই। ধর্ম্মমহাসভা হওয়ার জন্য আমার বড় ভাবনা হয় নাই—উহা কেবল একটি সুযোগস্বরূপ উপস্থিত হইয়াছিল। আমার মনে যে সঙ্কল্প ঘুরিতেছিল, তাহাই আমাকে সমগ্র জগতে ঘুরাইয়াছে। আমার

আমার কার্য্যপ্রণালী

সঙ্কল্প এই—প্রথমতঃ আমাদের শাস্ত্রভাণ্ডারে সঞ্চিত, মঠ ও অরণ্যে গুপ্তভাবে রক্ষিত, অতি অল্প লোকের অধিকৃত ধর্ম্মরত্ন-গুলিকে প্রকাশ্যে বাহির করা—ঐ শাস্ত্রনিবদ্ধ তত্ত্বগুলিকে শুধু যে সকল লোকের হস্তে গুপ্তভাবে রহিয়াছে তাহাদের নিকট হইতেই বাহির করিলে হইবে না, উহা হইতেও দুর্ভেদ্যপেটিকা অর্থাৎ যে ভাষায় ঐ তত্ত্বগুলি রক্ষিত সেই সংস্কৃত শব্দের শত শত শতাব্দীর সঞ্চিত আবরণ হইতে বাহির করিতে হইবে। এক কথায় আমি ঐ তত্ত্বগুলিকে সর্ব্বসাধারণের বোধ্য করিতে চাই ; আমি চাই, ঐ ভাবগুলি সর্ব্বসাধারণের, প্রত্যেক ভারতবাসীর,—সে সংস্কৃত ভাষা জানুক বা নাই জানুক, সকলের সম্পত্তি হউক।

সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিয়া শাস্ত্রীয় তত্ত্বসমূহের প্রচার

এই সংস্কৃত ভাষার—আমাদের গৌরব-বস্তু এই সংস্কৃত ভাষার—কাঠিন্যই এই সকল ভাব প্রচারের এক মহান্ অন্তরায়, আর যতদিন পর্য্যন্ত না আমাদের সমগ্র জাতিই (যদি ইহা সম্ভব হয়) উত্তমরূপে সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত হইতেছে, ততদিন ঐ অন্তরায় দূর হইবার নহে। সংস্কৃত ভাষা যে কঠিন ভাষা, তাহা তোমরা এই কথা বলিলেই বুঝিবে যে, আমি সারাজীবন ধরিয়া ঐ ভাষা অধ্যয়ন করিতেছি, তথাপি প্রত্যেক নূতন সংস্কৃত গ্রন্থই আমার নূতন ঠেকে। তবে যাহাদের ঐ ভাষা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করিবার অবসর কখনই হয় নাই, তাহাদের পক্ষে উহা কিরূপ কঠিন হইবে, তাহা তোমরা অনায়াসেই বুঝিতে পার। সুতরাং তাহাদিগকে অবশ্যই চলিত ভাষায় এই সকল তত্ত্ব শিক্ষা দিতে হইবে।

সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষাও চলিবে। কারণ, সংস্কৃত শিক্ষায় সংস্কৃত শব্দগুলির উচ্চারণ মাত্রেই জাতির মধ্যে একটা গৌরব, একটা শক্তির ভাব জাগিবে। ভগবান্ রামানুজ, চৈতন্য ও কবীর ভারতের নিম্ন-জাতিগণকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের চেষ্টার ফলে সেই মহাপুরুষগণের জীবদ্দশায় অদ্ভুত ফল-লাভ হইয়াছিল। কিন্তু পরে তাঁহাদের কার্য্যের এরূপ শোচনীয় পরিণাম কেন হইল, তাহারও নিশ্চিত কিছু কারণ আছে—এই মহান্ আচার্য্যগণের তিরোভাবের পর এক শতাব্দী যাইতে না যাইতে কেন সেই উন্নতির প্রতিরোধ হইল? ইহার উত্তর এই—তাঁহারা নিম্নজাতিসমূহকে উন্নত করিয়াছিলেন বটে, তাহারা উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরূঢ় হউক, ইহা তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল বটে, কিন্তু তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারের জন্য শক্তি প্রয়োগ করেন নাই। এমন কি, এত বড় যে বুদ্ধ তিনিও সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তার বন্ধ করিয়া দিয়া এক বিষম ভুল করিয়াছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি তখনি তখনি যাহাতে কার্য্যের ফললাভ হয়, তাহার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, সুতরাং সংস্কৃতভাষানিবদ্ধ ভাবসমূহ অনুবাদ করিয়া তখনকার প্রচলিত ভাষা পালিতে প্রচার করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহা খুব ভালই করিয়াছিলেন—লোকে তাঁহার ভাব বুঝিল, কারণ, তিনি সর্ব্বসাধারণের ভাষায় লোককে উপদেশ দিয়াছিলেন। এ খুব ভালই হইয়াছিল—তাঁহার প্রচারিত ভাবসকল শীঘ্র শীঘ্র চারিদিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল; দূরে, অতি দূরে তাঁহার ভাবসমূহ ছড়াইয়া

সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শিখাইতে হইবে

পড়িল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার বিস্তার হওয়া উচিত ছিল। জ্ঞানের বিস্তার হইল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে 'গৌরব-বুদ্ধি' ও 'সংস্কার' জন্মিল না। শিক্ষা মজ্জাগত হইয়া সংস্কারে পরিণত না হইলে শুধু কতকগুলি জ্ঞানসমষ্টি কখনও নানা ভাববিপ্লবের মধ্যে তিষ্ঠিতে পারে না। তোমরা জগৎকে কতকগুলি জ্ঞান দিয়া যাইতে পার কিন্তু তাহাতে উহার বিশেষ কল্যাণ হইবে না; ঐ জ্ঞান আমাদের মজ্জাগত হইয়া সংস্কারে পরিণত হওয়া চাই। আমরা সকলেই আধুনিক কালের এমন অনেক জাতির বিষয় জানি, যাহাদের এইরূপ কতকগুলি জ্ঞান আছে, কিন্তু সে সকল জাতি ঘোর অসভ্য জাতির তুল্য, তাহারা ব্যাঘ্রতুল্য নৃশংস—কারণ তাহাদের জ্ঞান সংস্কারগত হয় নাই। সভ্যতার ন্যায় জ্ঞানও ভাসা ভাসা মাত্র, উহা ভিতরটাকে স্পর্শ করে না, একটু নাড়িলেই ভিতরের পশু-প্রকৃতি জাগিয়া উঠে। এরূপ ব্যাপার জগতে ঘটিয়া থাকে। অতএব এই বিপদ হইতে সাবধান হইতে হইবে। সাধারণকে প্রচলিত ভাষায় শিক্ষা দাও, তাহাদিগকে ভাব দাও, তাহারা অনেক বিষয় অবগত হইবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের জ্ঞান যাহাতে সংস্কারে পরিণত হয়, তাহার চেষ্টা কর। যতদিন পর্য্যন্ত না তাহা করিতে পারিতেছ, ততদিন সাধারণের চিরস্থায়ী উন্নতির আশা নাই। এমন এক নূতন জাতি উঠিবে, যাহারা সংস্কৃত ভাষা শিখিয়া লইয়া অপর সকলের উপরে উঠিবে ও উহাদের উপর পূর্ব্বের ন্যায়ই প্রভুত্ব করিবে। হে নিম্নজাতীয় ব্যক্তিগণ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমাদের অবস্থা উন্নত করিবার

একমাত্র উপায় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা আর উচ্চতর জাতিগণের বিরুদ্ধে এই যে লেখালেখি দ্বন্দ্ব বিবাদ চলিতেছে, উহা বৃথা, উহাতে কোনরূপ কল্যাণ হয় নাই, হইবেও না, উহাতে অশান্তির অনল আরও জ্বলিয়া উঠিবে আর দুর্ভাগ্যক্রমে পূর্ব্ব হইতেই নানা ভাগে বিভক্ত এই জাতি ক্রমশঃ আরও বিভক্ত হইয়া পড়িবে। জাতিভেদ উঠাইয়া দিবার—সাম্যভাব আনিবার একমাত্র উপায় উচ্চবর্ণের শিক্ষা—যাহা লইয়া তাহাদের তেজ ও গৌরব—স্বায়ত্তীকরণ। তাহা যদি করিতে পার, তোমরা যাহা চাহিতেছ, তাহা পাইবে।

এই সঙ্গে আমি আর একটি প্রশ্নের বিচার করিতে ইচ্ছা করি। অবশ্য মাদ্রাজের সহিতই এই প্রশ্নের বিশেষ সম্বন্ধ। একটি মত আছে—দাক্ষিণাত্যে আর্য্যাবর্ত্তনিবাসী আর্য্যগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক দ্রাবিড়ী জাতির নিবাস ছিল; কেবল এই দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণ আর্য্যাবর্ত্তনিবাসী ব্রাহ্মণগণ হইতে উৎপন্ন, সুতরাং দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য জাতি দক্ষিণী ব্রাহ্মণগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক জাতি। এখন প্রত্নতাত্ত্বিক মহাশয় আমায় ক্ষমা করিবেন—আমি বলি, এই মত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ইহার একমাত্র প্রমাণ এই যে, আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের ভাষায় প্রভেদ বিদ্যমান; আমি ত আর কোন প্রভেদ দেখিতে পাই না। আমরা এতগুলি আর্য্যাবর্ত্তের লোক এখানে রহিয়াছি আর আমি আমার ইউরোপীয় বন্ধুগণকে এই সমবেত লোকগুলির মধ্য হইতে আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যবাসী বাছিয়া লইতে আহ্বান করিতেছি। উহাদের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? একটু

সমগ্র ভারতই আর্য্যময়

ভাষার প্রভেদ মাত্র। পূর্ব্বোক্ত মতবাদীরা বলেন, দক্ষিণী ব্রাহ্মণেরা আর্য্যাবর্ত্ত হইতে যখন আসেন, তখন তাঁহারা সংস্কৃতভাষী ছিলেন, এক্ষণে এখানে আসিয়া দ্রাবিড়ী ভাষা কহিতে কহিতে সংস্কৃত ভুলিয়া গিয়াছেন। যদি ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে ইহাই হয়, তবে অন্যান্য জাতির সম্বন্ধেই বা ও কথা না খাটিবে কেন? অন্যান্য জাতিরাও আর্য্যাবর্ত্ত-নিবাসী ছিল—তাহারাও দাক্ষিণাত্যে আসিয়া সংস্কৃত ভুলিয়া গিয়া দ্রাবিড়ী ভাষা লইয়াছে—এ কথাই বা বলা যাইবে না কেন? যে যুক্তি দ্বারা তুমি দাক্ষিণাত্যবাসী ব্রাহ্মণেতর জাতিকে অনার্য্য বলিয়া প্রমাণ করিতে যাইতেছ, আমি সেই যুক্তিতেই তাহাদিগকে আর্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারি। ও সব আহাম্মকের কথা, ও সব কথায় বিশ্বাস করিও না। হইতে পারে একটি দ্রাবিড়ী জাতি ছিল—তাহারা এক্ষণে লোপ পাইয়াছে; যাহারা অবশিষ্ট আছে, তাহারা বনজঙ্গলে বাস করিতেছে। খুব সম্ভব যে, ঐ দ্রাবিড়ী ভাষাও সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু সকলেই আর্য্য, আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দাক্ষিণাত্যে আসিয়াছে। সমগ্র ভারত আর্য্যময়, এখানে অপর কোন জাতি নাই। আবার আর এক মত আছে যে, শূদ্রেরা নিশ্চিত অনার্য্য জাতি—তাহারা আর্য্যগণের দাসস্বরূপ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিতেছেন—ইতিহাসে একবার যাহা ঘটিয়াছে তাহার পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে। যেহেতু মার্কিন, ইংরাজ, পর্ত্তুগীজ ও ওলন্দাজ জাতি আফ্রিকান বেচারাদিগকে ধরিয়া জীবদ্দশায় কঠোর পরিশ্রম করাইয়াছে এবং মরিলে টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, যেহেতু ঐ আফ্রিকানদের সহিত সঙ্করোৎপন্ন তাঁহাদের সন্তানগণকে ক্রীতদাস করা হইয়াছিল এবং তাহাদিগকে

ঐ অবস্থায় অনেক দিন ধরিয়া রাখা হইয়াছিল, এই ঘটনার তুলনা লইয়া মন হাজার হাজার বৎসর অতীত কালে লাফাইয়া চলিয়া যায়, আর এরূপ কল্পনা করে যে, সেইরূপ ব্যাপার এখানেও ঘটিয়াছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ স্বপ্নে দেখিতে থাকেন যে, ভারত কৃষ্ণচক্ষু আদিম জাতিসমূহে পরিপূর্ণ ছিল—উজ্জ্বলকায় আর্য্যগণ আসিয়া তথায় বাস করিলেন; তাঁহারা কোথা হইতে যে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিলেন, সে বিষয় ঈশ্বরই জানেন! কাহারও কাহারও মতে মধ্য তিব্বত হইতে, আবার কেহ কেহ বলে—মধ্য এসিয়া হইতে। অনেক স্বদেশহিতৈষী ইংরাজ আছেন—যাঁহারা মনে করেন, আর্য্যগণ সকলেই হিরণ্যকেশ ছিলেন। অপরে আবার নিজ নিজ পছন্দ অনুসারে তাঁহাদিগকে কৃষ্ণকেশ বলিয়া স্থির করেন। লেখকের নিজের চুল কাল হইলে তিনি আর্য্যগণকেও কৃষ্ণকেশ করিয়া বসেন। আর্য্যগণ সুইজারলণ্ডের হ্রদসমূহের তীরে বাস করিতেন—সম্প্রতি এরূপ প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। তাঁহারা যদি সকলে মিলিয়া তথায় এই সব মতামতের সঙ্গে ডুবিয়া মরিতেন, তাহা হইলে আমি বড় দুঃখিত হইতাম না। আজকাল কেহ কেহ বলেন, তাঁহারা উত্তর-মেরু-নিবাসী ছিলেন। আর্য্যগণ ও তাঁহাদের বাসভূমির বালাই লইয়া মরি আর কি! যদি আমাদের শাস্ত্রে এই সকল বিষয়ের কোন প্রমাণ আছে কি না অনুসন্ধান করা যায়, তবে দেখিতে পাইবে, আমাদের শাস্ত্রে ইহার সমর্থক কোন বাক্য নাই। এমন কোন বাক্য নাই, যাহাতে আর্য্যগণকে ভারতবহির্ভূত প্রদেশনিবাসী মনে করা যাইতে পারে, আর আফগানিস্থান প্রাচীন ভারতের

অন্তর্ভূত ছিল। শূদ্রজাতি যে সকলেই অনার্য্য এবং তাহারা যে বহুসংখ্যক ছিল, এসব কথাও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। সে সময়ে সামান্য কয়েকজন উপনিবেশকারী আর্য্যের পক্ষে শত সহস্র অনার্য্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বাসই অসম্ভব হইত। উহারা পাঁচমিনিটে আর্য্যদের চাটনি করিয়া ফেলিত।

জাতিভেদ সমস্যার একমাত্র যুক্তিসঙ্গত মীমাংসা মহাভারতেই পাওয়া যায়। মহাভারতে লিখিত আছে—সত্যযুগের প্রারম্ভে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতি ছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন। জাতিভেদ সমস্যার যত প্রকার ব্যাখ্যা শুনা যায়, তন্মধ্যে ইহাই একমাত্র সত্য ও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা। আগামী সত্যযুগে আবার ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই ব্রাহ্মণরূপে পরিণত হইবেন। সুতরাং ভারতের জাতিভেদ সমস্যার মীমাংসা এরূপ দাঁড়াইতেছে—উচ্চবর্ণগুলিকে হীনতর করিতে হইবে না—ব্রাহ্মণ জাতির লোপসাধন করিতে হইবে না। ভারতে ব্রাহ্মণই মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ—শঙ্করাচার্য্য তাঁহার গীতাভাষ্যের ভূমিকায় এই ভাবটি অতি সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের কারণ বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণত্বের রক্ষার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ; ইহাই তাঁহার অবতরণের মহান্ উদ্দেশ্য। এই ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, এই আদর্শ ও সিদ্ধ পুরুষের প্রয়োজন—ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের লোপ হইলে চলিবে না। আর আধুনিক জাতিভেদ প্রথার যতই দোষ থাকুক, আমরা জানি, আমাদিগকে

জাতিভেদ সমস্যার মীমাংসা মহাভারতেই রহিয়াছে

ব্রাহ্মণজাতির পক্ষে এইটুকু বলিতেই হইবে যে, অন্যান্য জাতি অপেক্ষা তাঁহাদের মধ্যেই অধিকাংশ ব্রাহ্মণত্বসম্পন্ন লোকের অভ্যুদয় হইয়াছে। ইহা সত্য। অন্যান্য জাতিকে তাঁহাদিগকে এ গৌরব দিতেই হইবে। আমাদিগকে ভরসা করিয়া তাঁহাদের দোষ দেখাইতে হইবে, কিন্তু যেটুকু প্রশংসা, যেটুকু গৌরব তাঁহাদের প্রাপ্য, তাঁহাদিগকে তাহা দিতে হইবে। 'প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য দাও'—এই প্রাচীন ইংরাজী চলিত বাক্যটি মনে রাখিও। অতএব হে বন্ধুগণ, বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাদের প্রয়োজন নাই। উহাতে কি ফল হইবে? উহাতে আমাদিগকে আরও বিভক্ত করিবে, আমাদিগকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবে, আমাদিগকে আরও অবনত করিয়া ফেলিবে। একচেটিয়া অধিকারের, একচেটিয়া দাবীর দিন চলিয়া গিয়াছে, চিরদিনের জন্য ভারতক্ষেত্র হইতে চলিয়া গিয়াছে, আর ইহাই ভারতে ইংরাজাধিকারের এক মহা সুফল।

এমন কি, মুসলমান অধিকারেও এই একচেটিয়া-অধিকার-রাহিত্যস্বরূপ মহা সুফল ফলিয়াছে! আর মুসলমান রাজত্ব যে প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ মন্দ ছিল, তাহাও নহে—জগতের কোন জিনিসই সম্পূর্ণ মন্দও নহে, কোন জিনিসই সম্পূর্ণ ভালও নহে।

মুসলমান ও ইংরাজ শাসনের সুফল

মুসলমানের ভারতাধিকার দরিদ্র পদদলিতদের উদ্ধারের কারণ হইয়াছিল। এই জন্যই আমাদের এক পঞ্চমাংশ ভারতবাসী মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। কেবল তরবারির বলে ইহা সাধিত হয় নাই। কেবল তরবারি ও বন্দুকের বলে

ইহা সাধিত হইয়াছিল, এ কথা মনে করা নিতান্ত পাগলামি মাত্র। আর তোমরা যদি সাবধান না হও, তবে মান্দ্রাজের পঞ্চমাংশ, এমন কি, অর্দ্ধেক লোক খ্রীষ্টিয়ান হইয়া যাইবে। মালাবার দেশে আমি যাহা দেখিয়াছি, তদপেক্ষা জগতে আর অধিক আহাম্মকি কি কিছু থাকিতে পারে? পারিয়া বেচারাকে উচ্চবর্ণের সঙ্গে এক রাস্তায় যাইতে দেওয়া হয় না, কিন্তু যাই তিনি খ্রীষ্টিয়ান হইয়া পূর্ব্বনাম বদলাইয়া একটা আম্ব্রু পিক্রু যা হয় ইংরাজী নাম নিলেন বা মুসলমান হইয়া মুসলমানী নাম নিলেন, আর কোন গোল নাই, তখন তিনি বাপের ঠাকুর! এইরূপ দেশাচার দেখিয়া ইহা ব্যতীত আর কি সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, মালাবারীরা সব পাগল, তাদের গৃহগুলি সব পাগলাগারদ, আর যতদিন তাহারা নিজেদের প্রথা ও আচারাদির সংশোধন না করিতেছে, ততদিন তাহারা ভারতীয় সকল জাতির ঘৃণার পাত্র থাকিবে? এরূপ দূষিত ও পৈশাচিক প্রথাসমূহ যে এখনও অবাধে রাজত্ব করিতেছে, ইহা কি তাহাদের ঘোরতর লজ্জার বিষয় নহে? নিজেদের ছেলেরা অনাহারে মরিতেছে—এদিকে যাই তাহারা অপরের হইতেছে, অমনি তাহাদিগকে খাওয়াইয়া মোটা করা হইতেছে! বিভিন্ন জাতির ভিতর আর বিবাদ বিসম্বাদ থাকা উচিত নয়।

উচ্চতর বর্ণকে নীচু করিয়া এ সমস্যার মীমাংসা হইবে না, নিম্নজাতিকে উন্নত করিতে হইবে। আর যদিও কতকগুলি ব্যক্তি (অবশ্য ইহাদের শাস্ত্রজ্ঞান এবং প্রাচীনগণের মহান্ উদ্দেশ্য বুঝিবার ক্ষমতা কিছুই নাই) অন্যরূপ বলিয়া থাকেন, তথাপি

ইহাই আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট কার্য্যপ্রণালী। তাহারা উহা বুঝিতে পারে না, কিন্তু যাঁহাদের মস্তিষ্ক আছে, যাঁহাদের ধারণাশক্তি আছে, তাঁহারাই প্রাচীনগণের কার্য্যপ্রণালী ও উহার পরিসর বুঝিতে সমর্থ। তাঁহারা দূরে অবস্থিত হইয়া অনন্তযুগ ধরিয়া জাতীয় জীবনের যে অপূর্ব্ব প্রবাহ চলিয়াছে, তাহার আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করেন। তাঁহারা প্রাচীন ও আধুনিক সকল শাস্ত্রের মধ্য দিয়া একটির পর একটি প্রণালী সন্ধান করিতে পারেন।

প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের জাতিভেদ সমস্যার মীমাংসা—নীচ জাতিকে ক্রমশঃ উন্নত করা

সেই কার্য্যপ্রণালী কি? একদিকে ব্রাহ্মণ, অপর দিকে চণ্ডাল; আর চণ্ডালকে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণত্বে উন্নয়নই তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী। যেগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক শাস্ত্র, তাহাতে দেখিবে, নিম্নতর জাতিসমূহকে ক্রমশঃ উচ্চাধিকার দেওয়া হইতেছে। এমন শাস্ত্রও আছে, যাহাতে এইরূপ কঠোর বাক্য বলা হইয়াছে যে, যদি শূদ্র বেদ শ্রবণ করে, তাহার কর্ণে তপ্ত সীসা ঢালিয়া দিতে হইবে, যদি তাহার বেদ কিছু স্মরণ থাকে তবে তাহাকে কাটিয়া ফেলিতে হইবে। যদি সে ব্রাহ্মণকে 'ওহে ব্রাহ্মণ' বলিয়া সম্বোধন করে, তবে তাহার জিহ্বাচ্ছেদ করিতে হইবে। ইহা প্রাচীন আসুরিক বর্ব্বরতা—সন্দেহ নাই, আর ইহা বলাও বাহুল্য মাত্র, কিন্তু ইহাতে ব্যবস্থাপকগণের কোন দোষ দেওয়া যায় না—কারণ তাঁহারা সমাজের অংশবিশেষের প্রথাবিশেষ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র। এই প্রাচীনগণের ভিতর সময়ে সময়ে আসুরিক-প্রকৃতি লোকের অভ্যুদয় হইয়াছিল। সকল যুগে,

সর্ব্বত্রই অল্পবিস্তর আসুরিক প্রকৃতির লোক বর্ত্তমান ছিল। পরবর্ত্তী স্মৃতিসমূহে আবার দেখিবে, শূদ্রের প্রতি ব্যবস্থার কঠোরতা কিছু কমিয়াছে—'শূদ্রগণের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারের প্রয়োজন নাই, কিন্তু তাহাদিগকে বেদাদি শিক্ষা দিবে না।' ক্রমশঃ আমরা আরও আধুনিক, বিশেষতঃ যেগুলি এই যুগের জন্য বিশেষভাবে উপদিষ্ট, সেই সকল স্মৃতিতে দেখিতে পাই, 'যদি শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের আচার ব্যবহার অনুকরণ করে, তাহারা ভালই করিয়া থাকে—তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান কর্ত্তব্য।' এইরূপে ক্রমশঃ যতই দিন যাইতেছে, ততই শূদ্রদিগকে বেশী বেশী অধিকার দেওয়া হইতেছে। এইরূপে মূল কার্য্যপ্রণালীর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে কার্য্যে পরিণতির অথবা বিভিন্ন শাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া উহার বিস্তারিত বিবরণের কিরূপে সন্ধান পাওয়া যাইবে

জাতিভেদের কঠোরতা সত্বেও বিভিন্নজাতির ক্রমোন্নতি

তাহা দেখাইবার আমার সময় নাই, কিন্তু এ বিষয়ে সোজাসুজি বিচার করিয়া দেখিলেও বুঝিতে পারা যায় যে, সকল জাতিকেই ধীরে ধীরে উঠিতে হইবে। এখনও যে সহস্র সহস্র জাতি রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি আবার ব্রাহ্মণ জাতিতে উন্নীত হইতেছে। কারণ, জাতিবিশেষ যদি আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘোষণা করে, তাহাতে কে কি বলিবে? জাতিভেদ যতই কঠোর হউক, উহা এইরূপেই সৃষ্ট হইয়াছে। মনে কর, কতগুলি জাতি রহিয়াছে—প্রত্যেক জাতিতে দশ সহস্র করিয়া ব্যক্তি। উহারা যদি মিলিয়া আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘোষণা করে, তবে কেহই তাহাদিগকে বাধা দিতে পারে না।

আমি নিজ জীবনে ইহা দেখিয়াছি। কতকগুলি জাতি শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠে আর যখনই তাহাদের সকলের একমত হয়, তখন তাহাদিগকে আর কে বাধা দিতে পারে? কারণ, আর যাহাই হউক, প্রত্যেক জাতির সহিত অপর জাতির কোন সম্পর্ক নাই। এক জাতি অপর জাতির কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে না—এমন কি এক জাতির বিভিন্ন শাখাগুলিও পরস্পরের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে না।

আর শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি বড় বড় যুগাচার্য্যগণ জাতিগঠনকারী ছিলেন। তাঁহারা যে সকল অদ্ভুত ব্যাপার করিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমাদিগকে বলিতে পারি না, আর তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ, আমি যাহা বলিতে যাইতেছি, তাহাতে বিরক্ত হইতে পার। কিন্তু আমার ভ্রমণে ও অভিজ্ঞতায় আমি ইহার সন্ধান পাইয়াছি আর আমি ঐ গবেষণায় অদ্ভুত ফললাভ করিয়াছি। সময়ে সময়ে তাঁহারা দলকে দল বেলুচি লইয়া এক মুহূর্ত্তে তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় করিয়া ফেলিতেন; দলকে দল জেলে লইয়া এক মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মণ করিয়া ফেলিতেন। তাঁহারা সকলেই ঋষি মুনি ছিলেন—আমাদিগকে তাঁহাদের কার্য্যকলাপ ভক্তিশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে।

শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি যুগাচার্য্যগণ নূতন জাতির স্রষ্টা

তোমাদিগকেও ঋষিমুনি হইতে হইবে। ইহাই কৃতকার্য্য হইবার গূঢ় উপায়। অল্পাধিকপরিমাণে সকলেরই ঋষিত্বসম্পন্ন হইতে হইবে! 'ঋষি' শব্দের অর্থ কি? বিশুদ্ধস্বভাব ব্যক্তি। অগ্রে বিশুদ্ধচিত্ত হও—তোমার শক্তি আসিবে। কেবল 'আমি ঋষি' বলিলেই চলিবে না, কিন্তু যখনই তুমি যথার্থ ঋষিত্বলাভ করিবে, তুমি

কার্য্য করিবার উপায় ঋষিত্বলাভ

দেখিবে যে, অপরে তোমার কথা কোন না কোন ভাবে শুনিতেছে। তোমার ভিতর হইতে এক আশ্চর্য্য বস্তু আসিয়া অপরের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে। তাহাতে তাহারা বাধ্য হইয়া তোমার অনুবর্ত্তী হইবে, বাধ্য হইয়া তোমার কথা শুনিবে, এমন কি, তাহাদের অজ্ঞাতসারে তাহাদের নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমার সঙ্কল্পিত কার্য্যসিদ্ধির সহায়ক হইবে। ইহাই ঋষিত্ব।

অবশ্য যাহা বলিলাম, তাহাতে কার্য্যপ্রণালীর বিশেষ বর্ণনা কিছু হইল না। বংশপরম্পরাক্রমে পূর্ব্বোক্ত ভাব লইয়া কার্য্য করিতে করিতে বিশেষ বিশেষ কার্য্যপ্রণালী আবিষ্কৃত হইবে। বিবাদবিসম্বাদের যে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, তাহাই দেখাইবার জন্য এক্ষণে আমি দুই একটি কথার আভাস দিলাম মাত্র। আমার অধিকতর দুঃখের কারণ এই যে, আজকাল বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পর ঘোর বাদ প্রতিবাদ চলিতেছে। এটি বন্ধ হওয়াই চাই। উভয় পক্ষেরই ইহাতে কিছু লাভ নাই। উচ্চতর বর্ণের, বিশেষ ব্রাহ্মণের ইহাতে লাভ নাই; কারণ, একচেটিয়া অধিকারের দিন গিয়াছে। প্রত্যেক অভিজাত জাতির কর্ত্তব্য—নিজের সমাধি নিজে খনন করা; আর যত শীঘ্র তাঁহারা একার্য্য করেন, ততই তাঁহাদের পক্ষে মঙ্গল। যত বিলম্ব হইবে, উহা তত পচিবে আর উহার মৃত্যুও ত তত ভয়ানক হইবে। এই কারণে ব্রাহ্মণ জাতির কর্ত্তব্য —ভারতের অন্যান্য সকলের উদ্ধারের চেষ্টা। তিনি যদি ইহা করেন এবং যতদিন ইহা করেন, ততদিনই

ব্রাহ্মণ জাতির কর্ত্তব্য সর্ব্বসাধারণে ধর্ম্ম ও বিদ্যাদান

তিনি ব্রাহ্মণ, কিন্তু যদি তিনি কেবল টাকার চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ান, তবে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। আবার তোমাদেরও উচিত—কেবল প্রকৃত ব্রাহ্মণকে সাহায্য করা। তাহাতে স্বর্গলাভ হইবে। কিন্তু অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে দান করিলে তাহার ফলে স্বর্গ না হইয়া তাহার বিপরীত হইয়া থাকে—আমাদের শাস্ত্র এই কথা বলিয়া থাকেন। এই বিষয়ে তোমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে। তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ, যিনি সাংসারিক কোন কর্ম্ম করেন না। সাংসারিক কার্য্য অপর জাতির জন্য, ব্রাহ্মণের জন্য নহে। ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া আমি বলিতেছি,—তাঁহারা যাহা জানেন তাহা শিখাইয়া, শত শত শতাব্দীর শিক্ষা অভিজ্ঞতায় যাহা তাঁহারা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা দান করিয়া ভারতবাসীকে উন্নত করিবার জন্য তাঁহাদিগকে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের কর্ত্তব্য—প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব কি তাহা স্মরণ করা। মনু বলিয়াছেন--

ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে॥ ১।৯৯

অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে যে এত সম্মান ও বিশেষ বিশেষ অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহার কারণ, তাঁহার নিকট ধর্ম্মের ভাণ্ডার। তাঁহাকে ঐ ধনভাণ্ডার খুলিয়া উহার অন্তর্গত রত্নরাজি জগতে বিতরণ করিতে হইবে। ইহা সত্য কথা যে—ভারতীয় অন্যান্য সকলের নিকট ব্রাহ্মণই প্রথম ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশ করেন—আর তিনি সকলের পূর্ব্বে জীবনের গূঢ়তম সমস্যাসমূহের রহস্য উপলব্ধি করিবার জন্য সর্ব্বত্যাগ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ যে অন্যান্য জাতি হইতে অধিকতর উন্নতির পথে

অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার অপরাধ কি? অপর জাতিরা কেন জ্ঞানলাভ করিল না, কেন তাঁহাদের ন্যায় অনুষ্ঠান করিল না? তাহারা কেন প্রথমে অলস হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া শশক ও কূর্ম্মের গতি শক্তি পরীক্ষার পুনরভিনয় করিল?

ব্রাহ্মণেতর জাতির কর্ত্তব্য

তবে কথা এই—অপর অপেক্ষা অধিক অগ্রসর হওয়া ও সুবিধালাভ করা এক কথা, আর অসদ্ব্যবহারের জন্য ঐগুলিকে ধরিয়া রাখা আর এক কথা। ক্ষমতা যখন অসদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তখন উহা আসুরিক ভাব ধারণ করে; কেবল সদুদ্দেশ্যে ক্ষমতার ব্যবহার করিতে হইবে। অতএব এই শত শত শতাব্দীর সঞ্চিত শিক্ষা ও সংস্কার—তিনি এতদিন যাহার রক্ষকস্বরূপ আছেন—সর্ব্বসাধারণকে দিতে হইবে আর তাঁহারা সর্ব্বসাধারণে উহা এত দিন দেন নাই, এই কারণেই মুসলমান আক্রমণ সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহারা গোড়া হইতেই সর্ব্বসাধারণের নিকট এই ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত করেন নাই—এই কারণেই সহস্র বর্ষ ধরিয়া যে কেহ ইচ্ছা করিয়াছে, সেই ভারতে আসিয়া আমাদিগকে পদদলিত করিয়াছে। ইহাতেই আমাদের এইরূপ অবনতি ঘটিয়াছে।

বৈদেশিক আক্রমণের কারণ ব্রাহ্মণেতর জাতিকে ধর্ম্ম ও বিদ্যায় বঞ্চিত করা

আর আমাদের সর্ব্বপ্রথম কার্য্য এই যে, আমাদের সাধারণ পূর্ব্বপুরুষগণ যে ভাণ্ডারে ধর্ম্মরূপ অপূর্ব্ব রত্নরাজি সঞ্চিত করিয়া গোপনে রাখিয়াছিলেন, তাহা খুলিয়া সেইগুলি বাহির করিয়া প্রত্যেককে দিতে হইবে এবং ব্রাহ্মণকেই এই কার্য্য প্রথমে করিতে

হইবে। বাঙ্গালাদেশে একটি প্রাচীন কুসংস্কার আছে—যে গোখুরা সাপ কামড়াইয়াছে, সে যদি নিজেই নিজের বিষ উঠাইয়া লয়, তবেই সে রোগী বাঁচিবে! সুতরাং ব্রাহ্মণকে তাঁহার নিজ বিষ উঠাইয়া লইতে হইবে।

ব্রাহ্মণেতর জাতিকে উন্নত হইতে হইলে সংস্কৃত বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে হইবে

ব্রাহ্মণেতর জাতিকে আমি বলিতেছি, অপেক্ষা কর, ব্যস্ত হইও না। সুবিধা পাইলেই ব্রাহ্মণ জাতিকে আক্রমণ করিতে যাইও না। কারণ, আমি তোমাদিগকে দেখাইয়াছি, তোমরা নিজের দোষে কষ্ট পাইতেছ। তোমাদিগকে আধ্যাত্মিকতা উপার্জ্জন করিতে ও সংস্কৃত শিখিতে কে নিষেধ করিয়াছিল? এতদিন তোমরা করিতে-ছিলে কি? তোমরা এত দিন উদাসীন ছিলে কেন? আর অপরে তোমাদের অপেক্ষা অধিক মস্তিষ্ক, অধিক বীর্য্য, অধিক সাহস ও অধিক ক্রিয়াশক্তির পরিচয় দেখাইয়াছে বলিয়া এখন বিরক্তি প্রকাশ কর কেন? সংবাদপত্রে এই সকল বৃথা বাদপ্রতিবাদ, বিবাদবিসম্বাদে বৃথা শক্তিক্ষয় না করিয়া, নিজগৃহে এইরূপ কলুষাত্মক বিবাদে ব্যস্ত না থাকিয়া সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া ব্রাহ্মণ যে শিক্ষাবলে এত গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন, তাহা পাইবার চেষ্টা কর—তবেই তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। তোমরা সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত হও না কেন? তোমরা ভারতের সকল বর্ণের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারের জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় কর না কেন? আমি তোমাদিগকে ইহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। যখনই এইগুলি করিবে তখনই তোমরা ব্রাহ্মণের তুল্য হইবে। ভারতে অধিকার লাভের ইহাই রহস্য।

সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য থাকিলেই ভারতে সম্মানভাজন হওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞানলাভ হইলে কেহই তোমার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সাহসী হইবে না। ইহাই একমাত্র রহস্য—এই পথ অবলম্বন কর। অদ্বৈতবাদের প্রাচীন উপমা লইয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়, সমগ্র জগৎ আপন মায়ায় আপনি মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সঙ্কল্পই জগতে অমোঘ শক্তি। দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন পুরুষের শরীর হইতে যেন এক প্রকার তেজ নির্গত হইতে থাকে আর তাঁহার নিজের মন যে অবস্থায় অবস্থিত অপর ব্যক্তির মনে ঠিক সেই ভাবের উৎপাদন করে—এইরূপ প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন পুরুষসমূহের মধ্যে মধ্যে আবির্ভাব হইয়া থাকে। আর যখনই একজন শক্তিসম্পন্ন পুরুষের শক্তিতে অনেকের ভিতর সেই একই প্রকার ভাবের উদয় হয়, তখনই আমরা শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠি। একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখ,—চার কোটি ইংরাজ ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর উপর কিরূপে প্রভুত্ব করিতেছে? সংহতিই শক্তির মূল—একথা বলিলে তোমরা হয়ত বলিবে—উহা ত জড়শক্তিবলেই সাধিত হয়—সুতরাং আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজন কোথায় রহিল? আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজন আছে বৈ কি। এই চার কোটি ইংরাজ তাঁহাদের সমুদয় ইচ্ছাশক্তি একযোগে প্রয়োগ করিতে পারেন আর উহার দ্বারাই তাঁহাদের অসীম শক্তিলাভ হইয়া থাকে আর তোমাদের ত্রিশ ক্রোর লোকের প্রত্যেকেরই বিভিন্ন ভাব।

মনের বলেই সব হয়

সুতরাং ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিতে হইলে তাহার মূল রহস্যই এই সংহতি, শক্তিসংগ্রহ, বিভিন্ন ইচ্ছাশক্তিসমূহের একত্র

মিলন। আর এখনই আমার মনশ্চক্ষের সমক্ষে ঋগ্বেদ সংহিতার সেই অপূর্ব্ব শ্লোক প্রতিভাত হইতেছে :—

সকলে সম-অন্তঃকরণ হইলেই জাতীয় উন্নতি

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাং।
দেবা ভাগং যথা পূর্ব্বে ইত্যাদি। ১০।১৯১।২

তোমরা সকলে সমান্তঃকরণবিশিষ্ট হও, কারণ পূর্ব্বকালে দেবগণ একমনা হইয়াই তাহাদের ভাগ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেবগণ একচিত্ত বলিয়াই মানবের উপাসনার যোগ্য হইয়াছেন, সমাজগঠনের ইহাই রহস্য! আর যতই তোমরা আর্য্য দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ প্রভৃতি তুচ্ছ বিষয় লইয়া বিবাদে ব্যস্ত থাকিবে, ততই তোমরা ভবিষ্যৎ ভারতের উপাদান স্বরূপ শক্তি সংগ্রহ হইতে অনেক দূরে অবস্থিত থাকিবে। কারণ এইটি বিশেষ লক্ষ্য করিও যে, ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে ইহারই উপর নির্ভর করিতেছে। এই ইচ্ছাশক্তিসমূহের একত্র সম্মিলন, এককেন্দ্রীকরণ, ইহাই রহস্য। প্রত্যেক চীনাম্যানের মনের ভাব ভিন্ন ভিন্ন আর মুষ্টিমেয় কয়েকটি জাপানী একচিত্ত, ইহার ফল কি হইয়াছে, তাহা তোমরা জান। জগতের ইতিহাসে চিরকালই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। তোমরা দেখিবে, ক্ষুদ্র জাতিসমূহ চিরকালই বড় বড় প্রকাণ্ড জাতিসমূহের উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকে, আর ইহা খুবই স্বাভাবিক; কারণ, ক্ষুদ্র সংহত জাতিসমূহের বিভিন্ন ভাবসমূহকে এককেন্দ্রানুগ করা অতি সহজ —আর তাহাতেই তাহারা সহজেই উন্নত হইয়া থাকে। আর যে জাতিতে লোকসংখ্যা যত অধিক, তাহার সমবেতভাবে

কার্য্যপরিচালন তত কঠিন। উহা যেন একটা অসংহত অনিয়ন্ত্রিত লোকসমষ্টিস্বরূপ, তাহারা কখন মিলিতে পারে না। যাহা হউক, আমাদিগকে সমুদয় বিবাদবিসম্বাদ ছাড়িতে হইবে।

আমরা নারীজাতির ন্যায় ঈর্ষ্যাপরায়ণ

আমাদের ভিতর আর এক দোষ আছে। ভদ্রমহিলাগণ, আমায় ক্ষমা করিবেন, কিন্তু শত শত শতাব্দীর দাসত্বে আমরা যেন একদল স্ত্রীলোকের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছি। তোমরা এদেশে বা অপর যে কোন দেশে যাও দেখিবে, তিনজন স্ত্রীলোক যদি একত্র পাঁচ মিনিটের জন্য মিলিয়াছে ত বিবাদ করিয়া বসিয়াছে। পাশ্চাত্যদেশসমূহের বড় বড় সভা করিয়া তাহারা নারীজাতির ক্ষমতা ও অধিকার ঘোষণায় গগন ফাটাইয়া দেয়—তারপর দুইদিন যাইতে না যাইতে পরস্পরে বিবাদ করিয়া বসে, তখন কোন পুরুষ আসিয়া তাহাদের সকলের উপর প্রভুত্ব করিতে থাকে। সমগ্র জগতেই এইরূপ দেখিবে—নারীজাতিকে শাসনে রাখিতে এখনও পুরুষের প্রয়োজন। আমরা এইরূপ স্ত্রী-লোকের তুল্য হইয়াছি; যদি কোন নারী আসিয়া তাহাদের উপর নেতৃত্ব করিতে যায়, অমনি সকলে মিলিয়া তাহার সম্বন্ধে কঠোর সমালোচনা করিতে থাকে, তাহাকে ছিঁড়িয়া ফেলে, তাহাকে দাঁড়াইতে দেয় না, জোর করিয়া বসাইয়া দেয়। কিন্তু যদি একজন পুরুষ আসিয়া তাহাদের প্রতি একটু কর্কশ ব্যবহার করে, মধ্যে মধ্যে গালমন্দ করে, তবেই তাহাদের স্বস্তিবোধ হয়। তাহারা যে ঐরূপ ব্যবহারে—ঐরূপ প্রভাবে প্রভাবিত হইতে অভ্যস্ত হইয়াছে! সমগ্র জগৎই যাদুকর ও বশীকরণবিদ্‌গণে

পূর্ণ—শক্তিশালী ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা এইরূপে অপরকে বশীকরণ করিতেছে। আমরাও ঐরূপ হইয়াছি। যদি তোমাদের দেশের একজন কেহ বড় হইতে চেষ্টা করে, তোমরা সকলেই তাহাকে চাপিয়া দিতে চাও, কিন্তু একজন বিদেশী আসিয়া যদি লাথি মারে, তবে তাহা অনায়াসে সহিতে প্রস্তুত। তোমরা ইহাতে অভ্যস্ত হইয়াছ। এই দাসত্ব তিলক কপালে লইয়া তোমরা আবার বড় বড় নেতা হইতে চাও? সুতরাং তোমাদের ঐ দোষ ছাড়িয়া দাও।

জননী জন্মভূমি-রূপ বিরাট্ দেবতার উপাসনা কর

আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া সেই পরম জননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের আরাধ্যা দেবী হন, অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এই কয়েক বর্ষ ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন—এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত—তোমার স্বজাতি—সর্ব্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্ব্বত্র তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল ব্যাপিয়া আছেন। তুমি কোন্ নিষ্ফলা দেবতার অন্বেষণে ধাবিত হইতেছ আর তোমার সম্মুখে—তোমার চতুর্দ্দিকে যে দেবতাকে দেখিতেছ, সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ না? যখন তুমি ঐ দেবতার উপাসনায় সক্ষম হইবে, তখন অন্যান্য দেবতাকেও পূজা করিতে তোমার ক্ষমতা হইবে। তোমরা একপোয়া পথ হাঁটিতে পার না, হনুমানের ন্যায় সমুদ্র পার হইতে যাইতেছ? তাহা কখনই হইতে পারে না। সকলেই যোগী হইতে চায়, সকলেই ধ্যান করিতে অগ্রসর। তাহা হইতেই পারে না। সারাদিন সংসারের সঙ্গে, কর্ম্মকাণ্ডে মিশিয়া সন্ধ্যাবেলায়

খানিকটা বসিয়া নাক টিপিলে কি হইবে? একি এতই সোজা ব্যাপার নাকি—তিনবার নাক টিপিয়াছ আর অমনি ঋষিগণ উড়িয়া আসিবেন? একি তামাসা—একি ছেলেখেলা না কি? আবশ্যক—চিত্তশুদ্ধি। কিরূপে এই চিত্তশুদ্ধি হইবে? প্রথম পূজা—বিরাটের পূজা—তোমার সম্মুখে, তোমার চারিদিকে যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহাদের পূজা—ইঁহাদের পূজা করিতে হইবে—সেবা নহে, 'সেবা' বলিলে আমার অভিপ্রেত ভাবটি ঠিক বুঝাইবে না, 'পূজা' শব্দেই ঐ ভাবটি ঠিক প্রকাশ করা যায়। এই সব মানুষ—এই সব পশু—ইহারাই তোমার ঈশ্বর আর তোমার স্বদেশবাসিগণই তোমার প্রথম উপাস্য। তোমাদিগকে পরস্পরের প্রতি দ্বেষ হিংসা পরিত্যাগ করিয়া ও পরস্পরে বিবাদ না করিয়া প্রথমে এই স্বদেশিগণের পূজা করিতে হইবে। তোমাদের নিজেদের ঘোর কুকর্ম্মফলে কষ্ট পাইতেছ তথাপি এত কষ্টেও তোমাদের চোখ খুলিতেছে না।

বিষয় প্রকাণ্ড—কোন্‌খানে থামিব তাহা জানি না। সুতরাং মাদ্রাজে আমি যেভাবে কার্য্য করিতে চাই, দুচার কথায় তাহা তোমাদের নিকট বলিয়া আমি বক্তৃতা শেষ করিব। আমাদিগকে সমগ্র জাতির আধ্যাত্মিক ও লৌকিক শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। এটি কি বুঝিতেছ? তোমাদিগকে উহার কল্পনা করিতে হইবে, উহার আলোচনা করিতে হইবে, উহার সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইবে, পরিশেষে উহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। যতদিন না ইহা করিতেছ, ততদিন তোমাদের জাতির উদ্ধার নাই।

আধুনিক শিক্ষার দোষ গুণ

তোমরা এক্ষণে শিক্ষালাভ করিতেছ, তাহার কতকগুলি গুণ আছে বটে, কিন্তু উহার আবার কতকগুলি বিশেষ দোষও আছে, আর এই দোষ এত বেশী যে, গুণভাগ উহাতে ডুবিয়া যায়। প্রথমতঃ ঐ শিক্ষায় মানুষ প্রস্তুত হয় না—ঐ শিক্ষা সম্পূর্ণ নাস্তি-ভাবপূর্ণ। এইরূপ শিক্ষায় অথবা অন্য যে কোন শিক্ষায় এইরূপ সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়, তাহা মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ানক।

শিক্ষা অর্থে ভাঙ্গা নহে গড়া

বালক স্কুলে গেলে, সে প্রথম শিখিল—তাহার বাপ একটা মূর্খ, দ্বিতীয়তঃ তাহার পিতামহ একটা পাগল, তৃতীয়তঃ প্রাচীন আচার্য্যগণ সব ভণ্ড, আর চতুর্থতঃ শাস্ত্র সব মিথ্যা! ষোল বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই সে একটা প্রাণহীন, মেরুদণ্ডহীন 'না' এর সমষ্টি হইয়া দাঁড়ায়। আর ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, এইরূপ পঞ্চাশ বৎসরের শিক্ষায় ভারতের তিন প্রেসিডেন্সির ভিতরে একটা লোকও জন্মাইল না। মৌলিকতাভাবপূর্ণ যে কেহ এখানে জন্মাইয়াছে, সে এদেশের নয়, অন্যত্র শিক্ষালাভ করিয়াছে অথবা তাহারা আপনাদিগকে কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিবার জন্য প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছে। মাথায় কতকগুলা ভাব ঢুকাইয়া সারাজীবন হজম

শুধু গ্রন্থপাঠে শিক্ষালাভ হয় না

হইল না—অসম্বদ্ধ ভাবে মাথায় ঘুরিতে লাগিল—ইহাকে শিক্ষা বলে না। আমাদিগকে বিভিন্ন ভাবসমূহকে এমনভাবে আপনার করিয়া লইতে হইবে, যাহাতে আমাদের জীবন গঠিত হয়, যাহাতে মানুষ প্রস্তুত হয়, চরিত্র গঠিত হয়। যদি তোমরা পাঁচটি ভাব হজম করিয়া জীবন ও চরিত্র ঐ ভাবে গঠিত করিতে পার, তবে যে

ব্যক্তি একখানা সারা লাইব্রেরি মুখস্থ করিয়াছে, তাহার অপেক্ষা তোমার অধিক শিক্ষা হইয়াছে, বলিতে হইবে।

যথা খরশ্চন্দনভারবাহী
ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য॥

চন্দনভারবাহী গর্দ্দভ যেমন উহার ভারই বুঝিতে পারে, অন্যান্য গুণ বুঝিতে পারে না ইত্যাদি।

যদি শিক্ষা বলিতে কতকগুলি বিষয় জানা মাত্র বুঝায়, তবে লাইব্রেরিগুলিই ত জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সাধু, অভিধানসমূহই ত ঋষি। সুতরাং আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত যে, আমাদের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা আমাদের নিজেদের হাতে লইতে হইবে এবং যতদূর সম্ভব, জাতীয়ভাবে ঐ শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। অবশ্য ইহা একটি গুরুতর ব্যাপার—কঠিন সমস্যা। আমি জানি না, ইহা কখন কার্য্যে পরিণত হইবে কিনা। কিন্তু আমাদিগকে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিতে হইবে।

জাতীয়ভাবে শিক্ষাদান করিতে হইবে

কিরূপে আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে? দৃষ্টান্তস্বরূপ এই মাদ্রাজের কথাই ধর। আমাদিগকে একটি মন্দির করিতে হইবে—কারণ, হিন্দুগণ সকল কার্য্যেরই প্রথমে ধর্ম্মকে লইয়া থাকে। তোমরা বলিতে পার, ঐ মন্দিরে কী দেবতার পূজা হইবে, বিভিন্ন সম্প্রদায়, এই বিষয় লইয়া বিবাদ করিতে পারে। এরূপ হইবার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। আমরা যে মন্দির করিবার কথা বলিতেছি, উহা অসাম্প্রদায়িক হইবে, ইহাতে সকল সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ উপাস্য

অসাম্প্রদায়িক হিন্দুমন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে

ওঙ্কারেরই কেবল উপাসনা হইবে। যদি কোন সম্প্রদায়ের ওঙ্কারোপাসনায় আপত্তি থাকে, তবে তাহার নিজেকে হিন্দু বলিবার কোন অধিকার নাই। যে যে সম্প্রদায়ভুক্ত হউক না কেন, সকলেই হিন্দু। নিজের নিজের সম্প্রদায়গত ভাব অনুসারেই সকলেই ঐ ওঙ্কারের ব্যাখ্যা করিতে পারে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের উপযোগী একটি মন্দিরের প্রয়োজন। অন্যান্য স্থানে তোমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ দেবপ্রতিমা থাকিতে পারে, কিন্তু এখানে তোমাদের হইতে ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তিগণের সহিত বিরোধ করিও না। এখানে আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়সমূহের সাধারণ মতসমূহ শিক্ষা দেওয়া হইবে, অথচ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ঐ স্থানে আসিয়া তাঁহাদের মতসমূহ শিক্ষা দিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে—কেবল একটি বিষয় নিষেধ—তোমার সহিত কাহারও মতবিরোধ হইলে সেই সম্প্রদায়ের সহিত বিবাদ করিতে পারিবে না। তোমার যাহা বক্তব্য আছে, বলিয়া যাও, জগৎ উহা শুনিতে চায়। কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে তোমার কি মত, জগতের তাহা শুনিবার অবকাশ নাই, ওটি তোমার নিজের মনের ভিতরই থাকুক।

দ্বিতীয়তঃ এই মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক ও প্রচারক গঠন করিবার জন্য একটি বিদ্যালয় থাকিবে। ইহা হইতে যে সকল আচার্য্য গঠিত হইবে, তাহারা সর্ব্বসাধারণকে ধর্ম্ম ও অপরা বিদ্যা শিক্ষা দিবে। আমরা এক্ষণে যেমন দ্বারে দ্বারে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছি, তাহাদিগকে সেইরূপ ধর্ম্ম ও বিদ্যা উভয়ই প্রচার করিতে হইবে। আর ইহা অতি সহজেই হইতে পারে।

উক্ত মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে আচার্য্যগণের শিক্ষালয়সমূহ স্থাপন করিতে হইবে

এই সকল আচার্য্য ও প্রচারকগণের চেষ্টায় যেমন কার্য্য বিস্তৃত হইতে থাকিবে, অমনি এইরূপ আচার্য্য ও প্রচারকের সংখ্যাও বাড়িতে থাকিবে, ক্রমশঃ অন্যান্য স্থানে এইরূপ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিবে, যতদিন না সমগ্র জগৎ ছাইয়া ফেলিতে পারে। ইহাই আমার প্রণালী।

ইহা অতি প্রকাণ্ড ব্যাপার বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহা চাই-ই চাই। তোমরা বলিতে পার টাকা কোথায়—টাকার প্রয়োজন নাই, টাকায় কি হইবে? গত বার বৎসর ধরিয়া কাল কি খাইব আমার তাহার ঠিক ছিল না কিন্তু আমি জানিতাম—অর্থ এবং আমার যাহা কিছু আবশ্যক সে সব আসিবেই আসিবে, কারণ অর্থাদি আমার দাস, আমি ত তাদের দাস নহি। আমি বলিতেছি নিশ্চয় আসিবে। জিজ্ঞাসা করি, লোক কোথায়? আমাদের অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে, তাহা তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লোক কোথায়?

লোক চাই

হে মাদ্রাজবাসী যুবকবৃন্দ, আমার আশা তোমাদের উপর, তোমরা কি তোমাদের সমগ্র জাতির আহ্বানে সাড়া দিবে না? তোমরা যদি ভরসা করিয়া আমার কথায় বিশ্বাস কর, তবে আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমাদের প্রত্যেকেরই ভবিষ্যৎ বড় গৌরবময়। নিজেদের উপর প্রবল বিশ্বাস রাখ, যেমন বাল্যাবস্থায় আমার ছিল। আর সেই বিশ্বাসবলেই আমি এক্ষণে এই সকল কঠিন কার্য্য সাধনে সমর্থ হইতেছি। তোমাদের প্রত্যেকে নিজের প্রতি এই বিশ্বাসসম্পন্ন হও যে অনন্ত শক্তি আমাদের সকলের আত্মার মধ্যে

বিশ্বাসেই শক্তি আসিবে

বর্ত্তমান। তোমরা সমগ্র ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করিবে। হাঁ, আমরা জগতের সকল দেশে যাইব আর আগামী দশ বর্ষের মধ্যে আমাদের ভাব—যে সকল বিভিন্ন শক্তি সহযোগে জগতের প্রত্যেক জাতি গঠিত হইতেছে তাহার একাংশস্বরূপ হইবে। আমাদিগকে ভারতান্তর্গত বা ভারতবহির্ভূত প্রত্যেক জাতির জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে—আর এই অবস্থা আনয়নের জন্য আমা-দিগকে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে।

কয়েকজন দৃঢ়শরীর স্বার্থত্যাগী যুবকের আবশ্যক

ইহার জন্য আমি চাই কয়েকটি যুবক। বেদ বলিতেছেন, 'আশিষ্ঠো বলিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো মেধাবী' (তৈত্তি—উপ ২।৮) যুবকগণই ঈশ্বর লাভ করিবেন। এই-ই সময়, তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনগতি স্থির করিবার, যতদিন যৌবনের তেজ রহিয়াছে, যতদিন না তোমরা কর্ম্মশ্রান্ত হই-তেছ, যতদিন তোমাদের ভিতর যৌবনের নবীনতা ও সতেজভাব রহিয়াছে ; কাজে লাগো—এই-ই সময়। কারণ, নব প্রস্ফুটিত, অস্পৃষ্ট, অনাঘ্রাত পুষ্পই কেবল প্রভুর পাদ-পদ্মে অর্পণের যোগ্য—তিনি গ্রহণ করেন। তবে ওঠো, বিবাদ বিসম্বাদ করিবার ও ওকালতি প্রভৃতি কার্য্যের অপেক্ষা বড় বড় কাজ করিবার রহিয়াছে। আয়ু স্বল্প, সুতরাং তোমাদের জাতির কল্যাণের জন্য—সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য আত্মবলিদানই জীবনের শ্রেষ্ঠতম কর্ম্ম। এই জীবনে আর আছে কি ? তোমরা হিন্দু আর তোমাদের মজ্জাগত বিশ্বাস যে, দেহের নাশে জীবনের নাশ হয় না। সময়ে সময়ে মাদ্রাজী যুবকগণ আসিয়া আমার নিকট নাস্তিকতার কথা কহিয়া থাকে। আমি বিশ্বাস করি না যে,

হিন্দু কখন নাস্তিক হইতে পারে। পাশ্চাত্য গ্রন্থাদি পড়িয়া, সে মনে করিতে পারে, আমি জড়বাদী হইলাম, কিন্তু সে দুদিনের জন্য, উহা তোমাদের মজ্জাগত নহে, তোমাদের ধাতে যাহা নাই, তাহা তোমরা কখনই বিশ্বাস করিতে পার না, উহা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব চেষ্টা। ঐরূপ করিবার চেষ্টা করিও না। আমি বাল্যাবস্থায় একবার ঐরূপ চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু উহাতে কৃতকার্য্য হই নাই—উহা যে হইবার নয়। জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আত্মা অবিনাশী ও অনন্ত, অতএব যখন মৃত্যুই নিশ্চয়, তখন এস, একটি মহান্ আদর্শ লইয়া উহাতেই সমগ্র জীবন নিয়োজিত করি। ইহাই আমাদের সঙ্কল্প হউক আর সেই ভগবান্, যিনি শাস্ত্রমুখে বলিয়াছেন যে, 'আমি নিজ জনের পরিত্রাণের জন্য বার বার ধরাধামে আবির্ভূত হইয়া থাকি,' সেই মহান্ কৃষ্ণ আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন এবং আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায় হউন।

চেন্নাপুরী দাতব্য ভাণ্ডারে বক্তৃতা

মাদ্রাজে অবস্থানকালীন স্বামিজী 'চেন্নাপুরী অন্নদান সমাজম্' নামক এক 'দাতব্য ভাণ্ডারে'র সাম্বৎসরিক অধিবেশনে সভাপতি হন। জনৈক পূর্ব্ব বক্তা অন্যান্য জাতি হইতে ব্রাহ্মণ জাতিকে বিশেষভাবে ভিক্ষাদান প্রথার দোষ প্রদর্শন করেন। স্বামিজী ঐ বিষয়ে বলেন, এই প্রথার ভাল মন্দ দুদিকই আছে। ব্রাহ্মণগণই হিন্দুজাতির সমুদয় জ্ঞান ও চিন্তাসম্পত্তির রক্ষকস্বরূপ। যদি তাঁহাদিগকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অন্নের সংস্থান করিতে হয়, তবে তাঁহাদের জ্ঞানচর্চ্চার বিশেষ ব্যাঘাত পড়িবে ও সমগ্র হিন্দুজাতি তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।

ভারতের অবিচারিত দান ও অন্যান্য জাতির বিধিবদ্ধ দান-প্রথার তুলনা করিয়া স্বামিজী বলিলেন, ভারতের দরিদ্র মুষ্টিভিক্ষা লইয়া সন্তোষ শান্তিতে জীবন যাপন করে, পাশ্চাত্যদেশের দরিদ্রকে আইন "গরীব-খানায়" (poor house) যাইতে বাধ্য করে; মানুষ কিন্তু আহার অপেক্ষা স্বাধীনতা ভালবাসে সুতরাং সে গরীব-খানায় না যাইয়া সমাজের শত্রু, চোর ডাকাত হইয়া দাঁড়ায়। ইহাদিগকে শাসনে রাখিবার জন্য আবার অতিরিক্ত পুলিশ ও জেল প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিতে সমাজকে অতিশয় বেগ পাইতে হয়। সভ্যতা নামে পরিচিত ব্যাধি যতদিন সমাজ-শরীর অধিকার করিয়া থাকিবে, ততদিন দারিদ্র্য থাকিবেই সুতরাং দরিদ্রকে সাহায্য দানেরও আবশ্যক থাকিবে। এখন হয় ভারতের ন্যায় অবিচারিত ভাবে দান করিতে হইবে,—যাহার ফলে অন্ততঃ সন্ন্যাসীগণকে—তাঁহারা সকলে অকপট না হইলেও—আহার লাভ করিবার জন্য শাস্ত্রের দুচারটা কথাও শিক্ষা করিতে বাধ্য করিয়াছে,—অথবা পাশ্চাত্য জাতির ন্যায় বিধিবদ্ধভাবে দান করিতে হইবে, যাহার ফলে অতি ব্যয়সাধ্য দরিদ্র দুঃখ-নিবারণ প্রথার উৎপত্তি হইয়াছে এবং যে আইনের ফলে ভিক্ষুককে চোর ডাকাতে পরিণত করিয়াছে। এই দুইটি ছাড়া পথ নাই। এখন কোন্ পথ অবলম্বনীয়, একটু ভাবিলেই বুঝা যাইবে।

বিধিবদ্ধ না অবিচারিত দান

কলিকাতা

মান্দ্রাজ হইতে স্বামিজী কলিকাতায় আসিলেন। অভ্যর্থনা সমি তর বন্দোবস্ত অনুসারে খিদিরপুর হইতে একখানি স্পেশ্যাল ট্রেণে অতি প্রত্যুষে শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌছিলেন। তথায় প্রায় বিশ সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। ট্রেণ ষ্টেশনে পৌছিবামাত্র স্বামিজী গাড়ীতেই দণ্ডায়মান হইয়া সমবেত জনগণের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। স্বামিজীর প্রতিভাদীপ্ত অথচ কমনীয় মূর্ত্তি দেখিয়া কলিকাতাবাসীগণের মন উৎসাহে ভরিয়া গেল। 'জয় ভগবান্ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকী জয়' 'জয় স্বামী বিবেকানন্দজীকী জয়' শব্দে ষ্টেশন মুখরিত হইল। যুবকগণ স্বামিজীর গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া দিয়া নিজেরা টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। রিপন কলেজ পর্য্যন্ত পথ পত্রপুষ্পাদিনির্ম্মিত তোরণ ও পতাকায় শোভিত হইয়াছিল। রিপন কলেজে অতি অল্পক্ষণ থাকিয়া স্বামিজী রায় পশুপতিনাথ বসু বাহাদুরের বাগবাজারস্থ ভবনে গুরুভ্রাতাদিগের সহিত মিলিত হইলেন এবং তথায় পশুপতিবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আলমবাজারস্থ মঠে গিয়া রহিলেন। তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যগণ গোপাললাল শীলের কাশীপুরস্থ উদ্যানে রহিলেন। স্বামিজী মঠ হইতে প্রত্যহ তথায় আসিয়া আগন্তুকগণকে নানাবিধ উপদেশ দিতে লাগিলেন।

প্রায় এক সপ্তাহ পরে রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণে অভিনন্দনসভা আহূত হইল। প্রায় পাঁচ সহস্র শ্রোতৃবৃন্দের সমাগম হয়। সভাপতি রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর

অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলেন। পরে একটি রৌপ্যপাত্রে ঐ অভিনন্দনপত্র স্বামিজীকে প্রদত্ত হইল। আমরা সমগ্র অভিনন্দন-পত্রটির বঙ্গানুবাদ দিলাম।

কলিকাতা অভিনন্দন

শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামী

প্রিয় ভ্রাতঃ,—

কলিকাতা ও বঙ্গদেশের অন্যান্য কতিপয় স্থানের হিন্দু অধিবাসী আমরা আপনার নিজ জন্মভূমিতে শুভাগমনোপলক্ষে আপনাকে হৃদয়ের সহিত অভ্যর্থনা করিতেছি। এই কার্য্যে আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত একটু গর্ব্ব অনুভব করিতেছি, কারণ, জগতের বিভিন্ন প্রদেশে আপনি যে মহৎকার্য্য করিয়াছেন এবং নিজ জীবনেও যে মহৎ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহাতে শুধু যে আপনি আমাদের ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহা নহে, আপনি সমগ্র ভারতের বিশেষতঃ আমাদের এই বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

১৮৯৩ সালে আমেরিকার চিকাগো শহরে যে মহামেলা বসিয়াছিল, তাহার অঙ্গীভূত ধর্ম্মমহাসভায় আপনি আর্য্য-ধর্ম্মের তত্ত্বসমূহ বিবৃত করিয়াছেন। আপনার ব্যাখ্যান আপনার অধিকাংশ শ্রোতার নিকট দৈববাণী স্বরূপ প্রতিভাত হইয়াছিল, আপনার বক্তৃতার ওজস্বিতা ও মাধুর্য্য সকলকে অভিভূত

করিয়াছিল। কেহ কেহ হয়ত একটু সন্দেহের ভাবে উহা লইয়াছিল, কতকগুলি ব্যক্তি উহার সমালোচনা করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু উহাতে অধিকাংশ শিক্ষিত মার্কিনের ধর্ম্মবিশ্বাসে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। তাহাদের মনে যেন নূতন আলোকের উদয় হইল আর তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ সত্যানুরাগ ও অকপটতা-বশে তাহারা ঐ নূতন আলোকের সম্পূর্ণ সহায়তা লইতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইল। আপনার কার্য্যক্ষেত্রের পরিধি বাড়িল, আপনার প্রচার-বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষ হইতে চলিল। নানা প্রদেশ হইতে, নানা নগর হইতে আপনার আহ্বানের পর আহ্বান আসিতে লাগিল, আপনাকে অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হইল, অনেক সন্দেহ ভঞ্জন করিতে হইল, অনেক সমস্যার মীমাংসা করিতে হইল। আপনি এই সমুদয় কার্য্যই উদ্যমের সহিত, দক্ষতার সহিত অকপটভাবে করিলেন আর উহাব স্থায়ী ফলও ফলিল। আপনার উপদেশ আমেরিকার সাধারণতন্ত্রের অনেক সুশিক্ষিত সমাজে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, নূতন চিন্তা ও গবেষণার উদ্দীপনা করিয়াছে আর অনেকস্থলে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ধারণাসকলকে হিন্দু আদর্শসমূহের সভ্যতা ও সৌন্দর্য্য উপলব্ধির দিকে অগ্রসর করিয়া স্পষ্টভাবেই পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। বিভিন্ন ধর্ম্মের যুগপৎ চর্চ্চা ও আধ্যাত্মিক সত্যের অনুসন্ধানের জন্য প্রতিষ্ঠিত ক্লাব ও সমিতিসমূহের অতি সত্বর বৃদ্ধি পাশ্চাত্যদেশে আপনার কার্য্যের সাক্ষিস্বরূপ। আপনাকে লণ্ডনে স্থাপিত একটি বেদান্তদর্শন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে। আপনি নিয়মিতভাবে বক্তৃতা দিয়াছেন, শ্রোতৃবর্গ নিয়মিতভাবে উহাতে যোগদান করিয়াছে এবং বহু

স্থানে উহার আদর হইয়াছে। বক্তৃতাগৃহের প্রাচীরের বাহিরেও উহাদের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। লণ্ডনস্থ বেদান্তদর্শনের ছাত্রগণ আপনার তথা হইতে আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আপনাকে যে অভিনন্দন দিয়াছিল, তাহাতে যেরূপ আগ্রহের সহিত তাহারা আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছে তাহাতেই বুঝা যায়, আপনার শিক্ষায় তাহাদের আপনার প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধা ও প্রীতির উদয় হইয়াছে।

বেদান্তের আচার্য্যরূপে উহার বিস্তারে সফলকাম হইবার কারণ শুধু আপনার আর্য্যধর্ম্মের সত্যসমূহের সহিত গভীর ও সন্নিকট পরিচয় অথবা বক্তৃতা ও লেখা দ্বারা শাস্ত্রব্যাখ্যানে পটুতা নহে, কিন্তু প্রধানতঃ আপনার চরিত্র। আপনার বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও গ্রন্থাবলী অধ্যাত্ম ও সাহিত্য জগতে অতি মূল্যবান্ জিনিস হইয়াছে, সুতরাং উহাদের প্রভাব লোকের উপর বিস্তৃত না হইয়া যায় নাই। কিন্তু আপনার সরল, অকপট, আত্মত্যাগময় জীবন এবং আপনার বিনয়, আদর্শে দৃঢ়নিষ্ঠা ও তৎপরায়ণতার দৃষ্টান্তে উহার ফল শতগুণ বাড়িয়াছে—তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার নয়।

আমাদের ধর্ম্মের মহান্ সত্যসমূহের আচার্য্যরূপে আপনি জগতের যে হিতসাধন করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে হইতেছে, আপনার শ্রদ্ধাস্পদ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্বর্গীয় স্মৃতির সম্মান প্রদর্শন আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা যে আপনাকে পাইয়াছি, তাহার জন্যও আমরা তাঁহার নিকট ঋণী। আপনার ভিতর যে স্বর্গীয় বহ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিল, তিনি তাঁহার অপূর্ব্ব দৈবশক্তি-বলে তাহা অনেকদিন পূর্ব্বেই আবিষ্কার করেন

এবং আপনার ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। সুখের বিষয়, তাহা এক্ষণে পরিপূর্ণ হইতে চলিয়াছে। ঈশ্বরপ্রসাদে আপনি দৈবদৃষ্টি ও ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন! তাঁহার যাহা আবরণ ছিল, তাহা তিনিই খুলিয়া দেন, তাঁহার পবিত্র স্পর্শের দ্বারা আপনার চিন্তাপ্রণালী ও জীবনোদ্দেশ্যের গতি ফিরাইয়া দেন এবং তিনিই সেই অদৃশ্যরাজ্যের তত্ত্বান্বেষণে আপনার সহায়তা করেন। আপনিই পরবংশীয়গণের নিকট তাঁহার শ্রেষ্ঠ দায়স্বরূপ।

হে মহাত্মন্, আপনি যে পথ নির্ব্বাচন করিয়াছেন, সেই পথে স্থিরভাবে সাহসের সহিত অগ্রসর হউন। আপনাকে সমগ্র জগৎ জয় করিতে হইবে। আপনাকে অজ্ঞ, নাস্তিক, স্বেচ্ছায় অন্ধ-জনগণের নিকট হিন্দুধর্ম্ম ব্যাখ্যা ও সমর্থন করিতে হইবে। আপনি যে ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতেই আমাদের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইয়াছে আর আপনি এখনই যতটা সফলতালাভ করিয়াছেন, জগতের অনেক দেশ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কিন্তু এখনও অনেক কাজ বাকি রহিয়াছে আর আমাদের স্বদেশ—আমাদেরই বা বলি কেন—আপনার স্বদেশ আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। অগণ্য হিন্দুর নিকটই আপনাকে হিন্দুধর্ম্মের সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অতএব আপনি এই মহান্ কর্ম্মের জন্য প্রস্তুত হউন। আপনার প্রতি এবং আমাদের জীবনব্রতের ন্যায্যতার প্রতি আমাদের যথেষ্ট বিশ্বাস আছে, আমাদের জাতীয় ধর্ম্ম কোনরূপ ভৌতিক বিজয় চাহে না। উহার লক্ষ্য আধ্যাত্মিক; জড়নয়নের অন্তরালে অবস্থিত, বিচারদৃষ্টিতে

মাত্র প্রতিভাত সত্যই উহার অস্ত্র। আপনি সমগ্র জগৎকে এবং আবশ্যক হইলে হিন্দুদিগকে তাহাদের অন্তশ্চক্ষু উন্মীলন করিতে, ইন্দ্রিয়ের রাজ্যের পারে যাইতে, শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ যথার্থভাবে অধ্যয়ন করিতে, সেই পরমসত্যের সম্মুখীন হইতে এবং মনুষ্য বলিয়া জগতে তাহাদের যথার্থ স্থান ও চরমগতি কি, তাহা উপলব্ধি করিতে আহ্বান করুন। সকলকে জাগাইতে অথবা আহ্বান করিতে আপনার অপেক্ষা উপযুক্ত আর কেহ নাই আর আমরা আপনাকে এইটুকু নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, বিধাতা নিশ্চিতই যে কাজের জন্য আপনাকে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহাতে আমরা আপনাকে সহৃদয় সহানুভূতির সহিত ও অবিচলিতভাবে সহায়তা করিব।

প্রিয় ভ্রাতঃ

আপনার স্নেহের বন্ধু ও ভক্তগণ

কলিকাতা অভিনন্দনের উত্তর

আমি কলিকাতাবাসী বালকরূপে তোমাদের নিকট উপস্থিত

মানুষ আপনার মুক্তির চেষ্টায় জগৎপ্রপঞ্চের সম্বন্ধ একেবারে ত্যাগ করিতে চায়, মানুষ নিজ আত্মীয় স্বজন স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধবের মায়া কাটাইয়া সংসার হইতে দূরে, অতি দূরে পলাইয়া যায়। চেষ্টা করে—দেহগত সকল সম্বন্ধ, পুরাতন সকল সংস্কার ত্যাগ করিতে, এমন কি, মানুষ নিজে যে সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত দেহধারী মানব, ইহা ভুলিতেও প্রাণপণে চেষ্টা করে, কিন্তু তাহার অন্তরের অন্তরে সে সর্ব্বদাই একটি মৃদু অস্ফুটধ্বনি শুনিতে পায়, তাহার কর্ণে একটি সুর সর্ব্বদা বাজিতে থাকে, কে যেন দিবারাত্র তাহার কানে কানে মৃদু স্বরে বলিতে থাকে, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"। হে ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানীর অধিবাসিগণ! তোমাদের নিকট আমি সন্ন্যাসিভাবে উপস্থিত হই নাই, ধর্ম্মপ্রচারকরূপেও নহে, কিন্তু তোমাদের নিকট পূর্ব্বের ন্যায় সেই কলিকাতাবাসী বালকরূপে তোমাদের সহিত আলাপ করিতে উপস্থিত হইয়াছি। হে ভ্রাতৃগণ! আমার ইচ্ছা হয়, এই নগরীর রাজপথের ধূলির উপর বসিয়া বালকের ন্যায় সরলপ্রাণে তোমাদিগকে আমার মনের কথা সব খুলিয়া বলি। অতএব তোমরা যে আমাকে 'ভাই' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছ, তাহার জন্য তোমাদিগকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ

দিতেছি। হাঁ, আমি তোমাদের ভাই, তোমরাও আমার ভাই। পাশ্চাত্যদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের অব্যবহিত পূর্ব্বে একজন ইংরাজ বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "স্বামীজি! চার বৎসর বিলাসের লীলাভূমি, গৌরব-মুকুট-ধারী, মহাশক্তিশালী পাশ্চাত্য-ভূমিতে ভ্রমণের পর আপনার মাতৃভূমি কেমন লাগিবে?" আমি বলিলাম, "পাশ্চাত্যভূমিতে আসিবার পূর্ব্বে ভারতকে আমি ভালবাসিতাম, এক্ষণে ভারতের ধূলিকণা পর্য্যন্ত আমার নিকট পবিত্র, ভারতের হাওয়া আমার নিকট এখন পবিত্রতামাখা, ভারত এখন আমার নিকট তীর্থস্বরূপ।" ইহা ব্যতীত আর কোন উত্তর আমার আসিল না।

হে কলিকাতাবাসিগণ, আমার ভাই সকল, তোমরা আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছ, তজ্জন্য তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমার অসাধ্য। অথবা তোমাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়াই বাহুল্যমাত্র, কেন না তোমরা আমার ভাই, যথার্থ ভ্রাতারই কাজ করিয়াছ। অহো! হিন্দুভ্রাতারই কাজ। কারণ, এরূপ পারিবারিক বন্ধন, এরূপ সম্পর্ক, এরূপ ভালবাসা আমাদের মাতৃভূমির চতুঃসীমার বাহিরে আর কোথাও নাই।

চিকাগো ধর্ম্ম-মহাসভার যথার্থ ইতিহাস

এই চিকাগো ধর্ম্মসভা একটি বিরাট ব্যাপার হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের বহু নগর হইতে আমরা এই সভার উদ্যোক্তাগণকে ধন্যবাদ দিয়াছি। তাহারা আমাদের প্রতি দয়া প্রকাশের জন্য ধন্যবাদার্হও বটে। কিন্তু এই ধর্ম্মমহাসভার যথার্থ ইতিহাস যদি জানিতে চাও, যথার্থ উদ্দেশ্য যদি জানিতে চাও, তবে আমার নিকট

শুন। তাহাদের ইচ্ছা ছিল, আপনাদের প্রভুত্বপ্রতিষ্ঠা। তথাকার অধিকাংশ লোকের ইচ্ছা ছিল, খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা এবং অপর ধর্ম্ম-সকলকে হাস্যাস্পদ করা। কার্য্যতঃ তাহাদের ইচ্ছানুরূপ না হইয়া অন্যরূপ হইয়াছিল। বিধির বিধানে তাহা না হইয়া যাইবার জো-ই ছিল না। অনেকেই আমাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়াছিল, তাহাদিগকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দেওয়া হইয়াছে। বাস্তবিক কথা এই—আমার আমেরিকা যাত্রা ধর্ম্মমহাসভার জন্য নয়। এই সভার দ্বারা আমাদের অনেকটা পথ পরিষ্কার ও কাজের সুবিধা হইয়াছে বটে। সেইজন্য আমরাও উক্ত মহাসভার সভ্যগণের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে বুদ্ধ আছি। কিন্তু ঠিক বলিতে হইলে আমাদের ধন্যবাদ যুক্তরাজ্যনিবাসী, সহৃদয়, আতিথেয়, উন্নত সমুদয় মার্কিন জাতির প্রাপ্য—যাহাদের মধ্যে অপর জাতি অপেক্ষা ভ্রাতৃভাব বিশেষরূপে বিকাশ হইয়াছে। কোন মার্কিনের সহিত ট্রেণে পাঁচ মিনিটের জন্য আলাপ হইলেই তিনি তোমার বন্ধু হইবেন এবং অতিথিরূপে বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া প্রাণের কথা খুলিয়া বলিবেন। ইহাই মার্কিনদের লক্ষণ—ইহাই তাহাদের পরিচয়। তাহাদের ধন্যবাদ দেওয়া আমাদের কর্ম্ম নয়। আমার প্রতি তাহাদের দয়া বর্ণনাতীত, আমার প্রতি তাহারা যেরূপ অপূর্ব্ব দয়া প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা বলিতে আমার বহুবর্ষ লাগিবে।

সহৃদয় মার্কিনজাতি

কিন্তু শুধু মার্কিনগণকে ধন্যবাদ দিলে চলিবে না; তাহারা যতদূর ধন্যবাদার্হ, আট্‌লাণ্টিকের অপরপারস্থ সেই ইংরাজ-জাতিকেও আমাদের তদ্রূপ বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

ইংরাজ জাতির উপর আমা অপেক্ষা অধিক ঘৃণাসম্পন্ন হইয়া কেহই কখন ব্রিটিশ ভূমিতে পদার্পণ করেন নাই; এই প্লাটফরমে যে সকল ইংরাজ বন্ধু রহিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার সাক্ষ্য দিবেন। কিন্তু যত আমি তাঁহাদের সহিত একত্রে বাস করিতে লাগিলাম, যতই তাঁহাদের সহিত মিশিতে লাগিলাম, যতই দেখিতে লাগিলাম, ব্রিটিশ জাতির জীবনযন্ত্র কিরূপে পরিচালিত হইতেছে, যতই ঐ জাতির হৃৎস্পন্দন কোথায় হইতেছে, বুঝিতে লাগিলাম, ততই উহাদিগকে ভালবাসিতে লাগিলাম। আর হে ভ্রাতৃগণ, এখানে এমন কেহই উপস্থিত নাই, যিনি ইংরাজজাতিকে এখন আমাপেক্ষা বেশী ভালবাসেন। তাহাদিগের বিষয় ঠিক ঠিক জানিতে হইলে সেখানে কি কি ব্যাপার ঘটিতেছে, তাহা দেখিতে হইবে ও তাহাদের সহিত মিশিতে হইবে। আমাদের জাতীয় দর্শনশাস্ত্র বেদান্ত যেমন সমুদয় দুঃখই অজ্ঞানপ্রসূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেইরূপ ইংরাজ ও আমাদের মধ্যে বিরোধভাবও প্রায়ই অজ্ঞান-জনিত বলিয়া জানিতে হইবে। আমরা তাহাদের জানি না, তাহারাও আমাদের জানে না।

ভাবগোপনে অভ্যস্ত ইংরাজ জাতি

দুর্ভাগ্যক্রমে পাশ্চাত্যদেশবাসিগণের ধারণা এই যে, আধ্যাত্মিকতা, এমন কি, নীতি পর্য্যন্ত সাংসারিক উন্নতির সঙ্গে চিরসংশ্লিষ্ট। আর যখনই কোন ইংরাজ বা অপর কোন পাশ্চাত্যদেশবাসী ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন এবং দেখিতে পান,—এখানে দুঃখ দারিদ্র্য অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজত্ব করিতেছে, তিনি

অজ্ঞানই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতির পরস্পর বিদ্বেষের মূল;

অমনি সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন যে, এ দেশে ধর্ম্মের কি কথা, নীতি পর্য্যন্ত থাকিতে পারে না। তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা অবশ্য সত্য। ইউরোপের শৈত্যপ্রধান আবহাওয়া এবং অন্যান্য নানা কারণে তথায় দারিদ্র্য ও পাপ একত্রে অবস্থান করে দেখা যায়, ভারতবর্ষে কিন্তু তাহা নহে। আমার অভিজ্ঞতা এই, ভারতবর্ষে যে যত দরিদ্র, সে তত অধিক সাধু, কিন্তু ইহা ঠিক ঠিক বুঝা সময়-সাপেক্ষ। আর ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের এই গুপ্ত রহস্য বুঝিবার জন্য দীর্ঘকাল ভারতে বাস করিয়া সময় নষ্ট করিতে কয়জন বৈদেশিক প্রস্তুত আছেন? এই জাতির চরিত্র ধৈর্য্যসহকারে অধ্যয়ন করিবেন ও বুঝিতে পারিবেন, এরূপ লোক অল্পই আছেন। এখানে—কেবল এখানেই এমন জাতির বাস, যাহাদের নিকট দারিদ্র্য ও পাপ তুল্যার্থসূচক নহে; কেবল তাহাই নহে, দারিদ্র্যকে এখানে অতি উচ্চাসন দেওয়া হইয়া থাকে। এখানে দরিদ্র সন্ন্যাসীর বেশই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন পাইয়া থাকে। এইরূপ আমাদিগকেও তাহাদের সামাজিক রীতিনীতি অতি ধৈর্য্যসহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। উহাদের সম্বন্ধে হঠাৎ একটা সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলে চলিবে না। উহাদের স্ত্রী পুরুষের মেলামেশা এবং অন্যান্য আচার-ব্যবহার সকলগুলিরই অর্থ আছে, সকলগুলিরই ভাল দিক্ আছে, কেবল তোমাদিগকে যত্নপূর্ব্বক ধৈর্য্যসহকারে উহাদের আলোচনা করিতে হইবে। আমার এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, আমরা তাহাদের আচার-ব্যবহারের অনুকরণ করিব বা তাহারা আমাদের অনুকরণ করিবে; সকল দেশেরই আচার ব্যবহার শত শত শতাব্দীর অতি মৃদুগতি ক্রমবিকাশের ফলস্বরূপ এবং সকল-

গুলির গভীর অর্থ আছে। সুতরাং আমরাও তাহাদের আচার ব্যবহারগুলিকে যেন উপহাস না করি, তাহারাও যেন আমাদের তদ্রূপ না করে।

আমি এই সভার সমক্ষে আর একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। আমার মতে আমেরিকা অপেক্ষা ইংলণ্ডে আমার প্রচারকার্য্য অধিকতর সন্তোষজনক হইয়াছে। অকুতোভয়, দৃঢ় অধ্যবসায়শীল ইংরাজ জাতির মস্তিষ্কে কোন ভাব যদি একবার প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয় (তাহার মস্তিষ্কের খুলি যদিও অপর জাতি অপেক্ষা স্থূলতর, সহজে কোন ভাব ঢুকিতে চায় না, কিন্তু যদি অধ্যবসায়রূপ স্ক্রুপের দ্বারা ঐ খুলি ভেদ করিয়া তাহার মস্তিষ্কে কোন ভাব প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায়) উহা তাহার মস্তিষ্কে থাকিয়া যায়, কখন বাহির হয় না আর ঐ জাতির অসীম কার্য্যকারিণী শক্তিবলে বীজভূত সেই ভাব হইতে অঙ্কুর উদ্গত হইয়া অবিলম্বে ফল প্রসব করে; অপর কোন দেশে তদ্রূপ নহে। এই জাতির যেরূপ অপরিসীম কার্য্যকারিণীশক্তি, এই জাতির যেরূপ অনন্তজীবনীশক্তি, অপর কোন জাতির তদ্রূপ দেখিতে পাইবে না। এই জাতির কল্পনাশক্তি অল্প, কার্য্যকারিণীশক্তি অগাধ। আর এই ইংরাজ-হৃদয়ের গুপ্ত উৎস কোথায় তাহা কে জানে? তাহার হৃদয়ের গভীর প্রদেশে যে কত কল্পনা ও ভাবোচ্ছ্বাস লুক্কায়িত, তাহা কে বুঝিতে পারে? উহারা বীরের জাতি, উহারা প্রকৃত ক্ষত্রিয়, উহাদের শিক্ষাই ভাব গোপন করা, কখন না দেখান—বাল্যকাল হইতেই তাহারা এই শিক্ষা পাইয়াছে। খুব কম ইংরাজ

আমার মতে ইংলণ্ডে আমার প্রচারকার্য্য অধিকতর স্থায়ী হইবে

দেখিতে পাইবে যে, কখন নিজ হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে ; পুরুষের কথা কেন, ইংরাজরমণীও কখনও হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করে না। আমি ইংরাজ রমণীকে এমন কার্য্য করিতে দেখিয়াছি যাহা করিতে অতি সাহসী বাঙ্গালীও পশ্চাৎপদ হইবে। কিন্তু এই বীরত্বের ভিত্তির পশ্চাতে, এই ক্ষত্রসুলভ কঠিনতার অন্তরালে ইংরাজ হৃদয়ের ভাব-বারির গভীর উৎস লুক্কায়িত। যদি আপনি একবার উহার নিকট পৌছিতে পারেন, যদি আপনার একবার ইংরাজের সহিত ঘনিষ্ঠতা হয়, যদি উহার সহিত মিশেন, যদি তাঁহাকে একবার আপনার নিকট তাঁহার হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করাইতে পারেন, তবে তিনি আপনার চিরমিত্র, তবে তিনি আপনার চিরদাস। এই হেতু আমার মতে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ইংলণ্ডে আমার প্রচারকার্য্য অধিকতর সন্তোষজনক হইয়াছে। আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি যে, কাল যদি আমার দেহত্যাগ হয়, ইংলণ্ডে আমার প্রচারকার্য্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে ও ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে থাকিবে।

ভদ্রমহোদয়গণ ! আপনারা আমার হৃদয়ের আর এক তন্ত্রী—সর্ব্বাপেক্ষা গভীরতম তন্ত্রীতে আঘাত করিয়াছেন—আমার গুরুদেব, আমার আচার্য্য, আমার জীবনের আদর্শ, আমার ইষ্ট, আমার প্রাণের দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম গ্রহণ করিয়া। যদি কায়মনোবাক্য দ্বারা আমি কোন সৎকার্য্য করিয়া থাকি, যদি আমার মুখ হইতে এমন কোন কথা বহির্গত হইয়া থাকে, যাহাতে জগতে কোন ব্যক্তি কিছুমাত্র উপকৃত হইয়াছে, তাহাতে আমার কোন গৌরব নাই ;

মদীয় আচার্য্য রামকৃষ্ণ পরমহংস

তাহা তাঁহার। কিন্তু যদি আমার জিহ্বা কখন অভিশাপ বর্ষণ করিয়া থাকে, যদি আমার মুখ হইতে কখন কাহার প্রতি ঘৃণাসূচক বাক্য বাহির হইয়া থাকে, তবে তাহা আমার, তাঁহার নহে। যাহা কিছু দুর্ব্বল, দোষযুক্ত সবই আমার। যাহা কিছু জীবনপ্রদ, যাহা কিছু বলপ্রদ, যাহা কিছু পবিত্র, সকলই তাঁহার শক্তির খেলা, তাঁহারই বাণী এবং তিনি স্বয়ং। সত্য, বন্ধুগণ, জগৎ এখনও সেই নরবরের সহিত পরিচিত হয় নাই। আমরা জগতের ইতিহাসে শত শত মহাপুরুষের জীবনী পাঠ করিতেছি। এখন আমরা যে আকারে সেই সকল জীবনী পাইতেছি, তাহাতে শত শত শতাব্দী ধরিয়া শিষ্যপ্রশিষ্যগণের পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধনরূপ কলম চালানোর পরিচয় পাওয়া যায়। সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া ঐ সকল প্রাচীন মহা-পুরুষগণের জীবনচরিতকে বসিয়া মাজিয়া কাটিয়া ছাঁটিয়া মসৃণ করা হইয়াছে, কিন্তু তথাপি যে জীবন আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যাঁহার ছায়ায় আমি বাস করিয়াছি, যাঁহার পদতলে বসিয়া আমি সব শিখিয়াছি, সেই রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন যেরূপ উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত, আমার মতে আর কোন মহাপুরুষের তদ্রূপ নহে।

বন্ধুগণ! তোমাদের সকলেরই গীতার ভগবদ্বক্ত্রবিনিঃসৃত সেই প্রসিদ্ধ বাণী জানা আছে,—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" ৪।৭-৮

"যখনই যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই

আমি শরীর ধারণ করি। সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য, অসাধু দলনের জন্য ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করি।"

এই সঙ্গে আর একটি কথা আপনাদিগকে বুঝিতে হইবে, আজ আমাদের সমক্ষে তদ্রূপ বস্তু বিদ্যমান। এইরূপ একটি ধর্ম্ম-বন্যা প্রবলবেগে আসিবার পূর্ব্বে সমাজের সর্ব্বত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সদৃশতরঙ্গপরম্পরার আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে একটি তরঙ্গ—প্রথমে যাহার অস্তিত্বই হয়ত কাহারও চক্ষে পড়ে নাই, যাহাকে কেহ ভাল করিয়া দেখে নাই, যাহার গূঢ়শক্তি সম্বন্ধে কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই—ক্রমশঃ প্রবল হইতে থাকে, অপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলিকে যেন গ্রাস করিয়া নিজ অঙ্গে মিলাইয়া লয়। এইরূপে সুবিপুলকায় ও প্রবল হইয়া মহাবন্যারূপে পরিণত হয় এবং সমাজের উপর এরূপ বেগে পতিত হয় যে, কেহ উহার গতি রোধ করিতে পারে না। এরূপ ব্যাপারই এক্ষণে ঘটিতেছে। যদি তোমাদের চক্ষু থাকে, তবেই তোমরা উহা দেখিবে, যদি তোমাদের হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত থাকে, তবেই তোমরা উহা গ্রহণ করিবে, যদি তোমরা সত্যানুসন্ধিৎসু হও, তবেই তোমরা উহার সন্ধান পাইবে। অন্ধ, সে অতি অন্ধ, যে সময়ের চিহ্ন না দেখিতেছে, না বুঝিতেছে। দেখিতেছ না, দরিদ্র ব্রাহ্মণ পিতামাতার সুদূর গ্রামজাত এই সন্তান এক্ষণে সেই সকল দেশে সত্য সত্যই পূজিত হইতেছেন, যাহারা শত শত শতাব্দী ধরিয়া পৌত্তলিক উপাসনার বিরুদ্ধে চীৎকার করিয়া আসিতেছে। ইহা কাহার শক্তি? ইহা কি তোমাদের শক্তি না

মহাশক্তির আধার শ্রীরামকৃষ্ণ

আমার? না, ইহা আর কাহারও শক্তি নহে। যে শক্তি এখানে রামকৃষ্ণ পরমহংসরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, এ সেই শক্তি। কারণ, তুমি, আমি, সাধু, মহাপুরুষ এমন কি, অবতারগণ, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই শক্তির বিকাশ মাত্র, কোথাও বা কম কোথাও বা বেশী ঘনীভূত, পুঞ্জীকৃত। এখন আমরা সেই মহাশক্তির খেলার আরম্ভ মাত্র দেখিতেছি। আর বর্ত্তমান যুগের অবসান হইবার পূর্ব্বেই তোমরা ইহার আশ্চর্য্য, অতি আশ্চর্য্য খেলা প্রত্যক্ষ করিবে। ভারতবর্ষের পুনরুত্থানের জন্য এই শক্তির বিকাশ ঠিক সময়েই হইয়াছে। যে মূল জীবনী শক্তি ভারতকে সদা সঞ্জীবিত রাখিবে, তাহার কথা সময়ে সময়ে আমরা ভুলিয়া যাই!

প্রত্যেক জাতিরই উদ্দেশ্যসাধনের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যপ্রণালী আছে। কেহ রাজনীতি, কেহ সমাজসংস্কার, কেহ বা অপর কিছুকে প্রধান অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতেছে। আমাদিগের পক্ষে ধর্ম্মের মধ্য দিয়া নহিলে কার্য্য করিবার অন্য উপায় নাই। ইংরাজ রাজনীতির সহায়তায় ধর্ম্ম বুঝেন, বোধ হয় মার্কিন সমাজ-সংস্কারের সহায়তায় সহজে ধর্ম্ম বুঝিতে পারেন, কিন্তু হিন্দু—রাজনীতি সমাজসংস্কার ও অন্যান্য যাহা কিছু সবই, ধর্ম্মের ভিতর দিয়া নহিলে বুঝিতে পারেন না। জাতীয়-জীবন-সঙ্গীতের এইটিই যেন প্রধান সুর, অন্যগুলি যেন তাহারই একটু উল্টা পাল্টাকরা মাত্র। আর ঐটিই নষ্ট হইবার আশঙ্কা হইয়াছিল। আমরা যেন আমাদের জাতীয় জীবনের এই মূল ভাবটিকে সরাইয়া তৎস্থানে অন্য একটি স্থাপন করিতে যাইতেছিলাম, আমরা যেন

যে মেরুদণ্ডের বলে আমরা দণ্ডায়মান, তাহার পরিবর্ত্তে অপর একটি স্থাপন করিতে যাইতেছিলাম, আমাদের জাতীয় জীবনের ধর্ম্মরূপ মেরুদণ্ডের স্থানে আমরা রাজনীতিরূপ মেরুদণ্ড স্থাপন করিতে যাইতেছিলাম। যদি আমরা ইহাতে কৃতকার্য্য হইতাম, তবে তাহার ফলে আমাদের সমূলে বিনাশ হইত। কিন্তু তাহা ত হইবার নয়। তাই এই মহাশক্তির প্রকাশ হইয়াছিল। এই মহাপুরুষকে তোমরা যে ভাবেই লও, তাহা আমি বড় ধরি না; ইহাকে তোমরা কতটা ভক্তি শ্রদ্ধা কর, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, কিন্তু আমি তোমাদিগকে জোর করিয়া বলিতেছি, কয়েক শতাব্দী যাবৎ ভারতে এরূপ অদ্ভুত মহাশক্তির বিকাশ আর কখন হয় নাই। আর তোমরা যখন হিন্দু, তখন এই শক্তির দ্বারা শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র মানবজাতির উন্নতি ও মঙ্গল কিরূপে সাধিত হইতেছে, ইহা জানিবার জন্য তোমাদের এই শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ইহাকে বুঝিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অহো, জগতের কোন দেশে সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃভাবের কথা উত্থাপন ও আন্দোলন হইবার অনেক পূর্ব্বেই এই নগরীর সন্নিকটে এমন একজন ছিলেন, যাঁহার সমস্ত জীবনটাই একটি ধর্ম্মমহাসভার স্বরূপ ছিল।

একটি সগুণ আদর্শের প্রয়োজন

ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের শাস্ত্র নির্গুণ ব্রহ্মকেই আমাদের চরম লক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর ঈশ্বরেচ্ছায় সকলেই যদি সেই নির্গুণ ব্রহ্ম উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেন, তবে বড়ই ভাল হইত; কিন্তু তাহা যখন হইবার নয়, তখন আমাদের

মনুষ্যজাতির অনেকেরই পক্ষে একটি সগুণ আদর্শ না থাকিলে একেবারেই চলিবে না। এইরূপ কোন মহান্ আদর্শ পুরুষে বিশেষ অনুরাগী হইয়া তাঁহার পতাকার নিম্নে দণ্ডায়মান না হইয়া কোন জাতিই উঠিতে পারে না, কোন জাতিই বড় হইতে পারে না, এমন কি, একেবারে কাজই করিতে পারে না। রাজনৈতিক, এমন কি, সামাজিক বা বাণিজ্যজগতেরও কোন আদর্শ পুরুষ কখন সর্ব্বসাধারণ ভারতবাসীর উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন না। আমরা চাই আধ্যাত্মিক আদর্শ। উন্নত অধ্যাত্ম-রাজ্যের পারদর্শী মহাপুরুষগণের নামে আমরা একত্র সম্মিলিত হইতে চাই—সকলে মাতিতে চাই। ধর্ম্মবীর নহিলে আমরা তাঁহাকে আদর্শ করিতে পারি না। রামকৃষ্ণ পরমহংসে আমরা এইরূপ এক ধর্ম্মবীর—এইরূপ এক আদর্শ পাইয়াছি। যদি এই জাতি উঠিতে চায়, তবে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, এই নামে সকলকে মাতিতে হইবে। রামকৃষ্ণ পরমহংসকে আমি তুমি বা অপর কেহ, যেই প্রচার করুক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। আমি তোমাদের নিকট এই মহান্ আদর্শ পুরুষকে ধরিলাম। এখন বিচারের ভার তোমাদের উপর। এই মহান্ আদর্শ পুরুষকে লইয়া কি করিবে, আমাদের জাতীয় কল্যাণের জন্য তোমাদিগের এখনই তাহা স্থির করা উচিত। একটি কথা আমাদিগের স্মরণ রাখা আবশ্যক,—তোমরা যত মহা-পুরুষকে দেখিয়াছ অথবা স্পষ্ট করিয়াই বলিতেছি, যত মহাপুরুষের জীবন চরিত পাঠ করিয়াছ, ইহার জীবন তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্রতম। আর ইহা ত স্পষ্টই দেখিতেছ যে, এরূপ অত্যদ্ভুত

আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশের কথা তোমরা ত কখনও পড় নাই, দেখিবার আশা ত দূরের কথা। তাঁহার তিরোভাবের পর দশ বৎসর যাইতে না যাইতে এই শক্তি জগৎকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহা ত তোমরা প্রত্যক্ষই দেখিতেছ। হে ভদ্রমহোদয়গণ! এই কারণে আমাদের জাতীয় কল্যাণের জন্য, আমাদের ধর্ম্মের উন্নতির জন্য কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া আমি এই মহান্ আধ্যাত্মিক আদর্শ তোমাদের সম্মুখে স্থাপন করিতেছি। আমাকে দেখিয়া তাঁহাকে বিচার করিও না। আমি অতি ক্ষুদ্র যন্ত্রমাত্র, আমাকে দেখিয়া তাঁহার চরিত্রের বিচার করিও না। উহা এত উন্নত ছিল যে, আমি অথবা তাঁহার অপর কোন শিষ্য যদি শত শত জীবন ধরিয়া চেষ্টা করি, তথাপি তিনি যথার্থ যাহা ছিলেন, তাহার কোটী ভাগের এক ভাগেরও তুল্য হইতে পারি না। তোমরাই বিচার কর, তোমাদের অন্তরের অন্তরে সেই সনাতন, সাক্ষিস্বরূপ বর্ত্তমান আছেন, আর আমি হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করিতেছি, সেই রামকৃষ্ণ পরমহংস আমাদের জাতির কল্যাণের জন্য, আমাদের দেশের উন্নতির জন্য, সমগ্র মানবজাতির হিতের জন্য তোমাদের হৃদয় খুলিয়া দিন আর আমরা কিছু করি বা না করি, যে মহাযুগান্তর অবশ্যম্ভাবী, তাহার সহায়তার জন্য তোমাদিগকে অকপট ও দৃঢ়ব্রত করুন। তোমার আমার ভাল লাগুক বা নাই লাগুক, তাহার জন্য প্রভুর কার্য্য আটকাইয়া থাকে না! তিনি সামান্য ধূলি হইতেও তাঁহার কার্য্যের জন্য শত সহস্র কর্ম্মী সৃজন করিতে পারেন। তাঁহার অধীনে থাকিয়া কার্য্য করা ত আমাদের পক্ষে সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয়!

ক্রমশঃ এই ভাব চারিদিকে ছড়াইতে থাকে। তোমরা বলিয়াছ, আমাদিগকে সমগ্র জগৎ জয় করিতে হইবে। হাঁ তাহা আমাদিগকে করিতেই হইবে; ভারতকে অবশ্যই পৃথিবী জয় করিতে হইবে, ইহা হইতে নিম্নতর আদর্শে আমি কখনই সন্তুষ্ট হইতে পারি না। আদর্শটি হয় ত খুব বড় হইতে পারে, তোমাদের অনেকের এ কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে, কিন্তু তথাপি ইহাই আমাদিগকে আদর্শ করিতে হইবে। আমাদিগকে হয় সমগ্র জগৎ জয় করিতে হইবে নতুবা মরিতে হইবে, ইহা ছাড়া আর কোন পথ নাই। বিস্তৃতিই জীবনের চিহ্ন। আমাদিগকে ক্ষুদ্র গণ্ডির বাহিরে যাইতে—হৃদয়ের প্রসার করিতে হইবে, আমাদের যে জীবন আছে, তাহা দেখাইতে হইবে, নতুবা আমরা হীনাবস্থ হইয়া পচিয়া মরিব, আর অন্য উপায় নাই। দুয়ের মধ্যে একটা কর, হয় বাঁচ না হয় মর।

আমাদের আদর্শ সমগ্র জগদ্বিজয়

সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া আমাদের দেশের দ্বেষকলহের কথা কাহারও অবিদিত নাই, কিন্তু আমার কথা শুন, ইহা সব দেশেই আছে। রাজনীতি যে সকল জাতির জাতীয়জীবনের মেরুদণ্ড, সেই সকল জাতি আত্মরক্ষার জন্য বৈদেশিক নীতি (Foreign Policy) অবলম্বন করিয়া থাকে। যখন তাহাদের নিজ দেশে পরস্পরের মধ্যে গৃহবিবাদ আরম্ভ হয়, তখন তাহারা কোনও বৈদেশিক জাতির সহিত বিবাদের সূচনা করে, অমনি গৃহবিবাদ থামিয়া যায়। আমাদের গৃহবিবাদ আছে কিন্তু উহা থামাইবার

আমাদের বৈদেশিক নীতি (Foreign Policy)

কোন বৈদেশিক নীতি নাই। জগতের সমগ্রজাতির মধ্যে আমাদের শাস্ত্রের সত্য প্রচারই আমাদের সনাতন বৈদেশিক নীতি হউক। ইহা যে আমাদিগকে এক অখণ্ড জাতিরূপে মিলিত করিবে, তাহার কি আর প্রমাণান্তর চাও? তোমাদের মধ্যে যাহারা রাজনীতি-ঘেঁষা, তাহাদিগকে আমি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। অদ্যকার সভাই যে এ বিষয়ের চূড়ান্ত প্রমাণ।

বিদেশে ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা আমাদের সঙ্কীর্ণতা দূর হইবে

দ্বিতীয়তঃ, এই সব স্বার্থের বিচার ছাড়িয়া দিলেও আমাদের পশ্চাতে নিঃস্বার্থ, মহান্, জীবন্ত দৃষ্টান্ত সকল রহিয়াছে। ভারতের পতন ও দুঃখদারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, তিনি নিজ কার্য্যক্ষেত্র সঙ্কোচ করিয়াছিলেন, শামুকের মত দরজায় খিল দিয়া বসিয়াছিলেন, আর্য্যেতর অন্যান্য সত্যপিপাসু মানব জাতির নিকট নিজ রত্নভাণ্ডার—জীবনপ্রদ সত্যরত্নের ভাণ্ডার—উন্মুক্ত করেন নাই। আমাদের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, আমরা বাহিরে যাইয়া অপর জাতির সহিত আমাদের তুলনা করি নাই আর তোমরা সকলেই জান, যে দিন হইতে রাজা রামমোহন রায় এই সঙ্কীর্ণতার বেড়া ভাঙ্গিলেন, সেই দিন হইতে—আজ ভারতের সর্ব্বত্র যে একটু স্পন্দন, যে একটু জীবন অনুভূত হইতেছে—তাহার আরম্ভ হইয়াছে। সেইদিন হইতেই ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্য পথ অবলম্বন করিয়াছে এবং ভারত এক্ষণে ক্রমবর্দ্ধমান গতিতে উন্নতি লাভ করিতেছে। ভূতকালে যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী দেখা গিয়া থাকে, তবে জানিও, এক্ষণে মহা বন্যা আসিতেছে, আর কেহই উহার গতিরোধ

করিতে পারিবে না। অতএব আমাদিগকে বিদেশে যাইতে হইবে।

আর আদানপ্রদানই অভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র। আমরা কি চিরকালই পাশ্চাত্যগণের পদতলে বসিয়া সব জিনিস, এমন কি, ধর্ম্ম পর্য্যন্ত শিখিব? অবশ্য উহাদের নিকট আমরা কল কব্জা শিখিতে পারি, আরও অন্যান্য অনেক জিনিস উহাদের নিকট শিখিতে পারি, কিন্তু আমাদেরও তাহাদিগকে কিছু শিখাইতে হইবে। আমরা উহাদিগকে আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের গভীর আধ্যাত্মিকতা শিখাইব। জগৎ পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার অপেক্ষা করিতেছে। পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে ভারত যে ধর্ম্মরূপ অমূল্যরত্ন পাইয়াছে, তাহার জন্য জগৎ সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছে। হিন্দুজাতি শত শত শতাব্দীর অবনতি ও দুঃখ দুর্ব্বিপাকের মধ্যেও যাহা সযত্নে হৃদয়ে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে, জগৎ সেই রত্নের আশায় সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছে।

পাশ্চাত্য-জাতির নিকট শুধু শিখিলে চলিবে না, কিছু শিখাইতেও হইবে

তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সেই অপূর্ব্ব রত্নরাজির জন্য ভারতবহির্ভূত প্রদেশবাসীরা কিরূপ উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে, তাহা তোমরা কি বুঝিবে? আমরা এখানে অনর্গল বাক্যব্যয় করিতেছি, পরস্পর বিবাদ করিতেছি, যাহা কিছু গভীর শ্রদ্ধার বস্তু সব হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছি,—এক্ষণে এই হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়াটা একটা জাতীয় পাপের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এই ভারতে যে সঞ্জীবন অমৃত রাখিয়া গিয়াছেন তাহার এক কণা লাভের জন্য ভারতবহির্ভূতপ্রদেশনিবাসী

ভারতের ধর্ম্মগ্রহণের জন্য ভারতেতর দেশীয় লোকে অতিশয় আগ্রহবান্

লক্ষ লক্ষ নরনারী কিরূপ আগ্রহের সহিত হাত বাড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা আমরা কিরূপে বুঝিব ? অতএব আমাদিগকে ভারতের বাহিরে যাইতে হইবে। আমাদের আধ্যাত্মিকতার বিনিময়ে তাহারা যাহা কিছু দিতে পারে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। চৈতন্যরাজ্যের অপূর্ব্ব তত্ত্বসমূহের বিনিময়ে আমরা জড়রাজ্যের অদ্ভুত তত্ত্বসমূহ শিক্ষা করিব। চিরকাল ধরিয়া আমাদিগকে শিষ্য থাকিলে চলিবে না, আমাদিগকে গুরুও হইতে হইবে। সমাবস্থাপন্ন না হইলে কখন বন্ধুত্ব হয় না ; আর যখন একদল লোক সর্ব্বদাই আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিয়া থাকে ও অপর দল সর্ব্বদাই তাহার পদতলে বসিয়া শিক্ষা লইতে উদ্যত, তখন উভয়ের মধ্যে কখন সমান সমান ভাব আসিতে পারে না। যদি ইংরাজ বা মার্কিণগণের সহিত তোমাদের সমান হইতে ইচ্ছা থাকে, তবে তোমাদিগকে যেমন উহাদের নিকট শিখিতে হইবে, তেমন শিখাইতেও হইবে। আর এখনও শত শত শতাব্দী ধরিয়া জগৎকে শিখাইবার জিনিষ তোমাদের যথেষ্ট আছে। তাহাই এক্ষণে করিতে হইবে।

'ভাবুক' বাঙ্গালী জাতিই সমগ্র জগতে ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যের উপযুক্ত

হৃদয়ে উৎসাহাগ্নি জ্বালিতে হইবে। লোকে বলিয়া থাকে, বাঙ্গালী জাতির কল্পনাশক্তি অতি প্রখর, আমি উহা বিশ্বাস করি। আমাদিগকে লোকে কল্পনাপ্রিয় ভাবুক জাতি বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে; কিন্তু বন্ধুগণ! আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, ইহা উপহাসের বিষয় নয়, কারণ

প্রবল উচ্ছ্বাসেই হৃদয়ে তত্ত্বালোকের স্ফুরণ হয়। বুদ্ধিবৃত্তি বিচার শক্তি খুব ভাল জিনিস হইতে পারে; কিন্তু উহা বেশী দূর যাইতে পারে না। ভাবের মধ্য দিয়াই গভীরতম রহস্যসমূহ উদ্ঘাটিত হয়। অতএব বাঙ্গালীর দ্বারাই—ভাবুক বাঙ্গালী দ্বারাই—এ কার্য্য সাধিত হইবে।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত", কঠ ১।৩।১৪—"উঠ, জাগ, যতদিন না অভীপ্সিত বস্তু লাভ করিতেছ, ততদিন ক্রমাগত তদুদ্দেশ্যে চলিতে ক্ষান্ত হইও না।" কলিকাতাবাসী যুবকগণ, উঠ, জাগ, কারণ শুভ মুহূর্ত্ত আসিয়াছে। এখন আমাদের সকল বিষয়ে সুবিধা হইয়া আসিতেছে। সাহস অবলম্বন কর, ভয় পাইও না, কেবল আমাদের শাস্ত্রেই ভগবানে 'অভীঃ' এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদিগকে—'অভীঃ', নির্ভীক হইতে হইবে, তবেই আমরা কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিব। উঠ, জাগ, কারণ, তোমাদের মাতৃভূমি এই মহাবলি প্রার্থনা করিতেছেন। যুবকগণের দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হইবে। "যুবা, আশিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, মেধাবী"—তাহাদিগের দ্বারাই এই কার্য্য সাধিত হইবে। আর কলিকাতায় এইরূপ শত সহস্র যুবা রহিয়াছে। তোমরা বলিয়াছ, আমি কিছু কার্য্য করিয়াছি। যদি তাহাই হয়, তবে ইহাও স্মরণ রাখিও যে, আমিও এক সময় অতি নগণ্য বালকমাত্র ছিলাম—আমিও এক সময় এই কলিকাতার রাস্তায় তোমাদের মত খেলিয়া বেড়াইতাম। যদি আমি এতদূর করিয়া থাকি, তবে তোমরা আমাপেক্ষা কত অধিক কার্য্য করিতে পার। উঠ, জাগ, জগৎ তোমাদিগকে আহ্বান

কলিকাতাবাসী যুবকগণ, উঠ

করিতেছে। ভারতের অন্যান্য স্থানে বুদ্ধিবল আছে, ধনবল আছে, কিন্তু কেবল আমার মাতৃভূমিতেই উৎসাহাগ্নি বিদ্যমান। এই উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে হইবে; অতএব হে কলিকাতাবাসী যুবকবৃন্দ! হৃদয়ে এই উৎসাহাগ্নি জ্বালিয়া জাগরিত হও।

ভাবিও না তোমরা দরিদ্র, ভাবিও না তোমরা বন্ধুহীন; কে কোথায় দেখিয়াছে—টাকায় মানুষ করিয়াছে? মানুষই চিরকাল টাকা করিয়া থাকে। জগতের যাহা কিছু উন্নতি, সব মানুষের শক্তিতে হইয়াছে, উৎসাহের শক্তিতে হইয়াছে, বিশ্বাসের শক্তিতে হইয়াছে। তোমাদের মধ্যে যাহারা সেই সকল উপনিষদের মধ্যে মনোরম কঠোপনিষদ্ পাঠ করিয়াছ, তাহাদের সকলের অবশ্য স্মরণ আছে,—সেই রাজা এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ভাল ভাল জিনিস দক্ষিণা না দিয়া অতি বৃদ্ধ, কার্য্যের অনুপযুক্ত গো দক্ষিণা দিতেছিলেন। ঐ উপনিষদে লিখিত আছে, সেই সময় তাঁহার পুত্র নচিকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধা প্রবেশ করিল। এই 'শ্রদ্ধা' শব্দ আমি তোমাদের নিকট ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া বলিব না; অনুবাদ করিলে ভুল হইবে। এই অপূর্ব্ব শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝা কঠিন; এই শব্দের প্রভাব ও কার্য্যকারিতা অতিশয় প্রবল। নচিকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদয় হইবামাত্র কি ফল হইল, দেখ। শ্রদ্ধার উদয় হইবামাত্রই নচিকেতার মনে উদয় হইল, অনেকের মধ্যে প্রথম অনেকের মধ্যে মধ্যম, আমি অধম কখনই নহি, আমিও কিছু কার্য্য করিতে পারি। তাঁহার এইরূপ আত্মবিশ্বাস ও সাহস বাড়িতে

দারিদ্র্য বা অন্য কিছু সৎকার্য্যের প্রতিবন্ধক নহে; বিশ্বাস উৎসাহ ও নির্ভীকতায় অসাধ্যসাধন হয়—কঠোপনিষদে যম-নচিকেতা সংবাদ

শ্রদ্ধা

লাগিল, তখন যে সমস্যার চিন্তায় তাঁহার মন আলোড়িত হইতেছিল, তিনি সেই মৃত্যুতত্ত্বের মীমাংসা করিতে উদ্যত হইলেন, যমগৃহে গমন ব্যতীত এই সমস্যার মীমাংসার আর উপায় ছিল না, সুতরাং তিনি যমসদনে গমন করিলেন। সেই নির্ভীক বালক নচিকেতা যমগৃহে তিন দিন অপেক্ষা করিলেন। তোমরা সকলেই জান, কিরূপে তিনি যমের নিকট হইতে সমুদয় তত্ত্ব অবগত হইলেন। আমাদের চাই এই শ্রদ্ধা। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারত হইতে ইহা প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। তজ্জন্যই আমাদের এই উপস্থিত দুর্দ্দশা। মানুষে মানুষে প্রভেদ—এই শ্রদ্ধার তারতম্য লইয়া, আর কিছুতেই নহে। এই শ্রদ্ধার তারতম্যেই কেহ বড় হয়, কেহ ছোট হয়। মদীয় আচার্য্যদেব বলিতেন, যে আপনাকে দুর্ব্বল ভাবে, সে দুর্ব্বলই হইবে, আর ইহা অতি সত্য কথা। এই শ্রদ্ধা তোমাদের ভিতর প্রবেশ করুক। পাশ্চাত্য জাতি জড়জগতে যে আধিপত্য [illegible]ভ করিয়াছে, তাহা এই শ্রদ্ধার ফলে। তাহারা তাহাদের শারীরিক বলে বিশ্বাসী। আর তোমরা যদি তোমাদের আত্মায় বিশ্বাসসম্পন্ন হও, তাহা হইলে তাহার ফল আরও অদ্ভুত হইবে। তোমাদের শাস্ত্র, তোমাদের ঋষিগণ যাহা একবাক্যে প্রচার করিতেছেন, সেই অনন্ত শক্তির আধার, অনন্ত আত্মায় বিশ্বাসসম্পন্ন হও—সেই আত্মায়, যাঁহাকে কেহ নাশ করিতে পারে না, অনন্ত শক্তি রহিয়াছে; কেবল উহাকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। কারণ এখানেই অন্যান্য দর্শন ও ভারতীয় দর্শনের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ। দ্বৈতবাদীই হউন, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীই হউন, অদ্বৈতবাদীই হউন, সকলেই দৃঢ় বিশ্বাস করেন যে, আত্মার মধ্যেই সমুদয় শক্তি

অবস্থিত ; কেবল উহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। অতএব আমি চাই এই শ্রদ্ধা। আমাদের সকলেরই ইহা আবশ্যক—এই আত্মবিশ্বাস ; আর এই বিশ্বাস উপার্জ্জন করা রূপ মহান্ কার্য্য তোমাদের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। আমাদের জাতীয় শোণিতে এক ভয়ানক রোগের বীজ প্রবেশ করিতেছে—সকল বিষয় হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া—গাম্ভীর্য্যের অভাব—এই দোষ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে। বীর হও, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও, আর যাহা কিছু আসিবেই আসিবে।

আমি ত এখনও কিছুই করিতে পারি নাই, তোমাদিগকেই সব করিতে হইবে। যদি কাল আমার দেহত্যাগ হয়, সঙ্গে সঙ্গে এই কার্য্যের অস্তিত্ব লুপ্ত হইবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জন সাধারণের মধ্য হইতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি আসিয়া এই ব্রত গ্রহণ করিবে এবং এই কার্য্যের এতদূর উন্নতি ও বিস্তার সাধন করিবে যে, আমি কল্পনায়ও তাহা কখন আশা করি নাই। আমার দেশের উপর আমি বিশ্বাস করি, বিশেষতঃ, আমার দেশের যুবকদলের উপর। বঙ্গীয় যুবকগণের স্কন্ধে অতি গুরুভার সমর্পিত। আর কখনও কোন দেশের যুবকদলের উপর এত গুরুভার পড়ে নাই। আমি প্রায় অতীত দশ বৎসর ধরিয়া সমুদয় ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়াছি—তাহাতে আমার দৃঢ় সংস্কার হইয়াছে যে বঙ্গীয় যুবকগণের ভিতর দিয়াই সেই শক্তি প্রকাশ হইবে, যাহাতে ভারতকে তাহার উপযুক্ত আধ্যাত্মিক অধিকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবে। নিশ্চয় বলিতেছি,

আমি যে কার্য্যের সূচনা মাত্র করিয়াছি, বঙ্গীয় যুবকগণকে তাহা সম্পাদন করিতে হইবে

এই হৃদয়বান্ উৎসাহী বঙ্গীয় যুবকগণের ভিতর হইতেই শত শত বীর উঠিবে, যাহারা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রচারিত সনাতন আধ্যাত্মিক সত্যসকল প্রচার করিয়া ও শিক্ষা দিয়া জগতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত—এক মেরু হইতে অপর মেরু পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিবে। তোমাদের সম্মুখে এই মহান্ কর্ত্তব্য রহিয়াছে। অতএব আর একবার তোমাদিগকে সেই মহতী বাণী—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' স্মরণ করাইয়া দিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি। ভয় পাইও না, কারণ, মনুষ্য-জাতির ইতিহাসে দেখা যায়, যত কিছু শক্তি প্রকাশ হইয়াছে, সবই সাধারণ লোকের মধ্যে। জগতে যত বড় বড় প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ জন্মিয়াছেন, সবই সাধারণ লোকের মধ্য হইতে, আর ইতিহাসে একবার যাহা ঘটিয়াছে, তাহা পুনরায় ঘটিবে। কিছুতেই ভয় পাইও না। তোমরা অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য করিবে। যে মুহূর্ত্তে তোমার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই তুমি শক্তিহীন। ভয়ই জগতের সমুদয় দুঃখের মুখ্য কারণ, ভয়ই সর্ব্বাপেক্ষা বড় কুসংস্কার, নির্ভীক হইলে এক মুহূর্ত্তেই স্বর্গ পর্য্যন্ত আবির্ভূত হয়। অতএব "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

জনসাধারণের মধ্য হইতেই মহাপুরুষ জন্মিয়া থাকেন

ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাদিগকে পুনরায় ধন্যবাদ দিতেছি। আমি কেবল আপনাদিগকে ইহাই বলিতে পারি যে, আমার ইচ্ছা—আমার প্রবল আন্তরিক ইচ্ছা এই, যাহাতে আমি জগতের,

সর্ব্বোপরি আমার স্বদেশ ও স্বদেশবাসিগণের যৎসামান্ত সেবায়ও লাগিতে পারি।

স্বামিজী কলিকাতায় ষ্টার থিয়েটারে আর একটি বক্তৃতা করেন। উহার সমগ্রটির বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল।

সর্ব্বাবয়ব বেদান্ত

দূরে—অতি দূরে, যথায় লিপিবদ্ধ ইতিহাস, এমন কি, কিম্বদন্তীর ক্ষীণ রশ্মিজাল পর্য্যন্ত প্রবেশে অসমর্থ—অনন্তকাল ধরিয়া স্থিরভাবে সেই আলোক জ্বলিতেছে, বহিঃপ্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যে কখন কিছু নিষ্প্রভ কখন অত্যুজ্জ্বল কিন্তু চিরকাল অনির্ব্বাণ ও স্থিরভাবে থাকিয়া শুধু সমগ্র ভারতে নয়, সমগ্র চিন্তাজগতে উহার পবিত্র রশ্মি—নীরব অননুভাব্য শান্ত অথচ সর্ব্বশক্তিমান্ পবিত্র রশ্মি—বিকিরণ করিতেছে; ঊষাকালীন শিশিরসম্পাতের ন্যায় অশ্রুত ও অলক্ষ্যভাবে পড়িয়া অতি সুন্দর গোলাপকলিকে প্রস্ফুটিত করিতেছে—এই সেই উপনিষদের তত্ত্বরশ্মি; এই সেই বেদান্ত দর্শন। কেহই জানে না, কবে উহা প্রথম ভারতক্ষেত্রে আবির্ভূত হইল। অনুমানবলে এ তত্ত্বাবিষ্কারের চেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে। বিশেষতঃ এ বিষয়ে পাশ্চাত্য লেখকগণের অনুমানসমূহ এতই পরস্পর বিরুদ্ধ যে, তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট সময় নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। আমরা হিন্দুগণ কিন্তু

বেদান্তের নীরব প্রভাব

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে উহার কোন উৎপত্তি স্বীকার করি না। আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতেছি, মানব আধ্যাত্মিক রাজ্যের যাহা কিছু পাইয়াছে বা পাইবে, ইহাই তাহার প্রথম ও ইহাই শেষ। এই বেদান্তসমুদ্র হইতে সময়ে সময়ে জ্ঞানালোকরূপ তরঙ্গরাজি উত্থিত হইয়া কখন পূর্ব্বে কখন পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়াছে। অতি প্রাচীনকালে এই তরঙ্গ পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়া এথেন্স্, আলেকজান্দ্রিয়া ও আন্তিয়কে যাইয়া গ্রীকদিগের চিন্তাগতি নিয়মিত করিয়াছে।

সাঙ্খ্যদর্শন যে প্রাচীন গ্রীকদিগের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, ইহা নিশ্চিত। আর সাঙ্খ্য ও ভারতীয় অন্যান্য সকল ধর্ম্ম বা দার্শনিক মতই উপনিষদ্ বা বেদান্তরূপ একমাত্র প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতেও প্রাচীন বা আধুনিক কালে নানা বিরোধী সম্প্রদায় বর্ত্তমান থাকিলেও ইহাদের সকলগুলিই উপনিষদ্ বা বেদান্তরূপ একমাত্র প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। তুমি দ্বৈতবাদী হও, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হও, শুদ্ধাদ্বৈতবাদী হও, অদ্বৈতবাদী হও, অথবা যে কোন প্রকারের অদ্বৈতবাদী বা দ্বৈতবাদী হও অথবা তুমি যে নামেই আপনাকে অভিহিত কর না কেন, তোমাকে তোমার শাস্ত্র উপনিষদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেই হইবে। যদি ভারতের কোন সম্প্রদায় উপনিষদের প্রামাণ্য স্বীকার না করে, তবে সেই সম্প্রদায়কে 'সনাতন' মতাবলম্বী বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না। আর, জৈন বৌদ্ধগণের মত পর্য্যন্ত, উপনিষদের প্রামাণ্য স্বীকার করে নাই বলিয়া ভারতভূমি হইতে বিদূরিত

বেদান্তই হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত সকল সম্প্রদায়ের ভিত্তি

হইয়াছিল ; অতএব জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বেদান্ত ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। আর আমরা যাহাকে হিন্দুধর্ম্ম বলি, এই অনন্ত শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট মহান্ অশ্বত্থবৃক্ষস্বরূপ হিন্দুধর্ম্ম, বেদান্তের প্রভাবে সম্পূর্ণ অনুপ্রাণিত। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বেদান্তই আমাদের জীবন, বেদান্তই আমাদের প্রাণ, আমরণ আমরা বেদান্তের উপাসক ; আর হিন্দু বলিলেই বেদান্তী বুঝাইয়া থাকে।

অতএব ভারতভূমিতে ভারতীয় শ্রোতৃবর্গের সমক্ষে বেদান্তপ্রচার যেন আপাত দৃষ্টিতে অসঙ্গত বোধ হয় কিন্তু যদি কিছু প্রচার করিতে হয়, তবে তাহা এই বেদান্ত। বিশেষতঃ এই যুগে ইহার প্রচার বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, আমি তোমাদিগকে এইমাত্র বলিয়াছি, ভারতীয় সকল সম্প্রদায়েরই উপনিষদের প্রামাণ্য মানিয়া চলা উচিত বটে, কিন্তু এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা আপাততঃ অনেক বিরোধ দেখিতে পাই।

ভারতে বেদান্ত-প্রচার দ্বারাই সকল সম্প্রদায়ের সমন্বয় হইবে

অনেক সময় প্রাচীন বড় বড় ঋষিগণ পর্য্যন্ত উপনিষদ্‌সমূহের মধ্যে যে অপূর্ব্ব সমন্বয় রহিয়াছে, তাহা ধরিতে পারেন নাই। অনেক সময় মুনিগণ পর্য্যন্ত পরস্পর মতভেদহেতু বিবাদ করিয়াছেন। এই মতবিরোধ এই সময়ে এত বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, ইহা একটি চলিত বাক্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—যাহার মত অপর হইতে কিছু পৃথক নহে, সে মুনিই নহে—'নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।' কিন্তু এখন ওরূপ বিরোধে আর চলিবে না। এখন উপনিষদ্ মন্ত্রসমূহের মধ্যে গূঢ়রূপে যে

সমন্বয়ভাব রহিয়াছে, তাহার উত্তমরূপ ব্যাখ্যা ও প্রচার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সমন্বয় রহিয়াছে, তাহা জগতের সমক্ষে স্পষ্টরূপে দেখাইতে হইবে। শুধু ভারতের নয় সমগ্র জগতে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সামঞ্জস্য ভাব বিদ্যমান, তাহা দেখাইতে হইবে।

আর আমি ঈশ্বর কৃপায় এমন এক ব্যক্তির পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম, যাঁহার সমগ্র জীবনই উপনিষদের মহাসমন্বয়রূপ এতদ্বিধ ব্যাখ্যাস্বরূপ—যাঁহার উপদেশ অপেক্ষা জীবন সহস্রগুণে উপনিষদ্‌মন্ত্রের জীবন্ত ভাষ্যরূপ। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, উপনিষদের ভাবগুলি প্রকৃতপক্ষে যেন মানবরূপ ধরিয়া প্রকাশ হইয়াছে। সম্ভবতঃ সেই সমন্বয়ের ভাব আমার ভিতরেও কিছু আসিয়াছে। আমি জানি না, জগতের সমক্ষে উহা প্রকাশ করিতে পারিব কি না, কিন্তু বৈদান্তিক সম্প্রদায় সমুদয় যে পরস্পর বিরোধী নহে, উহারা যে পরস্পর সাপেক্ষ, একটি যেন অপরটির চরম পরিণতিস্বরূপ, একটি যেন অপরটির সোপানস্বরূপ এবং সর্ব্বশেষ চরম লক্ষ্য অদ্বৈত 'তত্ত্বমসি'তে পর্য্যবসান, ইহা দেখানই আমার জীবনব্রত।

সমন্বয়াচার্য্য মদীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেব

এমন সময় ছিল, যখন ভারতে কর্ম্মকাণ্ড প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিত। বেদের ঐ কর্ম্মকাণ্ডে অনেক উচ্চ উচ্চ আদর্শ ছিল সন্দেহ নাই, আমাদের বর্ত্তমান দৈনন্দিন কতকগুলি পূজার্চ্চনা এখনও ঐ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডানুসারে নিয়মিত হইয়া থাকে;

বৈদিক অপেক্ষা বৈদান্তিক নামই হিন্দুর অধিকতর উপযোগী

কিন্তু তথাপি বেদের কর্ম্মকাণ্ড ভারতভূমি হইতে প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের অনুশাসন অনুসারে আমাদের জীবন আজকাল খুব সামান্যই নিয়মিত হইয়া থাকে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা অনেকেই পৌরাণিক বা তান্ত্রিক। কোন কোন স্থলে ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ বৈদিক মন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন বটে; কিন্তু সে সকল স্থলেও উক্ত বৈদিক মন্ত্রগুলির ক্রমসন্নিবেশ অধিকাংশস্থলে বেদানুযায়ী নহে, তন্ত্র বা পুরাণানুযায়ী। অতএব বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের অনুবর্ত্তী এই অর্থে আমাদিগকে বৈদিক নামে অভিহিত করা আমার বিবেচনায় সঙ্গত বোধ হয় না। কিন্তু আমরা যে সকলে বৈদান্তিক, ইহা নিশ্চিত। হিন্দুনামে যাহারা পরিচিত, তাহাদিগকে বৈদান্তিক আখ্যা দিলে ভাল হয়। আর আমি তোমাদিগকে পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, দ্বৈতবাদী বা অদ্বৈতবাদী সকল সম্প্রদায়ই বৈদান্তিক নামে অভিহিত হইতে পারে।

ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মোটামুটি শ্রেণীবিভাগ—দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী

বর্ত্তমান কালে ভারতে যে সকল সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকে প্রধানতঃ দ্বৈত অদ্বৈত এই দুই প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহাদের অন্তর্গত কতকগুলি সম্প্রদায় যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতভেদের উপর অধিক ঝোঁক দেন এবং যাহাদের উপর নির্ভর করিয়া বিশুদ্ধাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি নূতন নূতন নাম গ্রহণ করিতে চান, তাহাতে বড় কিছু আসিয়া যায় না। মোটের উপর উহাদিগকে হয় দ্বৈতবাদী না হয়

অদ্বৈতবাদী এই দুই শ্রেণীর ভিতর ফেলিতে পারা যায়। আরও আধুনিক সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে কতকগুলি নূতন, অপরগুলি অতি প্রাচীন সম্প্রদায়সমূহের নূতন সংস্করণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। রামানুজের জীবন ও তাঁহার দর্শনকে পূর্ব্বোক্ত এক শ্রেণীর এবং শঙ্করাচার্য্যকে অপর শ্রেণীর প্রতিনিধি স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। রামানুজ অনতিপ্রাচীন ভারতের প্রধান দ্বৈতবাদী দার্শনিক, অন্যান্য দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়সমূহ সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে তাঁহার সমুদয় উপদেশের সারাংশ, এমন কি সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিয়মাবলী পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন। রামানুজ ও তাঁহার প্রচার-কার্য্যের সহিত ভারতের অন্যান্য দ্বৈতবাদী বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের তুলনা করিলে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবে, উহাদের পরস্পরের উপদেশ, সাধনপ্রণালী এবং সাম্প্রদায়িক নিয়মাবলীতে কতদূর সাদৃশ্য আছে। অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের আচার্য্য-প্রবর মধ্বমুনি এবং তাঁহার অনুবর্ত্তী আমাদের বঙ্গদেশের মহাপ্রভু চৈতন্যের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। চৈতন্যদেব মধ্বাচার্য্যের মতই বাঙ্গালা দেশে প্রচার করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে আরও কয়েকটি সম্প্রদায় আছে। যথা—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শৈব। সাধারণতঃ শৈবগণ অদ্বৈতবাদী; সিংহল এবং দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থান ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্র এই অদ্বৈতবাদী শৈব সম্প্রদায় বর্ত্তমান। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শৈবগণ 'বিষ্ণু' নামের পরিবর্ত্তে 'শিব' নাম বসাইয়াছে মাত্র, আর জীবাত্মার পরিণামবিষয়ক মতবাদ ব্যতীত অন্যান্য সর্ব্ববিষয়েই রামানুজমতাবলম্বী। রামানুজের মতানুবর্ত্তিগণ আত্মাকে অণু অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র বলিয়া থাকেন; কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের

অনুবর্ত্তিগণ তাঁহাকে বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী বলিয়া স্বীকার করেন। অদ্বৈতমতানুবর্ত্তী সম্প্রদায় প্রাচীনকালে অনেকগুলি ছিল। এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, প্রাচীনকালে এমন অনেক সম্প্রদায় ছিল, যাহাদিগকে শঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া নিজ সম্প্রদায়ের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে। কোন কোন বেদভাষ্যে বিশেষতঃ বিজ্ঞানভিক্ষু কৃত ভাষ্যে শঙ্করের উপর সময় সময় আক্রমণ দেখিতে পাওয়া যায়; এখানে বলা আবশ্যক, বিজ্ঞানভিক্ষু যদিও অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তথাপি শঙ্করের মায়াবাদ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এমন অনেক সম্প্রদায় ছিল বলিয়া স্পষ্টই বোধ হয়, যাহারা এই মায়াবাদ বিশ্বাস করিত না; এমন কি তাহারা শঙ্করকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' বলিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। তাহাদের ধারণা ছিল যে মায়াবাদ বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে লইয়া তিনি বেদান্তের ভিতর প্রবেশ করাইয়াছেন। যাহাই হউক, বর্ত্তমান কালে অদ্বৈতবাদিগণ সকলেই শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্ত্তী, আর শঙ্করাচার্য্য এবং তাঁহার শিষ্যগণ আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য উভয়ত্রই অদ্বৈতবাদ বিশেষরূপে প্রচার করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের প্রভাব আমাদের বাঙ্গালাদেশে এবং কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে বড় বিস্তৃত হয় নাই। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে স্মার্ত্তগণ সকলেই শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্ত্তী আর বারাণসী অদ্বৈতবাদের একটি কেন্দ্র বলিয়া আর্য্যাবর্ত্তের অনেক স্থলে ইহার প্রভাব বড় কম নহে।

এক্ষণে আর একটি কথা বুঝিতে হইবে যে, শঙ্কর ও রামানুজ কেহই নূতন তত্ত্বের আবিষ্কারক বলিয়া দাবি করেন নাই।

শঙ্কর বা রামানুজ কেহই নূতন তত্ত্বের আবিষ্কারক নহেন

রামানুজ স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, তিনি বোধায়নের ভাষ্যের অনুসরণ করিয়া তদনুসারেই বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "ভগবদ্বোধায়নকৃতাং বিস্তীর্ণাং ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিং পূর্ব্বাচার্য্যাঃ সংচিক্ষিপুঃ তন্মতানুসারেণ সূত্রাক্ষরাণি ব্যাখ্যাস্যন্তে", ইত্যাদি কথা তাঁহার ভাষ্যের প্রারম্ভেইআমরা দেখিতে পাই। বোধায়নের ভাষ্য আমার কখন দেখিবার সুযোগ হয় নাই। আমি সমগ্র ভারতে ইহার অন্বেষণ করিয়াছি, কিন্তু আমার অদৃষ্টে উক্ত ভাষ্যের দর্শনলাভ ঘটে নাই। পরলোকগত স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ব্যাসসূত্রের বোধায়নভাষ্য ব্যতীত অন্য কোন ভাষ্য মানিতেন না ; আর যদিও তিনি সুবিধা পাইলেই রামানুজের উপর কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই, কিন্তু তিনি কখনও বোধায়ন-ভাষ্য সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। রামানুজ কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, তিনি বোধায়নের ভাব, স্থানে স্থানে ভাষা পর্য্যন্ত লইয়া তাঁহার বেদান্তভাষ্য রচনা করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যও যে প্রাচীন ভাষ্যকারগণের গ্রন্থ অবলম্বনে তাঁহার ভাষ্য প্রণয়ন করেন, এইরূপ অনুমান করিবারও যথেষ্ট কারণ আছে। তাঁহার ভাষ্যের কয়েক স্থলে প্রাচীনতর ভাষ্যসমূহের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আরও, যখন তাঁহার গুরু এবং গুরুর গুরু, তিনি যে মতাবলম্বী, সেই অদ্বৈতমতাবলম্বী বৈদান্তিক ছিলেন বরং সময়ে সময়ে এবং কোন কোন বিষয়ে তাঁহা অপেক্ষা অদ্বৈততত্ত্বপ্রকাশে অধিক অগ্রসর ও সাহসী ছিলেন, তখন ইহা স্পষ্টই বোধ হয়, তিনিও বিশেষ কিছু নূতন জিনিষ প্রচার করেন

নাই। রামানুজ যেরূপ বোধায়নভাষ্য অবলম্বনে তদীয় ভাষ্য লিখিয়াছেন, শঙ্করও নিজ ভাষ্য রচনা তদ্রূপ করিয়াছিলেন; তবে কোন্ ভাষ্য অবলম্বনে তিনি উহা করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

তোমরা এই যে সকল দর্শনের কথা শুনিয়াছ বা দেখিয়াছ, উপনিষদ্ই তাহাদের সকলগুলিরই ভিত্তি। যখনই তাঁহারা শ্রুতির দোহাই দিয়াছেন তখনই তাঁহারা উপনিষদ্কে লক্ষ্য করিয়াছেন। ভারতের অন্যান্য দর্শনসমূহ উপনিষদ্ হইতে জন্মলাভ করিয়াছে বটে; কিন্তু ব্যাস-প্রণীত বেদান্তদর্শনের ন্যায় আর কোন দর্শনই ভারতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইতে পারে নাই। বেদান্তদর্শনও কিন্তু প্রাচীনতর সাংখ্যদর্শনের চরম পরিণতি মাত্র। আর সমগ্র ভারতের, এমন কি, সমগ্র জগতের সকল দর্শন ও সকল মতই কপিলের নিকট বিশেষ ঋণী। সম্ভবতঃ মনস্তত্ত্ব ও দার্শনিক বিষয়ে ভারতেতিহাসে কপিলের মত বড় লোক জন্মায় নাই। জগতে সর্ব্বত্রই কপিলের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে কোন সুপরিচিত দার্শনিকমত বিদ্যমান, সেইখানেই তাঁহার প্রভাব দেখিতে পাইবে। উহা সহস্রবর্ষ প্রাচীন হইতে পারে তথাপি তথায় সেই কপিলের—সেই তেজস্বী মহামহিমময় অপূর্ব্বপ্রতিভাসম্পন্ন কপিলের—প্রভাব দেখিতে পাইবে। তাঁহার মনোবিজ্ঞান ও তাঁহার দর্শনের অধিকাংশ অতি সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া ভারতের বিভিন্ন সকল সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের নিজ বঙ্গদেশে আমাদের নৈয়ায়িকগণ ভারতীয় দার্শনিক জগতের উপর বিশেষ

উপনিষদ্ ভারতীয় দর্শনসমূহের ভিত্তি

প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামান্য, বিশেষ, জাতি, দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি গুরুভার পারিভাষিক শব্দনিচয় (যাহা রীতিমত আয়ত্ত করিতে সমগ্র জীবন কাটিয়া যায়) লইয়াই বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহারা বৈদান্তিকদিগের উপর দর্শনালোচনার ভার দিয়া নিজেরা 'ন্যায়' লইয়া ব্যস্ত ছিলেন; কিন্তু আধুনিক কালে ভারতীয় সকল দার্শনিক সম্প্রদায়ই বঙ্গদেশীয় নৈয়ায়িকদিগেরবি চারপ্রণালী সম্বন্ধীয় পরিভাষা গ্রহণ করিয়াছেন। জগদীশ, গদাধর ও শিরোমণির নাম নদীয়ার ন্যায় মালাবার দেশেরও কোন কোন নগরে সুপরিচিত। এই ত গেল অন্যান্য দর্শনের কথা; ব্যাস প্রণীত বেদান্ত দর্শন কিন্তু ভারতে সর্ব্বত্র দৃঢ়প্রতিষ্ঠ আর উহার যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ প্রাচীন সত্যসমূহকে দার্শনিকভাবে বিবৃত করা, তাহা সাধন করিয়া উহা ভারতে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে। এই বেদান্ত দর্শনে যুক্তিকে সম্পূর্ণরূপে শ্রুতির অধীন করা হইয়াছে; শঙ্করাচার্য্যও একস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন, ব্যাস বিচারের চেষ্টা মোটেই করেন নাই, তাঁহার সূত্র প্রণয়নের একমাত্র উদ্দেশ্য—বেদান্তমন্ত্ররূপ পুষ্পসমূহকে এক সূত্রযোগে গাঁথিয়া একটি মালা প্রস্তুত করা। তাঁহার সূত্রগুলির প্রামাণ্য ততটুকু, যতটুকু তাহারা উপনিষদের অনুসরণ করিয়া থাকে; ইহার অধিক নহে।

ভারতের সকল সম্প্রদায়ই এক্ষণে এই ব্যাসসূত্রকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। আর এখানে যে কোন নূতন সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়, সেই সম্প্রদায়ই নিজ রুচি অনুযায়ী ব্যাসসূত্রের একটি নূতন ভাষ্য লিখিয়া সম্প্রদায়

পত্তন করে। সময় সময় এই ভাষ্যকারগণের মধ্যে অতিশয় প্রবল মতদ্বৈধ দেখা যায়। সময় সময় মূলের অর্থবিকৃতি অতিশয় বিরক্তিকর বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক সেই ব্যাসসূত্র এক্ষণে ভারতে প্রধান প্রামাণ্য গ্রন্থের আসন গ্রহণ করিয়াছে আর ব্যাসসূত্রের উপর একটি নূতন ভাষ্য না লিখিলে ভারতে কেহই সম্প্রদায় স্থাপনের আশা করিতে পারে না।

ব্যাসসূত্র

ব্যাসসূত্রের নীচেই জগদ্বিখ্যাত গীতার প্রামাণ্য। শঙ্করাচার্য্য গীতার প্রচার করিয়াই মহা গৌরবের ভাগী হইয়াছিলেন। এই মহাপুরুষ তাঁহার মহান্ জীবনে যে সকল বড় বড় কাজ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে গীতা প্রচার ও গীতার অতি সুন্দর একটি ভাষ্য প্রণয়ন অন্যতম। আর ভারতের সনাতন-পন্থাবলম্বী সকল সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতাগণই তাঁহার অনুসরণ করিয়া গীতার এক একটি ভাষ্য লিখিয়াছেন।

গীতা

উপনিষদ্ সংখ্যায় অনেক। কেহ কেহ বলেন ১০৮, কেহ আবার উহাদের সংখ্যা আরও অধিক বলিয়া থাকেন। উহাদের মধ্যে কতকগুলি স্পষ্ট আধুনিক। যথা আল্লোপনিষদ্। উহাতে আল্লার স্তুতি আছে এবং মহম্মদকে রজস্থল্লা বলা হইয়াছে। শুনিয়াছি, ইহা নাকি আকবরের রাজত্বকালে হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে মিলনসাধনের জন্য রচিত হইয়াছিল। সংহিতা ভাগে আল্লা বা ইল্লা বা এরূপ কোন শব্দ পাইয়া তদবলম্বনে এইরূপ উপনিষৎসমূহ রচিত হইয়াছে। এইরূপে এই আল্লোপনিষদে মহম্মদ রজস্থল্লা হইয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য যাহাই হউক, এই

উপনিষদ্-সংখ্যা—প্রামাণিক ও অপ্রামাণিক উপনিষদ্

জাতীয় আরও অনেকগুলি সাম্প্রদায়িক উপনিষদ্ আছে। স্পষ্টই বোধ হয়, উহারা সম্পূর্ণ আধুনিক আর এইরূপ উপনিষদ্ রচনা বড় কঠিনও ছিল না। কারণ, বেদের সংহিতা ভাগের ভাষা এত প্রাচীন যে, উহাতে ব্যাকরণের বড় বাঁধাবাঁধি ছিল না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার একবার বৈদিক ব্যাকরণ শিখিবার ইচ্ছা হয় এবং আমি অতি আগ্রহের সহিত পাণিনি ও মহাভাষ্য পড়িতে আরম্ভ করি। কিন্তু কিয়দ্দূর পাঠে অগ্রসর হইয়া দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে, বৈদিক ব্যাকরণের প্রধান ভাগ কেবল ব্যাকরণের সাধারণ বিধিসমূহের ব্যতিক্রম মাত্র। ব্যাকরণে একটি সাধারণ বিধি করা হইল, তার পরেই বলা হইল, বেদে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে। সুতরাং তোমরা দেখিতেছ, যে কোন ব্যক্তি যাহা কিছু লিখিয়া কত সহজে উহাকে বেদ বলিয়া প্রচার করিতে পারে। কেবল যাস্কের নিরুক্ত থাকাতেই একটু রক্ষা। কিন্তু হইাতে কতকগুলি একার্থক শব্দরাশির সন্নিবেশ আছে মাত্র। যেখানে এতগুলি সুযোগ, সেখানে তোমার যত ইচ্ছা খুশি উপনিষদ্ রচনা করিতে পার। একটু সংস্কৃত জ্ঞান যদি থাকে, তবে প্রাচীন বৈদিক শব্দের মত গুটিকতক শব্দ তৈয়ারী করিতে পারিলেই হইল। ব্যাকরণের ত আর কোন ভয় নাই, তখন রজস্মুল্লাই হউক বা যে কোন সুল্লাই হউক, তুমি উহাতে অনায়াসে ঢুকাইতে পার। এইরূপে অনেক নূতন উপনিষদ্ রচিত হইয়াছে, আর শুনিয়াছি, এখনও হইতেছে। আমি নিশ্চিতরূপে জানি ভারতের কোন কোন প্রদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও এরূপে নূতন উপনিষদ্ রচনা হইতেছে। কিন্তু এমন কতকগুলি উপনিষদ্

আছে, সেগুলি স্পষ্টই খাঁটি জিনিস বলিয়া বোধ হয়। শঙ্কর, রামানুজ ও অন্যান্য বড় বড় ভাষ্যকারেরা সেইগুলির উপর ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।

এই উপনিষদের আর দুই একটি তত্ত্ব সম্বন্ধে আমি তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি, কারণ, উপনিষৎসমূহ অনন্ত জ্ঞানের সমুদ্র, আর আমার ন্যায় একজন অযোগ্য ব্যক্তিরও উহার সকল তত্ত্ব বলিতে গেলে বছর বছর কাটিয়া যাইবে, একটি বক্তৃতায় কিছুই হইবে না। এই কারণে উপনিষদের আলোচনায় যে সকল বিষয় আমার মনে উদিত হইয়াছে, তন্মধ্যে দুই একটি বিষয় মাত্র তোমাদের নিকট বলিতে চাই। প্রথমতঃ, জগতে ইহার ন্যায় অপূর্ব্ব কাব্য আর নাই। বেদের সংহিতাভাগ আলোচনা করিয়া দেখিলে তাহাতেও স্থানে স্থানে অপূর্ব্ব কাব্য-সৌন্দর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ ঋগ্বেদ সংহিতার 'নাসদীয় সূক্তের' বিষয় আলোচনা কর। উহার মধ্যে প্রলয়ের গভীর অন্ধকারবর্ণনাত্মক সেই শ্লোক আছে—"তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে" ইত্যাদি। "যখন অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল।" এটি পড়িলেই অনুভব হয় যে, ইহাতে কবিত্বের অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য নিহিত রহিয়াছে। তোমরা কি ইহা লক্ষ্য করিয়াছ যে, ভারত-বহির্ভূত প্রদেশে এবং ভারতের অভ্যন্তরেও গম্ভীর ভাবের চিত্র অঙ্কিত করিবার অনেক চেষ্টা হইয়াছে? ভারতবহির্ভূত প্রদেশে এই চেষ্টা সর্ব্বদাই জড় প্রকৃতির অনন্ত ভাবের বর্ণনার আকার ধারণ করিয়াছে—কেবল অনন্ত বহিঃপ্রকৃতি, অনন্ত জড়, অনন্ত

উপনিষদ্ অপূর্ব্ব কাব্য-স্বরূপ

দেশের বর্ণনা। যখনই মিল্‌টন বা দান্তে বা অপর কোন প্রাচীন বা আধুনিক বড় ইউরোপীয় কবি অনন্তের চিত্র অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তখনই তিনি তাঁহার কবিত্বপক্ষসহায়ে আপনার বহির্দ্দেশে সুদূর আকাশে বিচরণ করিয়া অনন্ত বহিঃপ্রকৃতির কিঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ চেষ্টা এখানেও হইয়াছে বেদসংহিতায় এই বহিঃপ্রকৃতির অনন্ত বিস্তার যেরূপ অপূর্ব্ব ভাবে চিত্রিত হইয়া পাঠকবর্গের সমক্ষে স্থাপিত হইয়াছে, আর কোথাও এরূপ দেখিতে পাইবে না। সংহিতার এই "তম আসীৎ তমসা গূঢ়ং" বাক্যটি স্মরণ রাখিয়া তিন জন বিভিন্ন কবির অন্ধকারের বর্ণনার পরস্পর তুলনা করিয়া দেখ। আমাদের কালিদাস বলিয়াছেন, "সূচীভেদ্য অন্ধকার", মিল্‌টন বলিতেছেন, "আলোক নাই, দৃশ্যমান অন্ধকার।" কিন্তু ঋগ্বেদসংহিতা বলিতেছেন, "অন্ধকার অন্ধকারের দ্বারা আবৃত, অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকার লুক্কায়িত।" গ্রীষ্মপ্রধানদেশবাসী আমরা ইহা সহজেই বুঝিতে পারি। যখন হঠাৎ নূতন বর্ষাগম হয়, তখন সমস্ত দিগ্বলয় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠে এবং সঞ্চরণশীল শ্যাম জলদজাল ক্রমশঃ অন্য জলদজালকে আচ্ছন্ন করিতে থাকে। যাহা হউক, সংহিতার এই কবিত্ব অতি অপূর্ব্ব বটে, কিন্তু এখানেও বহিঃ-প্রকৃতির বর্ণনার চেষ্টা। অন্যত্র যেমন বহিঃপ্রকৃতির বিশ্লেষণবলে মানবজীবনের মহান্ সমস্যাসমূহের সমাধানের চেষ্টা হইয়াছে, এখানেও ঠিক তাহাই হইয়াছিল। প্রাচীন গ্রীক বা আধুনিক ইউরোপীয় যেমন জীবনসমস্যা এবং জগৎকারণীভূত বস্তু সম্বন্ধীয় পারমার্থিক তত্ত্ব সমাধানমানসে বহিঃপ্রকৃতির দিকে ধাবমান

হইয়াছিলেন, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণও তাহাই করিয়াছিলেন, আর ইউরোপীয়গণের ন্যায় তাঁহারাও বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্যজাতি এ বিষয়ে আর কিছু চেষ্টা করিল না; যেখানে ছিল, সেইখানেই পড়িয়া রহিল। বহির্জ্জগতে জীবন মরণের মহা সমস্যাসমূহের সিদ্ধান্ত লাভের চেষ্টায় বিফলমনোরথ হইয়া তাহারা আর অগ্রসর হইল না; আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণও ইহা অসম্ভব বলিয়া জানিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা এই সমস্যা-সমাধানে ইন্দ্রিয়গণের সম্পূর্ণ অক্ষমতা জগতের সমক্ষে নির্ভীকভাবে প্রকাশ করিলেন। উপনিষদ্ নির্ভীকভাবে বলিলেন :—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" তৈত্তি ২।৯

"ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি।,' কেন ১।৩

"মনের সহিত বাক্য তাঁহাকে না পাইয়া যথা হইতে ফিরিয়া আসে।"

"সেখানে চক্ষুও যাইতে পারে না, বাক্যও যাইতে পারে না।"

এইরূপ ও এতদ্রূপ বহুবিধ বাক্যের দ্বারা সেই মহা সমস্যা-সমাধানে ইন্দ্রিয়গণের সম্পূর্ণ অক্ষমতার কথা তাঁহারা ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা এই পর্য্যন্ত বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই; তাঁহারা বহিঃপ্রকৃতি ছাড়িয়া অন্তঃপ্রকৃতির উপর পড়িলেন। তাঁহারা এই প্রশ্নের উত্তর লাভ করিবার জন্য তাঁহাদের নিজ আত্মা সমীপে গমন করিলেন, তাঁহারা অন্তর্ম্মুখী হইলেন, তাঁহারা বুঝিলেন, প্রাণহীন জড় হইতে তাঁহারা কখনই সত্য লাভ করিতে পারিবেন না। তাঁহারা দেখিলেন, বহিঃপ্রকৃতিকে প্রশ্ন করিয়া কোন উত্তর পাওয়া যায় না, বহিঃপ্রকৃতি তাঁহাদিগকে কোন

আশাবাণী শুনায় না, সুতরাং তাঁহারা উহা হইতে সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা বৃথা জানিয়া বহিঃপ্রকৃতিকে ছাড়িয়া সেই জ্যোতির্ম্ময় জীবাত্মার দিকে ফিরিলেন—তথায় তাঁহারা উত্তর পাইলেন।

"তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ।"

মুণ্ডক ২।২।৫

"একমাত্র সেই আত্মাকেই অবগত হও, আর সমস্ত বৃথা বাক্য পরিত্যাগ কর।"

তাঁহারা আত্মাতেই সকল সমস্যার সমাধান পাইলেন; তাঁহারা এই আত্মতত্ত্বের আলোচনা করিয়াই বিশ্বেশ্বর পরমাত্মাকে এবং জীবাত্মার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ, তাঁহার প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য এবং এতদবলম্বনে আমাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ, এই সমুদায় অবগত হইলেন। আর এই আত্মতত্ত্বের বর্ণনার ন্যায় জগতের মধ্যে গাম্ভীর্য্যপূর্ণ কবিতা আর নাই। জড়ের ভাষায় এই আত্মাকে চিত্রিত করিবার চেষ্টা আর রহিল না। এমন কি, তাঁহারা আত্মার বর্ণনায় নির্দ্দিষ্টগুণবাচক শব্দ একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। তখন আর অনন্তের ধারণা করিবার জন্য ইন্দ্রিয়ের সহায়তা লাভের চেষ্টা রহিল না। বাহ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অচেতনমৃত জড়ভাবাপন্ন অবকাশরূপ অনন্তের বর্ণনা লোপ পাইল; তৎপরিবর্ত্তে আত্মতত্ত্ব এমন ভাষায় বর্ণিত হইতে লাগিল যে, উপনিষদের সেই শব্দগুলির উচ্চারণ মাত্রেই যেন এক সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় রাজ্যে অগ্রসর করিয়া দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই অপূর্ব্ব শ্লোকটির কথা স্মরণ কর।

উপনিষদে জগৎ-সমস্যার সমাধান বহিঃপ্রকৃতি হইতে নহে অন্তর্জ্জগতের বিশ্লেষণে, 'নেতি' 'নেতি' বিচারে

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥" মুণ্ডক ২।২।১০

জগতে আর কোন্ কবিতা ইহা অপেক্ষা গম্ভীরভাবদ্যোতক?

"তথায় সূর্য্য কিরণ দেয় না, চন্দ্র-তারাও নহে, এই বিদ্যুৎ তাঁহাকে আলোকিত করিতে পারে না, এই মর্ত্ত্য অগ্নির আর কথা কি?"

এইরূপ কবিতা আর কোথাও পাইবে না। সেই অপূর্ব্ব কঠোপনিষদের কথা ধর। এই কাব্যটি কি অপূর্ব্ব ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। ইহাতে কি অপূর্ব্ব শিল্পকৌশল প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার আরম্ভই অপূর্ব্ব! সেই বালক নচিকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধার আবির্ভাব, তাহার যমসদনে গমনেচ্ছা আর সেই 'আশ্চর্য্য' তত্ত্ববক্তা স্বয়ং যম তাহাকে জন্ম-মৃত্যুরহস্যের উপদেশ দিতেছেন! আর বালক তাঁহার নিকট কি জানিতে চাহিতেছে?—মৃত্যুরহস্য।

উপনিষদের উপদেশ ব্যক্তিবিশেষের জীবনের উপর নির্ভর করে না

উপনিষদ্ সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা, যাহাতে তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই, তাহা এই—উহারা কোন ব্যক্তিবিশেষের শিক্ষা নহে। যদিও আমরা উহাতে অনেক আচার্য্য ও বক্তার নাম পাইয়া থাকি বটে; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কাহারও বাক্যের উপর উপনিষদের প্রামাণ্য নির্ভর করে না। একটি মন্ত্রও তাঁহাদের কাহারও জীবনেরউপর নির্ভর করে না। এই সকল আচার্য্য ও বক্তা যেন ছায়ামূর্ত্তির ন্যায় রঙ্গমঞ্চের পশ্চাদ্ভাগে

রহিয়াছেন। তাঁহাদিগকে কেহ যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে না, তাঁহাদের সত্তা যেন কেহ স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছে না, কিন্তু প্রকৃত শক্তি রহিয়াছে উপনিষদের সেই অপূর্ব্ব মহিমময় জ্যোতির্ম্ময় তেজোময় মন্ত্রগুলির ভিতর—ব্যক্তিবিশেষের সহিত উহাদের যেন কোন সম্পর্ক নাই। বিশ জন যাজ্ঞবল্ক্য আসুন যান—কোনও ক্ষতি নাই, মন্ত্রগুলি ত রহিয়াছে। তথাপি উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের বিরোধী নহে। জগতে প্রাচীনকালে যে কোনও মহাপুরুষ বা আচার্য্যের অভ্যুদয় হইয়াছে বা ভবিষ্যতে হইবে, উহার বিশাল ও উদার বক্ষে তাঁহাদের সকলেরই স্থান হইতে পারে।

কিন্তু উহা ব্যক্তি বিশেষ উপাসনার বিরোধী নহে

উপনিষদ্ অবতার বা মহাপুরুষগণের পূজার বিরোধী নহে, বরং উহার স্বপক্ষ। অপরদিকে আবার উহা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিনিরপেক্ষ। উপনিষদের ঈশ্বর যেমন নির্গুণ অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের অতীত তত্ত্ব মাত্রেরই বিশেষ ভাবে সমর্থক, তদ্রূপ সমগ্র উপনিষদ্ই ব্যক্তিনির-পেক্ষতারূপ অপূর্ব্ব তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞানী, চিন্তাশীল, দার্শনিক ও যুক্তিবাদিগণ উহা হইতে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের ওজনেই ব্যক্তি নিরপেক্ষ তত্ত্বমাত্র পাইতে পারেন।

আর ইহাই আমাদের শাস্ত্র। তোমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, খ্রীষ্টিয়ানগণের পক্ষে যেমন বাইবেল, মুসলমানের পক্ষে যেমন কোরাণ, বৌদ্ধদের যেমন ত্রিপিটক, পার্শীদের যেমন জেন্দাবেস্তা, আমাদের পক্ষেও সেইরূপ উপনিষদ্। এইগুলিই আমাদের শাস্ত্র, অপর কিছু নহে। পুরাণ, তন্ত্র ও অন্যান্য সমুদয় গ্রন্থ এমন কি ব্যাসসূত্র পর্য্যন্ত প্রামাণ্য বিষয়ে গৌণ মাত্র,

আমাদের মুখ্য প্রমাণ বেদ। মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্র ও পুরাণ প্রভৃতি যতটুকু উপনিষদের সহিত মিলে, ততটুকুই গ্রহণ করিতে হইবে; যেখানে উভয়ের বিরোধ হইবে, সেখানে স্মৃত্যাদির প্রমাণকে নির্দ্দয়ভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমাদিগকে এই বিষয়টি সর্ব্বদা স্মরণ করিতে হইবে। কিন্তু ভারতের দুরদৃষ্ট-ক্রমে আমরা বর্ত্তমানকালে ইহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। সামান্য সামান্য গ্রাম্য আচার এক্ষণে উপনিষদের উপদেশের স্থলাভিষিক্ত হইয়া প্রমাণ স্বরূপ হইয়াছে। বাঙ্গালার কোন সুদূর পল্লীগ্রামে হয় ত কোন বিশেষ আচার ও মত প্রচলিত, সেইটি যেন বেদবাক্য, এমন কি তাহা হইতেও অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর "সনাতন-মতাবলম্বী" এই কথাটির কি অদ্ভুত প্রভাব! একজন গ্রাম্যলোকের নিকট—কর্ম্মকাণ্ডের সমুদয় বিশেষ বিশেষ নিয়মগুলি একটিও বাদ না দিয়া যে পালন করে, সেই খাঁটি সনাতন-পথাবলম্বী, আর যে না করে সে হিন্দুই নয়। অতি দুঃখের বিষয় যে, আমার মাতৃ-ভূমিতে অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা কোন তন্ত্রবিশেষ অবলম্বন করিয়া সর্ব্বসাধারণকে সেই তন্ত্রমতানুসারে চলিতে উপদেশ দেন। যে না চলে, সে তাহার মতে খাঁটি হিন্দু নয়। সুতরাং আমাদের পক্ষে এখন এইটি স্মরণ রাখা বিশেষ আবশ্যক যে, উপনিষদ্‌ই মুখ্য প্রমাণ, গৃহ্য ও শ্রৌত সূত্র পর্য্যন্ত বেদ প্রমাণের অধীন। এই উপনিষদ্ আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিগণের বাক্য আর যদি তোমরা হিন্দু হইতে চাও, তবে তোমাদিগকে উহা

উপনিষদ্‌ই আমাদের প্রামাণ্য শাস্ত্র—অন্যান্য শাস্ত্রের প্রামাণ্য উপনিষদ্ প্রমাণের অধীন

বিশ্বাস করিতেই হইবে। তোমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে যা খুশি তাই বিশ্বাস করিতে পার, কিন্তু বেদের প্রামাণ্য স্বীকার না করিলে তোমরা নাস্তিক। খ্রীষ্টিয়ান, বৌদ্ধ বা অন্যান্য শাস্ত্র হইতে আমাদের শাস্ত্রের এইটুকু পার্থক্য। ঐগুলিকে শাস্ত্র আখ্যা না দিয়া পুরাণ বলাই উচিত। কারণ, উহাতে জলপ্লাবনের ইতিহাস, রাজা ও রাজবংশীয়গণের ইতিহাস, মহাপুরুষগণের জীবনচরিত প্রভৃতি বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এগুলি পুরাণের লক্ষণ, সুতরাং যতটা বেদের সহিত মিলে, উহাদের মধ্যে ততটাই গ্রাহ্য। বাইবেল ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র যতটা বেদের সহিত মিলে ততটা গ্রাহ্য, কিন্তু যেখানে না মিলে, সেখানটা মানিবার প্রয়োজন নাই। কোরাণ সম্বন্ধেও এই কথা। এই সকল গ্রন্থে অনেক নীতি উপদেশ আছে; সুতরাং বেদের সহিত উহাদের যতটা ঐক্য হয়, ততটা পুরাণবৎ প্রামাণ্য, অবশিষ্টাংশ পরিত্যাজ্য।

বেদের অনৈতিহাসিকত্বই উহার সত্যতার প্রমাণ

বেদ সম্বন্ধে আমাদের এই বিশ্বাস আছে যে, বেদ কখনও লিখিত হয় নাই, বেদের উৎপত্তি নাই। জনৈক খ্রীষ্টিয়ান মিশনরী আমাকে এক সময় বলিয়াছিল, তাহাদের বাইবেল ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর স্থাপিত, অতএব সত্য। তাহাতে আমি উত্তর দিয়াছিলাম, আমাদের শাস্ত্রের ঐতিহাসিক ভিত্তি কিছুই নাই বলিয়া উহা সত্য। তোমাদের শাস্ত্র যখন ঐতিহাসিক, তখন নিশ্চয়ই কিছুদিন পূর্ব্বে উহা কোন মনুষ্য দ্বারা রচিত হইয়াছিল। তোমাদের শাস্ত্র মনুষ্যপ্রণীত, আমাদের নহে। আমাদের শাস্ত্রের

অনৈতিহাসিকতাই উহার সত্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বেদের সহিত আজকালকার অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের এই সম্বন্ধ।

উপনিষদে যে সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে এক্ষণে আমরা আলোচনা করিব। উহাতে নানাবিধ ভাবের শ্লোক দেখা যায়। কোন কোনটি সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদাত্মক। দ্বৈতবাদাত্মক বলিলে আমি কি লক্ষ্য করিতেছি? কতকগুলি বিষয়ে ভারতের সকল সম্প্রদায় একমত। প্রথমতঃ সকল সম্প্রদায়ই সংসারবাদ বা পুনর্জ্জন্মবাদ স্বীকার করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ, মনস্তত্ত্ববিজ্ঞানও সকল সম্প্রদায়ের একরূপ। প্রথমতঃ এই স্থূলশরীর, তৎপশ্চাতে সূক্ষ্মশরীর বা মন। জীবাত্মা সেই মনেরও পারে। পাশ্চাত্য ও ভারতীয় মনোবিজ্ঞানে এইটি বিশেষ প্রভেদ যে, পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে মন ও জীবাত্মার কিছু প্রভেদ করা হয় নাই, কিন্তু এখানে তাহা নহে। ভারতীয় মনোবিজ্ঞান মতে মন বা অন্তঃকরণ যেন জীবাত্মার হস্তে যন্ত্রস্বরূপ। ঐ যন্ত্রসাহায্যে উহা শরীর অথবা বাহ্য জগতের উপর কার্য্য করিয়া থাকে। এই বিষয়ে সকলেই একমত। আরও সকল সম্প্রদায়ই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, জীবাত্মা অনাদি অনন্ত। যতদিন না সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করিতেছেন, ততদিন তাঁহার পুনঃ পুনঃ জন্ম হয়।

উপনিষদের মুখ্য মতবাদসমূহ

আর একটি মুখ্য বিষয়ে সকলেরই এক মত, আর ইহাই ভারতীয় ও পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর মৌলিক প্রভেদ যে, তাঁহারা জীবাত্মাতে পূর্ব্ব হইতেই সকল শক্তি অবস্থিত স্বীকার করিয়া থাকেন। ইনস্‌পিরেশন (inspiration) শব্দ দ্বারা ইংরাজীতে

যে ভাব প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহাতে বুঝায়, যেন বাহির হইতে কিছু আসিতেছে; কিন্তু আমাদের শাস্ত্রানুসারে সকল শক্তি, সর্ব্ববিধ মহত্ব ও পবিত্রতা আত্মার মধ্যেই বিদ্যমান রহিয়াছে। যোগীরা তোমাকে বলিবেন, অণিমা লঘিমা প্রভৃতি সিদ্ধি যাহা তিনি লাভ করিতে চাহেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে লাভ করিবার নহে, তাহারা পূর্ব্ব হইতেই আত্মাতে বিদ্যমান, তাহাদিগকে ব্যক্ত করিতে হইবে মাত্র। পতঞ্জলির মতে তোমার পদতলচারী অতি ক্ষুদ্রতম কীটে পর্য্যন্ত অষ্টসিদ্ধি রহিয়াছে; কেবল তাহার দেহরূপ আধারের অনুপযুক্ততা হেতু উহারা প্রকাশিত হইতে পারিতেছে না। উৎকৃষ্টতর শরীর পাইলেই সেই শক্তিগুলি প্রকাশিত হইবে, কিন্তু উহারা পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল। তিনি তাঁহার সূত্রের এক স্থলে বলিয়াছেন, "নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ" ৪।৩। যেমন কৃষককে তাহার ক্ষেত্রে জল আনিতে হইলে কেবল তাহাকে তাহার ক্ষেত্রে আল ভাঙ্গিয়া দিয়া নিকটস্থ জলপ্রণালীর সহিত উহার যোগ করিয়া দিতে হয়, তাহা হইলে জল যেমন তাহার নিজ বেগে আসিয়া উপস্থিত হয়, তদ্রূপ জীবাত্মাতে সকল শক্তি, পূর্ণতা ও পবিত্রতা পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান, কেবল মায়াবরণের দ্বারা উহা প্রকাশিত হইতে পারিতেছে না। একবার এই আবরণ অপসারিত হইলে আত্মা তাঁহার স্বাভাবিক পবিত্রতা লাভ করেন এবং তাঁহার শক্তিসমূহ জাগরিত হইয়া উঠে। তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর ইহাই বিশেষ পার্থক্য। পাশ্চাত্যগণ এই ভয়ানক

আত্মাতে পূর্ব্ব হইতেই সকল শক্তি অবস্থিত

মত শিখাইয়া থাকে যে, আমরা সকলেই জন্মপাপী। আর যাহারা এইরূপ ভয়াবহ মতসমূহে বিশ্বাস করিতে পারে না, তাহাদের প্রতি অতিশয় বিদ্বেষ পোষণ করিয়া থাকে। তাহারা কখনও ইহা ভাবিয়া দেখে না, যদি আমরা স্বভাবতঃ মন্দই হই তবে আর আমাদের ভাল হইবার আশা নাই, কারণ, প্রকৃতি কখন পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। 'প্রকৃতির পরিবর্ত্তন'—এই বাক্যটি স্ববিরোধী। যাহার পরিবর্ত্তন হয়, তাহাকে আর প্রকৃতি বলা যায় না। এই বিষয়টি আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। এই বিষয়ে দ্বৈতবাদী অদ্বৈতবাদী এবং ভারতের সকল সম্প্রদায় একমত।

পাশ্চাত্যমত উহার সম্পূর্ণ বিপরীত—'আমরা জন্মপাপী'

ভারতের আধুনিক সকল সম্প্রদায় আর এক বিষয়ে একমত—ঈশ্বরের অস্তিত্ব। অবশ্য ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা, সকল সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন। দ্বৈতবাদীরা সগুণ—কেবল সগুণ ঈশ্বরই বিশ্বাস করিয়া থাকেন। আমি এই সগুণ কথাটি তোমাদিগকে আর একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে চাই। এই সগুণ বলিতে দেহধারী সিংহাসনোপবিষ্ট জগৎশাসনকারী পুরুষবিশেষকে বুঝায় না। সগুণ অর্থে গুণযুক্ত। শাস্ত্রে এই সগুণ ঈশ্বরের বর্ণনা অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। আর সকল সম্প্রদায়ই এই জগতের শাস্তা, স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা স্বরূপ সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করিয়া থাকেন। অদ্বৈতবাদীরা এই সগুণ ঈশ্বরের উপর আরও কিছু অধিক বিশ্বাস করিয়া থাকেন। তাঁহারা এই সগুণ ঈশ্বরের

ভারতীয় সকল সম্প্রদায়ের ঈশ্বরধারণা বিভিন্ন হইলেও সকলেই ঈশ্বরে বিশ্বাসী

উচ্চতর অবস্থাবিশেষে বিশ্বাসী—উহাকে সগুণ-নির্গুণ নাম দেওয়া যাইতে পারে। যাঁহার কোন গুণ নাই, তাঁহাকে কোন বিশেষণের দ্বারা বর্ণনা করা অসম্ভব। আর অদ্বৈতবাদী তাঁহার প্রতি সৎ চিৎ আনন্দ ব্যতীত অন্য কোন বিশেষণ দিতে প্রস্তুত নন। শঙ্কর ঈশ্বরকে সচ্চিদানন্দ বিশেষণে বিশিষ্ট করিয়াছেন কিন্তু উপনিষৎ-সমূহে ঋষিগণ আরও অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন, নেতি, নেতি অর্থাৎ ইহা নহে, ইহা নহে। যাহাই হউক, সকল সম্প্রদায়ই ঈশ্বরের অস্তিত্ব-স্বীকারে একমতাবলম্বী।

এক্ষণে দ্বৈতবাদীদের মত একটু আলোচনা করিব। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি রামানুজকে দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়সমূহের বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিস্বরূপ গ্রহণ করিব। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, বঙ্গদেশের লোক ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বড় বড় ধর্ম্মাচার্য্যগণ সম্বন্ধে অতি অল্পই সংবাদ রাখেন; আর সমগ্র মুসলমান রাজত্বকালে এক আমাদের চৈতন্য ব্যতীত সকল বড় বড় ধর্ম্মাচার্য্যগণই দাক্ষিণাত্যে জন্মিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যবাসীর মস্তিষ্কই এক্ষণে প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ভারত শাসন করিতেছে। কারণ, চৈতন্যও দাক্ষিণাত্যেরই সম্প্রদায়বিশেষভুক্ত (মধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়ভুক্ত) ছিলেন। যাহা হউক, রামানুজের মতে নিত্য পদার্থ তিনটি—ঈশ্বর, জীবাত্মা ও জড়প্রপঞ্চ। জীবাত্মাসকল নিত্য আর নিত্যকালই পরমাত্মা হইতে তাহাদের পার্থক্য থাকিবে, তাহাদের স্বতন্ত্রত্বের কথন লোপ হইবে না। রামানুজ বলেন, তোমার আত্মা আমার আত্মা হইতে চিরকালই পৃথক্ থাকিবে। আর এই জড়প্রপঞ্চ—এই

রামানুজের মত

প্রকৃতিও চিরকালই পৃথক্‌রূপেই বিদ্যমান থাকিবে। তাঁহার মতে জীবাত্মা ও ঈশ্বর যেমন সত্য, জড় প্রপঞ্চও তদ্রূপ। ঈশ্বর সকলের অন্তর্য্যামী আর এই অর্থে রামানুজ স্থানে স্থানে পরমাত্মাকে জীবাত্মার সহিত অভিন্ন—জীবাত্মার সারভূত পদার্থ—বলিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রলয়কালে যখন সমগ্র জগৎ সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয়, তখন জীবাত্মাসকলও সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইয়া কিছুদিন তদ্রূপ ভাবে অবস্থান করে। পরকল্পের প্রারম্ভে আবার তাহারা বাহির হইয়া তাহাদের পূর্ব্ব কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে। রামানুজের মতে যে কোন কার্য্যের দ্বারা আত্মার স্বাভাবিক পবিত্রতা ও পূর্ণত্বের সঙ্কোচ হয়, তাহাই অসৎকর্ম্ম, আর যাহার দ্বারা উহার বিকাশ হয়, তাহাই সৎকার্য্য। যাহাতে আত্মার বিকাশের সহায়তা করে তাহাই ভাল, আর যাহাতে উহার সঙ্কোচের সহায়তা করে, তাহাই মন্দ। এইরূপে আত্মার কখন সঙ্কোচ কখন বিকাশ হইতেছে, অবশেষে ঈশ্বর কৃপায় মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। আর রামানুজ বলেন, যাহারা শুদ্ধস্বভাব আর ঐ ভগবৎকৃপালাভের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে, তাহারাই উহা লাভ করে।

শ্রুতিতে একটি প্রসিদ্ধ বাক্য আছে, "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ"। "যখন আহার শুদ্ধ হয় তখন সত্ত্ব শুদ্ধ হয়, আর সত্ত্ব শুদ্ধ হইলে স্মৃতি অর্থাৎ ঈশ্বরস্মরণ (অথবা অদ্বৈতবাদীর মতে নিজ পূর্ণতার স্মৃতি) অচল ও স্থায়ী হয়।" এই বাক্যটি লইয়া ভাষ্যকারদিগের মধ্যে মহা বিবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ কথা এই—এই সত্ত্ব শব্দের অর্থ কি। আমরা জানি, সাংখ্যদর্শন

রামানুজ ও আহারশুদ্ধি

মতে—আর ভারতীয় সকল দর্শন-সম্প্রদায়ই একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, এই দেহ ত্রিবিধ উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছে—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। সাধারণ লোকের ধারণা এই, ঐ তিনটি গুণ; কিন্তু তাহা নহে; উহারা জগতের উপাদান-কারণস্বরূপ। আর আহার শুদ্ধ হইলে এই সত্ত্ব পদার্থ নির্ম্মল হইবে। বিশুদ্ধ সত্ত্ব লাভ করাই বেদান্তের একমাত্র কথা। আমি তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জীবাত্মা স্বভাবতঃ পূর্ণ ও শুদ্ধস্বরূপ আর বেদান্ত মতে উহা রজঃ ও তমঃ পদার্থদ্বয়দ্বারা আবৃত। সত্ত্ব পদার্থ অতিশয় প্রকাশস্বভাব আর যেমন আলোক সহজেই কাচকে ভেদ করে, তদ্রূপ আত্মচৈতন্যও সহজেই সত্ত্বপদার্থকে ভেদ করিয়া থাকে। অতএব যদি রজঃ ও তমঃ গিয়া কেবল সত্ত্ব দ্রব্য অবশিষ্ট থাকে, তবে জীবাত্মার শক্তি ও বিশুদ্ধত্ব প্রকাশিত হইবে, ও তিনি তখন অধিক পরিমাণে ব্যক্ত হইবেন। অতএব এই সত্ত্ব লাভ করা অত্যাবশ্যক। আর শ্রুতি এই সত্ত্বলাভের উপায়স্বরূপ বলিয়াছেন, "আহার শুদ্ধ হইলে সত্ত্ব শুদ্ধ হয়।" রামানুজ এই আহার শব্দ খাদ্য অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন, আর ইহা তিনি তাঁহার দর্শনের একটি প্রধান অবলম্বনস্তম্ভস্বরূপ করিয়াছেন; শুধু তাহাই নহে, সমগ্র ভারতের সকল সম্প্রদায়েই এই মতের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব এখানে আহার শব্দের অর্থ কি, এইটি আমাদিগকে বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে। কারণ, রামানুজের মতে এই আহারশুদ্ধি আমাদের জীবনের একটি অত্যাবশ্যক বিষয়। রামানুজ বলিতেছেন, খাদ্য তিন কারণে অশুদ্ধ হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, জাতিদোষ; খাদ্যের জাতি অর্থাৎ প্রকৃতিগত

দোষ। যথা, পেঁয়াজ রসুন প্রভৃতি স্বভাবতঃই অশুদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ, আশ্রয়দোষ—যে ব্যক্তির হাত হইতে খাওয়া যায়, সে ব্যক্তিকে আশ্রয় কহে। সে মন্দ লোক হইলে সেই খাদ্যও দুষ্ট হইয়া থাকে। আমি ভারতে এমন অনেক মহাত্মা নিজে দেখিয়াছি, যাঁহারা সারা জীবন ঠিক ঠিক এই উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য, তাঁহাদের এ ক্ষমতা ছিল, তাঁহারা যে ব্যক্তি খাদ্য আনিয়াছে, এমন কি, যে স্পর্শ করিয়াছে, তাহার গুণদোষ বুঝিতে পারিতেন, আর আমি নিজ জীবনে একবার নয়, শত শতবার ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তৃতীয়তঃ নিমিত্তদোষ—খাদ্যদ্রব্যে কেশ, কীট, আবর্জ্জনাদি কিছু পড়িলে তাহাকে খাদ্যের নিমিত্তদোষ বলে।

আমাদিগকে এক্ষণে এই শেষ দোষটি নিবারণের বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। ভারতে আহারে এই দোষটি বিশেষভাবে প্রবেশ করিয়াছে। এই ত্রিবিধদোষনির্ম্মুক্ত খাদ্য আহার করিতে পারিলে সত্ত্বশুদ্ধি হইবে।

তবে ত ধর্ম্মটা বড় সোজা ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল! যদি বিশুদ্ধ খাদ্য খাইলেই ধর্ম্ম হয়, তবে সকলেই ত ইহা করিতে পারে। জগতে এমন কে দুর্ব্বল বা অক্ষম লোক আছে, যে আপনাকে এই দোষসমূহ হইতে মুক্ত করিতে না পারে? অতএব শঙ্করাচার্য্য এই আহার শব্দের কি অর্থ করিয়াছেন, দেখা যাউক। শঙ্করাচার্য্য বলেন, 'আহার' শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়দ্বারা মনের মধ্যে যে চিন্তারাশি আহৃত হয়। উহা নির্ম্মল হইলে সত্ত্ব নির্ম্মল হইবে, তাহার পূর্ব্বে নহে। তুমি যাহা ইচ্ছা খাইতে পার। যদি কেবল পবিত্র ভোজনের দ্বারা সত্ত্ব শুদ্ধ

শঙ্কর ও আহারশুদ্ধি

হয়, তবে বানরকে সারা জীবন দুধ ভাত খাওয়াইয়া দেখ না কেন, সে একজন মস্ত যোগী হয় কি না! এরূপ হইলে ত গাভী হরিণ প্রভৃতিরাই সকলের অগ্রে বড় যোগী হইয়া দাঁড়াইত।

"নিত নহনেসে হরি মিলে ত জলজন্তু হোই
ফলমূল খাকে হরি মিলে ত বাদুড় বাঁদরাই
তিরণ ভখনসে হরি মিলে ত বহুৎ মৃগী অজা।"

ইত্যাদি।

যাহা হউক এই সমস্যার মীমাংসা কি? উভয়ই আবশ্যক। অবশ্য, শঙ্করাচার্য্য আহার শব্দের যে অর্থ করিয়াছেন, উহাই মুখ্য অর্থ; তবে ইহাও সত্য যে, বিশুদ্ধ ভোজনে বিশুদ্ধ চিন্তার সহায়তা করে। উভয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। উভয়ই চাই। তবে গোল এইটুকু দাঁড়াইয়াছে যে, বর্ত্তমান-কালে আমরা শঙ্করাচার্য্যের উপদেশ ভুলিয়া গিয়া কেবল 'খাদ্য' অর্থটি লইয়াছি। এই কারণেই যখন আমি বলি, ধর্ম্ম রান্নাঘরে ঢুকিয়াছে তখন লোকে আমার বিরুদ্ধে খেপিয়া উঠে। কিন্তু যদি তোমরা আমার সহিত মাদ্রাজে যাও, তবে তোমরাও আমার সহিত একমত হইবে। তোমরা বাঙ্গালীরা তাহাদের চেয়ে ঢের ভাল। মাদ্রাজে যদি কোন ব্যক্তি উচ্চবর্ণের খাদ্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তবে তাহারা সেই খাবারদাবার ফেলিয়া দিবে। কিন্তু তথাপি তথাকার লোকেরা এইরূপ খাদ্যাখাদ্য বিচারের দরুণ যে বিশেষ কিছু উন্নত হইয়াছে, তাহা ত দেখিতে পাইতেছি না। যদি কেবল এ খাওয়া ও খাওয়া ছাড়িলেই, এর তার দৃষ্টিদোষ হইতে বাঁচিলেই লোকে সিদ্ধ হইত, তবে দেখিতে—মাদ্রাজীরা

সামঞ্জস্য

সকলেই সিদ্ধ পুরুষ, কিন্তু তাহারা তাহা নহে। অবশ্য, আমাদের সম্মুখে যে কয়জন মাদ্রাজী বন্ধু রহিয়াছেন, তাহাদিগকে বাদ দিয়া আমি এই কথা বলিতেছি। তাঁহাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।

অতএব যদিও আহার সম্বন্ধে এই উভয় মত একত্র করিলেই একটি সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলেও "উল্টা বুঝ্‌লী রাম" করিও না। আজকাল এই খাদ্যের বিচার লইয়া ও বর্ণাশ্রম লইয়া খুব গোল উঠিয়াছে। আর এ বিষয় লইয়া বাঙ্গালীরাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চীৎকার করিতেছেন। আমি তোমাদের প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমরা এই বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে কি জান বল দেখি। এ দেশে এখন সেই চাতুর্ব্বর্ণ্য কোথায়? আমার কথার উত্তর দাও। আমি চাতুর্ব্বর্ণ্য দেখিতে পাইতেছি না। যেমন কথায় বলে, 'মাথা নেই তার মাথা ব্যথা', এখানে তোমাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টাও তদ্রূপ। এখানে ত চারি বর্ণ নাই; আমি এখানে কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র জাতি দেখিতেছি। যদি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি থাকে, তবে তাহারা কোথায় এবং হিন্দুধর্ম্মের নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণগণ কেন তাঁহাদিগকে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া বেদ পাঠ করিতে আদেশ না করেন? আর যদি এদেশে ক্ষত্রিয় বৈশ্য না থাকে, যদি কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্রই থাকে, তবে শাস্ত্রানুসারে যে দেশে কেবল শূদ্রের বাস, এমন দেশে ব্রাহ্মণের বাস করা উচিত নয়। অতএব তোমাদের তল্পিতল্পা বাঁধিয়া এ দেশ হইতে চলিয়া যাওয়া উচিত। যাহারা ম্লেচ্ছ খাদ্য আহার করে ও ম্লেচ্ছরাজ্যে বাস করে তাহাদের

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম

সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলিয়াছেন, তাহা কি তোমরা জান? তোমরা ত বিগত সহস্র বর্ষ ধরিয়া তাহা করিতেছ। ইহার প্রায়শ্চিত্ত কি, তাহা কি তোমরা জান? ইহার প্রায়শ্চিত্ত তুষানল। তোমরা আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিতে চাও, কার্য্যে কেন কপটাচারী হও? যদি তোমরা তোমাদের শাস্ত্রে বিশ্বাসী হও, তবে তোমরাও সেই ব্রাহ্মণবর্য্যের মত হও; যিনি আলেক্‌জাণ্ডার দি গ্রেটের সহিত গ্রীসদেশে গিয়াছিলেন ও ম্লেচ্ছ খাদ্য ভোজনের জন্য পরে তুষানল করিয়াছিলেন। এইরূপ কর দেখি! দেখিবে, সমগ্রজাতি তোমাদের পদতলে আসিয়া পড়িবে। তোমরা নিজেরাই তোমাদের শাস্ত্রে বিশ্বাস কর না—আবার অপরকে বিশ্বাস করাইতে যাও! আর যদি তোমরা মনে কর যে, এ যুগে ওরূপ কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে তোমরা সমর্থ নহ, তবে তোমাদের দুর্ব্বলতা স্বীকার কর এবং অপরের দুর্ব্বলতা ক্ষমা কর, অন্যান্য জাতির উন্নতির যতদূর পার সহায়তা কর। তাহাদিগকে বেদ পড়িতে দাও। জগতের অন্যান্য স্থানের আর্য্যগণের মত সৎ আর্য্য হও। আর হে বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণ, আমি তোমাদিগকে বিশেষভাবে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি, তোমরা প্রকৃত আর্য্য হও।

যে জঘন্য বামাচার তোমাদের দেশকে নাশ করিয়া ফেলিতেছে, উহা অবিলম্বে পরিত্যাগ কর। তোমরা ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান বিশেষ ভাবে দেখ নাই। যখন আমি আমার স্বদেশে প্রবেশ করি, উহার পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানের যতই বড়াই কর না কেন, যখন আমি দেখি, আমাদের সমাজে বামাচার কি ভয়ানকরূপে প্রবেশ করিয়াছে, তখন উহা আমার অতি ঘৃণিত নরকতুল্য স্থান বলিয়া

প্রতীয়মান হয়। এই বামাচার সম্প্রদায়সমূহ আমাদের বাঙ্গালা দেশের সমাজকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। আর যাহারা রাত্রে অতি বীভৎস লাম্পট্যাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, তাহারাই আবার দিনে আচার সম্বন্ধে উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করিয়া থাকে, আর অতি ভয়ানক ভয়ানক গ্রন্থসকল তাহাদের কার্য্যের সমর্থক। তাহাদের শাস্ত্রের আদেশে তাহারা এইরূপ বীভৎস কার্য্যসকল করিয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশের লোক তোমরা সকলেই ইহা জান। বামাচার তন্ত্রসকলই বাঙ্গালীর শাস্ত্র। এই তন্ত্রসকল রাশি রাশি প্রকাশিত হইতেছে আর শ্রুতি-শিক্ষার পরিবর্ত্তে উহাদের আলোচনায় তোমাদের পুত্রকন্যাগণের চিত্ত কলুষিত হইতেছে। হে কলিকাতাবাসী ভদ্রমোহদয়গণ! তোমাদের কি লজ্জা হয় না যে, এই সানুবাদ বামাচারতন্ত্ররূপ ভয়ানক জিনিস তোমাদের পুত্রকন্যাগণের হস্তে পড়িয়া তাহাদের চিত্ত কলুষিত করিতেছে এবং বাল্যকাল হইতেই ঐ গুলিকে হিন্দুর শাস্ত্র বলিয়া তাহাদিগকে শিখান হইতেছে? যদি হয় তবে তাহাদের নিকট হইতে সেগুলি কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে প্রকৃত শাস্ত্র—বেদ, উপনিষদ্, গীতা—পড়িতে দাও।

বামাচার

ভারতের দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়সমূহের মতে জীবাত্মাসকল চিরকাল জীবাত্মাই থাকিবে। ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ; তিনি পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত উপাদান কারণ হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদীদের মতে কিন্তু ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ উভয়ই, তিনি শুধু জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, কিন্তু তিনি উপাদানভূত নিজ

দ্বৈত ও অদ্বৈত মতে সৃষ্টিতত্ত্ব

হইতেই উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন ; ইহাই অদ্বৈতবাদীদিগের মত। কতকগুলি কিম্ভূতকিমাকার দ্বৈতবাদী সম্প্রদায় আছে ; তাহারা বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বর নিজ হইতেই এই জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অথচ তিনি জগৎ হইতে চির পৃথক্। আবার সকলেই সেই জগৎপতির চির অধীন। আবার অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহাদের মত এই যে, ঈশ্বর আপনাকে উপাদান করিয়া এই জগৎ উৎপাদন করিয়াছেন, আর জীবগণ কালে সান্তভাব পরিত্যাগ করিয়া অনন্তত্ব প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করিবে। কিন্তু এই সকল সম্প্রদায়ের এক্ষণে লোপ হইয়াছে। বর্ত্তমান ভারতে যে এক অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় দেখিতে পাও, তাহারা সকলেই শঙ্করের অনুগামী। শঙ্করের মতে ঈশ্বর মায়াবশেই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হইয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে নহে। ঈশ্বর যে এই জগৎ হইয়াছেন, তাহা নহে ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জগৎ নাই, ঈশ্বরই আছেন।

মায়াবাদ এবং কান্তের (Kant) দেশকাল-নিমিত্ত (Time Space Causality)

অদ্বৈত বেদান্তের এই মায়াবাদ বুঝা বিশেষ কঠিন ! এই বক্তৃতায় আমাদের দর্শনের এই মহা কঠিন সমস্যার বিষয় আলোচনা করিবার সময় নাই। তোমাদের মধ্যে যাহারা পাশ্চাত্য-দর্শন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তাহারা কান্তের দর্শনে কতকটা সদৃশ মত দেখিতে পাইবে। তবে তোমাদের মধ্যে যাহারা কান্ত সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্স্‌মূলারের লেখা পড়িয়াছ, তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি যে, তাঁহার লেখায় একটা মস্ত ভুল আছে। অধ্যাপকের মতে দেশকালনিমিত্ত যে আমাদের তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক, তাহা কান্তই প্রথম আবিষ্কার করেন ; কিন্তু

প্রতীয়মান হয়। এই বামাচার সম্প্রদায়সমূহ আমাদের বাঙ্গালা দেশের সমাজকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। আর যাহারা রাত্রে অতি বীভৎস লাম্পট্যাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, তাহারাই আবার দিনে আচার সম্বন্ধে উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করিয়া থাকে, আর অতি ভয়ানক ভয়ানক গ্রন্থসকল তাহাদের কার্য্যের সমর্থক। তাহাদের শাস্ত্রের আদেশে তাহারা এইরূপ বীভৎস কার্য্যসকল করিয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশের লোক তোমরা সকলেই ইহা জান। বামাচার তন্ত্রসকলই বাঙ্গালীর শাস্ত্র। এই তন্ত্রসকল রাশি রাশি প্রকাশিত হইতেছে আর শ্রুতি-শিক্ষার পরিবর্ত্তে উহাদের আলোচনায় তোমাদের পুত্রকন্যাগণের চিত্ত কলুষিত হইতেছে। হে কলিকাতাবাসী ভদ্রমোহদয়গণ! তোমাদের কি লজ্জা হয় না যে, এই সানুবাদ বামাচারতন্ত্ররূপ ভয়ানক জিনিস তোমাদের পুত্রকন্যাগণের হস্তে পড়িয়া তাহাদের চিত্ত কলুষিত করিতেছে এবং বাল্যকাল হইতেই ঐ গুলিকে হিন্দুর শাস্ত্র বলিয়া তাহাদিগকে শিখান হইতেছে? যদি হয় তবে তাহাদের নিকট হইতে সেগুলি কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে প্রকৃত শাস্ত্র—বেদ, উপনিষদ্, গীতা—পড়িতে দাও।

বামাচার

ভারতের দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়সমূহের মতে জীবাত্মাসকল চিরকাল জীবাত্মাই থাকিবে। ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ; তিনি পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত উপাদান কারণ হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদীদের মতে কিন্তু ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ উভয়ই, তিনি শুধু জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, কিন্তু তিনি উপাদানভূত নিজ

দ্বৈত ও অদ্বৈত মতে সৃষ্টিতত্ত্ব

হইতেই উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন ; ইহাই অদ্বৈতবাদীদিগের মত। কতকগুলি কিম্ভুতকিমাকার দ্বৈতবাদী সম্প্রদায় আছে ; তাহারা বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বর নিজ হইতেই এই জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অথচ তিনি জগৎ হইতে চির পৃথক্। আবার সকলেই সেই জগৎপতির চির অধীন। আবার অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহাদের মত এই যে, ঈশ্বর আপনাকে উপাদান করিয়া এই জগৎ উৎপাদন করিয়াছেন, আর জীবগণ কালে সান্তভাব পরিত্যাগ করিয়া অনন্তত্ব প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করিবে। কিন্তু এই সকল সম্প্রদায়ের এক্ষণে লোপ হইয়াছে। বর্ত্তমান ভারতে যে এক অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় দেখিতে পাও, তাহারা সকলেই শঙ্করের অনুগামী। শঙ্করের মতে ঈশ্বর মায়াবশেই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হইয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে নহে। ঈশ্বর যে এই জগৎ হইয়াছেন, তাহা নহে ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জগৎ নাই, ঈশ্বরই আছেন।

অদ্বৈত বেদান্তের এই মায়াবাদ বুঝা বিশেষ কঠিন! এই বক্তৃতায় আমাদের দর্শনের এই মহা কঠিন সমস্যার বিষয় আলোচনা করিবার সময় নাই। তোমাদের মধ্যে যাহারা পাশ্চাত্য-দর্শন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তাহারা কান্তের দর্শনে কতকটা সদৃশ মত দেখিতে পাইবে। তবে তোমাদের মধ্যে যাহারা কান্ত সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্‌স্‌মূলারের লেখা পড়িয়াছ, তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি যে, তাঁহার লেখায় একটা মস্ত ভুল আছে। অধ্যাপকের মতে দেশকালনিমিত্ত যে আমাদের তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক, তাহা কান্তই প্রথম আবিষ্কার করেন ; কিন্তু

মায়াবাদ এবং কান্তের (Kant) দেশকাল-নিমিত্ত (Time Space Causality)

প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। শঙ্করই ইহার প্রথম আবিষ্কর্ত্তা। তিনি দেশকালনিমিত্তকে মায়ার সহিত অভিন্নভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে শঙ্করভাষ্যের ভিতর আমি এই ভাবের দুই একটি স্থল দেখিতে পাইয়া বন্ধুবর অধ্যাপক মহাশয়কে পাঠাইয়াছিলাম। অতএব দেখিতেছ, কান্তের পূর্ব্বেও এই তত্ত্ব ভারতে অজ্ঞাত ছিল না। অদ্বৈতবেদান্তীদিগের এই মায়াবাদ মতটি একটু অপূর্ব্ব ধরণের। তাঁহাদের মতে ব্রহ্মই একমাত্র আছেন, ভেদ এই মায়াপ্রসূত।

এই একত্ব, এই 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ব্রহ্মই আমাদের চরম লক্ষ্য। আর এইখানেই আবার ভারতীয় ও পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে চিরদ্বন্দ্ব। সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া ভারত সমগ্র জগতের নিকট এই মায়াবাদ ঘোষণা করিয়া, যদি ক্ষমতা থাকে ত তাহাদিগকে উহা খণ্ডন করিতে আহ্বান করিয়াছে। জগতের বিভিন্ন জাতি ঐ আহ্বানে ভারতীয় মতের প্রতিবাদে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু তাহার ফল এই হইয়াছে যে, তাহারা মরিয়াছে, তোমরা এখনও জীবিত আছ। ভারত জগতের নিকট ঘোষণা করিয়াছে সমুদয়ই ভ্রান্তিবিজৃম্ভণ মায়ামাত্র। মৃত্তিকা হইতে ভাত কুড়াইয়াই খাও, অথবা স্বর্ণপাত্রেই ভোজন কর, মহারাজচক্রবর্ত্তী হইয়া রাজ-প্রাসাদেই বাস কর, অথবা অতি দরিদ্র ভিক্ষুকই হও, মৃত্যুই একমাত্র পরিণাম। সকলেরই সেই এক গতি, সবই মায়া। ইহাই ভারতের অতি প্রাচীন কথা। বারবার বিভিন্ন জাতি উঠিয়া উহা খণ্ডন করিবার, উহার বিপরীত প্রমাণ করিবার চেষ্টা

সবই মায়া—ত্যাগ বা বৈরাগ্য

করিয়াছে। তাহারা বড় হইয়া নিজেদের হস্তে সমুদয় ক্ষমতা লইয়াছে, ভোগকেই তাহাদের মূলমন্ত্র করিয়াছে! তাহারা যতদূর সাধ্য, সেই ক্ষমতার পরিচালন করিয়াছে; যতদূর সাধ্য, ভোগ করিয়াছে—কিন্তু পর মুহূর্ত্তে তাহারা মরিয়াছে। আমরা চিরকাল অক্ষত রহিয়াছি, তাহার কারণ আমরা দেখিতেছি—সবই মায়া। মহামায়ার সন্তানগণ চিরকাল বাঁচিয়া থাকে, কিন্তু অবিদ্যার সন্তানগণের পরমায়ু অতি অল্প।

বেদান্ত ও 'হেগেল' দর্শনের মূল পার্থক্য—বেদান্ত বৈরাগ্যবাদী, হেগেল ভোগবাদী

এখানে আবার আর একটি বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর বিশেষ পার্থক্য আছে। প্রাচীন ভারতেও হেগেল ও শোপেনহাওয়ার নামক জার্ম্মান দার্শনিকগণের মতের ন্যায় মতবাদের বিকাশ দেখা যায়। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ হেগেলীয় মতবাদ এখানে বীজাবস্থায়ই নষ্ট করা হইয়াছিল, উহার অঙ্কুর উদ্গত হইয়া বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়া উহার অমঙ্গলময়ী শাখাপ্রশাখাকে আমাদের এ মাতৃভূমিতে বিস্তৃত হইতে দেওয়া হয় নাই। হেগেলের মূল কথাটা এই যে, সেই এক নিরপেক্ষ সত্তা কুজ্ঝটিকাময় বিশৃঙ্খলভাবাপন্ন আর সাকার ব্যষ্টি উহা হইতে শ্রেষ্ঠতর। অর্থাৎ অ-জগৎ হইতে জগৎ শ্রেষ্ঠ, মুক্তি হইতে সংসার শ্রেষ্ঠ। ইহাই হেগেলের মূল কথা সুতরাং তাঁহার মতে যতই তুমি সংসারসমুদ্রে ঝাঁপ দিবে, তোমার আত্মা যতই জীবনের বিভিন্ন কর্ম্মজালে আবৃত হইবে, ততই তুমি উন্নত হইবে। পাশ্চাত্যদেশীয়গণ বলেন, তোমরা কি দেখিতেছ না, আমরা কেমন ইমারত বানাইতেছি, কেমন রাস্তা সাফ রাখিতেছি, কেমন

ইন্দ্রিয়ের বিষয় সম্ভোগ করিতেছি! ইহার পশ্চাতে—প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ভোগের পশ্চাতে—ঘোর দুঃখ যন্ত্রণা পৈশাচিকতা ঘৃণাবিদ্বেষ লুক্কায়িত থাকিতে পারে—তাহাতে কোন ক্ষতি নাই!

অপরদিকে আমাদের দেশের দার্শনিকগণ প্রথম হইতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, প্রত্যেক অভিব্যক্তিই যাহাকে তোমরা ক্রমবিকাশ বল, তাহা সেই অব্যক্তের আপনাকে ব্যক্ত করিবার বৃথা চেষ্টা মাত্র। এই জগতের সর্ব্বশক্তিমান্ কারণস্বরূপ তুমি, তুমি আপনাকে ক্ষুদ্র মৃৎপল্বলে প্রতিবিম্বিত করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছ! কিছুদিনের জন্য ঐ চেষ্টা করিয়া তুমি বুঝিবে, উহা অসম্ভব। তখন যেখান হইতে আসিয়াছিলে, পলাইয়া সেইখানেই ফিরিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই বৈরাগ্য—এই বৈরাগ্যের আবির্ভাব হইলে ধর্ম্মসাধনের সূত্রপাত হইল বুঝিতে হইবে। ত্যাগ ব্যতীত কিরূপে ধর্ম্ম বা নীতির সূত্রপাতমাত্রও হইতে পারে? ত্যাগেই ধর্ম্মের আরম্ভ, ত্যাগেই উহার সমাপ্তি। "ত্যাগ কর," বেদ বলিতেছেন, "ত্যাগ কর—ইহা ব্যতীত অন্য পথ নাই।"

বৈরাগ্যতত্ত্ব

"ন প্রজয়া ধনেন ন চেজ্যয়া
ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।"

"সন্তানের দ্বারা নহে, ধনের দ্বারা নহে, যজ্ঞের দ্বারা নহে, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে"

ইহাই ভারতীয় সকল শাস্ত্রের আদেশ। অবশ্য অনেকে রাজসিংহাসনে বসিয়াও মহা ত্যাগীর জীবন দেখাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু জনককেও কিছুদিনের জন্য সংসারের সহিত সংস্রব একেবারে

পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল, আর তাঁহার অপেক্ষা বড় ত্যাগী কে ছিলেন? কিন্তু আজকাল আমরা সকলেই জনক বলিয়া পরিচিত হইতে চাই। তাহারা জনক বটে কিন্তু তাহারা কতকগুলি হতভাগা ছেলের জনক মাত্র—তাহারা তাহাদের পেটের ভাত ও পরনের কাপড় জোগাইতেও অসমর্থ। ঐটুকুই তাহাদের জনকত্ব, পূর্ব্বকালীন জনকের ন্যায় তাঁহাদের ব্রহ্মনিষ্ঠা নাই। আমাদের আজকালকার জনকদের এইভাব! এখন জনক হইবার চেষ্টা একটু কম করিয়া সোজা পথে এস দেখি। যদি ত্যাগ করিতে পার, তবেই তোমার ধর্ম্ম হইবে। যদি না পার তবে তুমি প্রাচ্য হইতে পাশ্চাত্য দেশ পর্য্যন্ত সমগ্র জগতের যত পুস্তকালয় আছে, তাহার সকল গ্রন্থ পড়িয়া দিগ্‌গজ পণ্ডিত হইতে পার, কিন্তু তোমার ভিতর যদি ঐ কর্ম্মকাণ্ড থাকে, তবে তোমার কিছুই হয় নাই; তোমার ভিতর ধর্ম্মের বিকাশ কিছুমাত্র হয় নাই।

কলির 'জনক'গণ

কেবল ত্যাগের দ্বারাই এই অমৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে, ত্যাগই মহাশক্তি। যাহার ভিতর এই মহাশক্তির আবির্ভাব হয়, সে সমগ্র জগৎকে পর্য্যন্ত গ্রাহের ভিতর আনে না। তখন তাহার নিকট সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড গোষ্পদতুল্য হইয়া যায়—"ব্রহ্মাণ্ডং গোষ্পদায়তে"। ত্যাগই ভারতের সনাতন পতাকা। ঐ পতাকা সমগ্র জগতে উড়াইয়া, যে সকল জাতি মরিতে বসিয়াছে, ভারত তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছে—সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার, সর্ব্বপ্রকার অসাধুতার তীব্র প্রতিবাদ

ত্যাগকেই আদর্শ করিতে হইবে

করিতেছে ; তাহাদিগকে যেন বলিতেছে, সাবধান, ত্যাগের পথ, শান্তির পথ অবলম্বন কর, নতুবা মরিবে। হিন্দুগণ ঐ ত্যাগের পতাকাকে পরিত্যাগ করিও না—উহা সকলের সমক্ষে তুলিয়া ধর। তুমি যদি দুর্ব্বল হও এবং ত্যাগ না করিতে পার, কিন্তু আদর্শকে খাটো করিও না। বল আমি দুর্ব্বল—আমি সংসার ত্যাগ করিতে পারিতেছি না, কিন্তু কপটভাব আশ্রয় করিবার চেষ্টা করিও না—শাস্ত্রের বিকৃত অর্থ করিয়া আপাতমধুর যুক্তিজাল প্রয়োগ করিয়া লোকের চক্ষে ধূলি দিবার চেষ্টা করিও না, অবশ্য যাহারা এইরূপ যুক্তিতে মুগ্ধ হইয়া যায়, তাহাদেরও উচিত—নিজে নিজে শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার চেষ্টা করা। যাহা হউক, এরূপ কপটতা করিও না, বল যে আমি দুর্ব্বল। কারণ, এই ত্যাগটি বড়ই মহান্ আদর্শ। যদি যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ সৈন্যের পতন হয়, তাহাতে ক্ষতি কি—যদি দশ জন, দু-জন, এক জন সৈন্যও জয়ী হইয়া ফিরিয়া আসে।

সংগ্রামে যে লক্ষ লক্ষ লোকের পতন হয়, তাহারা ধন্য। কারণ, তাহাদের শোণিতমূল্যেই সংগ্রাম-বিজয় ক্রীত হয়। একটি ব্যতীত ভারতের বিভিন্ন সকল বৈদিক সম্প্রদায়ই এই ত্যাগকে তাঁহাদের প্রধান আদর্শ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায় একমাত্র তাহা করেন নাই। আর তোমাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিতে পারিতেছ, যেখানে ত্যাগ নাই সেখানে শেষে কি দাঁড়ায়। এই ত্যাগের আদর্শ রক্ষা করিতে গিয়া যদি গোঁড়ামি—অতি বীভৎস

ত্যাগরূপ শ্রেষ্ঠ আদর্শকে জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ঝুটা সন্ন্যাসীকেও মানিতে হইবে

গোঁড়ামি—আশ্রয় করিতে হয়, ভস্মমাখা উর্দ্ধবাহু জটাজুটধারীদিগকে প্রশ্রয় দিতে হয়, সেও ভাল। কারণ যদিও ঐ গুলি অস্বাভাবিক, তথাপি যে মনুষ্যত্বহারী বিলাসিতা ভারতে প্রবেশ করিয়া আমাদের মজ্জা মাংস পর্য্যন্ত শুষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে এবং সমগ্র ভারতীয় জাতিকে কপটতাপূর্ণ করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে, সেই বিলাসিতার স্থানে ত্যাগের আদর্শ ধরিয়া সমগ্র জাতিকে সাবধান করিবার জন্য ইহার প্রয়োজন। আমাদিগকে ত্যাগ অবলম্বন করিতে হইবেই হইবে। প্রাচীন কালে এই ত্যাগ সমগ্র ভারতকে জয় করিয়াছিল, এখনও এই ত্যাগই আবার ভারত জয় করিবে। এই ত্যাগ এখনও ভারতীয় সকল আদর্শের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও গরিষ্ঠ। ভগবান্ বুদ্ধ, ভগবান্ রামানুজ, ভগবান্ রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্মভূমি, ত্যাগের লীলাভূমি এই ভারত—যথায় অতি প্রাচীন কাল হইতে কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিবাদ চলিতেছে, যেখানে এখনও শত শত ব্যক্তি সর্ব্বত্যাগ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, সেই দেশ কি এক্ষণে তাহার আদর্শসমূহে জলাঞ্জলি দিবে ? কখনই নহে। হইতে পারে—পাশ্চাত্য বিলাসিতার আদর্শে কতকগুলি ব্যক্তির মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে, হইতে পারে—সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই ইন্দ্রিয়ভোগরূপ পাশ্চাত্য গরল আকণ্ঠ পান করিয়াছে, তথাপি আমার মাতৃভূমিতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি নিশ্চিত আছেন, যাঁহাদের নিকট ধর্ম্ম কেবল কথার কথা মাত্র রহিবে না, যাঁহারা প্রয়োজন হইলে ফলাফল বিচার না করিয়াই সর্ব্বত্যাগে প্রস্তুত হইবেন।

আর একটি বিষয় যাহাতে আমাদের সকল সম্প্রদায় একমত

তাহা আমি তোমাদের সকলের সমক্ষে বলিতে ইচ্ছা করি। ইহাও একটি প্রকাণ্ড বিষয়। এই ভাবটি ভারতের বিশেষ সম্পত্তি—তাহা এই যে, ধর্ম্মকে সাক্ষাৎ করিতে হইবে।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন"।

"অধিক বাক্যব্যয়ের দ্বারা অথবা কেবল বুদ্ধিবলে বা অনেক শাস্ত্র পাঠের দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না।"

প্রত্যক্ষানুভূতিই ধর্ম্ম

শুধু তাহাই নহে, জগতের মধ্যে একমাত্র আমাদের শাস্ত্র ঘোষণা করেন যে, এমন কি শাস্ত্রপাঠের দ্বারাও আত্মাকে লাভ করিতে পারা যায় না, বৃথা বাক্যব্যয়ের বা বক্তৃতা দ্বারা আত্মলাভ হয় না, উহাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে হইবে। গুরু হইতে শিষ্যে উহা সংক্রমিত হয়। শিষ্যের যখন এই অন্তর্দ্দৃষ্টি হয়, তখন তাঁহার নিকট সমুদয় পরিষ্কার হইয়া যায়, তিনি তখন সাক্ষাৎ আত্মোপলব্ধি করেন।

কুলগুরু প্রথা

আর এক কথা। বাঙ্গালা দেশে এক অদ্ভুত প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়—উহার নাম কুলগুরুপ্রথা। আমার পিতা তোমার গুরু ছিলেন—এক্ষণে আমি তোমার গুরু হইব। আমার পিতা তোমার পিতার গুরু ছিলেন, সুতরাং আমিও তোমার গুরু হইব। গুরু কাহাকে বলে? এ সম্বন্ধে প্রাচীন বৈদিক মত আলোচনা কর। যিনি বেদের রহস্য জানেন—গ্রন্থকীট, বৈয়াকরণ বা সাধারণ পণ্ডিতগণ গুরু-হইবার যোগ্য নহেন, কিন্তু যিনি বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য জানেন।

'যথা খরশ্চন্দনভারবাহী ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য।'

'যেমন চন্দনভারবাহী গর্দ্দভ চন্দনের ভারই জানে, কিন্তু চন্দনের গুণাবলি অবগত নহে'।

এই পণ্ডিতেরাও তদ্রূপ। ইঁহাদের দ্বারা আমাদের কোন কাজ হইবে না। তাঁহারা যদি প্রত্যক্ষ অনুভব না করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা কি শিখাইবেন? বালকবয়সে এ কলিকাতা শহরে আমি ধর্ম্মান্বেষণে এখানে ওখানে ঘুরিতাম আর খুব বড় বড় বক্তৃতা শুনিবার পর বক্তাকে জিজ্ঞাসা করতাম, আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন? ঈশ্বর দর্শনের কথায় সে ব্যক্তি চমকিয়া উঠিত আর একমাত্র রামকৃষ্ণ পরমহংসই আমায় বলিয়াছিলেন, আমি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছি। শুধু তাহাই নহে, তিনি আরও বলিয়াছেন, আমি তোমাকে তাঁহার দর্শন লাভ করিবার পথ দেখাইয়া দিব! শাস্ত্রের যথেচ্ছ অর্থ করিতে পারিলেই সেই প্রকৃত গুরুপদবাচ্য হইল না।

"বাগ্বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্।

বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥' বি, চূ ৫৮

"নানা প্রকারে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবার কৌশল কেবল পণ্ডিতদের আমোদের জন্য, মুক্তির জন্য নহে।"

'শ্রোত্রিয়'—যিনি বেদের রহস্যবিৎ, 'অবৃজিন'—নিষ্পাপ—'অকামহত'—যিনি তোমাকে উপদেশ দিয়া অর্থ সংগ্রহের বাসনা করেন না, তিনিই শান্ত, তিনিই সাধু। বসন্তকাল আগমন করিলে যেমন বৃক্ষে পত্রমুকুলোদয় হয়, অথচ উহা যেমন বৃক্ষের নিকট ঐ উপকারের পরিবর্ত্তে কোন প্রকার প্রত্যুপকার চাহে না, কারণ উহার প্রকৃতিই অপরের

'প্রকৃত' গুরু কে?

হিতসাধন। পরের হিত করিব, কিন্তু তাহার প্রতিদানস্বরূপ কিছু চাহিব না। প্রকৃত গুরু এইরূপ।

"তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনাঃ।
অহেতুনান্যানপি তারয়ন্তঃ॥"

"তাঁহারা স্বয়ং ভীষণ জীবনসমুদ্র পার হইয়া গিয়াছেন এবং নিজের কোন লাভের আশা না রাখিয়া অপরকেও তারণ করেন।"

এইরূপ ব্যক্তিই গুরু আর ইহাও বুঝিও যে, আর কেহই গুরু হইতে পারে না। কারণ,

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়াঃ
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥" কঠ ২।৫

"নিজেরা অন্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে; কিন্তু অহঙ্কারবশতঃ মনে করিতেছে, তাহারা সব জানে; শুধু ইহা ভাবিয়াই নিশ্চিন্ত নহে, তাহারা আবার অপরকে সাহায্য করিতে যায়। তাহারা নানারূপ কুটিল পথে ভ্রমণ করিতে থাকে। এইরূপ অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায় তাহারা উভয়েই খানায় পড়িয়া যায়।"

আমি তোমাদিগকে সনাতন মার্গের অধিকতর পক্ষপাতী করিতে চাই

তোমাদের বেদ এই কথা বলেন। এই বাক্যের সহিত তোমাদের আধুনিক প্রথার তুলনা কর। তোমরা বৈদান্তিক, তোমরা খাঁটি হিন্দু, তোমরা সনাতনমার্গের পক্ষপাতী! আমি তোমাদিগকে সনাতনমার্গের আরও অধিক পক্ষপাতী করিতে চাই! যতই তোমরা সনাতন মার্গের অধিতকর পক্ষপাতী হইবে, ততই তোমরা

অধিক বুদ্ধিমানের মত কাজ করিবে আর যতই তোমরা আজকাল-কার গোঁড়ামির অনুসরণ করিবে, ততই তোমরা অধিক নির্ব্বোধের মত কার্য্য করিবে। তোমাদের সেই অতি প্রাচীন সনাতন পন্থা অবলম্বন কর, কারণ, তখনকার শাস্ত্রের প্রত্যেক বাণী বীর্য্যবান্, স্থির অকপট হৃদয় হইতে উত্থিত, উহার প্রত্যেক সুরটিই অমোঘ। তাহার পর জাতীয় অবনতি আসিল—শিল্প, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম সকল বিষয়েই অবনতি আসিল। উহার কারণপরম্পরা বিচারের আমাদের সময় নাই, কিন্তু তখনকার লিখিত সকল পুস্তকেই এই জাতীয় ব্যাধি, জাতীয় অবনতির প্রমাণ পাওয়া যায়, জাতীয় বীর্য্যের পরিবর্ত্তে উহাতে কেবল রোদনধ্বনি। যাও, যাও—সেই প্রাচীন-কালের ভাব লইয়া এস, যখন জাতীয় শরীরে বীর্য্য ও জীবন ছিল। তোমরা আবার বীর্য্যবান হও, সেই প্রাচীন নির্ঝরিণীর জল আবার প্রাণ ভরিয়া পান কর। ইহা ব্যতীত ভারতের বাঁচিবার আর অন্য উপায় নাই।

আমিত্বলোপের তাৎপর্য্য

অদ্বৈতবাদীর মতে—(আমি অবান্তর প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রস্তাবিত বিষয় একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিলাম, বিষয় বিস্তীর্ণ এবং আমার তোমাদিগকে এত কথা বলিবার আছে যে, আমি সব ভুলিয়া যাইতেছি)—যাহা হউক, অদ্বৈতবাদীর মতে আমাদের যে এই ব্যক্তিত্ব রহিয়াছে, উহা ভ্রমমাত্র। সমগ্র জগতের পক্ষেই এই কথাটি ধারণা করা অতি কঠিন। যখনই তুমি কাহাকেও বল, সে 'ব্যক্তি' নহে, সে ঐ কথাতে এত ভীত হইয়া উঠে যে, সে মনে করে, আমার আমিত্ব—তাহা যাহাই হউক না কেন—বুঝি নষ্ট

হইয়া যাইবে। কিন্তু অদ্বৈতবাদী বলেন, প্রকৃতপক্ষে তোমার 'আমিত্ব' বলিয়া কিছুই নাই। তোমার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তেই তোমার পরিবর্ত্তন হইতেছে। তুমি এক সময় বালক ছিলে, তখন একরূপভাবে চিন্তা করিয়াছ; এখন তুমি যুবক, এখন একরূপ ভাবিতেছ; আবার যখন তুমি বৃদ্ধ হইবে, তুমি আর একরূপ ভাবিবে। সকলেরই পরিণাম হইতেছে। ইহাই যদি হয়, তবে আর তোমার 'আমিত্ব' কোথায়? এই 'আমিত্ব' বা 'ব্যক্তিত্ব' তোমার দেহগতও নহে, মনোগতও নহে। এই দেহ-মনের পারে তোমার আত্মা—আর অদ্বৈতবাদী বলেন,—এই আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ। দুইটি অনন্ত কখন থাকিতে পারে না। একজন ব্যক্তিই আছেন—তিনি অনন্তস্বরূপ।

সাদা কথায় বুঝাইতে গেলে বলিতে হয়, আমরা বিচারশীল প্রাণী—আমরা সব জিনিসই বিচার করিয়া বুঝিতে চাই। এখন

প্রকৃত বিচার কি ও তাহার পরিণাম

বিচার বা যুক্তি কাহাকে বলে?—যুক্তি বিচারের অর্থ—অল্প বিস্তর শ্রেণীভুক্তকরণ—ক্রমশঃ পদার্থ-নিচয়কে উচ্চ উচ্চ শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করিয়া শেষে এমন একস্থানে পঁহুছান, যাহার উপর আর যাওয়া চলে না। সসীম বস্তুকে যদি অনন্তের পর্য্যায়ভুক্ত করিতে পারা যায়, তবে উহার চরম বিশ্রাম হয়। একটি সসীম বস্তু লইয়া উহার কারণানুসন্ধান করিয়া যাও, কিন্তু যতক্ষণ না তুমি চরমে অর্থাৎ অনন্তে পঁহুছিতেছ, ততক্ষণ কোথাও শান্তি পাইবে না। আর অদ্বৈতবাদী বলেন, এই অনন্তেরই একমাত্র অস্তিত্ব আছে। আর সবই মায়া, আর কিছুরই সত্তা নাই। যে কোন জড় বস্তু

হউক, তাহার যথার্থ স্বরূপ যাহা, তাহা এই ব্রহ্ম। আমরা এই ব্রহ্ম; নামরূপাদি আর যাহা কিছু—সবই মায়া, ঐ নামরূপ তুলিয়া লও—তাহা হইলে আর তোমার আমার মধ্যে কোন ভেদ নাই। কিন্তু আমাদিগকে এই 'আমি' শব্দটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। সাধারণতঃ লোকে বলে, যদি আমি ব্রহ্মই হই, তবে আমি ইহা, উহা করিতে পারি না কেন? কিন্তু এখানে এই 'আমি' শব্দটি অন্য অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। তুমি যখন আপনাকে বদ্ধ বলিয়া মনে কর, তখন তুমি আর আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম নহ—যাঁহার কোন অভাব নাই—যিনি অন্তর্জ্জ্যোতিঃ। তিনি অন্তরারাম, আত্মতৃপ্ত, তাঁহার কোন অভাব নাই, তাঁহার কোন কামনা নাই, তিনি সম্পূর্ণ নির্ভয় ও সম্পূর্ণ স্বাধীন। তিনিই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মস্বরূপে আমরা সকলেই এক।

দ্বৈত ও অদ্বৈত মতে পার্থক্য—শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে উভয় মতের সমন্বয়

সুতরাং দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীর মধ্যে এইটিই বিশেষ পার্থক্য বলিয়া বোধ হয়। তোমরা দেখিবে, শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় বড় বড় ভাষ্যকারেরা পর্য্যন্ত নিজ নিজ মত পোষকতার জন্য স্থলে স্থলে শাস্ত্রের এরূপ অর্থ করিয়াছেন, যাহা আমার সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। রামানুজও ঐরূপ শাস্ত্রের এরূপ অর্থ করিয়াছেন, যাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। আমাদের পণ্ডিতদের ভিতরেও এই ধারণা দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে একটি মাত্র সত্য হইতে পারে, আর সকলগুলিই মিথ্যা—যদিও তাঁহারা শ্রুতি হইতে এই তত্ত্ব পাইয়াছেন (যে অত্যদ্ভুত তত্ত্ব ভারতকে এখনও জগৎকে শিক্ষা

দিতে হইবে) যে—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—প্রকৃত তত্ত্ব—প্রকৃত সত্তা একটি—সাধুগণ তাঁহাকেই নানারূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন। ইহাই আমাদের জাতীয় জীবনের মূলমন্ত্র, আর এই মূলতত্ত্বটিকে কার্য্যে পরিণত করাই আমাদের জাতির সমগ্র জীবন-সমস্যা। ভারতের কয়েকজনমাত্র পণ্ডিত—আমি পণ্ডিত অর্থে প্রকৃত ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিতেছি—ব্যতীত আমরা সকলেই সর্ব্বদাই এই তত্ত্ব ভুলিয়া যাই। আমরা এই মহান্ তত্ত্বটি সর্ব্বদাই ভুলিয়া যাই, আর তোমরা দেখিবে, অধিকাংশ পণ্ডিতের— আমার বোধ হয় শতকরা ৯৮ জনের—মত এই যে, হয় অদ্বৈতবাদ সত্য, নয় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সত্য, নতুবা দ্বৈতবাদ সত্য, আর তুমি যদি বারাণসীধামে পাঁচ মিনিটের জন্য কোন ঘাটে গিয়া বস, তবে তুমি আমার কথার প্রমাণ পাইবে। দেখিবে,—এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায় ও মত লইয়া রীতিমত যুদ্ধ চলিয়াছে। আমাদের সমাজের ও পণ্ডিতদের ত এই অবস্থা। এই বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক কলহ দ্বন্দ্বের ভিতর এমন একজনের অভ্যুদয় হইল, তিনি ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে—সেই সামঞ্জস্য কার্য্যে পরিণত করিয়া নিজ জীবনে দেখাইয়াছিলেন। আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসকে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিতেছি। তাঁহার জীবন আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, উভয় মতই আবশ্যক—উহারা গণিতজ্যোতিষের ভূকেন্দ্রিক (Geocentric) ও সূর্য্য-কেন্দ্রিক (Heliocentric) মতের ন্যায়। বালককে যখন প্রথম জ্যোতিষ শিক্ষা দেওয়া হয়, তখন তাহাকে ঐ ভূকেন্দ্রিক মতই শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু যখন সে জ্যোতিষের সূক্ষ্ম

সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়, তখন ঐ সূর্য্যকেন্দ্রিক মত শিক্ষা করা আবশ্যক হইয়া পড়ে, সে তখন জ্যোতিষের তত্ত্বসমূহ পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে বুঝিতে পারে। পঞ্চেন্দ্রিয়াবদ্ধ জীব স্বভাবতঃই দ্বৈতবাদী হইয়া থাকে। যতদিন আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা আবদ্ধ, ততদিন আমরা সগুণ ঈশ্বরই দর্শন করিব—সগুণ ঈশ্বরের অতিরিক্ত আর কোন ভাব দেখিতে পাইবনা, আমরা জগৎকে ঠিক এইরূপই দেখিতে পাইব। রামানুজ বলেন, 'যতদিন তুমি আপনাকে দেহ, মন বা জীব বলিয়া জ্ঞান করিতেছ, ততদিন তোমার প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়ায় জীব, জগৎ এবং এই উভয়ের কারণস্বরূপ বস্তুবিশেষের জ্ঞান থাকিবে।' কিন্তু মনুষ্যজীবনে এমন সময় কখন কখন আসিয়া থাকে, যখন দেহের জ্ঞান একেবারে চলিয়া যায়, যখন মন পর্য্যন্ত ক্রমশঃ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম হইতে হইতে প্রায় অন্তর্হিত হইয়া যায়, যখন দেহে আবদ্ধকারী ভীতি ও দুর্ব্বলতাজনক সমুদয় বস্তুই চলিয়া যায়। তখনই—কেবল তখনই সে সেই প্রচীন মহান্ উপদেশের সত্যতা বুঝিতে পারে। সেই উপদেশ কি?—

> ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
> নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ৫।১৯
>
> —গীতা।

'যাঁহাদের মন সাম্যভাবে অবস্থিত, তাঁহারা এইখানেই সংসার জয় করিয়াছেন। ব্রহ্ম নির্দ্দোষ এবং সর্ব্বত্র সম, সুতরাং তাঁহারা ব্রহ্মে অবস্থিত।'

'সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥' ১৩।২৮
—গীতা

'ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া তিনি আত্মা দ্বারা আত্মাকে হিংসা করেন না—সুতরাং পরম গতি প্রাপ্ত হন।'

গীতাতত্ত্ব

[স্বামিজী কলিকাতায় অবস্থানকালে অধিকাংশ সময়ই তদানীন্তন আলমবাজারের মঠে বাস করিতেন। এই সময় কলিকাতাবাসী কয়েকজন যুবক, যাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন, স্বামিজীর নিকট ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হন। স্বামিজী ইঁহাদিগকে ধ্যান ধারণা এবং গীতা বেদান্ত প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া ভবিষ্যতে কর্ম্মের উপযুক্ত করিতে লাগিলেন। একদিন গীতাব্যাখ্যাকালে তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ জনৈক ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়া রক্ষিত হইয়াছিল। তাহাই এস্থলে গীতাতত্ত্ব নামে অবিকল উদ্ধৃত হইল।]

গীতাগ্রন্থখানি মহাভারতের অংশবিশেষ। এই গীতা বুঝিতে চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে কয়েকটি বিষয় জানা আবশ্যক। ১ম, গীতাটি মহাভারতের ভিতর প্রক্ষিপ্ত অথবা মহাভারতেরই অংশবিশেষ অর্থাৎ উহা বেদব্যাসপ্রণীত কি না? ২য়, কৃষ্ণ নামে কেহ ছিলেন কি না? ৩য়, যে যুদ্ধের কথা গীতায় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যথার্থ ঘটিয়াছিল কি না? ৪র্থ, অর্জ্জুনাদি যথার্থ ঐতিহাসিক ব্যক্তি কি না? প্রথমতঃ সন্দেহ হইবার কারণগুলি কি, দেখা যাউক।

গীতা কি ঐতিহাসিক?

১ম—বেদব্যাস নামে পরিচিত অনেকে ছিলেন, তন্মধ্যে বাদরায়ণ ব্যাস বা দ্বৈপায়ন ব্যাস—কে ইহার প্রণেতা? ব্যাস একটি উপাধিমাত্র। যিনি কোন পুরাণাদি শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন তিনি ব্যাস নামে পরিচিত। যেমন বিক্রমাদিত্য—

বেদব্যাস

এই নামটিও একটি সাধারণ নাম। আরও, শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য করিবার পূর্ব্বে গীতাগ্রন্থখানি সর্ব্বসাধারণে ততদূর পরিচিত ছিল না। তাঁহার পরেই গীতা সর্ব্বসাধারণে বিশেষরূপে পরিচিত হয়। অনেকে বলেন, গীতার বোধায়ন-ভাষ্য পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। এ কথা প্রমাণিত হইলে গীতার প্রাচীনত্ব ও ব্যাসকর্ত্তৃত্ব কতকটা সিদ্ধ হয় বটে। কিন্তু বেদান্তদর্শনের যে বোধায়ন ভাষ্য ছিল বলিয়া শুনা যায়, যদবলম্বনে রামানুজ শ্রীভাষ্য প্রস্তুত করিয়াছেন বলিয়াছেন, শঙ্করের ভাষ্যের মধ্যে উদ্ধৃত যে ভাষ্যের অংশবিশেষ উক্ত বোধায়নকৃত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন যাহার কথা লইয়া দয়ানন্দ স্বামী প্রায় নাড়াচড়া করিতেন, তাহা আমি সমুদয় ভারতবর্ষ খুঁজিয়া এ পর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই। শুনিতে পাওয়া যায়, রামানুজও অপর লোকের হস্তে একটি কীটদষ্ট পুঁথি দেখিয়া তাহা হইতে তাঁহার ভাষ্য রচনা করেন। বেদান্তের বোধায়নভাষ্যই যখন এতদূর অনিশ্চিতের অন্ধকারে তখন গীতাসম্বন্ধে তৎকৃত ভাষ্যের উপর কোন প্রমাণ স্থাপন করিতে চেষ্টা বৃথা প্রয়াস মাত্র। অনেকে এইরূপ অনুমান করেন যে গীতাখানি শঙ্করাচার্য্য প্রণীত। তাঁহাদের মতে তিনি উহা প্রণয়ন করিয়া মহাভারতের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেন।

কৃষ্ণ

২য়—কৃষ্ণ সম্বন্ধে সন্দেহ এই ঃ—ছান্দোগ্য উপনিষদে এক স্থলে পাওয়া যায়, দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ঘোরনামা কোন ঋষির নিকট উপদেশ গ্রহণ করেন। মহাভারতে কৃষ্ণ দ্বারকার রাজা, আর বিষ্ণুপুরাণে গোপীদের সহিত বিহার-কারী কৃষ্ণের কথা বর্ণিত আছে! আবার ভাগবতে কৃষ্ণের

রাসলীলা বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে। অতি প্রাচীনকালে আমাদের দেশে মদনোৎসব নামে এক উৎসব প্রচলিত ছিল। সেইটিকেই লোকে দোলরূপে পরিণত করিয়া কৃষ্ণের ঘাড়ে চাপাইয়াছে। তাহাতে রাসলীলাদিও যে ঐরূপে চাপান হয় নাই, কে বলিতে পারে? পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে ঐতিহাসিক সত্যানুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তি অতি সামান্যই ছিল। সুতরাং যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। আর, পূর্ব্ব-কালে লোকের নামযশের আকাঙ্ক্ষা খুব অল্পই ছিল। এরূপ অনেক হইয়াছে, যেখানে একজন কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গুরু অথবা অপর কাহারও নামে চালাইয়া দিয়া গেলেন। এইরূপ স্থলে সত্যানুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকের বড় বিপদ। পূর্ব্বকালে ভূগোলের জ্ঞানও কিছুমাত্র ছিল না—অনেকে কল্পনাবলে ইক্ষুসমুদ্র, ক্ষীরসমুদ্র, দধিসমুদ্রাদি রচিয়াছেন। পুরাণে দেখা যায়, কেহ অযুত বর্ষ, কেহ লক্ষ বর্ষ, জীবন ধারণ করিতেছেন, কিন্তু আবার বেদে পাই, "শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ"। আমরা এখানে কাহার অনুসরণ করিব? সুতরাং কৃষ্ণ সম্বন্ধে সঠিক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত করা একরূপ অসম্ভব। লোকের একটা স্বভাবই এই যে, কোন মহাপুরুষের প্রকৃত চরিত্রের চতুর্দ্দিকে নানাবিধ অস্বাভাবিক কল্পনা করে। সম্ভবতঃ কৃষ্ণ সম্বন্ধে এই বোধ হয় যে তিনি একজন রাজা ছিলেন। এ বিষয় খুব সম্ভব এই জন্য যে, প্রাচীন কালে আমাদের দেশে রাজারাই ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারে উদ্যোগী ছিলেন। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, গীতাকার যিনিই হউন, গীতার মধ্যে যে শিক্ষা, সমুদয়

মহাভারতের মধ্যেও সেই শিক্ষা দেখিতে পাই। তাহাতে বোধ হয়, সেই সময় কোন মহাপুরুষ নূতনভাবে সমাজে এই ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন। আরও দেখা যায়, প্রাচীনকালে এক একটি সম্প্রদায় উঠিয়াছে—তাহার মধ্যে এক একখানি শাস্ত্র প্রচার হইয়াছে। কিছুদিন পরে সম্প্রদায় ও শাস্ত্র উভয়ই লোপ পাইয়াছে, অথবা সম্প্রদায়টি লোপ পাইয়াছে, শাস্ত্রখানি রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং অনুমান হয়, গীতা সম্ভবতঃ এমন এক সম্প্রদায়ের শাস্ত্র, যাহা এক্ষণে লোপ পাইয়াছে, কিন্তু যাহার মধ্যে খুব উচ্চ ভাব সকল নিবিষ্ট ছিল।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ

৩য়—কুরুপাঞ্চাল যুদ্ধের বিশেষ কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তবে, কুরুপাঞ্চাল নামে যুদ্ধ যে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর এক কথা—যুদ্ধের সময় এত জ্ঞান, ভক্তি, যোগের কথা আসিল কোথা হইতে? আর সেই সময় কি কোন সাঙ্কেতিক লিপি-কুশল ব্যক্তি (Short-hand writer) উপস্থিত ছিলেন, যিনি সেই সমস্ত টুকিয়া লইয়াছিলেন? কেহ কেহ বলেন, এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ রূপক মাত্র। ইহার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য—সদসৎ প্রবৃত্তির সংগ্রাম; এ অর্থও অসঙ্গত না হইতে পারে।

অর্জ্জুনাদি পাণ্ডবগণ

৪র্থ—অর্জ্জুন প্রভৃতির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ এই—শতপথ ব্রাহ্মণ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। উহাতে সমস্ত অশ্বমেধযজ্ঞকারিগণের নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু সে স্থলে অর্জ্জুনাদির নামগন্ধও নাই, অথচ পরীক্ষিত জনমেজয়ের নাম উল্লিখিত আছে। এ দিকে

মহাভারতাদিতে বর্ণনা—যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনাদি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

এখানে একটি কথা বিশেষরূপ স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই সকল ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধানের সহিত আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্থাৎ ধর্ম্মসাধনা শিক্ষার কোন সংশ্রব নাই। ঐগুলি যদি আজই সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলেও আমাদের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। তবে এত ঐতিহাসিক গবেষণার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে:—আমাদিগকে সত্য জানিতে হইবে, কুসংস্কারে আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না। এদেশে এ সম্বন্ধে বড় সামান্য ধারণা আছে। অনেক সম্প্রদায়ের বিশ্বাস এই যে, কোন একটি ভাল বিষয় প্রচার করিতে হইলে, একটি মিথ্যা বলিলে, যদি সেই প্রচারের সাহায্য হয়, তাহাতে কিছু মাত্র দোষ নাই অর্থাৎ The end justifies the means, এই কারণে অনেক তন্ত্রে 'পার্ব্বতীং প্রতি মহাদেব উবাচ' দেখা যায়। কিন্তু আমাদের উচিত সত্যকে ধারণা করা, সত্যে বিশ্বাস করা। কুসংস্কার মানুষকে এতদূর আবদ্ধ করিয়া রাখে যে, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণও অনেক কুসংস্কারে বিশ্বাস করিতেন। তোমাদিগকে সত্যের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কুসংস্কার সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে।

ঐতিহাসিক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা

এক্ষণে কথা হইতেছে,—গীতা জিনিসটিতে আছে কি? উপনিষদ্ আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহার মধ্যে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা চলিতে চলিতে হঠাৎ এক মহাসত্যের অবতারণা।

যেমন, জঙ্গলের মধ্যে অপূর্ব্ব সুন্দর গোলাপ, তাহার শিকড়, কাঁটা, পাতা সব সমেত। আর গীতাটি কি—গীতার মধ্যে এই সত্যগুলি লইয়া অতি সুন্দররূপে সাজান—যেন ফুলের মালা বা সুন্দর ফুলের তোড়া। উনিষদে শ্রদ্ধার কথা অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু ভক্তিসম্বন্ধে কোন কথা নাই বলিলেই হয়। গীতায় কিন্তু এই ভক্তির কথা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত আছে ও এই ভক্তির ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে।

গীতা ও উপনিষদের সম্বন্ধ

এক্ষণে গীতা যে কয়েকটি প্রধান প্রধান বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন দেখা যাউক। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে গীতার নূতনত্ব কি? নূতনত্ব এই যে, পূর্ব্বে যোগ, জ্ঞান, ভক্তি আদি প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু সকলের মধ্যেই পরস্পর বিবাদ ছিল, ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্যের চেষ্টা কেহ করেন নাই। গীতাকার এই সামঞ্জস্যের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি তদানীন্তন সমুদয় সম্প্রদায়ের ভিতর যাহা কিছু ভাল ছিল, সমুদয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও যে সমন্বয়ের ভাব দেখাইতে পারেন নাই এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামকৃষ্ণ পরমহংসের দ্বারা তাহা সাধিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ নিষ্কাম কর্ম্ম, এই নিষ্কাম কর্ম্ম অর্থে আজকাল অনেকে অনেকরূপ বুঝিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, নিষ্কাম হওয়ার অর্থ—উদ্দেশ্যহীন হওয়া। বাস্তবিক তাহাই যদি ইহার অর্থ হয়, তাহা হইলে ত হৃদয়শূন্য পশুরা ও দেয়ালগুলিও নিষ্কামকর্ম্মী; অনেকে আবার জনকের উদাহরণে নিজেকে

গীতায় প্রচারিত নূতন ভাবসমূহ

নিষ্কামকর্ম্মিরূপে পরিচিত করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু জনক ত পুত্রোৎপাদন করেন নাই, কিন্তু ইঁহারা পুত্রোৎপাদন করিয়াই জনকবৎ পরিচিত_হইতে চাহেন। প্রকৃত নিষ্কামকর্ম্মী পশুবৎ জড়প্রকৃতি বা হৃদয়শূন্য নহেন। তাঁহার অন্তর এতদূর ভালবাসায় ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ যে, তিনি সকল জগৎকে প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিতে পারেন। এরূপ প্রেম ও সহানুভূতি লোকে সচরাচর বুঝিতে পারে না। এই সমন্বয় ভাব ও নিষ্কাম কর্ম্ম—এই দুইটি গীতার বিশেষত্ব।

এক্ষণে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে একটু পাঠ করা যাক্।

'তং তথা কৃপয়াবিষ্টং' ইত্যাদি শ্লোকে কি সুন্দর কবিত্বের ভাবে অর্জ্জুনের অবস্থাটি বর্ণিত হইয়াছে। তারপর শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ,'—এই স্থানে অর্জ্জুনকে ভগবান্ যুদ্ধে প্রবৃত্তি দিতেছেন কেন? অর্জ্জুনের বাস্তবিক সত্ত্বগুণ উদ্রিক্ত হইয়া যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি হয় নাই; তমোগুণ হইতেই যুদ্ধে অনিচ্ছা হইয়াছিল। সত্ত্বগুণী ব্যক্তির স্বভাব এই যে, তাঁহারা অন্য সময়ে যেরূপ শান্ত, বিপদের সময়ও সেইরূপ ধীর। অর্জ্জুনের ভয় আসিয়াছিল। আর তাঁহার ভিতরে যে যুদ্ধপ্রবৃত্তি ছিল, তাহার প্রমাণ এই—তিনি যুদ্ধ করিতেই যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। সচরাচর আমাদের জীবনেও এইরূপ ব্যাপার দেখা যায়। অনেকে মনে করেন, আমরা সত্ত্বগুণী, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা তমোগুণী। অনেকে অতি অশুচি ভাবে থাকিয়া মনে করেন, আমরা পরমহংস। কারণ, শাস্ত্রে আছে, পরমহংসেরা জড়োন্মত্তপিশাচবৎ হইয়া থাকেন।

'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'

পরমহংসদিগের সহিত বালকের তুলনা করা হয়, কিন্তু তথায় বুঝিতে হইবে, ঐ তুলনা একদেশী। পরমহংস ও বালক কখনই অভিন্ন নহে। একজন জ্ঞানের অতীত অবস্থায় পঁহুছিয়াছেন, আর এক জনের জ্ঞানোন্মেষ মোটেই হয় নাই। আলোকের পরমাণুর অতি তীব্র স্পন্দন ও অতি মৃদু স্পন্দন উভয়ই দৃষ্টির বহির্ভূত। কিন্তু একটিতে তীব্র উত্তাপ ও অপরটিতে তাহার অত্যন্তাভাব বলিলেই হয়। সত্ত্ব ও তমোগুণ কিয়দংশে একরূপ দেখাইলেও উভয়ে অনেক প্রভেদ। তমোগুণ—সত্ত্বগুণের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আসিতে বড় ভালবাসেন। এখানে দয়ারূপ আবরণে উপস্থিত হইয়াছেন। অর্জ্জুনের এই মোহ অপনয়ন করিবার জন্য ভগবান কি বলিলেন? আমি যেমন প্রায়ই বলিয়া থাকি যে, লোককে পাপী না বলিয়া তাহার ভিতর যে মহাশক্তি আছে, সেই দিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়া দাও, ঠিক সেই ভাবেই ভগবান্ বলিতেছেন, 'নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে'—তোমাতে ইহা সাজে না। তুমি সেই আত্মা, তুমি আপনাকে ভুলিয়া আপনাকে পাপী, রোগী, শোকী করিয়া তুলিয়াছ—এ ত তোমার সাজে না। তাই ভগবান্ বলিতেছেন, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ।' জগতে পাপ তাপ নাই, রোগ শোক নাই; যদি কিছু পাপ জগতে থাকে, তাহা এই 'ভয়'। যে কোন কার্য্য তোমার ভিতরে শক্তির উদ্রেক করিয়া দেয়, তাহাই পুণ্য; আর যাহা তোমার শরীর-মনকে দুর্ব্বল করে, তাহাই পাপ। এই দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ কর। 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ,' তুমি বীর, তোমার এ সাজে না। তোমরা যদি জগৎকে এ কথা শুনাইতে পার—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ, নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে,' তাহা হইলে

তিন দিনের ভিতর এ সকল রোগ, শোক, পাপ, তাপ কোথায় চলিয়া যাইবে। এখানকার বায়ুতে ভয়ের কম্পন বহিতেছে। এ কম্পন উল্টাইয়া দাও। তুমি সর্ব্বশক্তিমান,—যাও, তোপের মুখে যাও, ভয় করিও না। মহাপাপীকে ঘৃণা করিও না, তাঁহার বাহির দিক দেখিও না। ভিতরের দিকে যে পরমাত্মা রহিয়াছেন, সেই দিকে দৃষ্টিপাত কর—সমগ্র জগৎকে বল, তোমাতে পাপ নাই, তাপ নাই, তুমি মহাশক্তির আধার।

এই একটি শ্লোক পড়িলেই সমগ্র গীতাপাঠের ফল পাওয়া যায়, কারণ, এই শ্লোকের মধ্যেই গীতার সমগ্র ভাব নিহিত।

আলমোড়া

স্বামিজী স্বাস্থ্যলাভার্থ কলিকাতা হইতে মধ্যে দার্জ্জিলিঙে গমন করিয়া তথায় দুই মাস কাল যাপন করেন। কলিকাতায় ফিরিবার কয়েক দিন পরেই কিন্তু হিমালয়ের অন্তর্গত আলমোড়া শহর হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহাকে তথায় যাইতে হইল। আলমোড়ার নিকটবর্ত্তী লোদিয়া নামক স্থানে এক মহতী জনতা আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। ক্রমাগত জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। স্বামিজী অশ্বারোহণে আলমোড়া শহরে প্রবেশ করিলেন। বাজারের রাস্তার কিয়দংশ বস্ত্রাবৃত করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তথায় সামিয়ানা অতি উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়া টাঙ্গান হইয়াছিল। অভ্যর্থনাসমিতির তরফ হইতে পণ্ডিত জ্বালাদত্ত যোশী হিন্দীতে একটি অভিনন্দন পাঠ করিলেন। উহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল :—

আলমোড়া অভিনন্দন

মহাত্মন্,

পাশ্চাত্যদেশে আধ্যাত্মিক দিগ্বিজয় সাধন করিয়া আপনি ইংলণ্ড হইতে আপনার মাতৃভূমি ভারতে আসিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন শুনিয়া অবধি আমরা স্বভাবতঃই আপনার দর্শনার্থ উৎসুক হইয়াছি। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের কৃপায় অবশেষে আমাদের বাসনা সফল হইল—আজ সেই শুভ মুহূর্ত্ত সমাগত।

ভক্তরাজ তুলসীদাস বলিয়াছেন,—'যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও প্রাণের সহিত ভালবাসে, সে নিশ্চিত তাহাকে পাইবে।' আজ আমরা তাঁহার সেই বাক্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম। আমরা আজ আপনাকে আন্তরিক ভক্তির সহিত অভ্যর্থনা করিবার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছি। আপনি কষ্ট স্বীকার করিয়া যে এই শহরে আসিয়া পুনরায়* আমাদিগকে দর্শন দিলেন, তাহাতে আমরা যে কি পর্য্যন্ত বাধিত হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। আপনার দয়ার জন্য যে আপনাকে কিরূপ ধন্যবাদ দিব, তাহা আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। ধন্য আপনি! ধন্য আপনার পূজ্যপাদ গুরুদেব, যিনি আপনাকে যোগমার্গে দীক্ষিত করেন। ধন্য এই ভারতভূমি, যেখানে এই ভয়াবহ কলিযুগেও আপনার ন্যায় আর্য্যবংশীয়গণের নেতা রহিয়াছেন। আপনি অতি অল্প বয়সেই আপনার সারল্য, অকপটতা, মহৎ চরিত্র, সর্ব্বভূতানুকম্পা, কঠোর সাধন, অমায়িক ব্যবহার ও জ্ঞানবিস্তারের চেষ্টা দ্বারা সমগ্র জগতে অক্ষয় যশঃ লাভ করিয়াছেন, আর আমরা তাহা লইয়া আজ এতদূর গৌরব অনুভব করিতেছি।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পর এদেশে আর কেহ কখন যে চেষ্টা করেন নাই, প্রকৃতপক্ষে আপনি সেই গুরুতর কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। আমাদের মধ্যে কে স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল যে, প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যগণের একজন বংশধর তপস্যার বলে ইংলণ্ড ও আমেরিকার বুধমণ্ডলীর সমক্ষে অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম্মের

* স্বামিজী পাশ্চাত্যদেশে যাত্রার অনেক পূর্ব্বে হিমালয় ভ্রমণকালে এখানে আসিয়াছিলেন।

শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিবেন ? চিকাগোর ধর্ম্মমহামণ্ডলীতে সমবেত বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রতিনিধিগণের সমক্ষে আপনি ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা এরূপ দক্ষতার সহিত সমর্থন করিলেন যে, তাঁহাদের চক্ষু খুলিয়া গেল। সেই মহতী সভায় বিদ্বান্ বক্তাগণ নিজ নিজ ভাবে নিজ নিজ ধর্ম্ম সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনারই জয়লাভ হইল। অন্য কোন ধর্ম্ম যে বৈদিক ধর্ম্মের সহিত প্রতি-যোগিতায় দাঁড়াইতে পারে না, ইহা আপনি সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ করিয়া দিলেন। শুধু তাহাই নহে, আমেরিকার নানা স্থানে এই প্রাচীন জ্ঞানের বার্ত্তা প্রচার করিয়া আপনি অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রাচীন আর্য্যধর্ম্ম ও দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছেন। ইংলণ্ডেও আপনি সনাতন ধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন—এক্ষণে উহাকে স্থানচ্যুতি করা অসম্ভব।

এত দিন পর্য্যন্ত ইউরোপ ও আমেরিকার বর্ত্তমান সভ্যজাতি-সমূহ আমাদের ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্বসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। কিন্তু আপনি আপনার আধ্যাত্মিক উপদেশাবলির দ্বারা তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দিয়াছেন। এখন তাহারা জানিয়াছে যে, যে সনাতন ধর্ম্মকে তাহারা অজ্ঞতাবশতঃ 'পণ্ডিতম্মন্যগণের চুলচেরা বিচারের ধর্ম্ম অথবা নির্ব্বোধদিগের জন্য কতকগুলি বৃথা বাগ্‌জাল' বলিয়া মনে করিত, তাহা প্রকৃতপক্ষে রত্নের খনি। বাস্তবিকই

'বরমেকো গুণী পুত্রো ন চ মূর্খশতৈরপি।
একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি ন চ তারাগণৈরপি॥'

আপনার ন্যায় সাধু ও ধার্ম্মিকগণের জীবনই জগতের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণকর। বর্ত্তমান ভারতের এই হীনাবস্থাসত্ত্বেও আপনার ন্যায়

ধার্ম্মিক সন্তানগণকে পাইয়াই ভারতমাতা সান্ত্বনা লাভ করিতেছেন। অনেকেই সাগর পার হইয়া এদিকে ওদিকে ছুটিয়া ঘুরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আপনার পূর্ব্বসুকৃতিবশে আপনি সমুদ্রপারে গিয়া আমাদের ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আপনি, সমগ্র মানবজাতিকে কায়মনোবাক্যে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া, আপনার জীবনের একমাত্র ব্রত করিয়াছেন। আপনি সর্ব্বদাই ধর্ম্মশিক্ষাদানে প্রস্তুত।

আপনি হিমালয়ে একটি মঠ স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন জানিয়া আমরা বড়ই সুখী হইয়াছি আর আমরা অকপটভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, যেন আপনার এই উদ্দেশ্য সফল হয়। আচার্য্যপ্রবর শঙ্করও তাঁহার আধ্যাত্মিক দিগ্বিজয়ের পর সনাতন ধর্ম্মের রক্ষার জন্য হিমালয়স্থ বদরিকাশ্রমে একটি মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় যদি আপনারও কামনা সফল হয়, তবে ভারতের প্রভূত কল্যাণ হইবে। এই মঠ স্থাপিত হইলে কুমায়ুনবাসী আমরা বিশেষভাবে ধর্ম্মবিষয়ে লাভবান্ হইব— আমাদিগের মধ্য হইতে সনাতন ধর্ম্মের ক্রমশঃ তিরোধান আমাদিগকে আর দেখিতে হইবে না।

স্মরণাতীত কাল হইতে এই হিমালয় তপোভূমিরূপে পরিগণিত। শ্রেষ্ঠতম ভারতীয় সাধুগণ এই স্থানে ধ্যান ধারণা ও তপস্যানিরত হইয়া জীবনযাপন করিয়াছেন। এখন সে সব অতীতের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা অন্তরের সহিত প্রার্থনা করি যে, এই মঠস্থাপনের দ্বারা আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে পুনরায় সেই ভাব উপলব্ধি করাইবেন। এই পবিত্র ভূমিই এক সময়ে সমগ্র ভারতে প্রকৃত ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সাধনা ও অকপট ব্যবহারপূর্ণ স্থান

বলিয়া বিখ্যাত ছিল—কালপ্রভাবে সেই সমুদয় হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। আমরা আশা করি, আপনার মহতী চেষ্টা দ্বারা ইহা আবার ইহার প্রাচীন ধর্ম্মগৌরব লাভ করিবে।

আপনার আগমনে আমরা যে কিরূপ আনন্দিত হইয়াছি, তাহা আমরা ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম। প্রার্থনা করি, আপনি দীর্ঘজীবন ও পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিয়া লোকহিতব্রতে নিযুক্ত থাকুন। আপনার আধ্যাত্মিক শক্তি দিন দিন বাড়িতে থাকুক—যেন আপনার চেষ্টা দ্বারা ভারতের এই দুরবস্থা শীঘ্র অপনীত হয়।

লালা বদরীশার হইয়া পণ্ডিত হরিনাম পাঁড়ে আর একটি অভিনন্দনপত্র পাঠ করিলেন। স্বামিজী যতদিন আলমোড়ায় ছিলেন, ততদিন এই শাজীর অতিথি হইয়াই বাস করিয়াছিলেন। আর একজন পণ্ডিত একটি সংস্কৃত অভিনন্দনপত্র পাঠ করিলেন।

আলমোড়া অভিনন্দনের উত্তর

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ শয়নে স্বপনে যে ভূমির বিষয় ধ্যান করিতেন, এই সেই ভূমি—ভারতজননী পার্ব্বতী দেবীর জন্মভূমি। এই সেই পবিত্র ভূমি, যথায় ভারতের প্রত্যেক যথার্থ সত্যপিপাসু আত্মা শেষ অবস্থায় আসিয়া জীবনের যবনিকাপাতে অভিলাষী হয়। এই পবিত্র ভূমির গিরিশিখরে, ইহার গভীর গহ্বরে, ইহার দ্রুতগামিনী স্রোতস্বতীসমূহের তীরে সেই অপূর্ব্ব তত্ত্বরাশি চিন্তিত হইয়াছিল—যাহার কণামাত্র বৈদেশিকগণের নিকট হইতে পর্য্যন্ত এরূপ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে, এবং উহার শ্রেষ্ঠতা নিকৃষ্টতা বিচারে অধিকারী পুরুষগণ যাহাকে অতুলনীয় বলিয়া আপনাদের মত

প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাই সেই ভূমি—অতি বাল্যকাল হইতেই আমি যেখানে বাস করিবার কল্পনা করিতেছি—আর তোমরা সকলেই জান, আমি এখানে চিরবাসের জন্য কতবারই না চেষ্টা করিয়াছি; আর যদিও উপযুক্ত সময় না আসায় এবং আমার কর্ম্ম থাকায় আমি এই পবিত্র ভূমি ত্যাগে বাধ্য হইয়াছি, তথাপি আমার প্রাণের বাসনা—এই ঋষিগণের প্রাচীন নিবাসভূমি. দর্শনশাস্ত্রের জন্মভূমি এই পর্ব্বতরাজের ক্রোড়ে আমার জীবনের শেষ দিন কয়টা কাটাইব। সম্ভবতঃ, বন্ধুগণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় এবারও বিফলমনোরথ হইব, নির্জ্জনে নিস্তব্ধতার মধ্যে অজ্ঞাতভাবে থাকা হয় ত আমার ঘটিবে না, কিন্তু আমি অকপটভাবে প্রার্থনা ও আশা করি, শুধু তাহাই নহে, একরূপ বিশ্বাস করি যে, জগতের অন্যান্য স্থানে না হইয়া এইখানেই আমার জীবনের শেষ কয়টা দিন কাটিবে। হে এই পবিত্র ভূমির অধিবাসিগণ, পাশ্চাত্যদেশে আমার সামান্য কার্য্যের জন্য তোমরা কৃপা করিয়া আমার যে প্রশংসাবাদ করিয়াছ, তাহার জন্য তোমাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু এক্ষণে আমার মন কি পাশ্চাত্য, কি প্রাচ্য কোন দেশের কার্য্য-সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহিতেছে না। যেমন এই শৈলরাজের চূড়ার পর চূড়া আমার নয়নগোচর হইতে লাগিল, ততই আমার কর্ম্মপ্রবৃত্তি—বৎসর বৎসর ধরিয়া আমার মাথায় যে বুদ্বুদ খেলিতেছিল, তাহা—যেন শান্ত হইয়া আসিল, আর কি কাজ আমি করিয়াছি, ভবিষ্যতেই বা আমার কি কার্য্য করিবার সঙ্কল্প আছে, ও সকল বিষয়ে আলোচনায় মন না গিয়া এখন আমার মন

বৈরাগ্যভূমি হিমালয়

—হিমালয় যে এক সনাতন সত্য অনন্তকাল ধরিয়া শিক্ষা দিতেছে, যে এক সত্য এই স্থানের হাওয়াতে পর্য্যন্ত খেলিতেছে, ইহার নদীসমূহের বেগশীল আবর্ত্তসমূহে আমি যে এক তত্ত্বের মৃদু অস্ফুট-ধ্বনি শুনিতেছি, সেই ত্যাগের দিকে প্রধাবিত হইয়াছে।

"সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।'

'এই জীবনে সকল জিনিসই ভয়ের কারণ—কেবল বৈরাগ্যবলেই নির্ভীক হওয়া যায়।'

হাঁ, সত্যই ইহা বৈরাগ্য-ভূমি। এখন আমার মনের ভাবসমূহ বিস্তারিতভাবে বলিবার সময় বা সুযোগ নাই। অতএব উপসংহারে বলিতেছি যে, এই হিমালয় পর্ব্বত বৈরাগ্য ও ত্যাগের সাকার মূর্ত্তিরূপে দণ্ডায়মান আর মানবজাতিকে এই ত্যাগ হইতে উচ্চতর ও মহত্তর আর কিছু শিক্ষা দিবার আমাদের নাই। যেমন আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তাঁহাদের জীবনের শেষভাগে এই হিমালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইতেন, সেইরূপ ভবিষ্যতে জগতের সর্ব্বস্থান হইতে বীর-হৃদয় ব্যক্তিগণ এই শৈলরাজের দিকে আকৃষ্ট হইবেন—যখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরোধ ও মতপার্থক্য লোকের স্মৃতিপথ হইতে অন্তর্হিত হইবে, যখন তোমার ধর্ম্মে ও আমার ধর্ম্মে যে বিবাদ, তাহা একেবারে অন্তর্হিত হইবে, যখন মানুষ বুঝিবে—এক সনাতন ধর্ম্মমাত্র বিদ্যমান—অন্তরে ব্রহ্মানুভূতি—আর যাহা কিছু সব বৃথা। এইরূপ সত্যপিপাসু জীবগণ, সংসার মায়ামাত্র, আর ঈশ্বর—কেবল ঈশ্বরের উপাসনা ব্যতীত আর সবই বৃথা জানিয়া, এখানে আসিবে।

বন্ধুগণ, তোমরা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার একটি সঙ্কল্পের বিষয়

উল্লেখ করিয়া আমায় বাধিত করিয়াছ। আমার মাথায় এখনও হিমালয়ে একটা কেন্দ্র স্থাপন করিবার সঙ্কল্প আছে; আর অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এই স্থানটিই এই সার্ব্বভৌম ধর্ম্মশিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্ররূপে কেন নির্ব্বাচিত করিয়াছি, তাহাও সম্ভবতঃ আমি তোমাদিগকে উত্তমরূপে বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছি। এই হিমালয়ের সহিত আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠতম স্মৃতিসমূহ জড়িত। যদি ভারতের ধর্ম্মেতিহাস হইতে হিমালয়কে বাদ দেওয়া যায়, তবে উহার অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকিবে। অতএব এখানে একটি কেন্দ্র হওয়া চাইই চাই—এ কেন্দ্র কর্ম্মপ্রধান হইবে না—এখানে নিস্তব্ধতা, শান্তি ও ধ্যানশীলতা অধিক মাত্রায় বিরাজ করিবে, আর আমি আশা করি, একদিন না একদিন আমি ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিব। আমি আরও আশা করি, আমি অন্য সময়ে তোমাদের সহিত মিলিত হইয়া এসকল বিষয় আলোচনা করিবার অধিকতর অবকাশ পাইব। এক্ষণে তোমরা আমার প্রতি যে সহৃদয় ব্যবহার করিয়াছ, তজ্জন্য তোমাদিগকে আবার ধন্যবাদ দিতেছি, আর ইহা আমি কেবল আমার প্রতি ব্যক্তিগত সদয় ব্যবহাররূপে গ্রহণ করিতে চাই না—আমি মনে করিতে চাই—আমাদের ধর্ম্মের প্রতিনিধি বলিয়া তোমরা আমার প্রতি এরূপ সহৃদয় ব্যবহার করিয়াছ। প্রার্থনা করি, এই ধর্ম্মভাব তোমাদিগকে যেন পরিত্যাগ না করে। প্রার্থনা করি, এক্ষণে আমরা যেরূপ পবিত্রভাবাপন্ন এবং ধর্ম্মভাবে মাতোয়ারা রহিয়াছি এইরূপই যেন সর্ব্বদাই থাকিতে পারি।

হিমালয়ে মঠ স্থাপনের উদ্দেশ্য

আলমোড়ায় অন্যান্য বক্তৃতা

স্বামিজীর আলমোড়া হইতে চলিয়া যাইবার দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিলে তাঁহার আলমোড়ার ভক্তগণ তাঁহাকে বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। স্থানীয় ইংরাজ অধিবাসিগণও তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে ইংলিশ ক্লাবে বক্তৃতা দিবার নিমন্ত্রণ করিলেন। স্থানীয় জেলা স্কুলে হিন্দীতে ও ক্লাবে ইংরাজীতে বক্তৃতা হইল। অনেকের মনে আশঙ্কা ছিল যে, হিন্দী ভাষা অসম্পূর্ণ ভাষা—সুতরাং উহাতে বক্তৃতা দিবার সুবিধা হইবে না। কিন্তু স্বামিজী যখন বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন ও ক্রমশঃ সুস্পষ্ট অথচ ওজস্বিনী ভাষায় তাঁহার বক্তব্য বিষয় বিবৃত করিতে লাগিলেন তখন সকলের ভ্রম বিদূরিত হইল। সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল—ভাষা যেন স্বামিজীর হস্তে যন্ত্রবিশেষ হইয়া যথেচ্ছ পরিচালিত হইতেছে; তিনি নূতন নূতন বাক্য, এমন কি, নূতন নূতন পদ পর্য্যন্ত গঠন করিয়া অনর্গল নিজ ভাব ব্যক্ত করিতেছেন। যাঁহারা হিন্দী ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ এবং যাঁহারা জানিতেন—হিন্দী ভাষা ওজস্বিনী বক্তৃতার কিরূপ অনুপযোগিনী, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন—স্বামিজী হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা করিতে যেরূপ কৃতকার্য্য হইলেন, এরূপ আর কেহ কখন হন নাই—শুধু তাহাই নহে, তিনি তাঁহার বক্তৃতার দ্বারা ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে হিন্দী ভাষার মধ্যে এমন যথেষ্ট উপাদান আছে, যদবলম্বনে হিন্দী ভাষার অচিন্ত্যপূর্ব্ব উন্নতি সাধন করিয়া উহাকে ওজস্বিনী বক্তৃতার উপযোগী করা যাইতে পারে।

বক্তৃতার বিষয় ছিল—"বেদের উপদেশ—তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক" (Vedic Teachings in Theory and Practice)। বাছাবাছা উচ্চশিক্ষিত প্রায় ৪ শত শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল। তাঁহারা অতিশয় আগ্রহের সহিত স্বামিজীর পাণ্ডিত্য ও ওজস্বিতাপূর্ণ বক্তৃতা শুনিতে লাগিলেন।

ইংলিশ ক্লাবে যে বক্তৃতা হয়, তাহাতে স্থানীয় সমুদয় ইংরাজ অধিবাসীই উপস্থিত ছিলেন। গুর্খা রেজিমেন্টের কর্ণেল পুলি সভাপতি হইয়াছিলেন। প্রথমে 'উপজাতীয় দেবতা' উপাসনার উৎপত্তি ও দেশ বিজয় দ্বারা উহার বিস্তৃতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া বেদের বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন। বেদে কি আছে, বেদের উপদেশ কি, সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া স্বামিজী আত্মার তত্ত্ব আনিয়া ফেলিলেন। পাশ্চাত্যপ্রণালীর (যাহা বাহ্যজগতে জীবনের গুরুতর সমস্যাসমূহের সমাধান করিতে যায়) সহিত প্রাচ্যপ্রণালীর (যাহা বহির্জ্জগতে উহার উত্তর না পাইয়া অন্তর্জ্জগতের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়) তুলনা করিলেন। স্বামিজী বলিলেন, হিন্দুজাতিই এই অন্তর্জ্জগতের অনুসন্ধানপ্রণালীর আবিষ্কর্ত্তা—ইহা এই জাতির বিশেষ সম্পত্তি—আর একমাত্র ঐ প্রণালীর সহায়তায় তাঁহারা ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতারূপ মহারত্ন আবিষ্কার করিয়া সমগ্র জগৎকে উহা প্রদান করিয়াছেন। ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া স্বামিজী আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ এবং উভয়ের স্বরূপতঃ একত্ব বিবৃত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মুহূর্ত্তের জন্য বোধ হইল—বক্তা, তাঁহার বক্তৃতা ও শ্রোতৃবৃন্দ যেন এক হইয়া গিয়াছে। যেন 'আমি' 'তুমি' 'উহা' কিছুই

নাই। যে সকল বিভিন্ন ব্যক্তি তথায় সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা যেন ক্ষণকালের জন্য সেই আচার্য্যবর্য্যের দেহ হইতে মহাশক্তিতে নিঃসরণশীল আধ্যাত্মিক জ্যোতিতে মিশিয়া আত্মহারা হইয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ রহিলেন।

যাঁহারা স্বামিজীর বক্তৃতা অনেকবার শুনিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনে অনেকবার এইরূপ অনুভূতি হইয়াছে। ক্ষণকালের জন্য তিনি যেন আর অবহিত, দোষগুণসমালোচক শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে বক্তৃতাকারী স্বামী বিবেকানন্দ থাকেন না—সে সময়ের জন্য যেন সব বিভিন্নতা, ব্যক্তিত্ব অন্তর্হিত হয়—নাম রূপ উড়িয়া যায়—কেবল এক চৈতন্যমাত্র বিরাজিত থাকে—যাহাতে বক্তা, শ্রোতা ও বাক্য এক হইয়া যায়।

পঞ্জাব ও কাশ্মীর

আড়াই মাস আলমোড়ায় থাকিয়া স্বামীজি নিমন্ত্রিত হইয়া পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ইংরাজী বক্তৃতা অতি অল্পই হইয়াছিল। হিন্দী ভাষায় অনেক স্থানে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সে সকলের রিপোর্ট আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সমাগত ভদ্রলোকগণের সহিত যথেষ্ট চর্চ্চা হইত এবং যেখানে যাইতেন, তথায়ই তিনি ছাত্রগণের ভিতর বিশেষভাবে কার্য্য করিতে প্রয়াস পাইতেন। এই সময়কার স্বামিজীর ভ্রমণের অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত বিবরণ স্বামিজীর ভবিষ্যৎ বিস্তারিত জীবনচরিতলেখকের কিছু কাজে লাগিতে পারে এবং স্বামিজীর ভক্তগণেরও কিঞ্চিৎ কৌতূহল চরিতার্থ হইতে পারে, এই বিশ্বাসে আমরা স্বামী অচ্যুতানন্দ নামক আর্য্যসমাজের ভূতপূর্ব্ব প্রচারক এবং স্বামিজীর একটি বিশেষ ভক্ত তাঁহার সঙ্গে ভ্রমণের সুযোগ পাইয়া তদীয় সংক্ষিপ্ত কার্য্যকলাপের বর্ণনাসমন্বিত যে ডায়েরী রাখিয়াছিলেন, আমরা তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

১৮৯৭—১০ই আগষ্ট, স্থান বেরিলি, প্রিয়নাথ বাবুর বাংলা। প্রাতঃকালে দুইজন ভদ্রলোকের সহিত অল্পক্ষণ সদালোচনা। পশ্চাৎ আর্য্যসমাজীয় অনাথালয় দর্শন। ভোজনান্তে লেবুমিশ্রিত চিনির সরবৎ পান। ছয় মাসের মধ্যে এরূপ সরবৎ আর পান করেন নাই।

অপরাহ্নে সমাগত লোকদিগের সহিত নানাবিধ তত্ত্বের আলোচনা। সন্ধ্যার সময় অল্প জ্বর, শরীর দুর্ব্বল।

১১ই আগষ্ট, স্থান ঐ। প্রাতঃকালে দুইজন ভদ্রলোককে তত্ত্ব উপদেশ। অপরাহ্নে লোকগণের সহিত নানাবিধ ধর্ম্মালোচনা, পশ্চাৎ ছাত্রসভার সংস্থাপন। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে অল্প জ্বর। এই দিন দিবাভাগে আহারের পর স্বামিজী অচ্যুতানন্দকে বলিলেন যে, আমি আর ৫।৬ বৎসর জীবিত থাকিব।*

১২ই আগষ্ট, স্থান ঐ। শরীর অসুস্থ, তথাপি দুইজন মুন্‌সেফ এবং অন্যান্য ভদ্রলোকের সহিত গভীর ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা। আহারান্তে জ্বর—অতিশয় কষ্ট হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই জ্বরের কতক শান্তি হইলে সমাগত অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণকে ধর্ম্মের সারতত্ত্ব সম্বন্ধে উত্তেজনাপূর্ণ উপদেশ। পরে রাত্রি ১১টার সময় ২য় শ্রেণীর রেলগাড়ীতে অম্বালায় গমন।

১৩ই আগষ্ট, স্থান অম্বালা ছাউনী। প্রাতঃকাল ৭টার সময় ট্রেণ অম্বালা ছাউনীতে আসিল। কতিপয় বাঙ্গালী ভদ্রলোক অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন, অশ্বশকটে আরূঢ় হইয়া বাংলায় আগমন। সেভিয়ার সাহেবের (ইনি এই ভ্রমণের সময় স্বামীজির সহিত অনেক স্থানেই ছিলেন) সহিত কথোপকথন এবং অন্যান্য ভদ্রলোকের সহিত বার্ত্তালাপ। শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ, মুখ হাস্যযুক্ত।

১৪ই আগষ্ট, স্থান ঐ। প্রাতঃকালে সমাগত লোকগণের সহিত অল্প আলোচনা। ভোজনান্তে ক্ষীরোদ বাবু এবং অন্যান্য ভদ্রলোকের

---

* ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই স্বামিজীর দেহত্যাগ হয়।

সহিত বিশেষ আলোচনা। শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল দেখিয়া সঙ্গিগণ সকলেই আনন্দিত।

১৫ই আগষ্ট, স্থান ঐ। প্রাতঃকালে অল্প আলোচনার পর ভ্রমণ করিতে করিতে সেভিয়ার সাহেবের বাংলায় গমন। ঐ সময়ে অনেক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বাহিরে গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। অপরাহ্নে আর্য্যসমাজীদের সহিত ধর্ম্মালোচনা। রাত্রিতে প্রচারকার্য্যের কথোপকথন। শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ।

১৬ই আগষ্ট, স্থান ঐ। প্রাতঃকালে সমাগত লোকগণের সহিত ধর্ম্মালোচনা। অপরাহ্নেও ঐ; রাত্রে মুসলমান, ব্রাহ্ম, আর্য্যসমাজী এবং হিন্দু এই সকল বিভিন্নমতাবলম্বী অনেক ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহাদের সহিত নানাবিধ তত্ত্বের আলোচনা হইল। লাহোর কলেজের জনৈক অধ্যাপক একটি ফনোগ্রাফ যন্ত্র লইয়া আসিয়া তাঁহাকে উহার মধ্যে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিলে তিনি অধ্যাপকের অনুরোধ রক্ষা করিলেন। শরীরের অবস্থা মাঝামাঝি।

১৭ই আগষ্ট, স্থান ঐ। প্রাতঃকালে সমাগত আর্য্যসমাজীদিগের সহিত বিশেষ শাস্ত্রালোচনা। আর্য্যসমাজীগণ নানাবিধ কূট প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু যথাযথ উত্তরদানে স্বামিজী সকলকেই নিরস্ত করিলেন, ভোজনের পর শরীর আবার অতিশয় অসুস্থ হইল, উদরে বেদনাবোধ হইতে লাগিল। তথাপি সন্ধ্যার পর এক ক্ষুদ্র সভায় উপস্থিত হইয়া দেড়ঘণ্টা যাবৎ হৃদয়গ্রাহী ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। রাত্রে অনাহার।

১৮ই আগষ্ট, স্থান ঐ। প্রাতঃকালে অল্প আলোচনা। আহারান্তে সমাগত লোকগণের সহিত কথোপকথন। রাত্রে তিনজন ভদ্রলোকের সহিত ইউরোপ, আমেরিকা এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানাবিধ কথা—স্বদেশোন্নতির প্রকৃত উপায় প্রদর্শন। শরীর পূর্ব্বদিন অপেক্ষা সুস্থ।

১৯শে আগষ্ট, স্থান ঐ। প্রাতঃকালে অল্প আলোচনা। পশ্চাৎ হিন্দু-মহমেডান্ স্কুল দর্শন। ভোজনান্তে শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ভদ্রলোকগণের সহিত অল্প আলোচনা। সন্ধ্যার পর আর্য্যসমাজী দ্বারকানাথ উকীল প্রমুখ অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত দেশভক্তি সমাজনীতি এবং তত্ত্ববিদ্যার সবিশেষ আলোচনা। দ্বারকানাথ বাবু স্বামিজীর কথাবার্ত্তায় বড়ই প্রীতিলাভ করিলেন। শ্যামবাবু অম্বালাতে স্বামিজী ও তাঁহার সঙ্গিগণের প্রতি বড়ই সদ্ব্যবহার করিলেন।

২০শে আগষ্ট—পূর্ব্বাহ্ণ বেলা ৯টার সময় মেলে অম্বালা হইতে সেভিয়ার দম্পতির সহিত অমৃতসর গমন। ষ্টেশনে অনেক ভদ্রলোক অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। ৪।৫ ঘণ্টা ব্যারিষ্টার তোড়রমলের বাটিতে থাকিয়া পশ্চাৎ কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া স্বাস্থ্যলাভের জন্য ধর্ম্মশালা নামক স্থানে গমন—সঙ্গে কেবল সেভিয়ার দম্পতী। ১৫ দিন তথায় বাস করিয়া পুনরায় অমৃতসরে গমন, ২ দিন অবস্থান। এখানে রায় মূলরাজ প্রমুখ আর্য্যসমাজীদের প্রধান প্রধান ব্যক্তির সহিত নানাবিধ আলোচনা।

অনুমান ৩১শে আগষ্ট অমৃতসর হইতে মেলে রাওলপিণ্ডি

গমন। ষ্টেশনে ডাক্তার ভক্তরামের ভ্রাতা স্বামিজীর জন্য বগি প্রভৃতির আয়োজন করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু স্বামিজী রাওলপিণ্ডিতে অবস্থান না করিয়া তৎক্ষণাৎ সেভিয়ার দম্পতির সহিত টঙ্গায় মরি পাহাড়ে চলিয়া গেলেন। স্বামিজীর অন্যান্য সঙ্গিগণ পশ্চাতে এক্কায় গেলেন। মরিতে উকীল হংসরাজের বাটীতে অবস্থিতি। ওখানকার বাঙ্গালী বাবুগণ স্বামিজীকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহাদের গৃহে যাইয়া স্বামিজী অনেক ধর্ম্মবিষয়ক গান গাহিলেন এবং তাঁহাদিগকে অনেক উপদেশ দিলেন। মরিতে অনুমান ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে আসা হইল। স্বামিজী সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে কাশ্মীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মরি হইতে অনুমান ৬ই সেপ্টেম্বর সকলে টঙ্গায় চড়িয়া ৮ই তারিখে বারামূলা আগমন। তথা হইতে তখন নৌকায় আরোহণ করিয়া শ্রীনগরে যাওয়া হইল। রাস্তায় সঙ্গি-গণের সহিত নানাবিধ চর্চ্চা—বড়ই আনন্দ।

১০ই সেপ্টেম্বর। শ্রীনগরে চিফ্ জাষ্টিস ঋষিবর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে অবস্থিতি। তিনি অতিশয় আগ্রহের সহিত স্বামিজীকে নিজ গৃহে রাখিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত ডাক্তার মিত্রেরও আলাপ হইল। তিনিও স্বামিজীর প্রতি সদ্ভাব প্রকাশ করিলেন। কাশ্মীরী অনেক পণ্ডিত তাঁহার নিকট আসিয়া নানাবিধ সৎচর্চ্চা করিতেন।

১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে রাজবাড়ী দর্শন করিতে গমন করিলেন। তথায় কোন পঞ্জাবী রাজকর্ম্মচারী আসিয়া তাঁহাকে অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন এবং রাজার সহিত তাঁহার সাক্ষাতের

অভিপ্রায় আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামিজী উত্তর করিলেন, হাঁ। এই অবসরে ডাক্তার মিত্র উপর হইতে নীচে আসিয়া স্বামিজীকে বলিলেন, কাল রাজা রামসিংহের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। ডাক্তার বাবুর সহিত অন্যান্য নানা বিষয়ের আলোচনা, ভ্রমণাদি।

১৪ই সেপ্টেম্বর, স্থান শ্রীনগর, কাশ্মীর। প্রাতঃকালে নানাবিধ চর্চ্চা। বেলা ২টার সময় রাজভবনে গমন। রাজা স্বামিজীকে যথোচিত সমাদর করিলেন—স্বামিজীকে চেয়ারে বসাইয়া কর্ম্মচারিগণের সহিত স্বয়ং নীচে আসনে বসিলেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক বিষয় চর্চ্চা হইল, প্রায় দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত। পশ্চাৎ স্বস্থানে গমন। ফিরিয়া আসিয়া সমাগত লোকগণের সহিত চর্চ্চা—পশ্চাৎ ভ্রমণ।

১৫ই সেপ্টেম্বর, স্থান ঐ—প্রাতঃকালে শঙ্করাচার্য্যের পর্ব্বত দর্শন, প্রত্যাগমন করিয়া সমাগত ব্যক্তিগণের সহিত আলোচনা। পশ্চাৎ ভোজনান্তে পুনর্ব্বার চর্চ্চা। দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চর্চ্চা হইল। পশ্চাৎ ভ্রমণান্তে সন্ধ্যার পর কয়েকজন পণ্ডিত এবং অপরাপর লোকের সহিত চর্চ্চা। একদিন একটি পাঞ্জাবী সাধু আসিলেন।

১৬ই সেপ্টেম্বর, স্থান ঐ। প্রাতঃকালে নৌকাযোগে হ্রদ ভ্রমণ—আনন্দের কথাবার্ত্তা। ৫টার সময় বাসায় প্রত্যাগমন। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে প্রায় ৯টা পর্য্যন্ত সমাগত পাঞ্জাবী ও কাশ্মীরী লোকের সহিত ইংরাজীতে ও হিন্দীতে ধর্ম্মচর্চ্চা, শঙ্কাসমাধান, পশ্চাৎ সঙ্গীত।

১৭ই সেপ্টেম্বর—স্থান ঐ—প্রাতঃকালে সমাগত পাঞ্জাবীদের সহিত ধর্ম্মচর্চ্চা—পশ্চাৎ উহাদের সহিত হাউস্‌বোটের বন্দোবস্তের জন্য প্লিডার জয়কৃষ্ণের বাটী গমন। তিনি যথোচিত সমাদরপূর্ব্বক হাউস্‌বোটের বন্দোবস্ত করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং বলিলেন, আর যাহা কিছু আবশ্যক হয়, আপনি আজ্ঞা করুন। স্বামিজী বলিলেন, আর কিছুর প্রয়োজন নাই। রাস্তায় পাঞ্জাবীদের সহিত ধর্ম্মচর্চ্চা হইল।

গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া সমাগত রাজা অমরসিংহের উজিরের সহিত নানাবিধ চর্চ্চা। প্রসঙ্গক্রমে হাউস্‌বোটের কথা উঠিল। তিনি বলিলেন, আমি এখনই উহার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি। অপরাহ্ণে গবর্ণরের সেক্রেটারী বোট লইয়া আসিলেন—তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা। পরে ভোজন, অল্প শয়ন, পরে কথাবার্ত্তা। অপরাহ্ণে চর্চ্চা এবং সঙ্গীত। সায়ংকালে এক সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ীতে ভোজনার্থ গমন। তথায় নানাবিধ শাস্ত্রচর্চ্চা। ঐ স্থানে অনেক পণ্ডিত এবং ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। পুষ্পবৃষ্টি ও মালা দ্বারা স্বামিজীকে তাঁহারা অভ্যর্থনা করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া বাসা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিলেন। বাস্তবিকই ইঁহারা স্বামিজীকে যথোচিত ভক্তি করিলেন।

১৮ই সেপ্টেম্বর—স্থান ঐ—প্রাতঃকালে সমাগত লোকগণের সহিত চর্চ্চা—ভোজনান্তেও চর্চ্চা। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নৌকায় নিমন্ত্রণে গমন। নিমন্ত্রণকারী অতি সম্ভ্রান্তবংশীয়। ইনি নানা উপাদেয় দ্রব্য আহার করাইলেন এবং ছবি ও পুস্তক দেখাইলেন।

১৯শে সেপ্টেম্বর—স্থান ঐ—প্রাতঃকালে সমাগত লোকগণের

সহিত চর্চ্চা। নৌকাযাত্রার বন্দোবস্ত। ভোজনান্তে পুনর্ব্বার কথাবার্ত্তা। দিনের শেষভাগে অশ্বারোহণে ভ্রমণ, প্রত্যাগমন করিয়া বিদ্যার্থীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা। সন্ধ্যার পর রাজা রামসিংহের মোসাহেবের বাড়ীতে ভোজনার্থ নৌকায় গমন। তথায় ভদ্রলোকগণের সঙ্গে কথাবার্ত্তা, ভোজনান্তে সেতার শ্রবণ। পশ্চাৎ বোটে আসিয়া শয়ন।

২০শে সেপ্টেম্বর, রাত্রি ৪টার সময় শ্রীনগর হইতে গমন। প্রাতঃকালে নানাবিধ কথাবার্ত্তা, পুস্তক পাঠ প্রভৃতি—নৌকাতেই আহার। পানপুর নামক স্থানে রাত্রিবাস। তথায় কেশর খেত দেখা এবং বাজারে ভ্রমণ।

২১শে সেপ্টেম্বর—নৌকায় ভ্রমণ—প্রাতঃকালে পুস্তক পাঠ। কথাবার্ত্তা—ভোজনান্তে পাঞ্জাবী ভ্রমণকারীদের সঙ্গে নানাবিধ বিষয়ের চর্চ্চা।

২২শে সেপ্টেম্বর—নৌকাযোগে অনন্তনাগ গমন। বিজবেরার মন্দির দেখা। অনন্তনাগ দর্শন। বাজার ভ্রমণ—সঙ্গীদের সঙ্গে অল্প ধর্ম্মচর্চ্চা।

২৩শে সেপ্টম্বর—অনন্তনাগে ভোজনাদি সমাপন করিয়া পদব্রজে মার্ত্তণ্ডে গেলেন। রাস্তায় দুই জন পাণ্ডাকে সদুপদেশ দিতে লাগিলেন। মার্ত্তণ্ডে যাইয়া সমাগত পাণ্ডাদের সহিত নানাবিধ চর্চ্চা।

২৪শে সেপ্টেম্বর—মার্ত্তণ্ড ধর্ম্মশালা—প্রাতঃকালে তথা হইতে অক্ষয়বল (আচ্ছাবল) যাত্রা। রাস্তায় লোকেরা একটি মন্দিরকে পাণ্ডবের মন্দির বলিয়া দেখাইল। মন্দির দেখিয়া স্বামিজী

বলিলেন, ২০০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে ইহা নির্ম্মিত, আর এমন উত্তম মন্দির দেখিতে পাওয়া যায় না। এই মন্দির পর্য্যন্ত হাঁটিয়া আসিয়া স্বামিজী ঘোড়ায় চলিলেন। এখানে নানাবিধ চর্চ্চা হইল।

ইহার পরের কয়েক দিনের ডায়েরী হারাইয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, কাশ্মীরে ভ্রমণ করিয়া স্বামিজী অনেকটা স্বাস্থ্যলাভ করিয়া নামিয়া মরি পাহাড়ে আসিলেন। সেভিয়ার দম্পতি তথায়ই বরাবর ছিলেন।

১২ই অক্টোবর—স্থান মরি—সেভিয়ার সাহেবের বাংলা। কথাবার্ত্তা ইত্যাদি।

১৩ই ঐ—স্থান ঐ—প্রাতঃকাল হইতে বেলা ৩টা পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা ইত্যাদি। পশ্চাৎ নিবারণ বাবুর বাটীতে গমন। সমাগত লোকগণের সহিত চর্চ্চা। তথায় রাত্রি অবস্থান।

১৪ই ঐ—স্থান ঐ—নিবারণ বাবুর বাড়ী। প্রাতঃকালে সমাগত লোকগণের সহিত কথাবার্ত্তা। অনেক বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবী ভদ্রলোক একত্রিত হইয়া স্বামিজীকে একটি অভিনন্দন দিবার সঙ্কল্প করিয়া তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। স্বামিজীও তাহাতে সম্মত হইলেন। রাত্রে অভিনন্দনসভা আহূত হইল। অভিনন্দন পড়া হইল। স্বামিজী তাহার উত্তরে এক মনোহর বক্তৃতা দিলেন। শ্রোতৃগণ সকলেই মহা সন্তুষ্ট হইল।

১৫ই ঐ—স্থান ঐ—নিবারণ বাবুর বাড়ী। প্রাতঃকালে সমাগত বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবী ভদ্রলোকগণের সহিত চর্চ্চা, অপরাহ্নে সেভিয়ারের বাংলায় গমন, কথাবার্ত্তা ইত্যাদি।

১৬ই ঐ—প্রাতঃকালে ৯টার সময় টঙ্গাযোগে রাওলপিণ্ডি

যাত্রা। রাস্তায় নানাবিধ কথাবার্ত্তা। প্রায় ৫টার সময় উকীল হংসরাজের বাটীতে গমন। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই সমাগত লোকগণের সহিত নানাবিধ চর্চ্চা। আর্য্যসমাজভুক্ত স্বামী প্রকাশানন্দের সহিত সদালাপ, স্বামিজী তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন। জজ নারায়ণ দাস, ভক্তরাম (তাঁহার ভ্রাতা—ব্যারিষ্টার) প্রভৃতি ভদ্রলোকগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৭ই ঐ—স্থান রাওলপিণ্ডি—হংসরাজের বাড়ী। প্রাতঃকালে সমাগত ভদ্রলোকগণের সহিত চর্চ্চা। পশ্চাৎ ভোজনার্থ ছাউনিতে নিমাইয়ের বাড়ী গমন। তথায় বাঙ্গালীদের সহিত কথাবার্ত্তা। প্রায় ৩টার সময় তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন। একটু বিশ্রাম করিয়া বক্তৃতা দিবার জন্য সুজানসিংহের বাগানে গমন। জজ রায় নারায়ণ দাসের প্রস্তাবে এবং উকিল হংসরাজের অনুমোদনে সুজানসিংহ সভাপতি হইলেন। সভায় প্রায় ৪০০ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা ৫টার সময় আরম্ভ হইয়া প্রায় ২ ঘণ্টাকাল হইল। ভাষা ইংরাজী—বিষয় হিন্দুধর্ম্ম। স্বামিজী বেদ হইতে শ্লোকাদি উদ্ধৃত করিয়া অতি প্রাঞ্জলভাবে বক্তব্য বিষয় বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। কখন বীরদর্পে আত্মার অনন্ত মহিমা ও সর্ব্বশক্তিমত্তার কথা বলিয়া শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে মহাতেজের—মহাশক্তির সঞ্চার করিতেছেন, কখন বা সামাজিক কপটাচারের প্রতি কঠোর শ্লেষ প্রয়োগে শ্রোতৃবৃন্দের হাস্যরসের ফোয়ারা ছুটাইয়া দিতেছেন। স্বামিজীর বক্তৃতায় সকলের হৃদয় উদ্দীপনাপূর্ণ হইয়া উঠিল। বক্তৃতান্তে বাসস্থানে প্রত্যাগমন করিয়া জনৈক ব্যক্তিকে সাধনরহস্য উপদেশ দিলেন। রাত্রে ভক্তরামের কুঠিতে

নিমন্ত্রণ। সঙ্গে জজ, প্রকাশানন্দ, হংসরাজ প্রভৃতিও গেলেন ও ভোজনাদি করিলেন। তথা হইতে রাত্রি ১০টার সময় স্বস্থানে আগমন। প্রকাশানন্দের সহিত রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত চর্চ্চা।

১৮ই ঐ—স্থান ঐ—প্রাতঃকালে রায় নারায়ণ দাস এবং বাবা ক্ষেমসিংহের পুত্রের সহিত চর্চ্চা—প্রকাশানন্দের সহিত কথাবার্ত্তা। ভোজনান্তে অল্প শয়ন। শয়নান্তে সঙ্গিগণকে অতিশয় শিরঃপীড়ার কথা জানাইলেন। গত দিন হইতে শিরঃপীড়া ভোগ করিতেছিলেন—এখন অত্যন্ত বাড়িয়া উঠায় ব্যক্ত করিলেন। তথাপি লোকের সঙ্গে হাস্যবদনেই কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। বাহিরের লোকে কিছুমাত্র বুঝিতে পারিল না। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে জজ ও ক্ষেমসিংহের পুত্রের আনীত বগিতে ভ্রমণ করিলেন—তাঁহাদের সহিত নানাবিধ কথাবার্ত্তা—রাত্রে উহাদের সহিত একত্রে ভোজন এবং আর্য্যসমাজ ও মুসলমানদিগের সম্বন্ধে অনেক শঙ্কা সমাধান। রাত্রি ১১টার সময় শয়ন। প্রকাশানন্দ ঐ সময় পর্য্যন্ত উপস্থিত।

১৯শে ঐ—স্থান ঐ—প্রাতঃকালে সেভিয়ারের বাংলায় গমন, তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা। পশ্চাৎ কালীবাড়ীতে আগমন—সঙ্গে প্রকাশানন্দ। তথায় পরস্পর চর্চ্চা ও ভোজন। ভোজনান্তে এক শিখের সহিত অনেক চর্চ্চা। সে সময় অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোকও উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার পর কালীবাড়ীতে অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক সমবেত হইলে একটি ছোট খাট সভা হইল। তাহাতে স্বদেশের কিসে প্রকৃত কল্যাণ হয়, এ বিষয়ে স্বামিজী অনেক উপদেশ দিলেন। পশ্চাৎ স্বামীজি ইঁহাদিগকে প্রচারকার্য্যের

জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিয়া দিতে অনুরোধ করায় তাঁহারা সম্মত হইলেন। রাত্রি ৮টার পর সেভিয়ারের বাংলায় যাইয়া তথায় ভোজন ও শয়ন।

২০শে ঐ—স্থান ঐ—প্রাতঃকালে ৯টা পর্য্যন্ত সেভিয়ার-দম্পতির সহিত কথাবার্ত্তা। পশ্চাৎ হংসরাজের বাড়ীতে গমন—কথাবার্ত্তা, ভোজন ইত্যাদি। ভোজনান্তে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন এমন সময় স্বামিজীর জনৈক গুরুভাই এক বগি লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক পীড়িত হইয়াছেন এবং তোমায় দর্শন করিতে ইচ্ছুক। দয়াল স্বামী তখনই যাইতে প্রস্তুত হইলেন। সঙ্গে প্রকাশানন্দ, নিমাই প্রভৃতি। তথায় সেই বাবু পাঁচটি প্রশ্ন করিলেন এবং বলিলেন, এই পাঁচটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না পাইলে আমি নাস্তিক হইয়া যাইব—স্বামিজী সেই প্রশ্নগুলির তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া প্রকৃত উত্তর প্রদান করাতে তিনি অতিশয় কৃতার্থ হইলেন! সেখানে জলখাবার খাওয়া হইল। রাত্রি প্রায় ৮॥০ টার সময় হংসরাজের বাড়ীতে গমন। হংসরাজের সহিত আনন্দে কথাবার্ত্তার সহিত ভোজন ও বিশ্রাম করিয়া তাঁহারই বগিতে চড়িয়া কালীবাড়ী গমন। তথায় দুইটি বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত হাস্যরসের কথাবার্ত্তা কহিয়া অল্প শয়ন।

পশ্চাৎ রাত্রি ১২টার পূর্ব্বে ষ্টেশনে গমন। তথা হইতে প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে যাত্রা। উজিরাবাদ ষ্টেশন পর্য্যন্ত একসঙ্গে যাইয়া স্বামিজী তাঁহার সঙ্গিগণের মধ্যে কয়েক জনকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পাঠাইলেন। স্বামিজী উজিরাবাদ হইতে জম্মুর ট্রেণে উঠিলেন ও

পর দিন ২১শে অক্টোবর বেলা ১২টার সময় জম্মুতে নামিলেন। একটি বাঙ্গালী রাজকর্ম্মচারী বগি লইয়া উপস্থিত ছিলেন—সেই বগিতে স্বামিজী ও তাঁহার সঙ্গিগণ তাঁহাদের জন্য পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জম্মুরাজের অভ্যর্থনাবিভাগের অধ্যক্ষ মহেশবাবুর পুত্রগণ অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে ফল ও মিছরি হস্তে লইয়া মহেশবাবু উপস্থিত হইলেন এবং যথোচিত সমাদরপূর্ব্বক স্বামিজীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। ভোজনান্তে অল্প শয়ন। শয়নান্তে রাজা অমরসিংহের কর্ম্মচারীর সহিত কথাবার্ত্তা, তাঁহার সঙ্গে অন্য তিনজন লোকও ছিলেন। ইতিমধ্যে ২ জন বাঙ্গালী আসিলেন—উঁহাদের সহিত রাজা লাইব্রেরী দেখিতে চাহিলেন। রাস্তায় অন্যান্য লোক আসিয়া মিলিল। শরীর সুস্থ ছিল না—পশ্চাৎ স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন।

২১শে অক্টোবর, স্থান জম্মুরাজনির্দ্ধারিত গৃহ। প্রাতঃকালে মহেশবাবুর সহিত কথাবার্ত্তা এবং সমাগত পাঞ্জাবীদের সহিত চর্চ্চা। স্নানান্তে একটি পাঞ্জাবী উকিলকে উপদেশ দেওয়া। আহার ও বিশ্রামান্তে মহেশবাবুর বাটী গমন, তাঁহার গুরু কৈলাসানন্দের সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা। মহেশবাবুর সহিত কার্য্য সম্বন্ধে পরামর্শ (স্বামিজীর কাশ্মীরে একটি মঠ সংস্থাপন করিবার সঙ্কল্প ছিল)। পশ্চাৎ রেসিডেণ্টের বাটী পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন, কথাবার্ত্তা ও ভোজন। পশ্চাৎ সমাগত রাজকর্ম্মচারী কৃপারাম ও তাঁহার সঙ্গে আগত জনৈক ব্রাহ্মণের সহিত কথাবার্ত্তা। পশ্চাৎ শয়ন।

২২শে অক্টোবর, স্থান ঐ—প্রাতঃকালে মহেশবাবুর সহিত কথাবার্ত্তা। ভোজনান্তে রাজদত্ত বগিতে বেলা ১১টার সময় রাজদর্শনার্থ গমন। মহারাজ—ভ্রাতৃদ্বয় ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ দ্বারা বেষ্টিত ছিলেন। স্বামিজীকে এক স্বতন্ত্র আসন দেওয়া হইল। প্রথমতঃ মহারাজ সন্ন্যাসধর্ম্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন—স্বামিজীও যথোচিত উত্তর দিলেন। পশ্চাৎ প্রসঙ্গক্রমে বহিরাচারের অসারতা প্রতিপাদন করিলেন। স্বামিজী কহিলেন —নানাবিধ কুসংস্কারে আবদ্ধ থাকায় ৭ শত বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবাসী বিজাতীয়দের দাসত্ব করিতেছে। যাহা যথার্থ পাপ ও সকল অনর্থের মূল—যথা ব্যভিচারাদি—তাহাতে আজকাল সমাজচ্যুত হইতে হয় না—এখন যা কিছু অপরাধ, সবই খাওয়া লইয়া। সমুদ্রযাত্রাপ্রসঙ্গে স্বামিজী বলিলেন, রামচন্দ্র লঙ্কায় গিয়াছিলেন, এবং বর্ম্মা, সিলোন প্রভৃতি স্থানে এখনও অনেকে বাণিজ্য করিতেছে। আর বিদেশযাত্রা না করিলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না। পরে বিলাত, আমেরিকার প্রচার সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। উপসংহারে স্বামিজী বলিলেন, দেশের কল্যাণের জন্য যদি নরকে যাইতে হয়, তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। প্রায় ৩টার সময় কথাবার্ত্তা শেষ হইল। কথাবার্ত্তায় মহারাজ প্রভৃতি সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। বগিতে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ছোট রাজার সহিত দেখা করিবার জন্য তাঁহার নূতন ভবনে গমন। বগি পৌঁছিবামাত্রই রাজা স্বামিজীকে প্রণামপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন। অনেক কথাবার্ত্তা

২৩শে ঐ—স্থান ঐ—প্রাতঃকালে সমাগত লোকগণের সহিত

বিশেষ চর্চ্চা। ভোজনের পর প্রধান কর্ম্মচারী ভাগরায়ের সহিত দেখা করিবার জন্য তাঁহার বাটীতে গমন—সঙ্গে মহেশবাবু। অনুমান ১॥৹ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরিয়া আসিলেন। কিছুক্ষণ পরে ডাকের অনেক চিঠি আসিল—পড়িতে লাগিলেন। এই সময়ে শিয়ালকোট হইতে অনেক ভদ্রলোক তথায় যাইবার নিমন্ত্রণ করিতে ইঞ্জিনিয়ার বাবুকে অগ্রসর করিয়া দিলেন। শীঘ্রই কতক চিঠি পড়িয়া স্বামিজী তাঁহাদের সহিত চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। প্রায় ২॥৹ ঘণ্টা চর্চ্চার পর তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন। পশ্চাৎ মহেশবাবুর অধীনস্থ বাঙ্গালী কর্ম্মচারী দুইজন আসিলেন। স্বামিজী বক্তৃতাস্থানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন ও বগিতে চড়িয়া তথায় গেলেন। বক্তৃতান্তে স্বস্থানে পদব্রজে আগমন। ভোজনসময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালীদের সহিত কথাবার্ত্তা।

ঐ দিন মহারাজ আগামী দিনে বক্তৃতা দিবার কথা বলিলেন, আর ইহাও ব্যক্ত করিলেন যে, যতদিন পর্যান্ত স্বামিজী জম্মুতে থাকিবেন, ততদিন যেন একদিন বিশ্রাম করিয়া একদিন বক্তৃতা করেন। তিনি অনুরোধ করিলেন, স্বামিজী যেন এখানে অন্ততঃ ১০।১২ দিন থাকেন।

২৪শে ঐ—স্থান ঐ—প্রাতঃকালে পদব্রজে নদী দেখিতে যাওয়া—নদীতীরে জলের কল দেখা। স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন, সমাগত লোকজনের সহিত কথাবার্ত্তা, ভোজন। পরে কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে গান করিতে লাগিলেন। লোকের সহিত কথাবার্ত্তা। সন্ধ্যার পর বগিতে চড়িয়া শহরের দীপমালিকা দেখা। পশ্চাৎ স্বস্থানে না যাইয়া মহেশবাবুর বাটী পর্য্যন্ত গমন। মহেশবাবুর

জ্বর হইয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া একজন বাঙ্গালী মাষ্টার ও অচ্যুতকে আর্য্যসমাজের দোষের বিষয় বর্ণনা ও অন্যান্য উপদেশ। পাঞ্জাবী লোকের অনভিজ্ঞতার বর্ণন।

ঐ দিন বক্তৃতাস্থানে যাইয়া পণ্ডিতগণ ও অন্যান্য ভদ্রলোকগণের সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিলেন। সকলেই মহারাজের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু মহারাজের কোন কারণে আসা হইল না। প্রায় ৫৷৷৹ সময় বক্তৃতা আরম্ভ হইল। বেদ হইতে পুরাণ পর্য্যন্ত সকল শাস্ত্রসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু কিছু বলিয়া ভক্তি সম্বন্ধে হাস্য-রসসম্বলিত মনোহর বক্তৃতা করিলেন। প্রায় ২ ঘণ্টা বক্তৃতা—পশ্চাৎ লাইব্রেরী দেখিয়া পদব্রজে স্বস্থানে আগমন।

২৫শে ঐ—স্থান ঐ—প্রাতঃকালে পদব্রজে ভ্রমণ ও রাজার পশুশালা দর্শন। সমাগত লোকগণের সহিত ধর্ম্মচর্চ্চা ও গূঢ়তত্ত্ব সমূহের মীমাংসা।

২৬শে ঐ—স্থান ঐ—পদব্রজে বনভ্রমণ, পথে সঙ্গিগণের নিকট মহারাষ্ট্রীয় জাতির ইতিহাস বর্ণন। ফিরিয়া আসিয়া সমাগত লোকগণের সহিত চর্চ্চা, মহেশবাবুর বাটি গমন ও কার্য্যসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা। প্রত্যাবর্ত্তনের পর ধর্ম্মচর্চ্চা, সঙ্গীতাদি।

২৮শে ঐ—স্থান ঐ—প্রাতঃকালে অল্প ভ্রমণ, পশ্চাৎ স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিয়া সমাজনীতিসম্বন্ধে অনেক গূঢ়তত্ত্বের উপদেশ। উপদেশের স্থূল মর্ম্ম এই,—সকলের ভোগ তুল্য হওয়া উচিত, বংশগত বা গুণগত জাতিভেদ ভোগ বা অধিকারের তারতম্য উঠিয়া যাওয়া উচিত। গুণগত ও বংশগত জাতিভেদের তুলনা

করিলে বংশগত জাতিভেদের কতকগুলি বিশেষ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। বংশগত জাতি থাকিলে কোন ব্যক্তি যতই গুণবান্ বা ধনবান্ হউক, স্বজাতি পরিত্যাগ করিতে পারে না ; সুতরাং তাহার জাতি তাহার গুণ ও ধনের কিছু না কিছু ভাগী হইয়া থাকে। গুণগত জাতিতে তাহা হইতে পারে না। বেকনের নীতিতত্ত্বের কথা। মান-যশের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কার্য্য করা মহাপুরুষের লক্ষণ—আমাকে লোকে মানুক বা না মানুক, যাহা কর্ত্তব্য বুঝিয়াছি, তাহা করিয়া যাইব। নিজের বাল্যকালের উদাহরণ দেখাইয়া বলিলেন, তিনি বাল্যকালে ডোম পাড়ায় যাইয়া তাহাদের কল্যাণসাধনে চেষ্টা করিতেন। এই সকল কথাবার্ত্তা নিজের অন্তরঙ্গ সঙ্গিগণের সঙ্গে হইল। এই সময়ে লাহোর হইতে সেভিয়ার সাহেবের পত্র আসিল। পত্র পড়িয়া জেসিরাম নামক জনৈক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক তাঁহাদিগকে খুব যত্ন করিতেছেন জানিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। পশ্চাৎ, আহারাদির পর, মহেশ-বাবুর বাটীতে গমন ও আগামী দিবসই চলিয়া যাইবেন, তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। মহেশবাবু আরও ২।৩ দিন থাকিতে অনুরোধ করিলেন।

২৭শে ঐ—স্থান ঐ—চর্চ্চা। রাজা রামসিংহের সহিত সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা।

স্বামিজী জম্মু হইতে শিয়ালকোটে আসিয়া দুইটি বক্তৃতা দিলেন। একটি ইংরাজীতে ও অপরটি হিন্দীতে হইল। আমরা উহার মধ্যে হিন্দী বক্তৃতাটি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। নিম্নে উহার বঙ্গানুবাদ দিলাম।

শিয়ালকোটে স্বামিজীর বক্তৃতা

ভক্তি

জগতে যে সকল বিভিন্ন ধর্ম্ম রহিয়াছে, তাহাদের সকলের উপাসনাপ্রণালী বিভিন্ন হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহারা এক। কোন কোন স্থলে লোকে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে উপাসনা করিয়া থাকে, কোন কোন স্থলে অগ্নি উপাসনা প্রচলিত, কোন কোন স্থলে আবার লোকে প্রতিমাপূজা করিয়া থাকে, আবার কতকগুলি ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বই বিশ্বাস করে না। সত্য বটে এই সকল প্রবল বিভিন্নতা বিদ্যমান, কিন্তু যদি প্রত্যেক ধর্ম্মব্যবহৃত যথার্থ কথাগুলি, উহাদের মূল তথ্য, উহাদের সার সত্যের দিকে লক্ষ্য কর, দেখিবে, তাহারা বাস্তবিক অভিন্ন। এমন ধর্ম্মও আছে যাহা ঈশ্বরোপাসনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না; এমন কি, ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত মানে না কিন্তু দেখিবে, ঐসকল ধর্ম্মাবলম্বীরা সাধু মহাত্মাদিগকে ঈশ্বরের ন্যায় উপাসনা করিতেছে। বৌদ্ধধর্ম্মই এই বিষয়ের প্রসিদ্ধ উদাহরণ। ভক্তি সকল ধর্ম্মেই রহিয়াছে—কোথাও এই ভক্তি ঈশ্বরে, কোথাও বা মহাপুরুষে অর্পিত। সর্ব্বত্রই এই ভক্তিরূপ উপাসনার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, আর জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তিলাভ অপেক্ষাকৃত সহজ। জ্ঞান লাভ করিতে

সকল ধর্ম্মই ভক্তি স্বীকার করিয়া থাকে

দৃঢ় অভ্যাস, অনুকূল অবস্থা প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ ও রোগশূন্য না হইলে এবং মন সম্পূর্ণরূপে বিষয়ানুরাগবিরহিত না হইলে যোগ অভ্যাস করা যাইতে পারে না। কিন্তু সকল অবস্থার লোক অতি সহজেই ভক্তিসাধন করিতে পারে। ভক্তিমার্গের আচার্য্য শাণ্ডিল্য ঋষি বলিয়াছেন, ঈশ্বরে পরমানুরাগই ভক্তি। প্রহ্লাদও এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তি একদিন খাইতে না পায় তাহার মহাকষ্ট হয়, সন্তানের মৃত্যু হইলে লোকের প্রাণে কি যন্ত্রণা হয়! যে ভগবানের প্রকৃত ভক্ত তাহারও প্রাণ ভগবানের বিরহে এরূপ ছটফট করিয়া থাকে। ভক্তির এই মহৎ গুণ যে, উহা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় আর পরমেশ্বরে দৃঢ় ভক্তি হইলে কেবল উহা দ্বারাই চিত্ত শুদ্ধ হইয়া থাকে।

ভক্তি অন্যান্য সাধন প্রণালী অপেক্ষা সহজ

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তিঃ" ইত্যাদি। (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য)

হে ভগবান্, তোমার অসংখ্য নাম আর তোমার প্রত্যেক নামেই তোমার অনন্ত শক্তি বর্ত্তমান। প্রত্যেক নামেরই গভীর তাৎপর্য্য আছে, আর তোমার নাম উচ্চারণ করিবার স্থান কাল কিছু বিচার করিবার নাই। মৃত্যু যখন স্থান কাল বিচার না করিয়াই মানুষকে আক্রমণ করে, তখন আর ঈশ্বরের নাম করিবার স্থান কাল বিচার কি হইতে পারে?

ঈশ্বর বিভিন্ন সাধক কর্ত্তৃক বিভিন্ন নামে উপাসিত হন বটে, কিন্তু এই ভেদ আপাতদৃষ্টমাত্র, বাস্তব ভেদ নহে। কেহ কেহ মনে করেন, আমার সাধনপ্রণালীই অধিক কার্য্যকর, অপরে

আবার তাহার নিজ সাধনপ্রণালীকেই শীঘ্র মুক্তিলাভের সহজ উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি ঐ উভয়ের মূলভিত্তি অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায়, তবে, দেখিতে পাওয়া যাইবে, উভয়ই একই প্রকার। শৈবগণ শিবকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী বলিয়া বিশ্বাস করেন ; বৈষ্ণবেরা একমাত্র তাঁহাদের সর্ব্বশক্তিমান্ বিষ্ণুতেই অনুরক্ত, আর দেবীর উপাসকগণ জগতের মধ্যে দেবীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালিনী—এ কথা ব্যতীত অন্য কোন কথায় বিশ্বাস করেন না। কিন্তু যদি স্থায়ী ভক্তি লাভ করিতে তোমার ইচ্ছা থাকে, তবে তোমাকে এই দ্বেষভাব একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। দ্বেষ ভক্তিপথের মহান্ প্রতিবন্ধক—যে ব্যক্তি উহা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই ঈশ্বরলাভ করেন। যদিও দ্বেষভাব পরিত্যাজ্য, তথাপি ইষ্টনিষ্ঠার প্রয়োজন। ভক্তশ্রেষ্ঠ হনুমান্ বলিয়াছেন,—

পথ ভিন্ন ভিন্ন—লক্ষ্য কিন্তু এক

"শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বো রামঃ কমললোচনঃ ॥"

"আমি জানি, প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্মীপতি যিনি, তিনিই সীতাপতি ; তথাপি কমললোচন রামই আমার সর্ব্বস্ব।"

মানুষের প্রত্যেকেরই ভাব ভিন্ন ভিন্ন। এই সকল বিভিন্ন ভাব লইয়া মানুষ জন্মিয়া থাকে। সে কখন ঐ ভাবকে অতিক্রম করিতে পারে না। জগৎ যে কখন একধর্ম্মাবলম্বী হইতে পারে না, ইহাই তাহার একমাত্র কারণ। ঈশ্বর করুন—জগৎ যেন কখন একধর্ম্মাবলম্বী না হয়। তাহা হইলে জগতে

এই সামঞ্জস্যের পরিবর্ত্তে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। সুতরাং মানুষ যেন নিজ নিজ প্রকৃতির অনুসরণ করে। আর যদি সে এমন গুরু পায়, যিনি তাঁহার ভাবানুযায়ী এবং সেই ভাবের পুষ্টিবিধায়ক উপদেশ দেন, তবেই সে উন্নতি করিতে সমর্থ হইবে। তাঁহাকে সেই ভাবের বিকাশ সাধন করিতে হইবে। কোন ব্যক্তি যে পথে চলিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে সেই পথে চলিতে দিতে হইবে; কিন্তু যদি আমরা তাহাকে অন্য পথে টানিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করি, তবে তাহার যাহা আছে সে তাহাও হারাইবে; সে একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে। যেমন একজনের মুখ আর একজনের সঙ্গে মেলে না, সেইরূপ একজনের প্রকৃতি আর একজনের সঙ্গে মেলে না। আর তাহাকে তাহার নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী চলিতে দিতে বাধা কি? কোন নদী এক বিশেষ দিকে প্রবাহিত হইতেছে—যদি উহাকে সেই দিকেই একটি নির্দ্দিষ্ট খাতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করা যায়, তবে উহার স্রোত আরও প্রবল হয়, উহার বেগ বর্দ্ধিত হয়; কিন্তু উহা যে দিকে স্বভাবতঃ প্রবাহিত হইতেছে, সেই দিক্ হইতে সরাইয়া অন্য দিকে প্রবাহিত করিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে দেখিবে, কি ফল হয়। উহার স্রোত ক্ষীণতর হইয়া যাইবে, স্রোতবেগও হ্রাস হইয়া যাইবে। এই জীবন একটা গুরুতর ব্যাপার—ইহাকে নিজ ভাবানুযায়ী পরিচালিত করিতে হইবে। যে দেশে সকলকে এক পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা হয়, সে দেশ ক্রমশঃ ধর্ম্মহীন হইয়া দাঁড়ায়। ভারতে কখন এরূপ চেষ্টা হয়

বিভিন্নতা প্রয়োজন

নাই। বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে কখন বিরোধ ছিল না, অথচ প্রত্যেক ধর্ম্মই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ কার্য্যসাধন করিয়া গিয়াছে—সেইজন্যই এখানে প্রকৃত ধর্ম্মভাব এখনও জাগ্রত রহিয়াছে। এখানে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিভিন্ন ধর্ম্মে বিরোধ নিম্নলিখিত কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। একজন মনে করিতেছে, সত্যের চাবি আমার নিকট, আর যে আমায় বিশ্বাস না করে, সে মূর্খ। অপর ব্যক্তি আবার মনে করিতেছে, ও ব্যক্তি কপট, কারণ, তাহা না হইলে সে আমার কথা শুনিত।

সকল ব্যক্তিই এক ধর্ম্মের অনুসরণ করুক, ইহাই যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হইত, তবে এত বিভিন্ন ধর্ম্মের উৎপত্তি হইল কিরূপে? তোমরা কি সেই সর্ব্বশক্তিমানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পার? সকলকে একধর্ম্মাবলম্বী করিবার জন্য অনেক প্রকার উদ্যোগ ও চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। এমন কি, তরবারিবলে সকলকে একধর্ম্মাবলম্বী করিবার চেষ্টাও যেখানে হইয়াছে, ইতিহাস বলেন, সেখানেও একবাড়ীতে দশটি ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। সমগ্র জগতে একটি ধর্ম্ম কখন থাকিতে পারে না। বিভিন্ন শক্তি মানব-মনে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া করিলে মানব চিন্তায় সমর্থ হয়। এই বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া না থাকিলে, মানুষ চিন্তা করিতেই সমর্থ হইত না! এমন কি, সে মনুষ্যপদবাচ্যই হইত না। মন্ ধাতু হইতে মনুষ্য শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে—মনুষ্য শব্দের অর্থ মননশীল। মনের পরিচালনা না থাকিলে চিন্তাশক্তিরও লোপ হয়, তখন

বিভিন্নতা না থাকিলে মানুষ চিন্তাশক্তির অভাবে পশুতুল্য হইয়া যাইবে

সেই ব্যক্তিতে আর একটা সাধারণ পশুতে কোন প্রভেদ থাকে না। তখন এরূপ ব্যক্তিকে দেখিয়া সকলেরই ঘৃণার উদ্রেক হয়। ঈশ্বর করুন, যেন ভারতের কখন এরূপ অবস্থা না হয়।

অতএব মনুষ্যত্ব যাহাতে থাকে, তজ্জন্য এই একত্বের মধ্যে বহুত্বের প্রয়োজন। সকল বিষয়েই এই বহুত্ব বা বৈচিত্র্য রক্ষার প্রয়োজন, কারণ যতদিন এই বহুত্ব থাকিবে ততদিনই জগতের অস্তিত্ব। অবশ্য বহুত্ব বা বৈচিত্র্য বলিলে ইহা বুঝায় না যে, উহার মধ্যে ছোট বড় আছে। যদি সকলেই সমানও হয়, তথাপি এই বৈচিত্র্য থাকিবার কোন বাধা নাই। সকল ধর্ম্মেই ভাল ভাল লোক আছে, এই কারণেই ঐ ঐ ধর্ম্ম লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকে, সুতরাং কোন ধর্ম্মকেই ঘৃণা করা উচিত নয়।

ধর্ম্ম যেন আচারপূত হয়

এখানে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে ধর্ম্ম অন্যায় কার্য্যের পোষকতা করিয়া থাকে, সেই ধর্ম্মের প্রতিও সম্মান দেখাইতে হইবে? অবশ্য, ইহার উত্তর আর 'না' ব্যতীত কি হইতে পারে? এইরূপ ধর্ম্মকে যত শীঘ্র সম্ভব দূরীভূত করিতে পারা যায়, ততই ভাল; কারণ, উহাতে লোকের অকল্যাণই হইয়া থাকে। নীতির উপরই যেন সকল ধর্ম্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, আর আচারকে যেন ধর্ম্ম হইতেও উচ্চাসন প্রদান করা হয়। এখানে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে, আচার অর্থে বাহ্য ও আভ্যন্তর উভয় প্রকার শুদ্ধি। জল এবং শাস্ত্রোক্ত অন্যান্য বস্তুসংযোগে শরীরের শুদ্ধিবিধান করা যাইতে পারে। আভ্যন্তর শুদ্ধি করিতে হইলে মিথ্যাভাষণ, সুরাপান

ও অন্যান্য গর্হিত কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে পরোপকার করিতে হইবে। শুধু মদ্যপান, চৌর্য্য, দ্যূতক্রীড়া, মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি অসৎকার্য্য হইতে বিরত হইলে চলিবে না। ঐগুলি ত তোমার কর্ত্তব্য। উহার জন্য তুমি কোনরূপ প্রশংসার ভাগী হইতে পার না। নিজের প্রতি এই কর্ত্তব্যগুলির সঙ্গে সঙ্গে অপরেরও যাহাতে কল্যাণ হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

এখানে আমি ভোজনের নিয়মসম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। ভোজন সম্বন্ধে প্রাচীন বিধি সমস্তই এক্ষণে লোপ পাইয়াছে—কেবল ইহার সঙ্গে খাইতে নাই, উহার সঙ্গে খাইতে নাই,—এইরূপ একটা অস্পষ্ট ধারণা লোকের মধ্যে বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। শত শত বর্ষ পূর্ব্বে আহার-সম্বন্ধে যে সকল সুন্দর নিয়ম ছিল, এক্ষণে তাহার ভগ্নাবশেষস্বরূপ এই স্পৃষ্টাস্পৃষ্ট বিচারমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রে খাদ্যের ত্রিবিধ দোষ কথিত আছে। (১) জাতিদোষ। যে সকল আহার্য্য বস্তু স্বভাবতঃই অশুদ্ধ, যেমন পেঁয়াজ, লশুন প্রভৃতি, সেইগুলি খাইলে জাতিদুষ্ট খাদ্য খাওয়া হইল। যে ব্যক্তি ঐ সকল খাদ্য অধিক পরিমাণে খায়, তাহার কাম রিপুর প্রাবল্য হয় এবং সে ব্যক্তি ঈশ্বর ও মানবের চক্ষে ঘৃণিত অসৎকর্ম্মসকল করিতে থাকে। (২) আবর্জ্জনা-কীটাদি-পূর্ণ স্থানে আহার; ইহাকে নিমিত্তদোষ বলে। এই দোষ বর্জ্জনের জন্য আহারের নিমিত্ত এমন স্থান নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে, যে স্থান খুব পরিষ্কার

আহারের নিয়ম

পরিচ্ছন্ন। (৩) আশ্রয়দোষ—অসৎব্যক্তি কর্তৃক স্পৃষ্ট অন্ন পরিত্যাগ করিতে হইবে; কারণ, এরূপ অন্নভোজন করিলে মনে অপবিত্র ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের সন্তান হইলেও যদি সে ব্যক্তি লম্পট ও কুক্রিয়াসক্ত হয়, তবে তাহার হাতে খাওয়া উচিত নয়।

এখন প্রকৃত তত্ত্ব ছাড়িয়া আমরা ছোবড়া লইয়া ব্যস্ত

এখন এ সমস্তই চলিয়া গিয়াছে—এখন কেবল এইটুকুতে ঠেকিয়াছে যে, আমাদের আত্মীয় স্বজন না হইলে তাহার হাতে আর খাওয়া হইবে না—সে ব্যক্তি হাজার জ্ঞানী ও উপযুক্ত লোক হউক। এই সকল নিয়ম যে কিরূপ উপেক্ষিত হইয়া থাকে, ময়রার দোকানে গেলে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইবে। দেখিবে মাছি সব চারদিকে ভন্ ভন্ করিয়া উড়িয়া দোকানের সব জিনিসে বসিতেছে—রাস্তার ধুলা উড়িয়া মিঠাইয়ের উপর পড়িতেছে আর ময়রারপোর কাপড়খানা এমনি যে চিম্‌টি কাটিলে ময়লা উঠে। কেন, খরিদ্দারেরা সকলে মিলিয়া বলুন না—দোকানে গ্লাসকেস না বসাইলে আমরা কেহ মিঠাই কিনিব না? এইরূপ করিলে আর মাছি আসিয়া খাবারের উপর বসিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে কলেরা ও অন্যান্য সংক্রামক রোগের বীজ আনিতে পারিবে না। পূর্ব্বকালে লোকসংখ্যা অল্প ছিল—তখন যে সকল নিয়ম ছিল, তাহাতেই কাজ চলিয়া যাইত। এখন লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে, অন্যান্য অনেক প্রকার পরিবর্ত্তনও ঘটিয়াছে। সুতরাং এই সকল বিষয়ে আমাদের এতদিন উৎকৃষ্টতর বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা উন্নতি না করিয়া ক্রমশঃ অবনতই হইয়াছি। মনু বলিয়াছেন "জলে থুথু ফেলিও না"; আর আমরা করিতেছি কি?

আমরা গঙ্গার ময়লা ফেলিতেছি। এই সকল বিবেচনা করিয়া স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, বাহ্যশৌচের বিশেষ আবশ্যক। শাস্ত্রকারেরাও তাহা জানিতেন কিন্তু এক্ষণে এই সকল শুচি অশুচি বিচারের প্রকৃত উদ্দেশ্য লুপ্ত হইয়াছে—এখন কেবল উহার খোসাটা মাত্র পড়িয়া আছে। চোর, লম্পট, মাতাল, অতি ভয়ানক জেলখাটা আসামী—ইহাদিগকে আমরা স্বচ্ছন্দে জাতিতে লইব, কিন্তু যদি একজন উচ্চজাতির লোক, নীচজাতীয়, অথচ তাহার অপেক্ষা কোন অংশে মন্দ নহে, এমন লোকের সঙ্গে বসিয়া খায় তবে সে তৎক্ষণাৎ জাতিচ্যুত হইবে—তাহার উঠিবার আর উপায় নাই। ইহাতেই আমাদের দেশে ঘোরতর অনিষ্ট হইতেছে। সুতরাং এইটি স্পষ্টরূপে জানা উচিত যে, পাপীর সংসর্গে পাপ এবং সাধুর সঙ্গে সাধুতা আসিয়া থাকে, আর অসৎ সংসর্গ দূর হইতে পরিহার করাই বাহ্যশৌচ। আভ্যন্তর শুদ্ধি আরও কঠিন। অন্তঃশৌচ-সম্পন্ন হইতে গেলে সত্যভাষণ, দরিদ্রসেবা এবং বিপন্ন ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণের সাহায্য প্রভৃতি আবশ্যক।

কিন্তু আমরা সচরাচর করিয়া থাকি কি? লোকে নিজের কোন কাজের জন্য কোন ধনী লোকের বাড়ী গেল এবং তাঁহাকে গরীবনাভাজ (গরীবের বন্ধু) প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ বিশেষণে বিশেষিত করিল। কিন্তু কোন গরীব তাঁহার বাটিতে আসিলে তিনি হয়ত তাহার গলায় ছুরি দিতে প্রস্তুত। অতএব ঐরূপ ধনী ব্যক্তিকে গরীবনাভাজ বলিয়া সম্বোধন করা ত স্পষ্টতঃই মিথ্যা কথা। আর ইহাতেই আমাদের মনকে মলিন করিয়া ফেলিতেছে। এই জন্যই শাস্ত্র সত্যই বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি দ্বাদশ বর্ষ ধরিয়া

সত্যভাষণাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করেন, আর এই দ্বাদশবর্ষকাল যদি তাঁহার মনে কথনও কুচিন্তার উদ্রেক না হইয়া থাকে, তবে তাঁহার বাক্‌সিদ্ধি হইবে—তাঁহার মুখ দিয়া যে কথা বাহির হইবে, তাহাই ফলিবে। সত্যভাষণের এমনই অমোঘ শক্তি, আর যিনি নিজের অন্তর বাহির উভয়ই শুদ্ধ করিয়াছেন, তিনিই ভক্তির অধিকারী।

সত্যবাদিতা

তবে ভক্তিরও এমনই মাহাত্ম্য যে, ভক্তি নিজেই মনকে অনেক পরিমাণে শুদ্ধ করিয়া দেয়। তুমি যে ধর্ম্মেরই সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখ না, দেখিবে—সকল ধর্ম্মেই ভক্তির প্রাধান্য আর সকল ধর্ম্মেই বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া থাকে। যদিও য়াহুদী, মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ানগণ বাহ্যশৌচের বাড়াবাড়ির বিরোধী, তথাপি তাহারাও কোন না কোনরূপে কিছু না কিছু বাহ্যশৌচ অবলম্বন করিয়া থাকে—তাহারা দেখিতে পায়, সর্ব্বদাই কিছু না কিছু পরিমাণে বাহ্যশৌচের প্রয়োজন।

য়াহুদীদের মধ্যে প্রতিমাপূজা নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু তথাপি তাহাদের একটি মন্দির ছিল এবং সেই মন্দিরে আর্ক নামক একটি সিন্দুক রাখা হইত, আর ঐ সিন্দুকের ভিতর 'মুশার দশ ঈশ্বরাদেশ' রক্ষিত হইত। ঐ সিন্দুকের উপর বিস্তারিতপক্ষযুক্ত দুইটি স্বর্গীয় দূতের মূর্ত্তি থাকিত, আর উহাদের ঠিক মধ্যস্থলে তাঁহারা ঈশ্বরাবির্ভাব দর্শন করিতেন। অনেকদিন হইল য়াহুদীদের সেই প্রাচীন মন্দির নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু নূতন নূতন মন্দিরগুলিও সেই প্রাচীন ধরণেই নির্ম্মিত হইয়া থাকে, আর এখন খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে ঐ সিন্দুকে

প্রতিমাপূজা

ধর্ম্মপুস্তকসমূহ রাখা হয়। রোমানক্যাথলিক ও গ্রীক খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে প্রতিমাপূজা অনেক পরিমাণে প্রচলিত। উহারা যীশুর মূর্ত্তি এবং তাঁহার পিতামাতার প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিয়া থাকে। প্রোটেষ্টাণ্টদের মধ্যে প্রতিমাপূজা নাই, কিন্তু তাহারাও ঈশ্বরকে ব্যক্তিবিশেষরূপে উপাসনা করিয়া থাকে। উহাও প্রতিমাপূজার রূপান্তর মাত্র। পারসী ও ইরাণীদের মধ্যে অগ্নিপূজা খুব প্রচলিত। মুসলমানগণ ভাল ভাল সাধু লোকের পূজা করিয়া থাকেন, আর প্রার্থনার সময় কাবার দিকে মুখ ফিরান। এই সকল দেখিয়া বোধ হয় যে, ধর্ম্মসাধনের প্রথমাবস্থায় লোকের কিছু বাহ্য সহায়তার প্রয়োজন হইয়া থাকে। যখন চিত্ত অনেকটা শুদ্ধ হইয়া আসে, তখন সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর বিষয়সমূহে ক্রমশঃ মন দেওয়া সম্ভব হইতে পারে।

"উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বাহ্যপূজাধমাধমা॥"

মহা, নিঃ, তন্ত্র, ১৪।১২২

"সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন—ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ধ্যান মধ্যম, স্তুতি ও জপ—অধম, এবং বাহ্যপূজা অধমাধম।"

কিন্তু এখানে এই কথাটি বিশেষভাবে বুঝিতে হইবে যে, বাহ্যপূজা অধমাধম হইলেও উহাতে কোন পাপ নাই। যে যাহা পারে, তাহার তাহাই করা উচিত। যদি তাহাকে সেই পথ হইতে নিবৃত্ত করা যায়, তবে সে নিজের কল্যাণের জন্য—নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য—অন্য কোনরূপে উহা করিবে। এই হেতু যে প্রতিমা পূজা করিতেছে, তাহার নিন্দা করা উচিত নয়। সে উন্নতির ঐ সোপানে পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াছে, সুতরাং তাহার উহা চাইই চাই। যাঁহারা

সমর্থ, তাঁহারা ঐ সকল ব্যক্তির চিত্তের অবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করুন—তাহাদের দ্বারা ভাল ভাল কাজ করাইয়া লউন। কিন্তু তাহাদের উপাসনা-প্রণালী লইয়া বিবাদের প্রয়োজন কি ?

পরাভক্তি লাভ হইলে আত্মা দেহ হইতে পৃথক হইয়া যান। কেহ কেহ ধন, কেহ কেহ বা পুত্রলাভের জন্য ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকে। আর উপাসনা করে বলিয়া তাহারা আপনাদিগকে ভাগবত বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু উহা প্রকৃত ভক্তি নহে, তাহারাও যথার্থ ভাগবত নহে। যদি তাহারা শুনিতে পায়, অমুক স্থানে এক সাধু আসিয়াছে—সে তামাকে সোনা করিতে পারে, অমনি তাহার নিকট তাহারা দলে দলে ছুটিতে থাকে। তথাপি তাহারা আপনাদিগকে ভাগবত বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয় না। পুত্রলাভের জন্য ঈশ্বরোপাসনাকে ভক্তি বলা যায় না, ধনী হওয়ার জন্য ঈশ্বরোপাসনাকে ভক্তি বলা যায় না, স্বর্গলাভের জন্য ঈশ্বরোপাসনাকে ভক্তি বলা যায় না, এমন কি, নরকযন্ত্রণা হইতে নিস্তারলাভের জন্য ঈশ্বরোপাসনাকেও ভক্তি নামে অভিহিত করিতে পারা যায় না। ভয় বা কামনা হইতে কখন ভক্তি জন্মিতে পারে না। তিনিই প্রকৃত ভাগবত, যিনি বলিতে পারেন—

প্রকৃত ভক্ত কে ?

"ন ধনং ন জনং ন চ সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবেদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

"হে জগদীশ্বর, আমি ধন, জন, পরমাসুন্দরী স্ত্রী অথবা পাণ্ডিত্য কিছুই কামনা করি না। হে ঈশ্বর, জন্মে জন্মে তোমাতে যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।"

যখন এই অবস্থা লাভ হয়, যখন মানুষ সর্ব্ববস্তুতে ঈশ্বর এবং ঈশ্বরে সমুদয় দর্শন করে, তখনই সে পূর্ণ ভক্তি লাভ করে। তখনই সে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকল বস্তুতেই বিষ্ণুকে অবতীর্ণ দেখিতে পায়, তখনই সে প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারে ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নাই, তখনই—কেবল তখনই সে আপনাকে হীনের হীন জানিয়া—প্রকৃত ভক্তের দৃষ্টিতে ভগবানকে উপাসনা করে। তাহার তখন আর বাহ্য অনুষ্ঠানাদি এবং তীর্থভ্রমণাদির প্রবৃত্তি থাকে না, সে প্রত্যেক মানবকেই যথার্থ দেবমন্দিরস্বরূপ বিবেচনা করে।

শাস্ত্রোক্ত ভক্তির অবস্থাভেদ ও উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য

আমাদের শাস্ত্রে ভক্তি নানারূপে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু যতদিন না আমাদের প্রাণে ভক্তিলাভের জন্য যথার্থ ব্যাকুলতা জাগিতেছে, ততদিন আমরা উহার কোনটিরই প্রকৃত তত্ত্ব যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই না। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ, আমরা ঈশ্বরকে আমাদের পিতা বলিয়া থাকি। কেন তাঁহাকে পিতা বলিব? পিতা শব্দে সচরাচর যাহা বুঝায়, উহা কখনই ঈশ্বরের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইতে পারে না। ঈশ্বরকে মাতা বলাতেও ঐ আপত্তি। কিন্তু যদি আমরা ঐ দুইটি শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য আলোচনা করি তবে দেখিব, ঐ দুইটি শব্দের যথার্থই সার্থকতা আছে। ঐ দুইটি শব্দ অত্যন্ত ভালবাসাসূচক—প্রকৃত ভাগবত ঈশ্বরকে প্রাণে প্রাণে ভালবাসেন বলিয়াই তিনি তাঁহাকে পিতা বা মাতা না বলিয়া থাকিতে পারেন না। রাসলীলায় রাধাকৃষ্ণের উপাখ্যান আলোচনা কর। ঐ উপাখ্যানে কেবল

ভক্তের প্রকৃত ভাব ব্যক্ত হইয়াছে—কারণ, সংসারের আর কোন প্রেমই নরনারীর পরস্পর প্রেম হইতে অধিক নহে। যেখানে এইরূপ প্রবল অনুরাগ, সেখানে কোন ভয় থাকে না, কোন বাসনা থাকে না, আর কোন আসক্তি থাকে না—কেবল এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে উভয়কে তন্ময় করিয়া রাখে। পিতামাতার প্রতি সন্তানের যে ভালবাসা, সে ভালবাসা ভয়মিশ্রিত, কারণ তাহাতে তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব থাকে। ঈশ্বর কিছু সৃষ্টি করিয়া থাকুন বা না-ই থাকুন, তিনি আমাদের রক্ষাকর্ত্তা হউন বা না-ই হউন, এ সকল জানিয়া আমাদের কি লাভ? তিনি আমাদের প্রাণের প্রিয়তম আরাধ্য দেবতা—সুতরাং ভয়ের ভাব ছাড়িয়া দিয়া আমাদের তাঁহাকে উপাসনা করা চাই। যখন মানুষের সকল বাসনা চলিয়া যায়, যখন সে অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা করে না, যখন সে ঈশ্বরের জন্য উন্মত্ত হয়, তখনই মানুষ ভগবানকে যথার্থভাবে ভালবাসিয়া থাকে। সংসারে প্রেমিক যেমন তাঁহার প্রেমাস্পদকে ভালবাসিয়া থাকে, এরূপভাবে আমাদিগকে ভগবানকে ভালবাসিতে হইবে। কৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর—রাধা তাঁহার প্রেমে উন্মত্ত। যে সকল গ্রন্থে রাধা-কৃষ্ণের উপাখ্যান আছে, সে সকল গ্রন্থ পাঠ কর, তাহার পর বুঝিবে—কিরূপে ঈশ্বরকে ভালবাসিতে হইবে। কিন্তু এ অপূর্ব্ব প্রেমের তত্ত্ব কে বুঝিবে? অনেক ব্যক্তি আছে, যাহাদের অন্তরের অন্তস্তলটা পর্য্যন্ত পাপে পূর্ণ—তাহারা পবিত্রতা বা নীতি কাহাকে বলে, জানে না, তাহারা কি এই সব তত্ত্ব বুঝিবে? তাহারা কোন মতেই এ সকল তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে না। যখন লোকে মন হইতে সমুদয় অসৎ

চিন্তা দূর করিয়া দিয়া নির্ম্মল পবিত্রতার বায়ু সেবন করিতে থাকে, তখন তাহারা মূর্খ হইলেও শাস্ত্রের অতি জটিল ভাষারও রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু এরূপ লোক সংসারে কয়জন—কয়জনের এরূপ হওয়া সম্ভব ?

এমন কোন ধর্ম্ম নাই, যাহা অসৎ লোকে কলুষিত না করিতে পারে। জ্ঞানমার্গের দোহাই দিয়া লোক অনায়াসেই বলিতে পারে, আত্মা যখন দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, তখন দেহ যাহাই করুক না কেন, আত্মা তাহাতে কখনই লিপ্ত হন না। যদি লোকে যথার্থভাবে ধর্ম্মের অনুসরণ করিত, তবে কি হিন্দু কি মুসলমান কি খ্রীষ্টিয়ান—যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী লোকই হউক না, সকলেই পবিত্রতার অবতারস্বরূপ হইত। কিন্তু প্রকৃতি মন্দ হইলে লোক মন্দ হইয়া থাকে,—আর মানুষও নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী পরিচালিত হইয়া থাকে,—ইহা অস্বীকার করিবার জো নাই। কিন্তু সকল ধর্ম্মেই অসাধুলোকের সংখ্যা যথেষ্ট হইলেও কতকগুলি ব্যক্তি এমন আছেন, যাঁহারা ঈশ্বরের নাম শুনিলেই উন্মত্ত হন—ঈশ্বরের গুণগান কীর্ত্তন করিতে করিতে যাঁহাদের চক্ষুতে প্রেমাশ্রুর আবির্ভাব হয়—এরূপ লোকই যথার্থ ভক্ত।

ধর্ম্মমাত্রই ভাল, কেবল তত্তদ্ধর্ম্মাবলম্বী অসৎ লোকের দ্বারাই উহা কলুষিত হয়

সংসারী লোক ঈশ্বরকে প্রভু ও নিজেকে তাঁহার নগদা মুটেস্বরূপ জ্ঞান করে। সে বলে, 'ধন্য পিতঃ, আজ আমায় দুপয়সা দিয়াছ—তজ্জন্য তোমায় ধন্যবাদ দিতেছি।' এইরূপে কেহ বলে—'হে ঈশ্বর, আমাদের ভরণপোষণের জন্য আমাদিগকে আহার্য্য

প্রদান কর।' কেহ বলে—'হে প্রভো, অমুক অমুক কারণে আমি তোমার প্রতি বড়ই কৃতজ্ঞ হইতেছি,' ইত্যাদি। এইরূপ ভাবসমূহ একেবারে পরিত্যাগ কর। শাস্ত্র বলেন, জগতে একমাত্র আকর্ষণী শক্তি রহিয়াছে—সেই আকর্ষণী শক্তির বশে সূর্য্য চন্দ্র এবং অন্যান্য সকলেই বিচরণ করিতেছে। সেই আকর্ষণী শক্তি ঈশ্বর। এই জগতে সকল বস্তু—ভালমন্দ যাহা কিছু—সবই ঈশ্বরাভিমুখে চলিতেছে। আমাদের জীবনে যাহা কিছু ঘটিতেছে, ভালই হউক, মন্দই হউক, সবই তাঁহার দিকে লইয়া যাইতেছে। একজন আর একজনকে আপন স্বার্থের জন্য খুন করিল। যাহা হউক, নিজের জন্যই হউক আর অপরের জন্যই হউক, ভালাবাসাই ঐ কার্য্যের মূলে। ভালই হউক, মন্দই হউক ভালবাসাই সকলের প্রেরক। সিংহ যখন ছাগশিশুকে হত্যা করে, তখন সে নিজে বা তাহার শাবকেরা ক্ষুধার্ত্ত বলিয়াই ঐরূপ করিয়া থাকে। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, ঈশ্বর কি?—তাহা হইলে বলিতে হইবে, ঈশ্বর প্রেমের অবতারস্বরূপ। সর্ব্বদা সকল অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রস্তুত, অনাদি, অনন্ত ঈশ্বর প্রত্যেক বস্তুতে বিদ্যমান রহিয়াছেন। তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট সাধনপ্রণালীর অনুষ্ঠান করিতে হইবে, নতুবা, হইবে না—তাঁহার এ অভিপ্রায় নহে। লোকে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁহার দিকে চলিয়াছে। পতির পরম অনুরাগিণী রমণী জানে না যে, তাহার পতির মধ্যে সেই মহা আকর্ষণী শক্তি রহিয়াছে—তাহাই তাহাকে তাহার স্বামীর দিকে টানিতেছে। আমাদের উপাস্য কেবল এই প্রেমের ঈশ্বর। যতদিন আমরা তাঁহাকে

ঈশ্বর পরম প্রেম স্বরূপ

স্রষ্টা পাতা আদি মনে করি, ততদিন তাঁহার বাহ্যপূজার প্রয়োজন হইয়া থাকে, কিন্তু যখন ঐ সকল ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে প্রেমের অবতারস্বরূপ চিন্তা করি এবং সকল বস্তুতে তাঁহাকে এবং তাঁহাতে সকলকে অবলোকন করি, তখনই আমরা স্থায়ী ভক্তি লাভ করিয়া থাকি।

শিয়ালকোটে স্বামিজীর নিকট অনেক প্রকার লোক আসিত। একদিন পার্ব্বত্যপ্রদেশ হইতে দুইজন সন্ন্যাসিনী স্বামিজীকে দর্শন করিতে আসিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া স্বামিজীর একটি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপনের প্রবল ইচ্ছা হইল এবং তিনি শিয়াল-কোটবাসীকে ঐ প্রস্তাব জ্ঞাপন করাইলেন। সকলেই আগ্রহের সহিত উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং উহার বন্দোবস্ত করিবার জন্য উপযুক্ত লোকগণের দ্বারা একটি কমিটিও গঠিত হইল। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, স্বামিজী বালকবালিকাগণের প্রাথমিক শিক্ষা রমণী শিক্ষয়িত্রীগণের দ্বারা হয়, ইহার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, আর যে কোন উপায়ে মহিলাগণ এই কার্য্যের উপযুক্ত হন, তাহারই আদর করিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার আরও বিশ্বাস ছিল যে, এই উপায়ে হিন্দুবিধবাগণের গ্রাসাচ্ছাদনের সমস্যা মীমাংসিত হইবে।

লাহোর

৫ই নবেম্বর স্বামিজী সঙ্গিগণসহ শিয়ালকোট হইতে অপরাহ্ণ ৪॥০ টার সময় লাহোরে উপস্থিত হইলেন। স্থানীয় সনাতন সভার

সভ্যগণ ষ্টেশনে আসিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। রাজা ধ্যান-সিংহের হাবেলী নামক লাহোর-মধ্যস্থ সুবৃহৎ প্রাসাদে স্বামিজীর শুভাগমন হইল। তথায় আসিয়া সমাগত দর্শকমণ্ডলীকে অনেক উপদেশ দিলেন। পশ্চাৎ, ভোজনান্তে, ট্রিবিউনের তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের বাটিতে গিয়া রাত্রি অবস্থান করিলেন।

আর্য্যসমাজও স্বামিজীকে অভ্যর্থনার ত্রুটি করিলেন না। দয়ানন্দ এঙ্গলো বেদিক কলেজের অধ্যক্ষ লালা হংসরাজ প্রভৃতি বড় বড় আর্য্যসমাজিগণ সর্ব্বদা তাঁহার সহিত নানারূপ চর্চ্চা করিতেন। আর্য্যসমাজীরা বেদকে—বিশেষতঃ বেদের সংহিতাভাগকে—একমাত্র প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন, আর ইহাও বলেন যে, বেদের ব্যাখ্যা এক প্রকারই হইতে পারে। কিন্তু স্বামিজীর মত বেদের উপনিষদ্‌ভাগই বিশেষ প্রামাণ্য—এবং ঐ উপনিষদের ব্যাখ্যা—অদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার বাদিগণ আপনাপন ইচ্ছানুযায়ী করিতে পারেন। ইহাতে কোন হানি নাই, বরং ইহাতে উন্নতিই হইয়া থাকে—কারণ মানুষকে জোর করিয়া কোন একটা ভাব না দিয়া তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে দিলে যদিও তাহার উন্নতি খুব ধীরে ধীরে হয়, তথাপি সেই উন্নতি খুব পাকা হইয়া থাকে। যদি বলা যায় দুইটি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মতই কিরূপে এক সময়ে সত্য হইতে পারে, তাহার উত্তর এই যে, মানুষের আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতির তারতম্যানুসারে ইহা সম্ভব।

আর্য্যসমাজীদের ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণা বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মসমাজের

ঈশ্বরধারণার তুল্য। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর নিরাকার, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, দয়াময়, প্রেমময়, আনন্দময়; তাঁহারা অদ্বৈতবাদীর নিগু'ণ ব্রহ্মও বুঝিতে পারেন না এবং মূর্ত্তিপূজকেরও প্রকৃত উদ্দেশ্য তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না। এই কারণে তাঁহারা অদ্বৈতবাদ ও মূর্ত্তিপূজার ঘোর বিরোধী। স্বামিজী অকাট্য যুক্তিজাল প্রয়োগ করিয়া আর্য্যসমাজীদিকে বিচার ও জ্ঞানের দৃষ্টিতে অদ্বৈতবাদ ব্যতীত আর কোন মত টিকিতে পারে না, ইহা বেশ করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। তারপর দেখাইলেন নিরাকার অথচ সগুণ ঈশ্বরের ধারণা—আমাদের মন এবং তজ্জাত কল্পনাশক্তির সহায়তা ব্যতীত হইতে পারে না। সুতরাং যদি আমাদের অক্ষমতাবশতঃ আমরা কল্পনাশক্তিরই সহায়তা গ্রহণ করিলাম, তখন যাহারা আরও নিম্ন অধিকারী, তাহারা যদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রতিমাদি দেখিয়া ঈশ্বরোপলব্ধি সহজে করিতে পারে, তবে তোমার তাহাকে বাধা দিবার কি প্রয়োজন আছে? তুমি শ্রেষ্ঠ অধিকারী হও, তোমার নিজ অভিপ্রায়মত সাধনা কর—কিন্তু অপর দুর্ব্বল ভ্রাতাকে বাধা দাও কেন? আর তুমি আপনাকে যতদূর জ্ঞানী মনে করিতেছ, বাস্তবিক তুমি ততদূর জ্ঞানী নহ—তোমা অপেক্ষা উচ্চতর ভাবের ভাবুক (অদ্বৈতবাদী) আছে। এইরূপ নানাবিধ উপদেশ দ্বারা স্বামিজী আর্য্যসমাজের গোঁড়ামি দূর করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন।

প্রায় প্রত্যহ প্রাতে ২ ঘণ্টা ও অপরাহ্নেও প্রায় ১৷৷০ ঘণ্টা ধ্যানসিংহের হাবেলীতে সমাগত প্রায় ১৫০৷২০০ পাঞ্জাবী ও

বাঙ্গালী ভদ্রলোকগণের সহিত এতদ্রূপ নানাবিধ চর্চ্চা হইত। এতদ্ব্যতীত স্বামিজীর আবাস-স্থান নগেন গুপ্তের বাটীতেও অনেক লোকের সমাগম হইত। একদিন নগেন গুপ্তের বাটীতে হংসরাজের সহিত কথাপ্রসঙ্গে স্বামিজী নিম্নলিখিত ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। হংসরাজ আর্য্য সমাজের মত—বেদের একপ্রকার অর্থই সঙ্গত হইতে পারে—সমর্থন করিতেছিলেন। স্বামিজী নানাবিধ যুক্তিজাল প্রয়োগ করিয়া অধিকারবিশেষে সম্পূর্ণ বিপরীত বিভিন্ন ব্যাখ্যা অবলম্বনে উন্নতিপথে অগ্রসর হওয়াই যে শ্রেয়ঃ, ইহা বুঝাইতেছিলেন—হংসরাজও বিপরীত যুক্তিসমূহ প্রয়োগ করিয়া উহা খণ্ডনের চেষ্টা করিতেছিলেন। অবশেষে স্বামিজী বলিয়া উঠিলেন,—লালাজি, আপনারা যে বিষয় লইয়া এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাকে আমি Fanaticism বা গোঁড়ামি আখ্যা দিয়া থাকি। সম্প্রদায়ের সত্বর বিস্তৃতিসাধনে যে ইহা বিশেষ সহায়তা করে, তাহাও আমি জানি। আর শাস্ত্রের গোঁড়ামি অপেক্ষা মানুষের (ব্যক্তিবিশেষকে অবতার বলিয়া আর তাঁহার আশ্রয় লইলেই মুক্তি—এইরূপ প্রচার) গোঁড়ামি দ্বারা আরও অদ্ভুতরূপে ও অতি শীঘ্র সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি হয়, ইহাও আমার বিলক্ষণ জানা আছে। আর আমার হস্তে সেই শক্তিও আছে। আমার গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসকে ঈশ্বরাবতাররূপে প্রচার করিতে আমার অন্যান্য গুরুভাইগণ সকলেই বদ্ধপরিকর, একমাত্র আমি ঐরূপ প্রচারের বিরোধী। কারণ, আমার দৃঢ়বিশ্বাস—মানুষকে তাহার নিজ বিশ্বাস ও ধারণানুযায়ী ধীরে ধীরে উন্নতি করিতে দিলে, যদিও অতি ধীরে ধীরে এই উন্নতি হয়, কিন্তু উহা

পাকা হইয়া থাকে। যাহা হউক, আমি চার বৎসর অন্ততঃ এইরূপ উদার ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া প্রচার করিব। যদি ইহাতে কোন ফল না হয়, (ফল হইবে বলিয়া যদিও আমার দৃঢ় বিশ্বাস) তবে আমি গোঁড়ামি প্রচার করিব।

এই স্থানে প্রসঙ্গক্রমে স্বামিজীর সম্বন্ধীয় দুই একটি ক্ষুদ্র ঘটনা বিবৃত করিতে চাই। যদিও ঐগুলি কোন বৃহৎ ব্যাপার নহে, তথাপি সকলেই জানেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় মহাপুরুষগণের প্রকৃত মহত্ত্ব বুঝা যায়। স্বামিজীর জনৈক শিষ্য, যিনি এই সময়ে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, ঘটনাগুলি বিবৃত করিয়াছেন।

স্বামিজী তাঁহার জনৈক সঙ্গীর নিকট অনেকক্ষণ ধরিয়া কোন ব্যক্তির খুব প্রশংসা করিতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গী হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু সে ব্যক্তি, স্বামিজী, আপনাকে মানে না। স্বামিজী তৎক্ষণাৎ বলিলেন, ভাল লোক হইতে হইলে যে আমায় মানিতে হইবে, ইহার মানে কি? সঙ্গীটি নিতান্ত অপ্রতিভ হইলেন।

এই সময়ে লাহোরে গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস আসিয়াছে। একদিন কোন কার্য্যোপলক্ষে উহার অন্যতম স্বত্বাধিকারী বাবু মতিলাল বসু নগেন গুপ্তের বাটী আসিয়াছেন। স্বামিজী দেখিয়াই চিনিলেন, তাঁহার বাল্যবন্ধু। অমনি তিনি নিতান্ত আত্মীয়ের ন্যায় খোলাখুলি ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। বাল্যকালে ইহারা এক আখড়ায় ব্যায়াম করিতেন। মতিবাবু তাঁহার বাল্যসঙ্গীর অপূর্ব্ব তেজ প্রতিভা ও শক্তিপ্রদীপ্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া যেন ঝলসিয়া গেলেন—স্বামিজী যতই তাঁহার সহিত আপনার মত ব্যবহার ও তদনুরূপ কথাবার্ত্তা

কহিবার চেষ্টা করিতেছেন, তিনিও যেন ততদূর সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেছেন, শেষে অনেকটা সাহস সংগ্রহ করিয়া মতিবাবু স্বামিজীকে সম্বোধন করিয়া অতি দীনস্বরে বলিলেন, 'ভাই, তোমায় এখন কি বলে ডাক্‌ব?' স্বামিজী অতিশয় স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন—'হাঁরে মতি, তুই কি পাগল হয়েছিস্ নাকি? আমি কি হয়েছি? আমিও সেই নরেন তুইও সেই মতি।' স্বামিজী এরূপভাবে কথাগুলি বলিলেন যে, মতিবাবুর সমুদয় সঙ্কোচ দূর হইয়া গেল!

স্বামিজী লাহোরে ১০।১১ দিন মাত্র ছিলেন। ধ্যানসিংহের হাবেলীতে প্রথম দিনের বক্তৃতার আয়োজন হয়। বিষয় ছিল—আমাদের সমস্যাসমূহ (The Problems Before Us)—কিন্তু স্বামিজী বক্তৃতা করিবেন শুনিয়া এত অধিক লোক সমাগম হইল যে, হলের ভিতর বক্তৃতা হওয়া অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। পরিশেষে ফাঁকায় বক্তৃতা হওয়া স্থির হইল। কিন্তু লোকের গোলমালের দরুণ স্বামিজী যতদূর সাধ্য উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করিয়াও সভায় নিস্তব্ধতা আনয়নে সমর্থ হইলেন না। সেইজন্য প্রায় দেড় ঘণ্টা বক্তৃতার পর সভা ভঙ্গ করা হইল। বক্তৃতার বিষয় যাহা ছিল, তাহা সমুদয় বিবৃত করা হয় নাই, এইজন্য ইহা 'হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ ভিত্তিসমূহ' (Common Bases of Hinduism) নামে প্রকাশিত হয়। আমরাও উহা ঐ নামে প্রকাশিত করিলাম।

'ভক্তি' নামক দ্বিতীয় বক্তৃতাটি মতিবাবুর সার্কাসপ্রাঙ্গণে হইয়াছিল। ট্রিবিউনের রিপোর্ট হইতে উহা অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল।

যাহা হউক, লাহোরবাসিগণ স্বামিজীর এই দুই বক্তৃতায় তৃপ্ত হইতে না পারিয়া ধ্যানসিংহের হাবেলীতে তৃতীয় বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিলেন। এবারে সভায় গোলমাল না হয়, এজন্য বিনামূল্যে টিকিট বিতরণের বন্দোবস্ত হইল এবং লোকের বসিবার জন্য চেয়ার প্রভৃতিরও সুবন্দোবস্ত হইল। লাহোরের সমুদয় শিক্ষিত ভদ্রলোক এই সভায় আগমন করিয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতাটি প্রায় ২॥০ ঘণ্টা ধরিয়া হয়। সকলেই শেষ পর্য্যন্ত আগ্রহের সহিত ইহা শ্রবণ করেন। জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তি (বাঙ্গালী) এই বক্তৃতা শুনিবার পর বন্ধুবান্ধবের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন—হাঁ, এই বক্তৃতায় 'মাল' আছে। ইহাই লাহোরের সুপ্রসিদ্ধ "বেদান্ত" বক্তৃতা।

আর একদিন স্বামিজী লাহোরের অনেকগুলি যুবককে লইয়া একটি সভা স্থাপন করিলেন। সভা স্থাপনের পূর্ব্বে স্বামিজী অতি বিশদ ভাষায় তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, কিরূপভাবে তাহারা তাহাদের প্রতিবেশীর কল্যাণ সাধনে সমর্থ। সভাটি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ভাবের হইল। অপরাহ্ণে পড়াশুনা হইতে অবকাশ পাইবার পর—যুবকগণকে 'দরিদ্রনারায়ণের' সেবা করিতে হইবে—যাহাতে ক্ষুধার্ত্ত খাইতে পায়,—পীড়িত ব্যক্তি ঔষধ পায়, অশিক্ষিত ব্যক্তি শিক্ষা পায়, সাদাসিদে ভাবে এইরূপ কার্য্য করিয়া যাইবার চেষ্টাই সভার উদ্দেশ্য হইল।

আর্য্যসমাজীরা পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধের আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। সনাতন সভার সভ্যেরা এই কারণে স্বামিজীকে 'শ্রাদ্ধ' বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে

লাগিলেন। নানা কারণে স্বামিজীর এ বিষয়ে বক্তৃতা দিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সনাতন সভার কর্ত্তৃপক্ষগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে অবশেষে অনিচ্ছাক্রমে সম্মত হইলেন। এই দিন পাঞ্জাবীগণ আরও স্থির করিয়াছিল যে, স্বামিজীকে লইয়া নগরসঙ্কীর্ত্তন করিবে। পাঞ্জাবীদের সংকল্প ছিল যে, স্বামিজীকে তাঞ্জামে চড়াইয়া সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে সহর প্রদক্ষিণ করাইবে। স্বামিজী তাঞ্জামে চড়িতে স্বীকৃত হন নাই, কিন্তু নগরসঙ্কীর্ত্তনে তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তিনি সঙ্গিগণের নিকট বলিয়াছিলেন, পাঞ্জাবীগণ সাধারণতঃ বড় শুষ্ক—যদি এইরূপ সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা তাহাদের মধ্যে কিছু ভক্তি প্রবেশ করে, এইজন্য তিনি সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিতে ইচ্ছুক। বাঙ্গালীগণকে তিনি নিশান প্রভৃতির আয়োজন ভাল করিয়া করিতে বলিয়াছিলেন। যাহা হউক, স্বামিজী সঙ্গিগণসহ লাহোরের মিউজিয়মে বেড়াইয়া ধ্যানসিংহের হাবেলীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বিস্তর লোক সমবেত হইয়াছে, কিন্তু সঙ্কীর্ত্তনের উদ্যোক্তৃগণ নাই। লোকপরম্পরায় শুনা গেল, লাহোর শহরের মধ্যে একখানি মাত্র খোল ছিল—তাহাও ব্যবহারাভাবে এতদিন অমনি পড়িয়া খারাপ হইতেছিল। তাহাতে এক ঘা চাঁটি দিবামাত্র উহা ফাঁসিয়া গিয়াছে। সঙ্কীর্ত্তন না হওয়াতে 'শ্রাদ্ধ' সম্বন্ধে বক্তৃতাও স্বামিজী দিলেন না। সমবেত লোকগণের মধ্যে গিয়া জানাইলেন, আজ আর বক্তৃতা হইবে না। কয়েক ব্যক্তি স্বামিজীর বাসস্থান পর্য্যন্ত গিয়া শ্রাদ্ধসম্বন্ধে স্বামিজীর সহিত অনেক তর্ক বিতর্ক করিলেন। স্বামিজীও শ্রাদ্ধের যুক্তিযুক্ততা বুঝাইয়া দিলেন।

আর একদিন অপরাহ্ণে স্বামিজীর জন্য একটি সান্ধ্যসম্মিলন হইল এবং তাহাতে লাহোরের গণ্যমান্য লোকগণের সহিত স্বামিজীর পরিচয় করাইয়া দেওয়া হইল। লাহোরের চিফ জষ্টিশ শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্য অনেক বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবী ভদ্রলোক স্বামিজীকে ও তাঁহার সঙ্গিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। সেই সকল স্থানেই নানাবিধ চর্চ্চা হইত। অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তি স্বামিজীর নিকট গুপ্তভাবে সাধনাদি শিক্ষা করিলেন। লাহোরের নিকটবর্ত্তী মিয়ানমীরে অনেক বাঙ্গালী কমিসেরিয়েটের কার্য্যোপলক্ষে বাস করেন। স্বামিজী এক দিন নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করিলেন। নানাবিধ ফলমূলমিষ্টান্নাদি দ্বারা তাঁহারা স্বামিজী ও তাঁহার সঙ্গিগণকে জলযোগ করাইলেন। তাঁহারা স্বামিজীর মধুর অথচ শিক্ষাপ্রদ উপদেশাবলী শুনিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন।

লাহোরের শিখ সম্প্রদায়ের 'শুদ্ধিসভা' নামক সভা আছে। যে সকল শিখ কোন কারণে মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা যদি অনুতপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার শিখ হইবার প্রার্থনা করে এবং মোহবশতঃ এরূপ ধর্ম্মান্তরগ্রহণরূপ অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, ইহা প্রমাণ করিতে পারে, তবে এই শুদ্ধিসভা তাহাদিগকে পুনরায় শিখ করিয়া থাকে। স্বামিজী নিমন্ত্রিত হইয়া সঙ্গিগণসহ এই সভার একটি অধিবেশনে গমন করিলেন। যখন তাঁহারা উপস্থিত হইলেন, তখন একটা সুবৃহৎ কড়ায় কড়াপ্রসাদ (হালুয়া) প্রস্তুত হইতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। আজ দুইজনকে শুদ্ধ করা হইবে। প্রথমতঃ

সভার সম্পাদক মহাশয়, কিরূপ অবস্থায় ইহারা মুসলমান হইয়াছিল, সেই সকল ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। পরে শুদ্ধিকামিদ্বয় —অনুতাপ প্রকাশপূর্ব্বক সভাসমক্ষে পুনরায় শিখধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার প্রার্থনা করিলে, গুরু গোবিন্দসিংহের নামোচ্চারণ, গ্রন্থ্ সাহেবের পবিত্র মন্ত্র সকল পাঠ ও পবিত্র বারিসেচনে উহাদিগকে 'শুদ্ধ' করা হইল। পরিশেষে সভাস্থ সকলকে কড়াপ্রসাদ বিতরিত হইল। স্বামিজী শিখদিগের এইরূপ উদার ভাব দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলেন।

এইরূপে লাহোরে ১০।১২ দিন কাটিয়া গেল। স্বামিজী সর্ব্বদাই এখানে কেবল মতবাদ অপেক্ষা কার্য্যের উপর বিশেষ ঝোঁক দিতেন।

হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ ভিত্তিসমূহ

এই সেই ভূমি—যাহা পবিত্র আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে পবিত্রতম বলিয়া পরিগণিত ; এই সেই ব্রহ্মাবর্ত্ত—আমাদের মনু মহারাজ যাহার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। এই সেই ভূমি—যেখান হইতে আত্মতত্ত্বজ্ঞানের জন্য সেই প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও অনুরাগ প্রসূত

হইয়াছে—ভবিষ্যতে যাহা (ইতিহাস এ বিষয়ের সাক্ষী) সমগ্র জগৎকে তাহার প্রবল বন্যায় ভাসাইয়াছে। এই সেই ভূমি—যেখানে ইহার বেগশালিনী স্রোতস্বিনীকুলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিভিন্ন আধারে প্রবল ধর্ম্মানুরাগ বিভিন্নরূপে উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ একাধারে মিলিয়া শক্তিসম্পন্ন হইয়া পরিশেষে জগতের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছে এবং বজ্রনির্ঘোষে উহার মহীয়সী শক্তি সমগ্র জগতে ঘোষণা করিয়াছে। এই সেই বীরভূমি, যাহাকে—

পুণ্যভূমি ব্রহ্মাবর্ত্ত

বহির্দ্দেশ হইতে ভারত যতবার অসভ্য বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে ততবারই—বুক পাতিয়া প্রথমে সেই আক্রমণ সহ্য করিতে হইয়াছে। এই সেই ভূমি, যাহা এত দুঃখ নির্য্যাতনেও উহার গৌরব, উহার তেজ সম্পূর্ণরূপে হারায় নাই। এখানেই অপেক্ষাকৃত আধুনিক-কালে দয়াল নানক তাঁহার অপূর্ব্ব বিশ্বপ্রেম প্রচার করেন। এখানেই সেই মহাত্মা তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ের কবাট খুলিয়া এবং বাহু প্রসারিত করিয়া সমগ্র জগৎকে—শুধু হিন্দুকে নয়, মুসলমানগণকে পর্য্যন্ত—আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়াছিলেন। এখানেই আমাদের জাতির শেষ চিহ্নস্বরূপ অথচ মহামহিমান্বিত গুরু গোবিন্দসিং জন্মগ্রহণ করেন, যিনি ধর্ম্মের জন্য নিজের এবং নিজের প্রাণসম প্রিয়তম আত্মীয়বর্গের রক্তপাত করিয়া—যাহাদের জন্য এই রক্তপাত করিলেন, তাহারাই যখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল তখন—মর্ম্মাহত সিংহের ন্যায় দক্ষিণদেশে যাইয়া নির্জ্জনবাস আশ্রয় করিলেন আর নিজ দেশের প্রতি বিন্দুমাত্র অভিশাপ বাক্য উচ্চারণ না করিয়া, বিন্দুমাত্র অসন্তোষের

ভাব প্রকাশ না করিয়া, শান্তভাবে এ মর্ত্ত্যধাম হইতে অপসৃত হইলেন।

হে পঞ্চনদ দেশের সন্তানগণ, এখানে—এই আমাদের প্রাচীন দেশে—আমি তোমাদের নিকট আচার্য্যরূপে উপস্থিত হই নাই, কারণ, তোমাদিগকে শিক্ষা দিবার মত জ্ঞান আমার অতি অল্পই আছে। আমি পূর্ব্বদেশ হইতে পশ্চিমদেশীয় ভ্রাতৃগণের সহিত সম্ভাষণ করিতে আসিয়াছি, আলাপ করিতে আসিয়াছি, পরস্পরের ভাব মিলাইবার জন্য আসিয়াছি। আমি এখানে আসিয়াছি—আমাদের মধ্যে কি বিভিন্নতা আছে তাহা বাহির করিবার জন্য নহে, আমি আমাদের মিলনভূমি কোথায়, তাহাই অন্বেষণ করিতে আসিয়াছি—এখানে আসিয়াছি বুঝিবার চেষ্টা করিতে, কোন্ ভিত্তি অবলম্বন করিয়া আমরা চিরকাল সৌভ্রাত্রসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে পারি, কোন্ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে—যে বাণী অনন্তকাল ধরিয়া আমাদিগকে আশার কথা শুনাইয়া আসিতেছে—তাহা প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে পারে। আমি এখানে আসিয়াছি—তোমাদিগের নিকট কিছু গড়িবার প্রস্তাব করিতে, কিছু ভাঙ্গিবার পরামর্শ দিতে নয়।

আমি তোমাদের নিকট কি ভাবে আসিয়াছি

সমালোচনার দিন চলিয়া গিয়াছে, আমরা এখন কিছু জিনিস গড়িবার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছি। জগতে সময়ে সময়ে সমালোচনা—এমন কি, কঠোর সমালোচনারও প্রয়োজন হইয়া থাকে, কিন্তু সে অল্প দিনের জন্য। অনন্ত কালের জন্য কার্য্য—উন্নতির চেষ্টা—গঠন—সমালোচনা বা ভাঙ্গাচোরা নহে। প্রায়

আমার উদ্দেশ্য বিনাশ নহে, গঠন

বিগত এক শত বর্ষ ধরিয়া আমাদের দেশের সর্ব্বত্র সমালোচনার বন্যা বহিয়াছে—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের তীব্র রশ্মিজাল অন্ধকারময় প্রদেশসমূহের উপর পড়িয়া আমাদের আনাচে কানাচে, গলিঘুঁজি-গুলিতেই অন্যান্য স্থান অপেক্ষা যেন সাধারণের অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়াছে। স্বভাবতঃই আমাদের দেশের সর্ব্বত্র মহা মহা মনীষিগণের—শ্রেষ্ঠ মহিমময় সত্য ও ন্যায়ানুরাগী মহাত্মাগণের—অভ্যুদয় হইল। তাঁহাদের হৃদয়ে অপার স্বদেশপ্রেম এবং সর্ব্বোপরি, ঈশ্বর ও ধর্ম্মের প্রতি প্রবল অনুরাগ ছিল। আর যেহেতু এই মহাপুরুষগণ স্বদেশকে এত প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন, যেহেতু তাঁহাদের প্রাণ স্বদেশের জন্য কাঁদিত, সেই হেতুই তাঁহারা যাহা কিছু মন্দ বলিয়া বুঝিতেন, তাহাকেই তীব্রভাবে আক্রমণ করিতেন। অতীতকালের এই মহাপুরুষগণ ধন্য—তাঁহারা দেশের অনেক কল্যাণসাধন করিয়াছেন ; কিন্তু আজ আমাদিগকে এক মহাবাণী বলিতেছে—যথেষ্ট হইয়াছে, সমালোচনা যথেষ্ট হইয়াছে, দোষদর্শন যথেষ্ট হইয়াছে। এখন নূতন করিয়া গড়িবার সময় আসিয়াছে, এখন আমাদের সমস্ত বিক্ষিপ্ত শক্তিকে একত্রীভূত করিবার, তাহাদিগকে এক কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত করিবার সময় আসিয়াছে, আর সেই সমষ্টিশক্তির সহায়তায়, শত শত শতাব্দী ধরিয়া যে জাতীয় গতি অবরুদ্ধপ্রায় হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দিতে হইবে। এখন বাড়ী পরিষ্কার হইয়াছে ; ইহাতে নূতন করিয়া বাস করিতে হইবে। পথ সাফ হইয়াছে ; আর্য্যসন্তানগণ, সম্মুখে অগ্রসর হও।

ভদ্রমোহদয়গণ, এই কথা বলিবার জন্যই আমি আপনাদের সম্মুখে আসিয়াছি, আর প্রথমেই আপনাদিগকে বলিতে চাই যে, আমি কোন দল বা বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত নহি। আমার চক্ষে সকল সম্প্রদায়ই মহান্ ও মহিমময়, আমি সকল সম্প্রদায়কেই ভালবাসি আর আমি সমগ্র জীবন ধরিয়া উহাদের মধ্যে যাহা সত্য, যাহা উপাদেয়, তাহাই বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছি। অতএব অদ্য রাত্রে আমার সঙ্কল্প এই যে, তোমাদের নিকট এমন কতকগুলি তত্ত্ব বলিব, যে গুলিতে আমরা সকলে একমত; যদি সম্ভব হয়, আমাদের পরস্পরের সম্মিলনভূমি আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিব, আর যদি ঈশ্বরের কৃপায় ইহা সম্ভব হয়, তবে অবিলম্বে উহা অবলম্বন করিয়া কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। আমরা হিন্দু। আমি এই হিন্দু শব্দটি কোনরূপ মন্দ অর্থে ব্যবহার করিতেছি না, আর যাহারা বিবেচনা করে, ইহার কোন মন্দ অর্থ আছে, তাহাদের সহিতও আমার মতের মিল নাই। প্রাচীনকালে ইহা দ্বারা কেবল সিন্ধুনদের পরপারবর্ত্তী লোকগণকে বুঝাইত, আজ যাহারা আমাদিগকে ঘৃণা করে, তাহাদের মধ্যে অনেকে ইহা কুৎসিত অর্থে ব্যাখ্যা করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু নামে কিছু আসিয়া যায় না। আমাদিগেরই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে—হিন্দু নাম সর্ব্ববিধ মহিমময়, সর্ব্ববিধ আধ্যাত্মিক বিষয়ের বাচক হইবে, অথবা চিরদিনই উহা ঘৃণাসূচক নামেই পর্য্যবসিত হইবে—উহা দ্বারা পদদলিত, অপদার্থ, ধর্ম্মভ্রষ্ট জাতি বুঝাইবে। যদি বর্ত্তমানকালে হিন্দু শব্দে কোন মন্দ জিনিস বুঝায়, বুঝাক্।

হিন্দু

এস, আমাদের কার্য্যের দ্বারা লোককে দেখাইতে প্রস্তুত হই যে, কোন ভাষাই ইহা হইতে উচ্চতর শব্দ আবিষ্কারে সমর্থ নহে। যে সকল নীতি অবলম্বনে আমার জীবন পরিচালিত হইতেছে—তন্মধ্যে একটি এই যে, আমি কখন আমার পূর্ব্বপুরুষগণকে স্মরণ করিয়া লজ্জিত হই নাই। জগতে যত ঘোর অহঙ্কারী পুরুষ জন্মিয়াছে, আমি তাহাদের অন্যতম ; কিন্তু আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি, আমার নিজের কোন গুণ বা শক্তি লইয়া আমি অহঙ্কার করি না, আমি আমার প্রাচীন পিতৃপুরুষগণের গৌরবে গৌরব অনুভব করিয়া থাকি। যতই আমি অতীতকালের আলোচনা করিয়াছি, যতই আমি অধিক পশ্চাদ্দৃষ্টিপরায়ণ হইয়াছি, ততই আমার হৃদয়ে এই গৌরববুদ্ধির আবির্ভাব হইয়াছে, ইহাতেই আমার বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও সাহস আসিয়াছে, আমাকে পৃথিবীর ধূলি হইতে উত্থিত করিয়া,আমাদের মহান্ পূর্ব্বপুরুষগণের মহান্ অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিতে নিযুক্ত করিয়াছে। সেই প্রাচীন আর্য্যদিগের সন্তানগণ, ঈশ্বরের কৃপায় তোমাদেরও সেই অহঙ্কার হৃদয়ে আবির্ভূত হউক, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের উপর সেই বিশ্বাস তোমাদের শোণিতের সহিত মিশিয়া তোমাদের জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া যাউক, উহা দ্বারা সমগ্র জগতের উদ্ধার সাধিত হউক।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের সকলের ঠিক মিলনভূমি কোথায়, আমাদের জাতীয় জীবনের সাধারণ ভিত্তি কি, তাহা বাহির করিতে চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে একটি বিষয় আমাদিগকে স্মরণ রাখিতেই হইবে। যেমন প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিত্ব আছে, সেইরূপ প্রত্যেক

জাতিরও একটি ব্যক্তিত্ব আছে। যেমন একজন ব্যক্তির অপর ব্যক্তি হইতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পার্থক্য আছে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই যেমন কতকগুলি বিশেষত্ব আছে, সেইরূপ একজাতিরও অপর জাতি হইতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ লক্ষণগত প্রভেদ আছে। আর যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই প্রকৃতির কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিতে হয়, যেমন তাহার নিজ ভূত কর্ম্মের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট বিশেষদিকে তাহাকে চলিতে হয়, জাতির পক্ষেও তাহাই। প্রত্যেক জাতিকেই এক একটি দৈবনির্দ্দিষ্ট পথে যাইতে হয়, প্রত্যেক জাতিরই জগতে কিছু বার্ত্তা ঘোষণা করিবার আছে, প্রত্যেক জাতিকেই ব্রতবিশেষের উদ্‌যাপন করিতে হয়।

আমাদের জাতীয়ত্ব কোথায়?

অতএব প্রথম হইতেই আমাদিগকে জাতীয় ব্রত কি, তাহা জানিতে হইবে, বিধাতা ইহাকে কি কার্য্যের জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহা জানিতে হইবে, বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন জাতীয় উন্নতি ও অধিকারে, ইহার স্থান কোথায়, তাহা বুঝিতে হইবে, বিভিন্ন জাতীয় সঙ্গীতের ঐক্যতানে ইহা কোন্ সুর বাজাইবে, তাহা জানিতে হইবে। আমাদের দেশে ছেলেবেলায় গল্প শুনিতাম, কতকগুলি সাপের মাথার মণি আছে—তুমি সাপটিকে যাহা ইচ্ছা করিতে পার, যতক্ষণ উহার মাথায় ঐ মণি থাকিবে, ততক্ষণ তাহাকে কোনমতে মারিতে পারিবে না। আমরা অনেক রাক্ষসীর গল্প শুনিয়াছি। তাহাদের প্রাণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষের ভিতর থাকিত। যতদিন ঐ পাখীটি মারিতে না পারিতেছ, ততদিন সেই রাক্ষসীকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ফেল, তাহাকে যাহা ইচ্ছা কর, কিন্তু রাক্ষসী

মরিবে না। জাতি সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। জাতিবিশেষের জীবন কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানবিশেষে থাকে, সেইখানেই সেই জাতির জাতীয়ত্ব আর তাহাতে যতদিন না ঘা পড়ে, ততদিন সেই জাতির মৃত্যু নাই। এই তত্ত্বের আলোকে আমরা জগতের ইতিহাসে যত অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত বক্ষ্যমাণ ব্যাপারটি বুঝিতে পারিব। বর্ব্বর জাতির আক্রমণতরঙ্গ বারবার আমাদের এই জাতির মস্তকের উপর দিয়া গিয়াছে। শত শত বর্ষ ধরিয়া 'আল্লা হো আকবর' রবে ভারতগগন মুখরিত হইয়াছে, আর এমন হিন্দু কেহ ছিল না, যে প্রতিমুহূর্ত্তে নিজ নিপাত আশঙ্কা না করিয়াছে। জগতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ সমুদয় দেশাপেক্ষা ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অত্যাচার ও নিগ্রহ সহিয়াছে। তথাপি আমরা পূর্ব্বে যেরূপ ছিলাম, এখনও একরূপ তাহাই আছি, এখনও আমরা নূতন বিপদের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত; শুধু তাহাই নহে—সম্প্রতি আমরা শুধু যে নিজেরাই অক্ষত, তাহা নহে, আমরা বাহিরে যাইয়াও অপরকে আমাদের ভাব প্রদানে প্রস্তুত—তাহার চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি। আর বিস্তৃতিই জীবনের চিহ্ন। আমরা আজ দেখিতেছি, আমাদের চিন্তা ও ভাবসমূহ শুধু আমাদের ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, কিন্তু আমরা ইচ্ছা করি বা না করি, উহারা বাহিরে যাইয়া অপর জাতির সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, অন্যান্য জাতির মধ্যে স্থান লাভ করিতেছে, শুধু তাহাই নহে, কোন কোন স্থলে ভারতীয় চিন্তা গুরুর আসন পাইতেছে। ইহার কারণ এই,—মানবজাতির মন যে সকল বিষয় লইয়া ব্যাপৃত থাকিতে পারে, তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও মহত্তম

বিষয় অর্থাৎ দর্শন ও ধর্ম্মই সমগ্র জগতের উন্নতির সমষ্টিতে ভারতের মহৎ দানস্বরূপ।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অন্যান্য অনেক বিষয়েরও চেষ্টা করিয়াছিলেন—অন্যান্য সকলের ন্যায় তাঁহারাও প্রথমে বহির্জ্জগতের রহস্য আবিষ্কার করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন—আমরা সকলেই একথা জানি আর সেই প্রকাণ্ড মস্তিষ্কশালী অদ্ভুত জাতি চেষ্টা করিলে সেই পথের এমন অদ্ভুত অদ্ভুত বিষয় আবিষ্কার করিতে পারিতেন, যাহা আজও সমস্ত জগতের স্বপ্নেরও অগোচর, কিন্তু তাঁহারা উচ্চতর বস্তু লাভের জন্য ঐ পথ পরিত্যাগ করিলেন—বেদের মধ্য হইতে সেই উচ্চতর বিষয়ের প্রতিধ্বনি শুনা যাইতেছে;—

'অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।'—মুণ্ডক-উ ১।৫

'তাহাই পরা বিদ্যা, যাহা দ্বারা সেই অবিনাশী পুরুষকে লাভ হয়।' এই পরিবর্ত্তনশীল, অশাশ্বত, প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় বিদ্যা, মৃত্যুদুঃখশোকপূর্ণ এই জগতের বিদ্যা খুব বড় হইতে পারে; কিন্তু যিনি অপরিণামী, আনন্দময়, একমাত্র যথায় শক্তির অবস্থান, একমাত্র যেখানে অনন্ত জীবন ও পূর্ণত্ব, একমাত্র যাঁহার নিকট যাইলে সকল দুঃখের অবসান হয়, তাঁহাকে জানাই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। যাহাই হউক, ইচ্ছা করিলে, তাঁহারা অনায়াসেই সেই সকল বিজ্ঞান, সেই সকল বিদ্যা আবিষ্কার করিতে পারিতেন, যাহাতে কেবল অন্নবস্ত্র সংগ্রহ হয়, যাহাতে আমাদের স্বজনগণকে জয় করিয়া তাহাদের উপর আধিপত্যের উপায় শিক্ষা দেয়, যাহাতে সবলকে দুর্ব্বলের উপর প্রভুত্ব কিরূপে

করা যায়, তাহা শিক্ষা দেয়, এ সকলই তাঁহারা আবিষ্কার করিতে পারিতেন কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে তাঁহারা ওদিকে কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া একেবারে অন্য পথ ধরিলেন—উহা পূর্ব্বোক্ত পথ হইতে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ ও মহৎ, পূর্ব্বোক্ত পথ হইতে উহাতে অনন্তগুণ আনন্দ; ঐ পথ ধরিয়া তাহারা এরূপ একনিষ্ঠভাবে অগ্রসর হইলেন যে, এক্ষণে উহা আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া পিতা হইতে পুত্রে উত্তরাধিকারসূত্রে আসিয়া আমাদের জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আমাদের ধমনীর প্রত্যেক শোণিতবিন্দুর সহিত মিশিয়া গিয়াছে, আমাদের স্বভাবতুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে—এখন ধর্ম্ম ও হিন্দু এই দুইটি শব্দ একার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাই আমাদের জাতির বিশেষত্ব, ইহাতে ঘা দিবার জো নাই। বর্ব্বর জাতিসমূহ তরবারি ও বন্দুক লইয়া বর্ব্বর ধর্ম্মসমূহের আমদানী করিয়া একজনও সেই সাপের মাথার মণি ছুঁইতে পারে নাই, একজনও এই জাতির প্রাণপাখীকে মারিতে পারে নাই। অতএব ইহাই আমাদের জাতির জীবনীশক্তি আর যতদিন ইহা অব্যাহত থাকিবে, ততদিন জগতে এমন কোন শক্তি নাই যে, এই জাতির বিনাশ সাধনে সক্ষম। যতদিন আমরা আমাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মহত্তম রত্নস্বরূপ এই ধর্ম্মকে ধরিয়া থাকিব, ততদিন জগতের সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন ও দুঃখের অগ্নিরাশির মধ্য হইতে প্রহ্লাদের ন্যায় অক্ষত শরীরে বাহির হইয়া আসিব।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ইচ্ছা করিলে বহির্জ্জগতের উন্নতি করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহারা উহা অসার বুঝিয়া অন্তর্জ্জগতে মনোনিবেশ করিলেন

হিন্দু যদি ধার্ম্মিক না হয়, তবে আমি তাহাকে হিন্দু বলি না। অন্যান্য দেশে রাজনীতিচর্চ্চা লোকের মুখ্য অবলম্বন হইতে পারে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সে একটু আধটু ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে, কিন্তু এখানে—এই ভারতে—আমাদের জীবনের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য ধর্ম্মানুষ্ঠান, তারপর যদি সময় থাকে, তবে অন্যান্য জিনিস তাহার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়—হানি নাই। এই বিষয়টি মনে রাখিলে আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব যে, জাতীয় কল্যাণের জন্য অতীতকালে যেমন, বর্ত্তমানকালেও তেমনি, চিরকালই আমাদিগকে প্রথমেই আমাদের জাতির সমগ্র আধ্যাত্মিক শক্তিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ভারতের বিক্ষিপ্ত আধ্যাত্মিক শক্তিগুলির একত্রীকরণই ভারতের জাতীয় একত্ব সাধনের একমাত্র উপায়। যাহাদের হৃদয়তন্ত্রী একবিধ আধ্যাত্মিক সুরে বাঁধা, তাঁহাদের সম্মিলনেই ভারতের জাতি গঠিত হইবে।

ভদ্রমহোদয়গণ, এদেশে যথেষ্ট সম্প্রদায় বিদ্যমান। এখনই যথেষ্ট রহিয়াছে, আর ভবিষ্যতেও যথেষ্ট হইবে। কারণ আমাদের ধর্ম্মের ইহাই বিশেষত্ব যে, মূলতত্ত্বগুলি এত উদার যে, যদিও উহা হইতেই অনেক বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি ব্যাপার বাহির হইয়াছে, কিন্তু উহারা এমন তত্ত্বসমূহেরই কার্য্যে পরিণতিস্বরূপ, যেগুলি আমাদের মস্তকোপরি বিদ্যমান আকাশের ন্যায় উদার এবং প্রকৃতির তুল্য নিত্য ও সনাতন। অতএব সম্প্রদায় যে স্বভাবতঃই চিরদিনই বিদ্যমান থাকিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া সাম্প্রদায়িক বিবাদের কোন প্রয়োজন নাই।

সম্প্রদায় থাক্, সাম্প্রদায়িকতা দূর হউক। সাম্প্রদায়িকতায় জগতের কিছু উন্নতি হইবে না, কিন্তু সম্প্রদায় না থাকিলে জগৎ চলিতে পারে না। একদল লোক কিছু সব কার্য্য করিতে পারে না। এই অনন্তপ্রায় শক্তিরাশি অল্প কয়েকটি লোকের দ্বারা কখনই পরিচালিত হইতে পারে না। এই বিষয় বুঝিলেই আমরা বুঝিব, কি প্রয়োজনে আমাদের ভিতর সম্প্রদায়ভেদরূপ এই শ্রমবিভাগ অবশ্যম্ভাবী রূপে আসিয়াছে। বিভিন্ন আধ্যাত্মিক-শক্তিসমূহের সুপরিচালনের জন্য সম্প্রদায় থাকুক, কিন্তু আমাদের পরস্পর বিবাদ করিবার কি প্রয়োজন আছে, যখন আমাদের অতি প্রাচীন শাস্ত্র সকল ঘোষণা করিতেছে যে, এই ভেদ আপাতপ্রতীয়মান মাত্র, এই সকল আপাতদৃষ্ট বিভিন্নতাসত্ত্বেও ঐ সকলের মধ্যে সম্মিলনের স্বর্ণসূত্র রহিয়াছে, ঐ সকলগুলির মধ্যেই সেই পরম মনোহর একত্ব রহিয়াছে। আমাদের অতি প্রাচীন গ্রন্থসমূহ ঘোষণা করিয়াছেন, 'একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' জগতে একমাত্র বস্তুই বিদ্যমান—ঋষিগণ তাঁহাকেই বিভিন্ন নামে বর্ণন করেন। অতএব যদি এই ভারতে—যেখানে চিরদিন সকল সম্প্রদায়ই সম্মানিত হইয়া আসিয়াছেন, সেই ভারতে যদি এখনও এই সকল সাম্প্রদায়িক বিবাদ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর এই দ্বেষহিংসা থাকে, তবে ধিক্ আমাদিগকে, যাহারা সেই মহিমান্বিত পূর্ব্বপুরুষগণের বংশধর বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেয়।

সম্প্রদায় থাকুক, সাম্প্রদায়িকতা দূর হউক

ভদ্রমহোদয়গণ, আমার বিশ্বাস—কতকগুলি প্রধান প্রধান

নতে আমাদের সকলেরই সম্মতি আছে, আমরা বৈষ্ণব হই বা শৈব হই, শাক্ত বা গাণপত্য হই, প্রাচীন বৈদান্তিকগণের বা আধুনিকগণের যাঁহাদেরই হউক, পদানুসরণ করি, প্রাচীন গোঁড়া সম্প্রদায়েরই হই, অথবা আধুনিক সংস্কৃত সম্প্রদায়েরই হই, যে আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়, আমার ধারণা—সে-ই কতকগুলি বিষয় বিশ্বাস করিয়া থাকে। অবশ্য ঐ তত্ত্বগুলির ব্যাখ্যাপ্রণালীতে ভেদ থাকিতে পারে, আর থাকাও উচিত; কারণ, আমরা সকলকেই আমাদের ভাবে আনিতে পারি না—ঐরূপ চেষ্টাই পাপ—আমরা যেরূপ ব্যাখ্যা করিব, সকলকেই সেই ব্যাখ্যা লইতে হইবে বা সকলকেই আমাদের প্রণালী অবলম্বনে চলিতে হইবে, জোর করিয়া এরূপ করিবার চেষ্টা পাপ। ভদ্রমহোদয়গণ, আজ যাঁহারা এখানে একত্রিত হইয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, আমরা বেদকে আমাদের ধর্ম্মরহস্যসমূহের সনাতন উপদেশ বলিয়া বিশ্বাস করি। আমরা সকলেই বিশ্বাস করি, এই পবিত্র শব্দরাশি অনাদি অনন্ত, প্রকৃতির যেমন আদি নাই, অন্ত নাই, ইহারও তদ্রূপ, আর যখনই আমরা এই পবিত্র গ্রন্থের পাদপদ্ম স্পর্শ করি, তখনই আমাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সকল ভেদ, সকল প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান হয়। আমাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার ভেদের শেষ মীমাংসক—শেষ বিচারকর্ত্তা এই বেদ। বেদ কি, এই লইয়া আমাদের মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে। কোন সম্প্রদায় বেদের অংশবিশেষকে অন্য অংশ হইতে পবিত্রতর জ্ঞান

(পার্শ্বটীকা: হিন্দুসম্প্রদায়-সমূহের সম্মিলনভূমি প্রথম—বেদ)

করিতে পারে। কিন্তু তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না, যতক্ষণ আমরা বলিতে পারি—বেদবিশ্বাসে আমরা সকলেই ভাই ভাই। এই সনাতন পবিত্র অপূর্ব্ব গ্রন্থ হইতেই আজ আমরা যে কিছু পবিত্র, মহৎ, উত্তম বস্তুর অধিকারী, সব আসিয়াছে। বেশ, তাই যদি আমরা বিশ্বাস করি, তবে এই তত্ত্বটিই এই ভারতভূমির সর্ব্বত্র প্রচারিত হউক। ইহাই যদি হয়, তবে বেদ চিরদিনই যে প্রাধান্যের অধিকারী, এবং বেদের যে প্রাধান্যে আমরাও বিশ্বাসী তাহা বেদকে দেওয়া হউক। অতএব আমাদের সম্মিলনের প্রথম ভূমি বেদ।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা সকলেই ঈশ্বর অর্থাৎ জগতের সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কারিণী শক্তি—যাহাতে কালে সমগ্র জগৎ লয় প্রাপ্ত হইয়া আবার কালে জগদ্ব্রহ্মাণ্ডরূপ এই অদ্ভুত প্রপঞ্চরূপে বহির্গত হয়, তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া থাকি। আমাদের ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় ধারণা ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইতে পারে—কেহ বা হয়ত সম্পূর্ণ সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসী, কেহ বা আবার সগুণ অথচ অমানবভাবাপন্ন ঈশ্বরে বিশ্বাসী, অপর কেহ আবার সম্পূর্ণ নির্গুণ ঈশ্বর মানিতে পারেন, আর সকলেই বেদ হইতে নিজ নিজ মতের প্রমাণ দেখাইতে পারেন। এই সকল ভেদ-সত্ত্বেও আমরা সকলেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া থাকি। অন্য কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, যাঁহা হইতে সমুদয় উৎপন্ন হইতেছে, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সকলে জীবিত, অন্তে সকলেই যাঁহাতে লীন হইবে, সেই অত্যদ্ভুত অনন্ত শক্তিকে যে বিশ্বাস না করে, তাহাকে হিন্দু বলা যাইতে পারে না। যদি তাহাই হয়, তবে

দ্বিতীয়—ঈশ্বর

এই তত্ত্বটিও ভারতভূমির সর্ব্বত্র প্রচার করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। ঈশ্বরের যে ভাবই তুমি প্রচার কর না কেন, তোমাতে আমাতে প্রকৃতপক্ষে কোন ভেদ নাই—আমরা তোমার সঙ্গে উহা লইয়া বিবাদ করিব না—কিন্তু যেরূপেই হউক, তোমায় ঈশ্বর প্রচার করিতে হইবে। আমরা ইহাই চাই। উহাদের মধ্যে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কোন ধারণাটি অপরটি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইতে পারে, কিন্তু মনে রাখিও ইহার কোনটিই মন্দ নহে। একটি উৎকৃষ্ট, অপরটি উৎকৃষ্টতর, অপরটি উৎকৃষ্টতম হইতে পারে, কিন্তু আমাদের ধর্ম্মতত্ত্বের পারিভাষিক শব্দনিচয়ের মধ্যে 'মন্দ' শব্দটির স্থান নাই। অতএব ঈশ্বরের নাম যিনি যে ভাবে ইচ্ছা প্রচার করেন তিনিই ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদভাজন। তাঁহার নাম যতই প্রচারিত হইবে ততই এই জাতির কল্যাণ। আমাদের সন্তানগণ বাল্যকাল হইতে এই ভাব শিক্ষা করুক—এই ঈশ্বরের নাম দরিদ্রতম ও নীচতম ব্যক্তির গৃহ হইতে ধনিশ্রেষ্ঠ উচ্চতম সকলের গৃহে প্রবিষ্ট হউক।

ভদ্রমহোদয়গণ, তৃতীয় তত্ত্ব যাহা আমি তোমাদের নিকট বলিতে চাই, তাহা এই জগতের অন্যান্য জাতির মত আমরা বিশ্বাস করি না যে, জগৎ কয়েক সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে মাত্র সৃষ্ট হইয়াছে, আর একদিন উহা একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইবে; আর ইহাও আমরা বিশ্বাস করি না যে, জীবাত্মাও এই জগতের সঙ্গে শূন্য হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। আমার বিবেচনায় এই বিষয়েও সকল হিন্দুই একমত হইতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি, প্রকৃতি অনাদি অনন্ত; তবে কল্পনাতে এই স্থূল বাহ্য জগৎ সূক্ষ্মাবস্থায় পরিণত হয়, কিছুকালের

জন্য ঐরূপ অবস্থায় থাকিয়া আবার বাহির হইয়া প্রকৃতি-নামধেয় এই অনন্ত প্রপঞ্চকে প্রকাশ করে আর এই তরঙ্গাকার গতি অনন্তকাল ধরিয়া—যখন কালেরও আরম্ভ হয় নাই, তখন হইতেই চলিতেছে এবং অনন্ত কাল ধরিয়া চলিবে।

তৃতীয়—সৃষ্টিবাদ

আরও সকল হিন্দুই বিশ্বাস করে যে, স্থূল জড় দেহটা, এমন কি, তাহার অভ্যন্তরস্থ মন-নামধেয় সূক্ষ্ম শরীরও প্রকৃত মানুষ নহে, কিন্তু প্রকৃত মানব এইগুলি হইতেও শ্রেষ্ঠতর। কারণ, স্থূলদেহ পরিণামী, মনও তদ্রূপ, কিন্তু এতদুভয়ের অতীত আত্মা-নামধেয় সেই অনির্ব্বচনীয় বস্তুর (আমি এই 'আত্মা' শব্দটির ইংরাজী অনুবাদ করিতে অক্ষম, যে শব্দের দ্বারাই ইহার অনুবাদ করা যাক্ না কেন, তাহা ভুল হইবে) আদি অন্ত কিছুই নাই, মৃত্যু নামক অবস্থাটির সহিত উহা পরিচিত নহে। তারপর আর একটি বিশেষ বিষয়ে অন্যান্য জাতির সহিত আমাদের ধারণার সম্পূর্ণ প্রভেদ, তাহা এই যে, আত্মা এক দেহ অবসানে আর এক দেহ ধারণ করে—এইরূপ করিতে করিতে তাহার এমন অবস্থা আসে, যখন তাহার কোনরূপ শরীরধারণের প্রয়োজন বা ইচ্ছা থাকে না—তখন সে মুক্ত হইয়া যায়, আর তাহার জন্ম হয় না। আমি আমাদের শাস্ত্রে সংসারবাদ বা পুনর্জ্জন্মবাদ এবং নিত্য-আত্মাসম্বন্ধীয় মতবাদের কথা বলিতেছি। আমরা যে সম্প্রদায়ভুক্ত হই না কেন, এই আর একটী বিষয়ে আমরা সকলেই একমত। এই আত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে। এক সম্প্রদায়ের

মতে এই আত্মা পরমাত্মা হইতে নিত্যভেদসম্পন্ন হইতে পারে, কাহারও মতে আবার উহা সেই অনন্ত বহ্নির স্ফুলিঙ্গ মাত্র হইতে পারে, অন্যের মতে হয়ত উহা অনন্তের সহিত অভেদ। আমরা এই আত্মার ও পরমাত্মার সম্বন্ধ লইয়া যেরূপ ইচ্ছা ব্যাখ্যা করি না, তাহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না; কিন্তু যতক্ষণ আমরা এই মূলতত্ত্ব বিশ্বাস করি যে—আত্মা অনন্ত, উহা কখনও সৃষ্ট হয় নাই, সুতরাং কখনই উহার নাশ হইবে না, উহাকে বিভিন্ন শরীর ধরিয়া ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতে হইবে, অবশেষে মনুষ্যশরীর ধারণ করিয়া পূর্ণত্ব লাভ করিতে হইবে—ততক্ষণ আমরা সকলেই একমত।

চতুর্থ—আত্মতত্ত্ব ও পুনর্জ্জন্মবাদ

তারপর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের মধ্যে সম্পূর্ণ ভেদসাধক, ধর্ম্মরাজ্যের মহত্তম ও অপূর্ব্বতম আবিষ্কার-স্বরূপ তত্ত্বটির কথা তোমাদিগকে বলিব। তোমাদের মধ্যে যাহারা পাশ্চাত্যতত্ত্বরাশির আলোচনায় বিশেষভাবে নিযুক্ত, তাহারা ইতঃপূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে, একটা মৌলিক প্রভেদ—যাহা কিছু প্রাচ্য, তাহা হইতে যাহা কিছু পাশ্চাত্য—তাহাকে যেন এক কুঠারাঘাতে পৃথক্ করিয়া দিতেছে। তাহা এই যে,—আমরা ভারতে সকলেই বিশ্বাস করি, আমরা শাক্তই হই, শৈবই হই, বৈষ্ণবই হই, এমন কি, বৌদ্ধ বা জৈনই হই,—আমরা সকলেই বিশ্বাস করি যে, আত্মা স্বভাবতঃই শুদ্ধ ও পূর্ণস্বভাব, অনন্তশক্তি ও আনন্দময়। কেবল দ্বৈতবাদীর মতে, আত্মার এই স্বাভাবিক আনন্দস্বভাব ভূত অসৎকর্ম্মজন্য সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইয়াছে আর ঈশ্বরানুগ্রহে উহা আবার খুলিয়া যাইবে এবং আত্মা নিজ পূর্ণস্বভাব পুনঃপ্রাপ্ত

হইবেন। কিন্তু অদ্বৈতবাদীর মতে, আত্মা কিছুদিনের জন্য সঙ্কোচ প্রাপ্ত হন, এধারণাটিও আংশিক ভ্রমাত্মক—মায়ার আবরণ দ্বারাই আমরা ভাবি যে, আত্মা তাঁহার সমুদয় শক্তি হারাইয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সমুদয় শক্তিই তখনও পূর্ণপ্রকাশ থাকে।

পঞ্চম—আত্মা সদা পূর্ণস্বভাব

দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদীর মতে এই প্রভেদ থাকিলেও মূল তত্ত্বে অর্থাৎ আত্মার স্বাভাবিক পূর্ণত্বে সকলেই বিশ্বাসী আর এখানেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের মধ্যে বজ্রদৃঢ় প্রাচীর ব্যবধান। প্রাচ্য জাতি যাহা কিছু মহৎ, যাহা কিছু ভাল তাহার জন্য অন্তরে অন্বেষণ করে। উপাসনার সময় আমরা চক্ষু মুদিয়া ঈশ্বরকে অন্তরে লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করি, পাশ্চাত্য জাতি তাহার ঈশ্বরকে বাহিরে অন্বেষণ করে। পাশ্চাত্যগণের ধর্ম্মপুস্তকসমূহ Inspired (in—ভিতরে, spirare—শ্বাসক্রিয়া করা—সুতরাং শ্বাসগ্রহণের ন্যায় বাহির হইতে ভিতরে আসিয়াছে)। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ কিন্তু Expired (শ্বাস পরিত্যাগের ন্যায় ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়াছে)—ঐগুলি ঈশ্বর-নিঃশ্বসিত—মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের হৃদয় হইতে উহারা নিঃসৃত হইয়াছে। (বৃহ-উ ২।৪।১০)।

এইটিই একটি প্রধান বুঝিবার জিনিস; আর হে আমার বন্ধুগণ, হে আমার ভাইগণ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, ভবিষ্যতে এই বিষয়টি আমাদিগকে বিশেষভাবে বার বার লোককে বুঝাইতে হইবে। কারণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং আমি তোমাদিগকেও এই বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি যে, যে ব্যক্তি দিবারাত্র আপনাকে হীন ভাবে, তাহার

দ্বারা ভাল কিছু হইতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তি দিবারাত্র আপনাকে দীনদুঃখী হীন ভাবে, সে হীনই হইয়া যায়। যদি তুমি বল—আমার মধ্যেও শক্তি আছে, তোমার ভিতর শক্তি জাগিবে—আর যদি তুমি বল, আমি কিছুই নই, ভাব যে, তুমি কিছুই নহ, দিবারাত্র যদি ভাবিতে থাক যে, তুমি কিছুই নহ, তবে তুমিও 'কিছু না' হইয়া দাঁড়াইবে। এই মহান্ তত্ত্বটি তোমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। আমরা সেই সর্ব্বশক্তিমানের সন্তান, আমরা সেই অনন্ত ব্রহ্মাগ্নির স্ফুলিঙ্গস্বরূপ। আমরা 'কিছু না' কিরূপে হইতে পারি? আমরা সব করিতে প্রস্তুত, সব করিতে পারি, আমাদিগকে সব করিতেই হইবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের হৃদয়ে এই আত্মবিশ্বাস ছিল, এই আত্মবিশ্বাসস্বরূপ প্রেরণাশক্তিই তাঁহাদিকে সভ্যতার উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে অগ্রসর করাইয়াছিল আর যদি এখন অবনতি হইয়া থাকে, যদি আমাদের ভিতর দোষ আসিয়া থাকে তবে আমি তোমাদিগকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, যে দিন আমাদের দেশের লোক এই আত্মপ্রত্যয় হারাইয়াছে, সেই দিন হইতেই এই অবনতি আরম্ভ হইয়াছে। আত্মবিশ্বাসহীনতা অর্থে ঈশ্বরে অবিশ্বাস! তোমরা কি বিশ্বাস কর, সেই অনন্ত মঙ্গলময় বিধাতা তোমাদের মধ্য দিয়া কার্য্য করিতেছেন? তোমরা যদি বিশ্বাস কর যে সেই সর্ব্বব্যাপী অন্তর্য্যামী প্রত্যেক অণুতে পরমাণুতে, তোমার দেহ মন আত্মায় ওতঃপ্রোতভাবে রহিয়াছেন, তাহা হইলে কি তোমরা নিরুৎসাহ হইতে পার? আমি হয় ত একটি ক্ষুদ্র

আত্মার স্বাভাবিক পূর্ণত্বে বিশ্বাসের মহৎ ফল

জলবুদ্‌বুদ্‌, তুমি হয় ত একটি পর্ব্বতপ্রায় তরঙ্গ ; হইলই বা। সেই অনন্ত সমুদ্র তোমারও যেমন আমারও সেইরূপ আশ্রয়। সেই প্রাণ, শক্তি ও আধ্যাত্মিকতার অনন্ত সমুদ্রে তোমারও যেমন আমারও তদ্রূপ অধিকার। আমার জন্ম হইতেই— আমারও যে জীবন আছে ইহা হইতেই—স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে পর্ব্বতপ্রায় উচ্চ তোমার ন্যায় আমিও সেই অনন্ত জীবন, অনন্ত শিব ও অনন্ত শক্তির সহিত নিত্যসংযুক্ত। অতএব হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের সন্তানগণকে তাহাদের জন্ম হইতেই এই জীবনপ্রদ, মহত্ত্ববিধায়ক, উচ্চ, মহান্‌ তত্ত্ব শিক্ষা দিতে আরম্ভ কর। তাহাদিগকে অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা নাই, তাহাদিগকে দ্বৈতবাদ বা যে কোন বাদ ইচ্ছা শিক্ষা দাও ; আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি—আত্মার পূর্ণস্বরূপ এই অদ্ভুত মতটি ভারতে সর্ব্বসাধারণ —সকল সম্প্রদায়ই বিশ্বাস করিয়া থাকে। আমাদের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কপিল যেমন বলিয়াছেন, যদি পবিত্রতা আত্মার স্বরূপ না হয়, তবে উহা কখনই পরে পবিত্রতা লাভে সমর্থ হইবে না ; কারণ যে স্বভাবতঃই পূর্ণ নহে, সে কোনরূপে উহা লাভ করিলেও আবার উহার নিকট হইতে চলিয়া যাইবে। যদি অপবিত্রতাই মানবের স্বভাব হয়, তবে যদিও ক্ষণকালের জন্য সে পবিত্রতা লাভ করিতে পারে, তথাপি চিরকালের জন্য তাহাকে অপবিত্র থাকিতেই হইবে। এমন সময় আসিবে, যখন এই পবিত্রতা ধুইয়া যাইবে, চলিয়া যাইবে আর আবার সেই প্রাচীন স্বাভাবিক অপবিত্রতা রাজত্ব করিবে। অতএব আমাদের সকল দার্শনিকগণ বলেন, পবিত্রতাই আমাদের স্বভাব, অপবিত্রতা নহে ; পূর্ণত্বই আমাদের স্বভাব,

অপূর্ণতা নহে—আর এইটি স্মরণ রাখিও। মৃত্যুকালে সেই মহর্ষি তাঁহার নিজ মনকে তাঁহার কৃত উৎকৃষ্ট কার্য্যাবলী ও উৎকৃষ্ট চিন্তা-রাশি স্মরণ করিতে বলিতেছেন—এই সুন্দর দৃষ্টান্তটি স্মরণ রাখিও * কই, তিনি ত তাঁহার মনকে তাঁহার সমুদয় দোষদুর্ব্বলতা স্মরণ করিতে বলিতেছেন না। অবশ্য মানুষের জীবনে দোষদুর্ব্বলতা যথেষ্ট আছে; কিন্তু সর্ব্বদাই তোমার প্রকৃত স্বরূপ স্মরণ কর—ইহাই ঐ দোষদুর্ব্বলতা প্রতীকারের একমাত্র উপায়।

প্রত্যক্ষানুভূতিই প্রকৃত ধর্ম্ম

ভদ্রমহোদয়গণ, আমার বোধ হয়, পূর্ব্বকথিত কয়েকটি মত ভারতের সকল বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ই স্বীকার করিয়া থাকেন, আর সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে এই সাধারণ ভিত্তির উপর গোঁড়া বা উদার—প্রাচীনপন্থী বা নব্যপন্থী—সকলেই সম্মিলিত হইবেন; কিন্তু সর্ব্বোপরি, আর একটি বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যক—আর আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, ইহা আমরা সময়ে সময়ে ভুলিয়া যাই—তাহা এই যে, ভারতে ধর্ম্মের অর্থ প্রত্যক্ষানুভূতি—তাহা না হইলে উহা ধর্ম্ম নামেরই যোগ্য নহে। 'এইমতে বিশ্বাস করিলেই তোমার পরিত্রাণ নিশ্চিত', একথা আমাদিগকে কেহ কখন শিখাইতে পারিবে না; কারণ, আমরা ওকথায় বিশ্বাসই করি না। তুমি নিজেকে যেরূপ গঠন করিবে, তুমি তাহাই হইবে। তুমি যাহা—তাহা তুমি ঈশ্বরানুগ্রহে এবং নিজ চেষ্টায় হইয়াছ। সুতরাং কেবল কতকগুলি মতামতে বিশ্বাস করিলে তোমার বিশেষ কিছু উপকার হইবে না। ভারতের আধ্যাত্মিক গগন হইতেই এই মহাশক্তিময়ী

* ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর॥ (ঈশ উপনিষদ্—১৭)

বাণী আবির্ভূত হইয়াছে—'অনুভূতি', আর একমাত্র আমাদের শাস্ত্রই বারবার বলিয়াছেন, 'ঈশ্বরকে দর্শন করিতে হইবে।' খুব সাহসের কথা বটে, কিন্তু উহার একবর্ণও মিথ্যা নয়—আগাগোড়া সত্য। ধর্ম্ম সাক্ষাৎ করিতে হইবে, কেবল শুনিলে হইবে না, কেবল তোতাপাখীর মত কতকগুলি মুখস্থ করিলেই চলিবে না, কেবল বুদ্ধির সায় দিলে চলিবে না, উহাতে কিছুই হয় না, ধর্ম্ম আমাদের ভিতর প্রবেশ করা চাই। 'এইজন্য প্রাচীনেরা এবং আধুনিকেরাও সেই ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন', ইহাই আমাদের নিকট ঈশ্বরের অস্তিত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ—আমাদের যুক্তিবিচার এইরূপ বলিতেছে বলিয়া যে আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তাহা নহে। আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার উৎকৃষ্ট যুক্তিসমূহ আছে বলিয়াই যে আমরা আত্মায় বিশ্বাসী, তাহা নহে; আমাদের বিশ্বাসের প্রধান ভিত্তি এই যে, এই ভারতে প্রাচীনকালে সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই আত্মাকে দর্শন করিয়াছেন, বর্ত্তমান কালেও খুঁজিলে অন্ততঃ দশজনও আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির সাক্ষাৎ মিলিবে এবং ভবিষ্যতেও সহস্র সহস্র ব্যক্তির অভ্যুদয় হইবে, যাঁহারা আত্মদর্শন করিবেন। আর যতদিন না মানব ঈশ্বর দর্শন করিতেছে, যতদিন না সে নিজ আত্মার সাক্ষাৎকারে সমর্থ হইতেছে, ততদিন তাহার মুক্তি অসম্ভব। অতএব সর্ব্বাগ্রে এই বিষয়টি আমাদিগকে বিশেষভাবে বুঝিতে হইবে আর আমরা উহা যতই ভাল করিয়া বুঝিব, ততই ভারতে সাম্প্রদায়িকতার হ্রাস হইবে। কারণ, সে-ই প্রকৃত ধার্ম্মিক, যে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছে—তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে।

'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥' মুণ্ডক উঃ, ২।২।৮

'তাঁহারই হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, কেবল তাঁহারই সকল সংশয় চলিয়া যায়, একমাত্র তিনিই কর্ম্মফল হইতে মুক্ত হন, যিনি তাঁহাকে দেখেন—যিনি আমাদের অতি নিকটতম আবার দূর হইতেও দূরবর্ত্তী।'

ধর্ম্মের প্রত্যক্ষানুভূতিই সাম্প্রদায়িকতা দূর করিবার প্রকৃত উপায়

হায়, আমরা অনেক সময় অনর্থক বাগাড়ম্বরকে আধ্যাত্মিক সত্য বলিয়া ভ্রম করি, পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতার ছটাকে গভীর ধর্ম্মানুভূতি মনে করি; তাই সাম্প্রদায়িকতা, তাই বিরোধ। যদি আমরা একবার বুঝিতে পারি, প্রত্যক্ষানুভূতিই প্রকৃত ধর্ম্ম, তাহা হইলে আমরা নিজ হৃদয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব—আমরা ধর্ম্মের সত্যসমূহ উপলব্ধির পথে কতদূর অগ্রসর। তাহা হইলেই আমরা বুঝিব যে, আমরা নিজেরাই অন্ধকারে ঘুরিতেছি ও অপরকেও সেই অন্ধকারে ঘুরাইতেছি। আর ইহা বুঝিলেই আমাদের সাম্প্রদায়িকতা ও দ্বন্দ্ব বিদূরিত হইবে। কোন ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক বিবাদ করিতে উদ্যত হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, 'তুমি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছ? তুমি কি আত্মদর্শন করিয়াছ? যদি না করিয়া থাক, তবে তোমার তাঁহার নাম প্রচারে কি অধিকার? তুমি নিজেই অন্ধকারে ঘুরিতেছ, আবার আমাকেও সেই অন্ধকারে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছ? অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায় আমরা উভয়েই যে খানায় পড়িয়া যাইব!' অতএব অপরের সহিত বিবাদ

করিবার পূর্ব্বে একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া অগ্রসর হইও। সকলকেই আপন আপন সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রত্যক্ষানুভূতির দিকে অগ্রসর হইতে দাও, সকলেই নিজ নিজ হৃদয়ে সেই সত্যদর্শনের চেষ্টা করুক। আর যখনই তাহারা সেই ভূমা, অনাবৃত সত্য দর্শন করিবে, তখনই তাহারা সেই অপূর্ব্ব আনন্দের আস্বাদ পাইবে। ভারতে প্রত্যেক ঋষি, যে কেহ সত্যকে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে যাঁহার কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহারা তাঁহারই সাক্ষাৎ পাইবে। তখন সেই হৃদয় হইতে কেবল প্রেমের বাণী বাহির হইবে; কারণ, যিনি সাক্ষাৎ প্রেমস্বরূপ, তিনি সেই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তখনই—কেবল তখনই সকল সাম্প্রদায়িক বিবাদ অন্তর্হিত হইবে এবং তখনই আমরা 'হিন্দু' এই শব্দটিকে এবং প্রত্যেক হিন্দুনামধারী ব্যক্তিকে প্রকৃতরূপে বুঝিতে, হৃদয়ে ধারণ করিতে, গভীরভাবে ভালবাসিতে ও আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হইব

প্রকৃত হিন্দু কে—গুরুগোবিন্দ-সিং

আমার কথা বিশ্বাস কর, তখনই—কেবল তখনই তুমি প্রকৃত হিন্দুপদবাচ্য, যখন মাত্র ঐ নামটিতেই তোমার ভিতরে মহা-বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত করিবে; তখনই—কেবল তখনই তুমি প্রকৃত হিন্দুপদবাচ্য হইবে, যখন যে কোন দেশীয়, যে কোন ভাষাভাষী হিন্দুনামধারী হইলেই অমনি তোমার পরমাত্মীয় বোধ হইবে; তখনই—কেবল তখনই তুমি হিন্দুপদবাচ্য, যখন হিন্দুনামধারী যে কোন ব্যক্তির দুঃখকষ্ট তোমার হৃদয়দেশ স্পর্শ করিবে আর তুমি নিজ সন্তান বিপদে পড়িলে যেরূপ উদ্বিগ্ন হও, তাহার কষ্টেও সেইরূপ

উদ্বিগ্ন হইবে; তখনই—কেবল তখনই তুমি হিন্দুপদবাচ্য, যখন তুমি তাহাদের নিকট হইতে সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার, নির্য্যাতন সহ্য করিতে প্রস্তুত হইবে—ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্বরূপ তোমাদের সেই মহান্ গুরুগোবিন্দসিংহের বিষয় আমি এই বক্তৃতার আরম্ভেই বলিয়াছি। এই মহাত্মা দেশের শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিলেন, হিন্দুধর্ম্মের রক্ষার জন্য নিজ শোণিতপাত করিলেন, নিজ পুত্রগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে দেখিলেন—কিন্তু যাহাদের জন্য আপনার এবং আপনার আত্মীয়স্বজনগণের রক্তপাত করিলেন, তাহারা তাঁহার সহায়তা করা দূরে থাক, তাহারাই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, এমন কি, দেশ হইতে তাড়াইয়া দিল—অবশেষে এই আহত কেশরী নিজ কার্য্যক্ষেত্র হইতে ধীরভাবে অপসৃত হইয়া দক্ষিণদেশে গিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু যাহারা অকৃতজ্ঞভাবে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, তাহাদের প্রতি একটি অভিশাপবাক্যও তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল না। আমার বাক্য অবধান কর—যদি তোমরা দেশের হিতসাধন করিতে চাও, তোমাদেরও প্রত্যেককে এক এক জন গোবিন্দসিং হইতে হইবে। তোমরা তাঁহার ভিতর সহস্র সহস্র দোষ দর্শন করিতে পার, কিন্তু তাঁহার মধ্যে যে হিন্দুরক্ত ছিল তাহার দিকে লক্ষ্য করিও। তোমাদিগকে প্রথমে এই স্বজাতীয় লোকরূপ দেবগণের পূজা করিতে হইবে, যদিও তাহারা সর্ব্বপ্রকারে তোমাদের অনিষ্টের চেষ্টা করে। যদিও তাহারা প্রত্যেকেই তোমার প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করে, তুমি তাহাদের প্রতি প্রেমের বাণী প্রয়োগ কর। যদি তাহারা তোমায় তাড়াইয়া দেয়, তবে সেই

বীরকেশরী গোবিন্দসিংহের মত সমাজ হইতে দূরে যাইয়া নিস্তব্ধতার মধ্যে মৃত্যুর প্রতীক্ষা কর। এইরূপ ব্যক্তিই হিন্দু নামের যোগ্য ; আমাদের সম্মুখে সর্ব্বদাই এরূপ আদর্শ থাকা আবশ্যক। পরস্পর বিরোধ ভুলিতে হইবে—চতুর্দ্দিকে প্রেমের প্রবাহ বিস্তার করিতে হইবে।

'ভারত উদ্ধারের' প্রকৃত উপায় —ধর্ম্ম

লোকে 'ভারত উদ্ধার' যেরূপে হয়, যাহার যাহা ইচ্ছা হয় বলুক। আমি সারা জীবন কার্য্য করিতেছি, অন্ততঃ কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতেছি—আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যতদিন না তোমরা প্রকৃতপক্ষে ধার্ম্মিক হইতেছ, ততদিন ভারতের উদ্ধার হইবে না। শুধু ভারতের নহে,—ইহার উপর সমগ্র জগতের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। কারণ, আমি তোমাদিগকে স্পষ্টই বলিতেছি, এক্ষণে পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল ভিত্তি পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়াছে। জড়বাদের অদৃঢ় বালুকাভিত্তির উপর স্থাপিত বড় বড় অট্টালিকা পর্য্যন্ত একদিন না একদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবেই হইবে। এ বিষয়ে জগতের ইতিহাসই আমাদের উৎকৃষ্ট সাক্ষ্য। জাতির উপর জাতি উঠিয়া জড়বাদের উপর নিজ মহত্ত্বের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিল—তাহারা জগতের নিকট ঘোষণা করিয়াছিল—মানব জড়মাত্র। লক্ষ্য করিয়া দেখ, পাশ্চাত্য ভাষায় মৃত্যুর কথা বলিতে গিয়া বলে, মানুষ আত্মা ত্যাগ করিল'(A man gives up the ghost)। আমাদের ভাষায় কিন্তু বলে, সে দেহত্যাগ করিল! পাশ্চাত্যদেশীয় লোকে নিজের কথা বলিতে গেলে প্রথমে দেহকেই লক্ষ্যকরিয়া থাকে, তাহার পর তাহার একটি আত্মা আছে বলিয়া

উল্লেখ করে ; কিন্তু আমরা প্রথমতঃই আপনাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করি, তারপর আমার একটা দেহ আছে—এই কথা বলি। এই দুইটি বিভিন্ন বাক্য আলোচনা করিলেই দেখিতে পাইবে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর কত পার্থক্য।

প্রাচ্য সভ্যতার ভিত্তি অধ্যাত্মবাদ—পাশ্চাত্যের জড়বাদ—উহার দৃষ্টান্ত

এই কারণে যে সকল সভ্যতা দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যাদি-রূপ বালির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহারা অল্প-দিন মাত্র জীবিত থাকিয়া জগৎ হইতে একে একে লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ভারত এবং অন্যান্য যে সকল জাতি ভারতের পদপ্রান্তে বসিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছে—যথা চীন ও জাপান—ইহারা এখনও জীবিত ; এমন কি, উহাদের ভিতর পুনরভ্যুত্থানের লক্ষণসমূহ দেখা যাইতেছে। তাহারা যেন রক্তবীজের ন্যায় ; সহস্রবার তাহাদিগকে নষ্ট কর—তাহারা আবার জীবিত হইয়া নূতন মহিমায় প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু জড়বাদের উপর যে সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত, তাহা একবার নষ্ট হইলে আর উঠে না ; একবার সেই অট্টালিকা পড়িয়া গেলে একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। অতএব ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক অপেক্ষা কর ; ভবিষ্যৎ গৌরব আমাদের জন্য সঞ্চিত রহিয়াছে।

ব্যস্ত হইও না ; অপর কাহাকেও অনুকরণ করিতে যাইও না। আমাদিগকে এই আর একটী বিশেষ বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে—

অন্ধ অনুকরণ পরিত্যাগ কর

অপরের অনুকরণ সভ্যতা বা উন্নতির লক্ষণ নহে। আমি আপনাকে রাজার বেশে ভূষিত করিতে পারি—তাহাতেই কি আমি রাজা হইব? সিংহচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভ কখন সিংহ হয় না। অনুকরণ—হীন, কাপুরুষের ন্যায় অনুকরণ

কখনই উন্নতির কারণ হয় না। বরং উহা মানবের ঘোর অধঃপাতের চিহ্ন। যখন মানুষ আপনাকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে, তখন বুঝিতে হইবে, তাহার উপর শেষ আঘাত পড়িয়াছে; যখন সে নিজ পূর্ব্বপুরুষগণকে স্বীকার করিতে লজ্জিত হয়, তখন বুঝিতে হইবে, তাহার বিনাশ আসন্ন। এই আমি হিন্দু জাতির মধ্যে একজন অতি নগণ্য ব্যক্তি; তথাপি আমি আমার জাতির—আমার পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরবে গৌরব অনুভব করিয়া থাকি। আমি নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকি। আমি যে তোমাদের একজন অযোগ্য দাস, ইহাতে আমি গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকি। তোমরা ঋষির বংশধর, সেই অতিশয় মহিমময়, পূর্ব্বপুরুষগণের বংশধর—আমি যে তোমাদের স্বদেশীয়, ইহাতে আমি গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকি। অতএব তোমরা আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন হও, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের নামে লজ্জিত না হইয়া তাঁহাদের নামে গৌরব অনুভব কর, আর অনুকরণ করিও না, অনুকরণ করিও না। যখনই তোমরা অপরের ভাবানুসারে পরিচালিত হইবে, তখনই তোমরা আপনাদের স্বাধীনতা হারাইবে। এমন কি, আধ্যাত্মিক বিষয়েও যদি তোমরা অপরের আজ্ঞাধীনে কার্য্য কর, তোমরা সকল শক্তি—এমন কি চিন্তাশক্তি পর্য্যন্ত হারাইবে।

তোমরা ঋষির বংশধর, সেই অতিশয় মহিমময় পূর্ব্বপুরুষগণের বংশধর

তোমাদের ভিতরে যাহা আছে, নিজ শক্তিবলে তাহা প্রকাশ কর; কিন্তু অনুকরণ করিও না—অথচ অপরের নিকট হইতে যাহা ভাল, তাহা গ্রহণ কর। আমাদিগকে অপরের নিকট শিখিতে হইবে। বীজ মাটিতে পুঁতিলে উহা মৃত্তিকা, বায়ু ও

জল হইতে রসসংগ্রহ করে বটে, কিন্তু উহা যখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হয়, তখন কি উহা মাটি, জল বা বায়ুর আকার ধারণ করে? না, উহা তাহা করে না। উহা মৃত্তিকাদি হইতে উহার প্রয়োজনীয় সারাংশ গ্রহণ করিয়া নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী একটি বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয়। তোমরাও এইরূপ কর।

অথচ অপরের নিকট শিক্ষা করিতে হইবে

অবশ্য অপরের নিকট হইতে আমাদের যথেষ্ট শিখিবার আছে; যে শিখিতে চায় না, সে ত পূর্ব্বেই মরিয়াছে। আমাদের মনু বলিয়াছেন—

'শ্রদ্দধানো শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥' ২।২৩৮

'নীচ ব্যক্তির সেবা করিয়া তাহার নিকট হইতেও যত্নপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ বিদ্যা শিক্ষা করিবে। হীন চণ্ডালের নিকট হইতেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম শিক্ষা করিবে' ইত্যাদি।

অপরের নিকট ভাল যাহা কিছু পাও, শিক্ষা কর, কিন্তু সেইটি লইয়া নিজেদের ভাবে গঠন করিয়া লইতে হইবে—অপরের নিকট শিক্ষা করিতে গিয়া অপরের সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য হারাইও না! এই ভারতের জাতীয় জীবন হইতে একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া যাইও না; এক মুহূর্ত্তের জন্য মনে করিও না, যদি ভারতের সকল অধিবাসী অপর জাতিবিশেষের পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার সম্পূর্ণ অনুকরণ করিত, তাহা হইলেই ভাল হইত। কয়েক বৎসরের অভ্যাস পরিত্যাগ করাই কি কঠিন ব্যাপার, তাহা তোমরা বেশ জান। আর ঈশ্বরই জানেন,

অপরের নিকট শিক্ষা লইয়া উহাকে নিজের করিয়া লইতে হইবে

কত সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া এই প্রবল জাতীয় জীবনস্রোত এক বিশেষ দিকে প্রবাহিত হইতেছে; তোমাদের শোণিতে ঈশ্বর জানেন, কত সহস্র সহস্র বর্ষের সংস্কার রহিয়াছে, আর তোমরা কি এই প্রবলা, সাগরে মিলিত-প্রায়া স্রোতস্বতীকে ঠেলিয়া আবার হিমালয়ের সেই তুষাররাশির নিকটে লইয়া যাইতে চাও? ইহা অসম্ভব। এইরূপ করিতে চেষ্টা করিলে তোমরাই নষ্ট হইবে। অতএব এই জাতীয় জীবনস্রোতকে প্রবাহিত হইতে দাও। যে সকল প্রবল অন্তরায় এই বেগশালিনী নদীর স্রোতোমার্গ অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেগুলিকে সরাইয়া দাও, পথ পরিষ্কার করিয়া দাও, নদীর খাতকে সরল করিয়া দাও— তাহা হইলে উহা নিজ স্বাভাবিক গতিতে প্রবলবেগে অগ্রসর হইবে—এই জাতি নিজের সর্ব্ববিধ উন্নতিসাধন করিতে করিতে চরম লক্ষ্যের দিকে ছুটিবে।

ভদ্রমহোদয়গণ, ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধানের জন্য আমি পূর্ব্বকথিত উপায়গুলি নির্দ্দেশ করিলাম। আরও অনেক বড় বড় সমস্যা আছে—সেগুলি সময়াভাবে অদ্য রাত্রে আলোচনা করিতে পারিলাম না। দৃষ্টান্তস্বরূপ জাতিভেদসম্বন্ধীয় অদ্ভুত সমস্যাটির কথা ধর। আমি সারা জীবন ধরিয়া এই সমস্যার সব দিক বিচার করিতেছি। আমি ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে গিয়া এই সমস্যার আলোচনা করিয়াছি। আমি এদেশের প্রায় সর্ব্বস্থানে গিয়া সকল জাতির লোকের সঙ্গে মিশিয়াছি, কিন্তু যতই আমি এই সমস্যার আলোচনা করিতেছি, ততই উহার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য পর্য্যন্ত ধারণা করিতে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতেছি। অবশেষে আমার চক্ষের সমক্ষে

জাতিভেদ ও খাদ্য সমস্যা

যেন ক্ষীণ রশ্মিধারা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, আমি এই সম্প্রতি ইহার মূল উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছি। তারপর আবার ভোজন পানাদি সম্বন্ধীয় গুরুতর সমস্যা রহিয়াছে। বাস্তবিকই ইহা একটি গুরুতর সমস্যা। আমরা সাধারণতঃ ইহা যত অনাবশ্যক বলিয়া মনে করি, প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। আর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, আমরা এক্ষণে এই আহারাদির সম্বন্ধে যে বিষয়ে ঝোঁক দিতে যাই, তাহা এক কিম্ভূতকিমাকার ব্যাপার, উহা শাস্ত্রানুমোদিত নহে অর্থাৎ আমরা ভোজনপানবিষয়ে প্রকৃত পবিত্রতা রক্ষা করিতে অবহেলা করিয়াই এই কষ্ট পাইতেছি —আমরা শাস্ত্রানুমোদিত ভোজনপানপ্রথা ভুলিয়া গিয়াছি।

আরও অন্যান্য কয়েকটি প্রশ্ন আছে, সেগুলিও আমি আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতে চাই। আর এই সমস্যাগুলির সমাধানই বা কি, কিরূপেই বা সেগুলি কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহাও আপনাদিগকে বলিতে চাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সুশৃঙ্খলভাবে সভার কার্য্য আরম্ভ হইতেই বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, আর এখন অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমি আপনাদের মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের এবং আপনাদের রাত্রির আহারের আর অধিক বিলম্ব করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি না। অতএব আমি জাতিভেদ ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আমার বক্তব্য ভবিষ্যতের জন্য রাখিলাম। আশা করি, ভবিষ্যতে আমরা সকলেই অপেক্ষাকৃত শান্ত ও সুশৃঙ্খলভাবে সভায় যোগদান করিতে চেষ্টা করিব।

ভদ্রমহোদয়গণ, আর একটি কথা বলিলেই আমার আধ্যাত্মিক তত্ত্বসম্বন্ধে বক্তব্য শেষ হইবে। ভারতে ধর্ম্ম অনেক দিন ধরিয়া নড়নচড়নহীন হইয়া আছে—আমরা চাই উহাকে গতিশীল করিতে। আমি প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে এই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই। অতীতকালে বরাবর যেরূপ হইয়া আসিয়াছে তাহার অনতিক্রমে যেমন রাজপ্রাসাদে, তেমনি অতি দরিদ্র ব্যক্তির পর্ণকুটিরেও যেন ধর্ম্ম প্রবেশ করে। এই জাতির সাধারণ উত্তরাধিকার এবং জন্মগত স্বত্বস্বরূপে প্রাপ্ত ধর্ম্মকে প্রত্যেক ব্যক্তির দ্বারে বিনাবেতনে বহন করিতে হইবে। ঈশ্বরের রাজ্যে বায়ু যেমন সকলের অনায়াসলভ্য, ভারতের ধর্ম্মও ঐরূপ সুলভ করিতে হইবে। আর ভারতে আমাদিগকে এইরূপেই কার্য্য করিতে হইবে, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় গঠন করিয়া এবং সামান্য সামান্য প্রভেদ লইয়া বিবাদ করিলে চলিবে না। আমি তোমাদিগকে কার্য্য-প্রণালীর আভাস এইটুকু দিতে চাই যে, যে সকল বিষয়ে আমাদের সকলের একমত, সেইগুলি প্রচার করা হউক—যে সকল বিষয়ে মতভেদ আছে, সেগুলি আপনা আপনি দূর হইয়া যাইবে। আমি যেমন ভারতবাসীকে বরাবর বলিয়াছি, যদি গৃহে শত শত শতাব্দীর অন্ধকার থাকে, আর যদি আমরা সেই ঘরে গিয়া ক্রমাগত চীৎকার করিয়া 'উঃ কি অন্ধকার, উঃ কি অন্ধকার' বলিতে থাকি, তবে কি অন্ধকার দূর হইবে? আলোক লইয়া আইস, অন্ধকার চিরকালের জন্য চলিয়া যাইবে। মানুষকে সংস্কার করিবার ইহাই রহস্য। তাহাদের হৃদয়ে উচ্চতর বিষয়সমূহের আভাস দাও—আগে মানুষে অবিশ্বাস লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইও না। আমি

গতিশীল ধর্ম্ম

মানুষের উপর—খুব খারাপ মানুষের উপরও—বিশ্বাস করিয়া কখন অকৃতকার্য্য হই নাই। সর্ব্বস্থলেই পরিণামে বিজয়লাভ হইয়াছে। মানুষকে বিশ্বাস কর—তা সে পণ্ডিতই হউক বা অজ্ঞ মূর্খ বলিয়াই প্রতীয়মান হউক। মানুষকে বিশ্বাস কর—তা তাহাকে দেবতা বলিয়াই বোধ হউক অথবা সাক্ষাৎ শয়তান বলিয়াই বোধ হউক। প্রথমে মানুষের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর—তারপর এই বিশ্বাস হৃদয়ে লইয়া ইহাও বুঝিতে চেষ্টা কর—যদি তাহার ভিতর কোন অসম্পূর্ণতা থাকে, যদি সে কিছু ভুল করে, যদি সে অতিশয় ঘৃণিত ও অসার মত অবলম্বন করে, তবে ইহা জানিও—তাহার প্রকৃত স্বভাব হইতে ঐগুলি প্রসূত হয় নাই—উচ্চতর আদর্শের অভাব হইতেই হইয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি মিথ্যার দিকে যায়, তাহার কারণ এই—সে সত্যকে ধরিতে পারিতেছে না। অতএব মিথ্যাকে দূর করিবার একমাত্র উপায় এই যে, তাহাকে সত্য যাহা, তাহা দিতে হইবে। তাহাকে সত্য কি, তাহা জানাইয়া দাও। তাহার সহিত সে নিজ ভাবের তুলনা করুক। তুমি তাহাকে সত্য জানাইয়া দিলে—ঐখানেই তোমার কাজ শেষ হইয়া গেল। সে এখন মনে মনে তাহার পূর্ব্ব-ধারণার সহিত উহার তুলনা করুক। আর ইহাও নিশ্চিত জানিও যে, যদি তুমি তাহাকে যথার্থ সত্য দিয়া থাক, তবে মিথ্যা অবশ্যই অন্তর্হিত হইবে; আলোক অন্ধকারকে অবশ্যই দূর করিবে; সত্য অবশ্যই তাহার ভিতরের সদ্ভাবকে প্রকাশিত করিবে। যদি সমগ্র দেশের আধ্যাত্মিক সংস্কার করিতে চাও, তবে ইহাই পথ—ইহাই

কার্য্যপ্রণালী—সাম্প্রদায়িক বিরোধ বর্জ্জন, না ভাঙ্গিয়া গড়িবার চেষ্টা ও মানুষে বিশ্বাস

একমাত্র পথ—বিবাদ বিসম্বাদে কোন ফল হইবে না অথবা তাহাদিগকে একথা বলিলেও চলিবে না যে, তাহারা যাহা করিতেছে, তাহা মন্দ। তাহাদের সম্মুখে ভালটি ধর, দেখিবে—কি আগ্রহের সহিত তাহারা উহা গ্রহণ করে। সেই অবিনাশী সদা মানবদেহ-নিবাসী ঐশ্বরিক শক্তি জাগ্রত হইয়া যাহা কিছু উত্তম, যাহা কিছু মহিমময়—কেবল তাহাকেই গ্রহণ করিতে হস্ত প্রসারণ করে।

যিনি আমাদের সমগ্র জাতির সৃষ্টিকর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা, যিনি আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ঈশ্বর,—তাঁহাকে বিষ্ণু, শিব, শক্তি বা গণপতি যে নামেই ডাকা হউক না কেন, তাঁহাকে সবিকার বা নির্ব্বিকার, সগুণ বা নির্গুণ যেরূপেই উপাসনা করা হউক না কেন, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যাঁহাকে জানিয়া 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি' বলিয়া গিয়াছেন, তিনি তাঁহার মহান্ প্রেম লইয়া আমাদের ভিতর প্রবেশ করুন, তিনি আমাদের উপর তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন, তাঁহার কৃপায় আমরা যেন পরস্পর পরস্পরকে বুঝিতে সমর্থ হই, তাঁহার কৃপায় যেন আমরা প্রকৃত প্রেম ও প্রবল সত্যানুরাগের সহিত পরস্পর পরস্পরের জন্য কার্য্য করিতে পারি, আর যেন ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনরূপ মহৎ কার্য্যের ভিতর আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত যশ, ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত গৌরবের বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা প্রবেশ না করে।

ভক্তি

[৯ই নবেম্বর সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকার সময় গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের তাঁবুতে ভক্তি সম্বন্ধে স্বামিজীর বক্তৃতা হয়। ইহাই লাহোরে স্বামিজীর দ্বিতীয় বক্তৃতা। লালা বালমুকুন্দ সভাপতি ছিলেন এবং দুই চারিটি কথায় বক্তার পরিচয় প্রদান করেন। লাহোর হইতে প্রকাশিত ট্রিবিউন পত্রে (নবেম্বর, ১৮৯৭) উহার সারাংশ প্রকাশিত হয়। আমরা উহার অনুবাদ করিয়া দিলাম।]

উপনিষদে ভক্তির বীজ

উপনিষৎসমূহের গম্ভীরনাদী প্রবাহের মধ্যে একটি শব্দ দূরাগত প্রতিধ্বনির ন্যায় আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। যদিও উহা উচ্চতায় ও আয়তনে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তথাপি সমগ্র বেদান্ত-সাহিত্যে উহা স্পষ্ট হইলেও তত প্রবল নহে। উপনিষদ্‌গুলির মুখ্য উদ্দেশ্য মনে হয় যেন, আমাদের সম্মুখে ভূমার ভাব ও চিত্র উপস্থিত করা। তথাপি এই অদ্ভুত ভাবগাম্ভীর্য্যের পশ্চাতে মধ্যে মধ্যে আমরা কবিত্বেরও আভাস পাই; যথা,

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।"—কঠ উপনিষৎ, ১৫।

"সেখানে সূর্য্য প্রকাশ পান না, চন্দ্রতারকাও নহে, এই সব বিদ্যুতও প্রকাশ পায় না, অগ্নির ত কথাই নাই।"

এই অপূর্ব্ব পংক্তিদ্বয়ের হৃদয়স্পর্শী কবিত্ব শুনিতে শুনিতে আমরা যেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ হইতে, এমন কি, মনোরাজ্য

হইতে দূরে, অতি দূরে নীত হইয়া থাকি—এমন এক জগতে নীত হই, যাহাকে কোন কালে জ্ঞানের বিষয় করিবার উপায় নাই, অথচ যাহা সর্ব্বদা আমাদের নিকটেই রহিয়াছে। এই মহান্ ভাবের ছায়ার ন্যায় অনুগামী আর এক মহান্ ভাব বর্ত্তমান, যাহা জনসাধারণের অধিকতর আয়ত্তাধীন, লোকের প্রাত্যহিক জীবনে অনুসরণের অধিকতর উপযোগী, যাহাকে মানবজীবনের প্রত্যেক বিভাগে প্রবিষ্ট করান যাইতে পারে। ঐ ভক্তিবীজ ক্রমে পুষ্টাবয়ব হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী কালে সম্পূর্ণভাবে ও সুস্পষ্ট ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে—আমরা পুরাণকে লক্ষ্য করিয়া একথা বলিতেছি।

এই পুরাণেই ভক্তির চরম আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তিবীজ পূর্ব্বাবধিই বর্ত্তমান; সংহিতাতেও উহার পরিচয় পাওয়া যায়, কিঞ্চিৎ অধিক বিকাশ উপনিষদে, কিন্তু উহার বিস্তারিত আলোচনা পুরাণে। সুতরাং ভক্তি কী বুঝিতে হইলে, আমাদের এই পুরাণগুলি বুঝা আবশ্যক। পুরাণের প্রামাণিকত্ব লইয়া ইদানীং বহু বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। এখান হইতে ওখান হইতে অনিশ্চিতার্থ অনেক অংশ লইয়া সমালোচিত হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখান হইয়াছে যে, ঐ অংশগুলি আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে তিষ্ঠিতে পারে না, ইত্যাদি ইত্যাদি! কিন্তু এই বাদানুবাদ ছাড়িয়া দিয়া, পৌরাণিক উক্তিগুলির বৈজ্ঞানিক, ভৌগোলিক ও জ্যোতিষিক সত্যাসত্য প্রভৃতি ছাড়িয়া দিয়া একটি জিনিস আমরা নিশ্চিতরূপে দেখিতে পাই, প্রায় সকল পুরাণেই আগা হইতে

পুরাণেই ভক্তির বিকাশ

গোড়া পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিলে সর্ব্বত্রই উহার পরিচয় পাওয়া যায়—তাহা এই ভক্তিবাদ। সাধু মহাত্মা ও রাজর্ষিগণের চরিতবর্ণনমুখে উহা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত, উদাহৃত ও আলোচিত হইয়াছে। সৌন্দর্য্যের মহান্ আদর্শের—ভক্তির আদর্শের দৃষ্টান্তসমূহ বিবৃত করাই যেন পুরাণগুলির প্রধান কার্য্য বলিয়া বোধ হয়।

পুরাণ সর্ব্বসাধারণের অধিকতর উপযোগী

আর আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই আদর্শ সাধারণ মানবের ধারণার অধিকতর উপযোগী। এরূপ লোক খুব অল্পই আছেন, যাঁহারা বেদান্তালোকের পূর্ণচ্ছটার বৈভব বুঝিতে ও উহার আদর করিতে পারেন—উহার তত্ত্বগুলি জীবনে পরিণত করা ত দূরের কথা। কারণ, প্রকৃত বেদান্তীর প্রথম কার্য্যই 'অভীঃ'—নির্ভীক হওয়া। যদি কেহ বেদান্তী হইবার স্পর্দ্ধা রাখে, তাহাকে হৃদয় হইতে ভয়কে একেবারে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে। আর আমরা জানি, ইহা কত কঠিন। যাঁহারা সংসারের সমুদয় সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন এবং যাঁহাদের এমন বন্ধন খুব কমই আছে, যাহাতে তাঁহাদিগকে দুর্ব্বলহৃদয় কাপুরুষ করিয়া ফেলিতে পারে, তাঁহারা পর্য্যন্ত অন্তরে অন্তরে অনুভব করেন যে, তাঁহারা সময়ে সময়ে কত দুর্ব্বল, কত নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়েন, সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকেও যেন মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মত হইয়া পড়িতে হয়। যাহাদের চারিদিকে বন্ধন, যাহারা অন্তরে বাহিরে শত সহস্র বিষয়ের দাস হইয়া রহিয়াছে, জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তেই দাসত্ব যাহাদিগকে ক্রমশঃ অধঃ হইতে অধে. আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহারা যে কত

দুর্ব্বল, তাহা কি আর বলিতে হইবে? এরূপ ব্যক্তিগণের নিকট পুরাণ-নিচয় ভক্তির অতি মনোহারিণী বার্ত্তা বহন করিয়া থাকে। তাহাদের জন্যই এই ভক্তির কোমল ও কবিত্বময় ভাব প্রচারিত, তাহাদের জন্য ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও সহস্র সহস্র সাধুগণের এই সকল অদ্ভুত ও বিস্ময়কর কাহিনী বিবৃত, আর এই দৃষ্টান্তগুলির উদ্দেশ্য—যাহাতে লোকে এই ভক্তিকে নিজ নিজ জীবনে বিকাশ করিতে পারে, তাহার পথ প্রদর্শন করা। আপনারা পুরাণগুলির বৈজ্ঞানিক সত্যতায় বিশ্বাস করুন বা নাই করুন, আপনাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিও নাই, যাঁহাদের জীবনে প্রহ্লাদ, ধ্রুব বা ঐ সকল প্রসিদ্ধ পৌরাণিক মহাত্মাগণের উপাখ্যানের প্রভাব কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না।

আবার শুধু আধুনিক কালেই পুরাণগুলির উপযোগিতা ও প্রভাব স্বীকার করিলে চলিবে না। পুরাণসমূহের প্রতি আমাদের এই কারণেই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত যে শেষ যুগের অবনত বৌদ্ধধর্ম্ম আমাদিগকে যে ধর্ম্মের অস্তিমুখে লইয়া যাইতেছিল, উহারা আমাদিগকে তদপেক্ষা প্রশস্ততর ও উন্নততর সর্ব্বসাধারণের উপযোগী ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছে। ভক্তির সহজ ও সুখসাধ্য ভাব ভাষায় লিখিত ও আলোচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু শুধু তাহাতেই চলিবে না, উহাকে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অবলম্বন করিতে হইবে, কারণ আমরা পরে দেখিব যে, এই ভক্তির ভাবটি ক্রমে প্রস্ফুটিত হইয়া অবশেষে প্রেমের সারভূত হইয়া উঠে। যতদিন ব্যক্তিগত ও জড়প্রীতি বলিয়া কিছু থাকিবে, ততদিন

পুরাণের অন্যান্য উপযোগিতা—উহা কোন না কোন আকারে থাকিবেই

কেহ পুরাণের উপদেশাবলী অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিবেন না। যতদিন সাহায্যের নিমিত্ত কোন ব্যক্তির উপর নির্ভররূপ মানবীয় দুর্ব্বলতা বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন এই সকল পুরাণ কোন না কোন আকারে থাকিবেই থাকিবে। আপনারা উহাদের নাম পরিবর্ত্তন করিতে পারেন, আপনারা এতাবৎ বর্ত্তমান পুরাণগুলির নিন্দা করিতে পারেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আপনাদিগকে বাধ্য হইয়া আর একখানি নূতন পুরাণ প্রণয়ন করিতে হইবে। ধরুন, আমাদের মধ্যে কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল—তিনি এই সকল প্রাচীন পুরাণ অস্বীকার করিলেন ; তাঁহার দেহত্যাগের পর বিশ বর্ষ যাইতে না যাইতে আমরা দেখিব যে, তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার জীবন অবলম্বন করিয়াই আর একখানি পুরাণ রচনা করিয়া ফেলিবে। পুরাণ ছাড়িবার জো নাই—প্রাচীন পুরাণ ও আধুনিক পুরাণ—এইটুকুমাত্র পার্থক্য। মানুষের প্রকৃতিই ইহা চাহিয়া থাকে। কেবল তাঁহাদেরই পুরাণের প্রয়োজন নাই, যাঁহারা সমুদয় মানবীয় দুর্ব্বলতার অতীত হইয়া প্রকৃত পরমহংসোচিত নির্ভীকতা লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা মায়ার বন্ধন, এমন কি, স্বাভাবিক অভাবগুলি পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়াছেন, কেবল সেই বিজয়মহিমমণ্ডিত ভূদেবগণের।

সাধারণ মানবের ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরকে উপাসনা না করিলে চলে না। যদি সে প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত ভগবানের পূজা না করে, তবে তাহাকে স্ত্রী, পুত্র, পিতা, বন্ধু, আচার্য্য বা অন্য কোন ব্যক্তিকে ভগবানের স্থলাভিষিক্ত করিয়া পূজা করিতেই হইবে। পুরুষ অপেক্ষা নারীগণের আবার ইহা অধিকতর আবশ্যক।

আলোকের স্পন্দন সর্ব্বত্রই থাকিতে পারে, অন্ধকারময় স্থানেও থাকিতে পারে। বিড়াল ও অন্যান্য জন্তু অন্ধকারেও দেখিতে পায়, এই ঘটনা হইতেই ইহা অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে হইলে আমরা যে স্তরে রহিয়াছি, উহাকে তদুপযোগী স্তরের স্পন্দনবিশিষ্ট হইতে হইবে। সুতরাং আমরা এক নির্গুণ নিরাকার সত্তা ইত্যাদি সম্বন্ধে কথা কহিতে পারি বটে, কিন্তু যতদিন আমরা সাধারণ মর্ত্ত্যজীব, ততদিন আমাদিগকে কেবল মানুষের মধ্যেই ভগবদ্দর্শন করিতে হইবে। অতএব আমাদের ভগবানের ধারণা ও উপাসনা স্বভাবতঃই মানুষী। সত্য সত্যই "এই শরীর ভগবানের শ্রেষ্ঠ মন্দির।" সেই জন্যই আমরা দেখিতে পাই যে যুগযুগান্তর ধরিয়া লোকে মানুষের উপাসনা করিয়া আসিতেছে, আর যদিও আমরা ঐ সঙ্গে স্বভাবতঃ যে সকল বাড়াবাড়ি হইয়া থাকে, তাহার অনেকগুলির নিন্দা বা কু-সমালোচনা করিতে পারি, তথাপি আমরা সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাই যে, উহার মর্ম্মদেশ অটুট রহিয়াছে, এই সব বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও, এই সকল সপ্তমে উঠা সত্ত্বেও, এই প্রচারিত মতবাদে সার আছে, উহার অভ্যন্তরভাগ খাঁটি ও সুদৃঢ়—উহার একটা মেরুদণ্ড আছে। আমি আপনাদিগকে না বুঝিয়া কোন পুরাতন উপকথা বা অবৈজ্ঞানিক খিচুড়ি গলাধঃকরণ করিতে বলিতেছি না, দুর্ভাগ্যবশতঃ কতকগুলি পুরাণের ভিতর যে বামাচারী ব্যাখ্যাসকল প্রবেশলাভ করিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটিতে বিশ্বাস করিতে বলিতেছি না, কিন্তু আমার

মানবভাবে ঈশ্বরোপাসনা সাধারণ মানবের অবশ্য-স্তাবী ও হিতকরী, আর পুরাণ উক্ত-ভাবের প্রচারক বলিয়া উহার স্থায়িত্ব

বক্তব্য এই যে, ইহাদের ভিতর একটি সার বস্তু আছে, ইহাদের লোপ না হইবার একটি পুষ্কল কারণ আছে, আর ভক্তির উপদেশ, ধর্ম্মকে দৈনন্দিন জীবনে পরিণত করা, দার্শনিক উচ্চগগনে বিচরণশীল ধর্ম্মকে সাধারণ মানবের দৈনন্দিন জীবনে পরিণত করাই পুরাণগুলির দারিত্বের কারণ।

বক্তা ভক্তিমার্গে সহায়ক জড়বস্তুর ব্যবহার সমর্থন করিলেন। তিনি বলিলেন, মানুষ এক্ষণে যদবস্থাপন্ন, ঈশ্বরেচ্ছায় তাহা না হইলে বড় ভাল হইত। কিন্তু বাস্তব ঘটনার প্রতিবাদ করা বৃথা। মানুষ চৈতন্য, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি সম্বন্ধে যতই বাগাড়ম্বর করুক না কেন, এক্ষণে সে জড়ভাবাপন্ন। সেই জড় মানবকে হাতে ধরিয়া ধীরে ধীরে তুলিতে হইবে, যতদিন না সে চৈতন্যময়—সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন হয়। আজকালকার দিনে শত করা ৯৯ জন লোকের পক্ষে চৈতন্য কি তাহা বুঝা কঠিন। যে সঞ্চালিনী শক্তিগুলি আমাদিগকে ঠেলিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর করাইতেছে এবং যে ফলগুলি আমরা লাভ করিতে চাহিতেছি, সে সমস্তই জড়। হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের ভাষায় বলি—আমরা কেবল স্বল্পতম বাধার পথে কাজ করিতে পারি, আর পুরাণকারগণের এইটুকু সহজ কাণ্ডজ্ঞান ছিল বলিয়াই তাঁহারা লোককে এই স্বল্পতম বাধার পথে কাজ করিবার প্রণালী দেখাইয়া গিয়াছেন। এই ভাবে উপদেশ দেওয়াতে পুরাণগুলি লোকের কল্যাণ সাধনে যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহা বিস্ময়কর ও অভূতপূর্ব্ব; ভক্তির আদর্শ অবশ্য চৈতন্যময় বা আধ্যাত্মিক, কিন্তু তাহার পথ জড়ের

ভক্তিমার্গে জড়বস্তুর সহায়তা লইবার অত্যাবশ্যকতা

ভিতর দিয়া, আর এই জড়ের সহায়তা অবলম্বন ব্যতীত গত্যন্তর নাই। অতএব জড় জগতে যাহা কিছু এই আধ্যাত্মিকতা লাভে সহায়তা করে, সেই সবগুলিকে লইতে হইবে এবং উহাদিগকে এমনভাবে আমাদের কাজে লাগাইতে হইবে, যাহাতে জড়ভাবাপন্ন মানব ক্রমোন্নত হইয়া আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন হইতে পারে। শাস্ত্র গোড়া হইতেই লিঙ্গজাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলকেই বেদ পাঠে অধিকার প্রদান করেন, ইহা দেখাইয়া তিনি বলিলেন যে, যদি জড় মন্দির নির্ম্মাণ দ্বারা মানুষ ভগবানকে অধিক ভালবাসিতে পারে, খুব ভাল কথা ; যদি ভগবানের প্রতিমা গঠন দ্বারা সে এই প্রেমের আদর্শে উপনীত হইবার সহায়তা পায়, আশীর্ব্বচন সহকারে —সে যদি চায়—তাহাকে বিশটি প্রতিমা পূজা করিতে দাও। যে কোন বিষয় হউক, যদি উহা তাহাকে ধর্ম্মের সেই চরম লক্ষ্য বস্তু লাভের সহায়তা করে, আর নীতিবিরুদ্ধ না হয়, ততক্ষণ সে তাহা অবাধে অবলম্বন করুক। 'নীতিবিরুদ্ধ না হয়,'—একথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, নীতিবিরুদ্ধ বিষয় আমাদের ধর্ম্মপথে সহায় না হইয়া বরং বহুল বিঘ্নই উৎপাদন করিয়া থাকে।

স্বামিজী দেখাইলেন, ভারতে কবীরই সর্ব্বপ্রথম ঈশ্বরোপাসনায় প্রতিমা ব্যবহারের বিরুদ্ধে উত্থিত হন। কিন্তু পক্ষান্তরে ইহাও বলিলেন যে, ভারতে এমন অনেক বড় বড় দার্শনিক ও ধর্ম্ম-সংস্থাপকের অভ্যুদয় হইয়াছে, যাঁহারা ভগবান্ যে সগুণ বা ব্যক্তিবিশেষ, ইহা পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতেন না। এবং অকুতোভয়ে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে সেই মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু তাঁহারা পর্য্যন্ত প্রতিমাপূজায় দোষারোপ করেন নাই। বড় জোর, তাঁহারা উহাকে খুব উচ্চাঙ্গের উপাসনা বলিয়া স্বীকার করেন নাই, আর কোন পুরাণেও প্রতিমাপূজাকে উচ্চাঙ্গের উপাসনা বলা হয় নাই জিহোবা একটি মঞ্জুষায় অবস্থান করিতেন, এই বিশ্বাসবান্ য়াহুদীগণও মূর্ত্তিপূজক ছিলেন, এই ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন, কেবল অপরে মন্দ বলে বলিয়া মূর্ত্তিপূজায় দোষারোপ করা অকর্ত্তব্য। তিনি বলিলেন বরং প্রতিমা বা অপর কোন জড়বস্তু যদি মানুষকে ধর্ম্মলাভে সাহায্য করে, তবে, উহা স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যাইতে পারে। আর আমাদের এমন কোন ধর্ম্মগ্রন্থ নাই, যাহাতে জড়ের সাহায্যে অনুষ্ঠিত বলিয়া উহা অতি নিম্নস্তরের উপাসনা, একথা অতি পরিষ্কারভাবে বলা হয় নাই।

ভারতের কোন কোন মহাত্মা প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেও অনেকেই উহার সমর্থক—উহা অতি নিম্নাঙ্গের উপাসনা

স্বামিজী বলিলেন, সমগ্র ভারতে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর প্রতিমাপূজা জোর করিয়া চাপাইবার যে চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার দোষ দেখাইবার উপযুক্ত ভাষা তিনি খুঁজিয়া পান না। প্রত্যেক ব্যক্তির কি উপাসনা করা ও কোন্ বস্তু অবলম্বনে উপাসনা করা উচিত, তাহা তাহাকে হুকুম করিয়া বলিয়া দিবার জন্য অপরের কি মাথাব্যথা পড়িয়াছিল ? কি করিয়া অপরে জানিবে যে, সে কিসের সাহায্যে উন্নতি করিবে—প্রতিমা-পূজা দ্বারা, না অগ্নিপূজা দ্বারা, না এমন কি, একটা স্তম্ভের উপাসনা দ্বারা ? আমাদের নিজ নিজ গুরু এবং গুরুশিষ্যের মধ্যে

ইষ্টনিষ্ঠা

যে সম্বন্ধ, তাহারই দ্বারা এসকল নির্দ্দিষ্ট ও পরিচালিত হইবে। ভক্তিগ্রন্থে ইষ্ট সম্বন্ধে যে নিয়ম আছে, ইহা হইতেই তাহার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রত্যেক লোককেই তাহার বিশেষ উপাসনা-পদ্ধতি, তাহার ভগবানের দিকে অগ্রসর হইবার বিশেষ পথ অবলম্বন করিতে হইবে। আর সেই নির্ব্বাচিত পথই তাহার ইষ্ট। অন্য উপাসনামার্গগুলিকে সহানুভূতির চক্ষে দেখিতে হইবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজ উপাসনাপদ্ধতি অনুসারে সাধন করিতে হইবে, যতদিন না সাধক গন্তব্য স্থলে উপনীত হয়, যতদিন না সে সেই কেন্দ্রস্থলে উপনীত হয়, যথায় আর জড়সাহায্যের প্রয়োজন নাই।

এই প্রসঙ্গে ভারতের অনেক স্থানে প্রচলিত কুলগুরুপ্রথা (যাহা একপ্রকার বংশপরম্পরাগত গুরুগিরি মাত্র) সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিবার জন্য দুই চারিটি কথা বলা আবশ্যক।

কুলগুরুপ্রথার দোষ

শাস্ত্রে আমরা পড়িয়া থাকি, যিনি বেদের সার মর্ম্ম বুঝেন, যিনি নিষ্পাপ, যিনি অর্থলোভে বা অপর কোন উদ্দেশ্যে লোককে শিক্ষা দেন না, যাঁহার কৃপা অহৈতুকী, বসন্ত ঋতু যেমন বৃক্ষ লতাদির নিকট কিছু প্রার্থনা করে না, কিন্তু যেমন বসন্তাগমে বৃক্ষলতাদি সতেজ হইয়া উঠে, উহাদের নূতন ফলপত্র-মুকুলাদির উদগম হয়, সেইরূপ যাহার স্বভাবই লোকের কল্যাণ সাধন, যিনি উহার পরিবর্ত্তে কিছুই চাহেন না, যাঁহার সারাজীবনই অপরের কল্যাণের জন্য, এইরূপ লোকই গুরুপদবাচ্য, অন্যে নহে।* অসদ্‌গুরুর নিকট ত জ্ঞানলাভের সম্ভাবনাই নাই, বরং তাঁহার শিক্ষায় এক বিপদাশঙ্কা আছে। কারণ গুরু কেবল

* বিবেকচূড়ামণি

শিক্ষক বা উপদেষ্টা মাত্র নহেন, শিক্ষকতা তাঁহার কর্ত্তব্যের অতি সামান্য অংশমাত্র। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে, গুরু শিষ্যে শক্তিসঞ্চার করেন। একটি সাধারণ জড়জগতের দৃষ্টান্ত ধরুন :— যদি কোন ব্যক্তি সু-বীজের টিকা না লন, তাঁহার শরীরে দূষিত অনিষ্টকর বীজ প্রবেশের ভয় আছে। সেইরূপ অসদ্‌গুরুর শিক্ষায় কিছু মন্দ জিনিস শিখিবার আশঙ্কা আছে। সুতরাং ভারতবর্ষ হইতে এই কুলগুরুর ভাবটি উঠিয়া যাওয়া একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। গুরুর কার্য্য যেন ব্যবসায়ে পরিণত না হয়। ইহাকে নিবারণ করিতেই হইবে, ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। কোন ব্যক্তিরই আপনাকে গুরু বলিয়া পরিচয় দিবার সঙ্গে সঙ্গে কুলগুরুপ্রথা যে অবস্থা আনয়ন করিয়াছে, তাহা সমর্থন করা উচিত নহে।

খাদ্যাখাদ্য বিচার

খাদ্যাখাদ্য বিচার সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করিয়া তিনি দেখাইলেন যে, আহার সম্বন্ধে আজকাল যে কঠোর নিয়মের উপর ঝোঁক দেওয়া হয়, সেটির অধিকাংশ বাহ্য ব্যাপার এবং যে উদ্দেশ্যে ঐ সকল নিয়ম প্রথম বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, সে উদ্দেশ্য এখন লোপ পাইয়াছে। কে খাদ্য স্পর্শ করিতে পাইবে, এই বিষয়ে অবহিত হওয়ার কথাটি তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন এবং দেখান যে, ইহার এক অতি গভীর দার্শনিক অর্থ আছে, কিন্তু সাধারণ লোকের প্রাত্যহিক জীবনে এই সাবধানতা রক্ষা করা কঠিন বা অসম্ভব। এখানে যে ভাবটি কেবল ধর্ম্মের জন্য সম্পূর্ণ উৎসৃষ্টপ্রাণ শ্রেণীবিশেষেই সম্ভব, তাহা সাধারণের জন্য নির্দ্দেশ করা ভ্রমাত্মক কার্য্য হইয়াছে। কেন না, জনসাধারণের অধিকাংশই জড়সুখের আস্বাদে অতৃপ্ত এবং

তৃপ্তির পূর্ব্বে জোর করিয়া তাহাদের উপর ধর্ম্ম চাপাইয়া দিবার সঙ্কল্প করা বৃথা।

ভক্তের জন্য বিহিত উপাসনাপদ্ধতিসমূহের মধ্যে মনুষ্যের উপাসনাই শ্রেষ্ঠতম। বাস্তবিক যদি কোনরূপ পূজা করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার মতে অবস্থানুযায়ী একটি, ছয়টি বা দ্বাদশটি দরিদ্রলোককে প্রত্যহ নিজ গৃহে আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করিলে ভাল হয়। তিনি অনেক দেশে দানের প্রথা দেখিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু উহাতে তাদৃশ সুফল না হওয়ার কারণ এই যে উহা যথাযথ ভাবের সহিত অনুষ্ঠিত হয় না। "এই নিয়ে যা"—এ ভাবে দান বা দয়াধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায় না, পরন্তু উহা হৃদয়ের অহঙ্কারের পরিচায়ক ; উদ্দেশ্য, যেন জগৎ জানিতে পারে যে তাহারা দয়াধর্ম্ম করিতেছে। হিন্দুদের অবশ্য জানা উচিত যে, স্মৃতির মতে দাতা গ্রহীতা অপেক্ষা হীনতর ; গ্রহীতা তৎকালে স্বয়ং নারায়ণ সুতরাং তাঁহার মতে এইরূপ নূতন ধরণের পূজাপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিলে ভাল হয় যে, কতিপয় দরিদ্র, অন্ধ বা ক্ষুধার্ত্ত নারায়ণকে প্রত্যহ প্রতিগৃহে আনয়ন করিয়া প্রতিমার যেরূপ পূজা করা হয়, সেইরূপ অশন বসন দ্বারা তাঁহাদের পূজা করা। পর দিবস আবার কতকগুলি লোককে লইয়া আসিয়া ঐরূপে পূজা করা। তিনি কোন উপাসনাপ্রণালীর দোষ দিতেছেন না, কিন্তু তাঁহার বলিবার অভিপ্রায় এই যে, এইভাবে নারায়ণপূজাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পূজা এবং ভারতের লোকের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। ...

দরিদ্রনারায়ণ পূজা

উপসংহারে তিনি ভক্তিকে একটি ত্রিকোণের সহিত তুলনা

করেন। ইহার প্রথম কোণ এই যে, প্রকৃত ভক্তি বা প্রেম কিছু চাহে না। প্রেমে ভয় নাই, ইহাই উহার দ্বিতীয় কোণ। পুরস্কার বা প্রতিদানের উদ্দেশ্যে ভালবাসা ভিক্ষুকের ধর্ম্ম, ব্যবসায়ীর ধর্ম্ম, প্রকৃত ধর্ম্মের সহিত উহার অতি অল্পই সম্বন্ধ। কেহ যেন ভিক্ষুক না হন, কারণ, ভিক্ষুকতা নাস্তিকতার চিহ্ন। "যে ব্যক্তি গঙ্গাতীরে বসতি করিয়া পানীয় জলের জন্য কূপ খনন করে, সে মূর্খ নয়ত কি ?" সেইরূপ জড়বস্তুর জন্য ভগবানের নিকট যে প্রার্থনা করে সে-ও মূর্খ।—ভক্তকে সর্ব্বদাই এই কথা বলিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে যে, "প্রভো, আমি তোমার নিকট কিছুই চাহি না, কিন্তু যদি তোমার কিছুর প্রয়োজন থাকে, আমি দিতে প্রস্তুত।" প্রেমে ভয় থাকে না। তিনি বলিতে লাগিলেন, "আপনারা কি দেখেন নাই যে, ক্ষীণকায়া অবলা নারী পথ দিয়া যাইতে যাইতে কুকুরের চীৎকারে নিকটতম গৃহে পলাইয়া আশ্রয় লয় ? পরদিনও সে পথ চলিতেছে—সঙ্গে তাহার শিশুপুত্র। হঠাৎ একটা সিংহ শিশুটিকে আক্রমণ করিল—তখন তাহাকে কি পূর্ব্বদিনের মত পলাইতে দেখিবেন ? কখনই না। সে তাহার সন্তানটিকে রক্ষা করিবার জন্য সিংহের মুখে যাইতেও সঙ্কুচিত হইবে না। তৃতীয় বা সর্বশেষ কোণ এই যে, প্রেমই প্রেমের লক্ষ্য। ভক্ত অবশেষে এই ভাবে উপনীত হন যে, কেবল প্রেমই সৎ আর সব অসৎ। ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে মানুষ আর কোথায় যাইবে ? সকল দৃশ্য বস্তুর মধ্যে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্টরূপে দৃশ্যমান। তিনিই সেই শক্তি, যাহা চন্দ্রসূর্য্যতারকারাজিকে পরিচালিত করিতেছে এবং নরনারীগণে,

ইতর প্রাণিগণের মধ্যে—সকল বস্তুতে সর্ব্বত্রই প্রকাশ পাইতেছে, জড়শক্তিরাজ্যে মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি রূপে তিনিই প্রকাশিত। তিনি সকল স্থানেই রহিয়াছেন, প্রতি পরমাণুতে রহিয়াছেন, সকল স্থানেই তাঁহার প্রকাশ। ইনিই সেই অনন্ত প্রেম, জগতের একমাত্র সঞ্চালিনী শক্তি এবং সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ স্বয়ং ভগবান্।

বেদান্ত

আমরা এই জগতে বাস করিয়া থাকি—বাহ্য জগৎ ও অন্তর্জ্জগৎ। অতি প্রাচীনকাল হইতেই মানব এই উভয় জগতেই প্রায় সমভাবেই উন্নতি করিয়া আসিতেছে। প্রথমেই বহির্জগতে গবেষণা আরম্ভ হয় আর মানব প্রথমতঃ বহিঃপ্রকৃতি হইতেই সমুদয় গভীর সমস্যার উত্তর লাভের চেষ্টা করিয়াছিল। মানব প্রথমতঃ তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ সমুদয় প্রকৃতি হইতে তাহার মহান্ ও সুন্দরের জন্য পিপাসার নিবৃত্তির চেষ্টা পাইয়াছিল; মানব নিজেকে এবং নিজের ভিতরের সমুদয় বস্তুকে স্থূলের ভাষায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, আর সে যে সকল উত্তর লাভ করিয়াছিল, ঈশ্বরতত্ত্ব ও উপাসনাতত্ত্ব সমূহ সম্বন্ধে যে সকল অত্যদ্ভুত সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, সেই শিবসুন্দরকে যে আবেগময়ী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছিল, তাহা অতি অপূর্ব্ব। বহির্জ্জগৎ হইতে মানব যথার্থই মহান্ ভাবসমূহ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু যখন পরে তাহার নিকট অন্য জগৎ উন্মুক্ত হইল, তাহা আরও মহত্তর, আরও সুন্দরতর, আরও অনন্তগুণে বিকাশশীল। বেদের কর্ম্মকাণ্ডভাগে আমরা ধর্ম্মের অত্যদ্ভুত তত্ত্বসমূহ বিবৃত দেখিতে পাই, আমরা জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা বিধাতার সম্বন্ধে অত্যদ্ভুত তত্ত্বসমূহ দেখিতে পাই, আর এই ব্রহ্মাণ্ডকে যেরূপ ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা স্থানে স্থানে অতিশয় প্রাণস্পর্শী। তোমাদের

মানবের বহির্জ্জগৎ ও অন্তর্জ্জগতে গবেষণা

মধ্যে হয়ত অনেকেরই ঋগ্‌বেদ সংহিতার প্রলয়বর্ণনাত্মক সেই অত্যদ্ভুত মন্ত্রটির কথা স্মরণ আছে। বোধ হয় এরূপ মহত্ত্বাব-দ্যোতক বর্ণনা আর কেহ কখন করিতে পারে নাই। তথাপি উহা কেবল বহিঃপ্রকৃতির মহান্ ভাবের বর্ণনা—উহা স্থূলেরই বর্ণনা—উহাতে যেন এখনও কিছু জড়ত্ব লাগিয়া রহিয়াছে। উহা কেবল জড়ের ভাষায়, সান্তের ভাষায় অনন্তের বর্ণনা; উহা জড় দেহেরই অন্তর বিস্তারের বর্ণনা—মনের নহে; উহা দেশেরই অনন্তত্বের বর্ণনা, চৈতন্যের নহে। এই কারণে বেদের দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডে আমরা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে, দেখিতে পাই। প্রথম প্রণালীটি ছিল—বহিঃপ্রকৃতি হইতে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত সত্য অনুসন্ধান করা। জড় জগৎ হইতে জীবনের সমুদয় গভীর সমস্যাসমূহের মীমাংসার চেষ্টাই প্রথমে হইয়াছিল।

'যস্যৈতে হিমবন্তো মহিত্বা'

'এই হিমালয় পর্ব্বত যাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে।'

এ খুব উচ্চ ধারণা বটে, কিন্তু ভারতের পক্ষে ইহা পর্য্যাপ্ত হয় নাই। ভারতীয় মন ঐ পথ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

বহির্জ্জগতে গবেষণায় অতৃপ্তি—অন্তর্জ্জগতে অনুসন্ধান

ভারতবাসীর গবেষণা সম্পূর্ণরূপে বহির্জ্জগৎ ছাড়িয়া ভিন্ন দিকে যাইল, অন্তর্জ্জগতে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল, জড় হইতে তাঁহারা ক্রমশঃ চিতে আসিলেন। এই প্রশ্ন চতুর্দ্দিক্ হইতে শ্রুত হইতে লাগিল,—মানুষের মৃত্যুর পর তাহার কি হয়?

'অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।' কঠ উঃ ১।২০

'কেহ কেহ বলে, মানুষের মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে, কেহ কেহ বলে, থাকে না; হে যমরাজ, ইহার মধ্যে সত্য কি?" এখানে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে, দেখিতে পাই। ভারতীয় মন বাহ্য জগৎ হইতে যাহা পাইবার তাহা পাইয়াছিল, কিন্তু উহাতে সে সন্তুষ্ট হয় নাই। উহা আরও অধিক অনুসন্ধানের প্রয়াসী হইয়াছিল, নিজের অভ্যন্তর দেশে গমন করিয়া নিজ আত্মার মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া সমস্যার মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছিল—শেষে উত্তর আসিল।

বেদের এই ভাগের নাম উপনিষদ্ বা বেদান্ত বা আরণ্যক বা রহস্য। এখানে আমরা দেখিতে পাই যে, ধর্ম্ম একেবারেই সমুদয় বাহ্য ক্রিয়াকলাপ হইতে মুক্ত। এখানে আমরা দেখিতে পাই, আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহ জড়ের ভাষায় বর্ণিত নহে, আধ্যাত্মিক ভাবসমূহ চৈতন্যের ভাষায় বর্ণিত—সূক্ষ্মতত্ত্বসমূহ তাহার উপযুক্ত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এখানে আর কোনরূপ স্থূলভাব নাই, আমরা যে সকল বিষয় লইয়া সচরাচর ব্যস্ত থাকি, সেই সকল বিষয়ের সহিত জোড়াতাড়া দিয়া সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা নাই। উপনিষদের মহামনাঃ ঋষিগণ—মহা সাহসের সহিত—এখনকার কালে আমরা এরূপ সাহসের ধারণাই করিতে পারি না—নির্ভয়ে কোনরূপ জোড়াতাড়া না দিয়া মানবজাতির নিকট মহত্তর সত্যসমূহ প্রচার করিয়াছিলেন, এইরূপ উচ্চতম সত্য জগতে আর কখনও প্রচারিত হয় নাই। হে আমার স্বদেশীয়গণ, আমি তোমাদের নিকট সেইগুলি বিবৃত করিতে চাই।

উপনিষদের বিশেষত্ব

বেদের এই জ্ঞানকাণ্ডও সুবৃহৎ সমুদ্রস্বরূপ। উহার বিন্দুমাত্র বুঝিতে হইলেও অনেক জন্ম প্রয়োজন। এই উপনিষদ্ সম্বন্ধে রামানুজ ঠিকই বলিয়াছেন যে, বেদান্ত বেদের বা শ্রুতির শিরঃস্বরূপ—আর সত্য সত্যই ইহা বর্ত্তমান ভারতের বাইবেলস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বেদের কর্ম্মকাণ্ডকে হিন্দুরা খুব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন কিন্তু আমরা জানি, প্রকৃতপক্ষে শত শত যুগ ধরিয়া শ্রুতি অর্থে উপনিষদ্—কেবল উপনিষদ্ই বুঝাইয়াছে! আমরা জানি, আমাদের সকল বড় বড় দর্শনকর্ত্তা—ব্যাস বা পতঞ্জলি বা গৌতম, এমন কি, সকল দর্শনশাস্ত্রের জনকস্বরূপ মহাপুরুষ কপিল পর্য্যন্ত—যখনই তাঁহাদের মতের সমর্থক প্রমাণের প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই তাঁহারা সকলেই উপনিষদ্ হইতেই উহা পাইয়াছেন, আর কোথা হইতেও নহে; কারণ, উহাদের মধ্যেই সনাতন সত্য অনন্তকালের জন্য নিহিত রহিয়াছে।

উপনিষদের অধিকতর প্রামাণ্য ও উহাদের প্রকাণ্ডত্ব

কতকগুলি সত্য আছে, যাহারা কেবল বিশেষ বিশেষ দেশকালপাত্রে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সত্য। সেগুলি বিশেষ বিশেষ যুগের বিধান হিসাবে সত্য। আবার আর কতকগুলি সত্য আছে, সেগুলি মানবপ্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যতদিন মানুষের অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন সেগুলিও থাকিবে। এই শেষোক্ত সত্যগুলি সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বকালিক, আর যদিও আমাদের ভারতীয় সমাজে নিশ্চিত অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, আমাদের আহার-বিহার পোষাক-পরিচ্ছদ উপাসনাপ্রণালী, এ সকলই যদিও অনেক বদলাইয়াছে, কিন্তু এই

সার্ব্বকালিক ও যুগধর্ম্ম

শ্রৌত সার্ব্বজনীন সত্যসমূহ—বেদান্তের এই অপূর্ব্ব তত্ত্বরাশি—স্বমহিমায় অচল অজেয় ও অবিনাশী ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

উপনিষদের যে সকল তত্ত্ব বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে, সেগুলির বীজ কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডেই পূর্ব্ব হইতে নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব, যাহা সকল সম্প্রদায়ের বৈদান্তিকগণকেই মানিয়া লইতে হইয়াছে, এমন কি, মনোবিজ্ঞান-তত্ত্ব যাহা সকল ভারতীয় চিন্তা-প্রণালীর মূলভিত্তিস্বরূপ, তাহাও কর্ম্মকাণ্ডে বিবৃত ও জগতের সমক্ষে প্রচারিত হইয়াছে। অতএব বেদান্তের আধ্যাত্মিক ভাগের বিষয় বলিবার পূর্ব্বে আপনাদের সমক্ষে কর্ম্মকাণ্ড সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক, আর বেদান্ত শব্দটি কি অর্থে আমি ব্যবহার করিতেছি, তাহা আমি প্রথমেই আপনাদের নিকট পরিষ্কার করিয়া বলিতে চাই। দুঃখের বিষয়, আজকাল আমরা একটি বিশেষ ভ্রমে প্রায়ই পতিত হইয়া থাকি—আমরা বেদান্ত শব্দে কেবল অদ্বৈতবাদ বুঝিয়া থাকি। আপনাদের কিন্তু এইটি সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক যে, ভারতবর্ষে আজকাল প্রস্থানত্রয় পড়িতে হয়।

উপনিষৎ-প্রচারিত সত্যসমূহের বীজ সংহিতায় বর্ত্তমান

প্রথমতঃ, শ্রুতি অর্থাৎ উপনিষদ্, দ্বিতীয়তঃ ব্যাসসূত্র। আমাদের দর্শনশাস্ত্রসমূহের মধ্যে এই ব্যাসসূত্রই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহার কারণ এই যে, উহা পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য দর্শনসমূহের সমষ্টি ও চরম পরিণতিস্বরূপ। এই দর্শনগুলিও যে পরস্পর পরস্পরের বিরোধী. তাহা নয়, উহাদের মধ্যে একটি

প্রস্থানত্রয়—বেদান্ত শব্দের প্রকৃত তৎপর্য্য

যেন অপরটির ভিত্তিস্বরূপ,—যেন সত্যানুসন্ধিৎসু মানবের নিকট সত্যের ক্রমবিকাশ দেখাইয়া ব্যাসসূত্রে চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। আর এই উপনিষদ্ ও বেদান্তের অপূর্ব্ব সত্যসমূহের প্রণালীবদ্ধ বিন্যাসস্বরূপ ব্যাসসূত্রের মধ্যে বেদান্তের ভগবদ্বক্ত্র-বিনিঃসৃত টীকাস্বরূপ গীতা বর্ত্তমান। এই কারণেই দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী, বৈষ্ণব—ভারতের যে কোন সম্প্রদায়ই হউন না কেন, যাঁহারাই আপনাদিগকে সনাতনমতাবলম্বী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চান—তাঁহারা সকলেই উপনিষদ্, গীতা ও ব্যাসসূত্রকে তাঁহাদের প্রামাণিক গ্রন্থস্বরূপ ধরিয়া থাকেন। আমরা দেখিতে পাই, কি শঙ্করাচার্য্য, কি রামানুজ, কি মধ্বাচার্য্য, কি বল্লভাচার্য্য, কি চৈতন্য—যে কেহই নূতন সম্প্রদায় গঠনের ইচ্ছা করিয়াছেন, তাঁহাকেই এই তিন প্রস্থান গ্রহণ করিতে ও কেবল তাহাদের উপর একটি করিয়া নূতন ভাষ্য রচনা করিতে হইয়াছে। অতএব উপনিষদ্‌কে অবলম্বন করিয়া যে সকল বিভিন্ন মতবাদের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে মাত্র একটি মতের উপর 'বেদান্ত' শব্দটিকে আবদ্ধ করিয়া রাখা অন্যায়। বেদান্ত শব্দে প্রকৃত পক্ষে এই সকল মতগুলিকেই বুঝায়। অদ্বৈতবাদীর যেমন বেদান্তী বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার, রামানুজীরও তদ্রূপ। আমি আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিতে চাই, আমরা প্রকৃতপক্ষে হিন্দুশব্দের দ্বারা বৈদান্তিক বুঝিয়া থাকি।

আর এই বিষয়ে আমি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই,—এই তিনটি মত স্মরণাতীত কাল হইতেই ভারতে প্রচলিত। শঙ্কর অদ্বৈতবাদের আবিষ্কারক নহেন, শঙ্করের আবির্ভাবের

অনেকদিন পূর্ব্ব হইতে উহা বর্ত্তমান ছিল—শঙ্কর উহার একজন শেষ প্রতিনিধি মাত্র। রামানুজী মতও তাহাই—রামানুজের জন্মের অনেক পূর্ব্ব হইতেই যে উহা বিদ্যমান ছিল, তাহা উঁহাদের মতের ভাষ্য হইতেই আমরা জানি। অন্যান্য যে সকল দ্বৈতবাদী সম্প্রদায় উঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেও এইরূপ। আর আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, উহারা পরস্পর পরস্পরের বিরোধী নহে। আমাদের ষড়্‌দর্শন যেমন মহান্ তত্ত্বসমূহের ক্রমবিকাশ মাত্র, আরম্ভ অতি মৃদুধ্বনিতে—শেষে অদ্বৈতের বজ্রনির্ঘোষে পরিণতি ; এইরূপই পূর্ব্বোক্ত তিনটি মতেও আমরা দেখিতে পাই, মনুষ্য মন উচ্চ হইতে উচ্চতর আদর্শের দিকে অগ্রসর হইয়াছে—অবশেষে সমুদয়ই অদ্বৈতবাদের সেই অদ্ভুত একত্বে পর্য্যবসিত হইয়াছে। অতএব এই তিনটী পরস্পর বিরোধী নহে।

অদ্বৈতবাদাদি সকল মতই সনাতন

এই সকল মত পরস্পর-বিরোধী নহে

অপর দিকে আমি তোমাদিগকে বলিতে বাধ্য যে, অনেকে এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন যে, ইহারা পরস্পর বিরোধী। আমরা দেখিতে পাই, অদ্বৈতবাদী যে শ্লোকগুলিতে বিশেষভাবে অদ্বৈতবাদের শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, সেইগুলিকে যথাযথ রাখিয়া দিতেছেন, কিন্তু যেখানে দ্বৈতবাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের উপদেশ, টানিয়া সেইগুলির অদ্বৈত অর্থ করিতেছেন। আবার দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ দ্বৈত শ্লোকগুলির যথাযথ অর্থ করিয়া অদ্বৈত শ্লোকগুলির টানিয়া

ভাষ্যকারগণের একদেশী সিদ্ধান্ত

দ্বৈত অর্থ করিতেছেন। অবশ্য ইঁহারা মহাপুরুষ—আমাদের গুরুপদবাচ্য। তবে ইহাও কথিত হইয়াছে যে, 'দোষা বাচ্যা গুরোরপি'—গুরুরও দোষ বলা উচিত। আমার মত এই যে, কেবল এই বিষয়েই তাঁহারা ভ্রমে পড়িয়াছিলেন। আমাদের শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই, কোনরূপ অসাধুতা অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মব্যাখ্যার আবশ্যক নাই, ব্যাকরণের মারপ্যাঁচ করিবার দরকার নাই, যে সকল শ্লোকের দ্বারা যে সকল ভাব কখনই উদ্দিষ্ট হয় নাই, সেই সকল শ্লোকের ভিতর সেই সব আমাদের নিজেদের ভাব প্রবেশ করাইবার কোন প্রয়োজন নাই, শ্লোকের সাদাসিদা অর্থ বুঝা অতি সহজ, আর যখনই তোমরা অধিকারভেদের অপূর্ব্ব রহস্য বুঝিবে, তখনই উহা তোমাদের নিকট অতি সহজ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

ইহা সত্য যে, উপনিষৎসমূহের লক্ষ্যবিষয় একটি—"কি সেই বস্তু, যাহাকে জানিলে সমুদয় জানা হয়"—'কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি।' মুণ্ডক উঃ ১।৩। আধুনিক কালের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, উপনিষদের উদ্দিষ্ট বিষয় চরম একত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা। আর বহুত্বের মধ্যে একত্বের অনুসন্ধান ভিন্ন জ্ঞান আর কিছুই নহে। সকল বিজ্ঞানই এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—সকল মানবীয় জ্ঞানই বহুত্বের মধ্যে একত্বানুসন্ধানের চেষ্টার উপর প্রতিষ্ঠিত। আর যদি কতকগুলি ঘটনাচক্রের মধ্যে একত্বানুসন্ধান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানবীয় বিজ্ঞানের কার্য্য হয়,—তবে যখন এই অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যপূর্ণ জগৎপ্রপঞ্চের মধ্যে—যাহা নামরূপে

লক্ষ্য এক হইলেও অধিকারভেদে শ্রুতির বিভিন্ন উপদেশ

সহস্রধা বিভিন্ন, যেখানে জড়চৈতন্তে ভেদ, যেখানে প্রত্যেক চিত্তবৃত্তি অপরটি হইতে ভিন্ন, যেখানে প্রত্যেক রূপটি অপরটি হইতে পৃথক্, যেখানে প্রত্যেক বস্তুর সহিত প্রত্যেক বস্তুর পার্থক্য বর্ত্তমান,—সেই জগৎপ্রপঞ্চের মধ্যে একত্ব আবিষ্কার করা যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তবে উহা কি গুরুতর ব্যাপার, ভাবিয়া দেখ। কিন্তু এই সকল ভিন্ন ভিন্ন অনন্ত লোক—এই সকল বিভিন্নতার মধ্যে একত্বাবিষ্কার করাই উপনিষদের লক্ষ্য। আমরা ইহা বুঝি। অন্য দিকে আবার "অরুন্ধতীন্যায়ের" প্রয়োগ করিতে হইবে। অরুন্ধতী নক্ষত্র কাহাকেও দেখাইতে হইলে উহার নিকটস্থ কোনও বৃহত্তর ও উজ্জ্বলতর নক্ষত্র দেখাইয়া উহাতে দৃষ্টি স্থির হইলে পরে ক্ষুদ্রতর অরুন্ধতী দেখাইতে হয়। এইরূপেই সূক্ষ্মতম ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইবার পূর্ব্বে অন্যান্য অনেক স্থূলতর ভাব বুঝাইয়া পরে ক্রমশঃ উচ্চতর ভাবের উপদেশ হইয়াছে। আমার এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য আর কিছু করিতে হইবে না—কেবল তোমাদিগকে উপনিষদ্ দেখাইয়া দিলেই হইবে—তাহা হইলেই তোমরা বুঝিতে পারিবে। প্রায় প্রত্যেক অধ্যায়ের আরম্ভেই দ্বৈতবাদ—উপাসনার উপদেশ। প্রথমতঃ তাঁহাকে জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তারূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তিনি আমাদের উপাস্য, শাস্তা, বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির নিয়ন্তা—তথাপি তিনি যেন প্রকৃতির বাহিরে রহিয়াছেন। আর এক পদ অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাই, যে আচার্য্য উপরোক্ত শিক্ষা দিয়াছেন, তিনিই আবার উপদেশ দিতেছেন যে, ঈশ্বর প্রকৃতির বাহিরে নহেন, প্রকৃতির ভিতরেই বর্ত্তমান রহিয়াছেন। অবশেষে এই দুইটি ভাবই পরিত্যক্ত

হইয়াছে,—যাহা কিছু সত্য, সবই তিনি—কোন ভেদ নাই, 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো'। যিনি সমগ্র জগতের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, তিনিই যে মানবাত্মার মধ্যে বর্ত্তমান, ইহাই শেষে ঘোষণা করা হইয়াছে। এখানে আর কোন প্রকার আপোষ নাই, এখানে আর অপরের মতামতের অপেক্ষা বা ভয় নাই। সত্য—নিরাবরণ সত্য—এখানে সুস্পষ্ট নির্ভীক ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে আর বর্ত্তমানকালেও আমাদের সেইরূপ নির্ভীক ভাষায় সত্য প্রচার করিতে ভয় পাইবার প্রয়োজন নাই, আর ঈশ্বরকৃপায় অন্ততঃ আমি এইরূপ নির্ভীক প্রচারক হইবার ভরসা রাখি।

এক্ষণে পূর্ব্বপ্রসঙ্গের অনুবৃত্তি করিয়া প্রথম জ্ঞাতব্য তত্ত্বগুলির আলোচনা করা যাক্। প্রথমতঃ সকল বৈদান্তিক সম্প্রদায় যাহাতে একমত, সেই জগৎস্থষ্টি প্রকরণ এবং মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। আমি প্রথমে জগৎ স্থষ্টি প্রকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আজকাল আধুনিক বিজ্ঞানে অদ্ভুত আবিষ্ক্রিয়াসমূহ যেন বজ্রবেগে আমাদের উপর পতিত হইয়া, আমরা যাহা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই, এমন অদ্ভুত তত্ত্বসমূহের সম্মুখীন করিতেছে। কিন্তু এগুলির অধিকাংশ বহুযুগ পূর্ব্বে আবিষ্কৃত সত্যসমূহের পুনরাবিষ্ক্রিয়া মাত্র। আধুনিক বিজ্ঞান এই সে দিন আবিষ্কার করিয়াছে যে, বিভিন্ন শক্তিসমূহের মধ্যে একত্ব রহিয়াছে। উহা এই সবে আবিষ্কার করিয়াছে যে, উত্তাপ, তাড়িত, চৌম্বকশক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত সমুদয় শক্তিকেই এক শক্তিতে পরিণত করা যাইতে পারে—সুতরাং লোকে উহাদিগকে যে কোন নামে অভিহিত করুক,

স্থষ্টিতত্ত্ব—প্রাণ ও আকাশ

বিজ্ঞান একমাত্র নামের দ্বারাই উহা অভিহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু সংহিতাতেও—উহা অতি প্রাচীন হইলেও উহাতে—সেই শক্তির ঐরূপ ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়। মাধ্যাকর্ষণই বল, উত্তাপই বল, তাড়িত বল, চৌম্বক শক্তিই বল, অথবা অন্তঃকরণের চিন্তাশক্তিই বল, সবই এক শক্তির প্রকাশমাত্র আর সেই এক শক্তির নাম প্রাণ। প্রাণ কি? প্রাণ অর্থে স্পন্দন। যখন সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড লীন হইয়া যায়, তখন এই অনন্ত শক্তিসমূহ কোথায় যায়? এগুলির কি লোপ হয় মনে কর? কখনই নহে। যদি বল, একেবারে শক্তিরাশির ধ্বংস হয়, তবে কোন বীজ হইতে আবার আগামী জগত্তরঙ্গ প্রসূত হইবে? কারণ, এই গতি ত চিরকাল ধরিয়া তরঙ্গাকারে চলিয়াছে—একবার উঠিতেছে, আবার পড়িতেছে—আবার উঠিতেছে, আবার পড়িতেছে—এইরূপ অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে। এই জগৎপ্রপঞ্চের বিকাশকে আমাদের শাস্ত্রে সৃষ্টি বলে। সৃষ্টি আর ইংরাজী creation এই দুইটি শব্দ একার্থক নহে। ইংরাজীতে সংস্কৃত শব্দগুলির ঠিক ঠিক অনুবাদ হয় না—যা তা করিয়া অনুবাদ করিয়া আমায় বলিতে হয়। 'সৃষ্টি' শব্দের ঠিক অর্থ—প্রকাশ হওয়া, বাহির হওয়া। জগৎপ্রপঞ্চ প্রলয়ের সময় সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর হইয়া যাহা হইতে উহার উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই প্রাথমিক অবস্থায় পরিণত হয়—কিছুকালের জন্য ঐ অবস্থায় শান্তভাবে থাকে—আবার ক্রমশঃ প্রকাশোন্মুখ হয়। ইহাই সৃষ্টি। আর প্রাণরূপিণী এই শক্তিগুলির কি হয়? তাহারা আদি প্রাণে পরিণত হয়, আর এই প্রাণ তখন প্রায় গতিহীন হয়—সম্পূর্ণরূপে গতিশূন্য কখনই হয় না, আর বৈদিক সূক্তের 'আনীদবাতং'—ঋগ্বেদ

১০।১২৯-২। গতিহীনভাবে স্পন্দিত হইয়াছিল—এই বাক্যের দ্বারা এই তত্ত্বেরই বর্ণনা করা হইয়াছে। বেদের অনেক পারিভাষিক শব্দের অর্থ নির্ণয় অতিশয় কঠিন। উদাহরণ স্বরূপ এই 'বাত' শব্দ ধর। কখন কখন ইহার দ্বারা বায়ু বুঝায়, কখন কখন গতি বুঝায়। লোকে অনেক সময় এই দুই অর্থে গোল করিয়া থাকে। এই বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। আর তখন ভূতের কি অবস্থা হয়? শক্তি সর্ব্বভূতে ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে। সেই সময় সকলই আকাশে লীন হয়—আবার আকাশ হইতে সমুদয় ভূতের প্রকাশ হয়। এই আকাশই আদিভূত। এই আকাশ প্রাণের শক্তিতে স্পন্দিত হইতে থাকে, আর যখন নূতন সৃষ্টি হইতে থাকে, তখন যেমন যেমন স্পন্দন দ্রুত হয়, অমনই এই আকাশ তরঙ্গায়িত হইয়া চন্দ্রসূর্য্যগ্রহ-নক্ষত্রাদির আকার ধারণ করে। অন্য স্থলে আছে—

'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্'।

'এই জগতে যাহা কিছু আছে, প্রাণ কম্পিত হইতে থাকিলে সকলই বাহির হয়।' এখানে 'এজতি' শব্দটি লক্ষ্য করিও—'এজ' ধাতুর অর্থ কম্পিত হওয়া।

জগৎপ্রপঞ্চসৃষ্টির এই কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইল। এতদ্ব্যতীত বিস্তার করিয়া বলিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়। কি প্রণালীতে সৃষ্টি হয়, কিরূপে প্রথমে আকাশের এবং আকাশ হইতে অন্যান্য বস্তুর উৎপত্তি হয়, আকাশের কম্পন হইতে বায়ুর উৎপত্তি কিরূপে হয় ইত্যাদি অনেক কথা বলিতে হয়। তবে ইহার মধ্যে

'মহৎ' হইতে আকাশ ও প্রাণের উৎপত্তি

একটি কথা স্পষ্ট যে, সূক্ষ্মতর হইতে স্থূলতরের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সর্ব্বশেষে স্থূলভূত উৎপন্ন হয়। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বাহিরের বস্তু আর ইহার পশ্চাতে সূক্ষ্মতর ভূত রহিয়াছে। এতদূর বিশ্লেষণ করিয়াও কিন্তু আমরা দেখিতে পাইলাম, সমুদয় জগৎকে দুই তত্ত্বে পর্য্যবসিত করা হইয়াছে মাত্র, এখনও চরম একত্বে পৌছান হয় নাই। শক্তিবর্গ প্রাণরূপ এক শক্তিতে এবং জড়বর্গ আকাশরূপ এক বস্তুতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই দুইটির মধ্যে কি আবার কোনরূপ একত্ব বাহির করা যাইতে পারে? ইহাদিগকেও কি এক তত্ত্বে পর্য্যবসান করা যাইতে পারে? আমাদের আধুনিক বিজ্ঞান এখানে নীরব—কোনরূপ মীমাংসা করিতে পারে নাই, আর যদি উহাকে ইহার মীমাংসা করিতে হয়, তবে যেমন উহা প্রাচীনদিগের ন্যায় আকাশ ও প্রাণকেই পুনরাবিষ্কার করিয়াছে, সেইরূপ সেই প্রাচীনদিগের পথেই চলিতে হইবে। আকাশ ও প্রাণ যে এক তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত, তিনি সেই সর্ব্বব্যাপী নির্গুণ তত্ত্ব, যিনি পুরাণে ব্রহ্মা—চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা—বলিয়া পরিচিত এবং যাঁহাকে মহৎ নামে নির্দ্দেশ করা যায়। এখানেই ঐ উভয়ের মিলন। দার্শনিক ভাষায় যাহা মন বলিয়া কথিত হয়, তাহা মস্তিষ্করূপ ফাঁদে আবদ্ধ সেই মহতের কিয়দংশ। আর জগতে সমুদয় মস্তিষ্কে উপহিত মহৎকে সমষ্টি বলা যায়।

কিন্তু এই পর্য্যন্ত বিশ্লেষণেই শেষ হয় নাই, উহা আরও দূরে অগ্রসর হইয়াছিল। আমরা প্রত্যেকে যেন এক একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড আর সমগ্র জগৎ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড।

মন জড়

আর ব্যষ্টিতে যাহা হইতেছে, তাহা সমষ্টিতেও ঘটিতেছে,

ইহা আমরা অনায়াসেই অনুমান করিতে পারি। যদি আমরা আমাদের নিজেদের মন বিশ্লেষণ করিতে পারিতাম, তবে আমরা সমষ্টি মনে কি হইতেছে, তাহাও অনেকটা নিশ্চিন্তরূপে অনুমান করিতে পারিতাম। এখন প্রশ্ন এই—এই মনটি কি। বর্ত্তমানকালে পাশ্চাত্যদেশে জড় বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শারীরবিধান-শাস্ত্র যেমন ধীরে ধীরে প্রাচীন ধর্ম্মের একটির পর আর একটি দুর্গ অধিকার করিয়া লইতেছে, পাশ্চাত্যেরা আর দাঁড়াইবার স্থান পাইতেছে না; কারণ, আধুনিক শারীরবিধানশাস্ত্র প্রতিপদে মনকে মস্তিষ্কের সহিত মিশাইয়াছে দেখিয়া তাহারা ফাঁপরে পড়িয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে আমরা ইহা বরাবর জানি। হিন্দুবালককে প্রথমেই এই তত্ত্ব শিখিতে হয় যে, মন জড়পদার্থ, তবে উহা সূক্ষ্মতর জড়। আমাদের এই দেহ স্থূল, কিন্তু এই দেহের পশ্চাতে সূক্ষ্ম শরীর বা মন রহিয়াছে। ইহাও জড়, কিন্তু সূক্ষ্মতর; আর ইহা আত্মা নহে।

আত্মা

এই আত্মা শব্দটি আমি তোমাদের নিকট ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া দিতে পারিতেছি না, কারণ ইউরোপে আত্মা শব্দের প্রতিপাদ্য কোন ভাবই নাই; অতএব এই শব্দ অনুবাদের অযোগ্য। জার্ম্মান দার্শনিকগণ আজকাল এই আত্মা শব্দটি Self শব্দের দ্বারা অনুবাদ করিতেছেন, কিন্তু যতদিন না এই শব্দটি সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়, ততদিন ইহা ব্যবহার করা অসম্ভব। অতএব উহাকে Self-ই বল বা আর যাহা কিছু বল, আমাদের আত্মা ছাড়া উহা আর কিছু নহে। এই আত্মাই মানুষের অভ্যন্তরে যথার্থ মানুষ। এই আত্মাই

জড় মনকে উহার যন্ত্র, অথবা মনোবিজ্ঞানের ভাষায়, উহার অন্তঃকরণস্বরূপে ব্যবহার করেন, আর মন কতকগুলি আভ্যন্তরিক যন্ত্রসহায়ে দেহের দৃশ্যমান যন্ত্রগুলির উপর কার্য্য করে। এই মন কি? এই সে দিন পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ জানিতে পারিয়াছেন যে, চক্ষু প্রকৃতপক্ষে দর্শনেন্দ্রিয় নহে, কিন্তু ইহারও পশ্চাতে প্রকৃত ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান, আর যদি উহা নষ্ট হইয়া যায়, তবে সহস্র-লোচন ইন্দ্রের মত মানুষের সহস্র চক্ষু থাকিতে পারে, কিন্তু সে কিছুই দেখিতে পাইবে না। তোমাদের দর্শন এই স্বতঃসিদ্ধ লইয়াই প্রথমে অগ্রসর হয় যে, দৃষ্টি বলিতে বাহ্য দৃষ্টি বুঝায় না। প্রকৃত দৃষ্টি অন্ত-রিন্দ্রিয়ের—অভ্যন্তরবর্ত্তী মস্তিষ্ককেন্দ্রসমূহের; তুমি তাহাদিগের যাহা ইচ্ছা নাম দিতে পার; কিন্তু ইন্দ্রিয় অর্থে আমাদের এই বাহ্য চক্ষু, নাসিকা বা কর্ণ বুঝায় না। আর এই ইন্দ্রিয়সমূহের সমষ্টি মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কারের সহিত মিলিত হইয়াই ইংরাজীতে mind নামে অভিহিত হয়। আর যদি আধুনিক শারীরতত্ত্ববিৎ আসিয়া তোমায় বলেন যে মস্তিষ্কই mind, এবং ঐ মস্তিষ্ক বিভিন্ন যন্ত্র বা কারণসমূহে গঠিত, তাহা হইলে তোমাদের ভীত হইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই—তাঁহাদিগকে তুমি অনায়াসেই বলিতে পার যে তোমাদের দার্শনিকগণ বরাবরই ইহা জানিতেন; ইহা তোমাদের ধর্ম্মের অক্ষরপরিচয় মাত্র।

ইন্দ্রিয় কোন্‌গুলি

বেশ কথা, এক্ষণে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, এই মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার প্রভৃতি শব্দের দ্বারা কি বুঝায়। প্রথমতঃ চিত্ত কি তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। চিত্তই প্রকৃতপক্ষে অন্তঃকরণের

মূল উপাদানস্বরূপ—ইহা মহতেরই অংশস্বরূপ—মনের বিভিন্ন অবস্থানসমূহের সাধারণ নাম। গ্রীষ্মের আপরাহ্ণে বিন্দুমাত্র তরঙ্গরহিত স্থির শান্ত একটি হ্রদকে উদাহরণস্বরূপে গ্রহণ কর। মনে কর, কোন ব্যক্তি এই হ্রদের উপর একটি প্রস্তর নিক্ষেপ করিল। তাহা হইলে কি ঘটিবে? প্রথমতঃ, জলে যে আঘাত দেওয়া হইল, সেইটিই যেন একটি ক্রিয়া হইল; তারপরেই জল উত্থিত হইয়া প্রস্তরটির দিকে প্রতিক্রিয়া করিল, আর সেই প্রতিক্রিয়া তরঙ্গের আকার ধারণ করিল। প্রথমতঃ জল একটু কম্পিত হইয়া উঠে, পরক্ষণেই তরঙ্গাকারে প্রতিক্রিয়া করে। এই চিত্তটিকে হ্রদের স্বরূপ ধর, আর বাহ্য বস্তুগুলি যেন উহার উপর নিক্ষিপ্ত প্রস্তরাবলী। যখনই উহা এই ইন্দ্রিয়গুলির সহায়তায় কোন বহির্বস্তুর সংস্পর্শে আসে—বাহ্য বস্তুগুলিকে অভ্যন্তরে গ্রহণ করিবার জন্য এই ইন্দ্রিয়গুলির প্রয়োজন—তখনই একটি কম্পন উৎপন্ন হয়। উহা মন—সংশয়াত্মক। তারপরেই একটি প্রতিক্রিয়া হয়—উহা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, আর এই বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অহংজ্ঞান ও বাহ্য বস্তুর জ্ঞান একত্র উদয় হয়। মনে কর, আমার হস্তের উপর একটি মশক আসিয়া দংশন করিল। এই বাহ্যবস্তুর আঘাত আমার চিত্তে নীত হইল, উহা একটু কম্পিত হইল—আমাদের মনোবিজ্ঞানমতে উহার নামই মন। তাহার পরেই একটি প্রতিক্রিয়া হইল এবং তৎক্ষণাৎ আমাদের ভিতর এই ভাবের উদয় হইল যে, আমার হাতে একটি মশক বসিয়াছে, আমার তাহাকে তাড়াইতে হইবে। তবে এইটুকু বুঝিতে হইবে

মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার শব্দগুলির তাৎপর্য্য

যে, হ্রদে যে সকল আঘাত আসে, তাহার সকলগুলিই বহির্জ্জগৎ হইতে ; কিন্তু মনোহ্রদে আঘাত বহির্জ্জগৎ হইতেও আসিতে পারে, আবার অন্তর্জ্জগৎ হইতেও আসিতে পারে। চিত্ত এবং উহার এই বিভিন্ন অবস্থানসমূহের নাম অন্তঃকরণ।

বস্তুজ্ঞানের প্রণালী ও অদ্বৈতবাদ

পূর্ব্বে যাহা বর্ণিত হইল, তাহার সহিত তোমাদিগকে আর একটি বিষয় বুঝিতে হইবে। তাহাতে আমাদের অদ্বৈতবাদ বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য হইবে। তোমাদের মধ্যে সকলে নিশ্চিত মুক্তা দেখিয়াছ, আর তোমাদের মধ্যে অনেকেই জান, মুক্তা কিরূপে নির্ম্মিত হয়। শুক্তির মধ্যে একটু ধূলি ও বালুকণা প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে উত্তেজিত করিতে থাকে, আর শুক্তির দেহ উহার উপর প্রতিক্রিয়া করিয়া ঐ ক্ষুদ্র বালুকাকে নিজ শরীরনিঃসৃত রসে প্লাবিত করিতে থাকে। উহাই তখন নির্দ্দিষ্ট গঠন প্রাপ্ত হইয়া মুক্তারূপে পরিণত হয়। এই মুক্তা যেরূপে গঠিত হয়, আমরা সমগ্রজগৎকে ঠিক সেই ভাবে গঠন করিতেছি। বাহ্য জগৎ হইতে আমরা কেবল আঘাতমাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকি। এমন কি, সেই আঘাতটির অস্তিত্ব জানিতে হইলেও আমাদিগকে ভিতর হইতে প্রতিক্রিয়া করিতে হয় ; আর যখন আমরা এই প্রতিক্রিয়া করি, তখন প্রকৃত পক্ষে আমরা আমাদের নিজ মনের অংশবিশেষকেই সেই আঘাতের দিকে প্রেরণ করি, আর যখন আমরা উহাকে জানিতে পারি, তাহা আর কিছুই নয় আমাদের নিজ মন ঐ আঘাতের দ্বারা যেরূপ আকার প্রাপ্ত হয়, আমরা সেইআকার প্রাপ্তমনকেই জানিতে পারি। যাঁহারা বহির্জ্জগতের বাস্তব সত্যতায় বিশ্বাস করিতে চান,

তাঁহাদিগকে একথা মানিতে হইবে, আর আজকাল এই শারীরবিধান শাস্ত্রের উন্নতির দিনে এ কথা না মানিয়া আর উপায় নাই যে, যদি বহির্জ্জগৎকে আমরা 'ক' বলিয়া নির্দ্দেশ করি, তবে আমরা প্রকৃত পক্ষে ক+মনকে জানিতে পারি, আর এই জ্ঞানক্রিয়ার মধ্যে মনের ভাগটি এত অধিক যে, উহা ঐ 'ক'এর সর্ব্বাংশব্যাপী আর ঐ 'ক'এর স্বরূপ প্রকৃত পক্ষে চিরকালই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় ; অতএব যদি বহির্জ্জগৎ বলিয়া কিছু থাকে, তবে উহা চিরকালই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। আমাদের মনের দ্বারা উহা যেরূপ গঠিত, পরিণত বা রূপান্তরিত হয়, আমরা উহার সেই ভাবকেই জানিতে পারি। অন্তর্জ্জগৎ সম্বন্ধেও তদ্রূপ। আমাদের আত্মা সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথা খাটে। আত্মাকে জানিতে হইলে উহাকেও আমাদের মনের মধ্য দিয়া জানিতে হয়, অতএব আমরা এই আত্মা সম্বন্ধে যতটুকু জানি, তাহা আত্মা+মন ব্যতীত আর কিছুই নহে। অর্থাৎ মনের দ্বারা আবৃত, মনের দ্বারা পরিণত বা গঠিত আত্মাকেই আমরা জানি। আমরা পরে এই তত্ত্বসম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিব। তবে এখানেই আমাদের ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক।

তারপর আর একটি বিষয় বুঝিতে হইবে। এই দেহ এক নিরবচ্ছিন্ন জড়স্রোতের নাম মাত্র। প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা ইহাতে নূতন নূতন উপাদান দিতেছি, প্রতি মুহূর্ত্তে আবার ইহা হইতে অনেক পদার্থ বাহির হইয়া যাইতেছে। যেন একটি সদা প্রবাহিত নদী—উহার রাশি রাশি জল সর্ব্বদাই এক স্থান হইতে অপর স্থানে চলিয়া যাইতেছে, তথাপি আমরা কল্পনাবলে সমুদয়টিকে

একবস্তুরূপে গ্রহণ করিয়া উহাকে সেই একই নদী বলিয়া থাকি। কিন্তু নদীটি প্রকৃতপক্ষে কি? প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন নূতন জল আসিতেছে, প্রতি মুহূর্ত্তে উহার তটভূমির পরিবর্ত্তন হইতেছে, প্রতি মুহূর্ত্তে তীরবর্ত্তী বৃক্ষলতা এবং উহার পত্রপুষ্পফলাদির পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। তবে নদীটি কি? উহা এই পরিবর্ত্তনসমষ্টির নাম মাত্র। মনের সম্বন্ধেও ঐ এক কথা। বৌদ্ধেরা এই ক্রমাগত পরির্ত্তনকে লক্ষ্য করিয়াই মহান্ ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ মতের সৃষ্টি করেন। উহা ঠিক ঠিক বুঝা অতি কঠিন ব্যাপার, কিন্তু বৌদ্ধ দর্শনে এই মত সুদৃঢ় যুক্তি দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে, আর ভারতে উহা বেদান্তের কোন কোন অংশের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছিল। এই মতকে নিরস্ত করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল, আর আমরা পরে দেখিব, কেবল অদ্বৈতবাদই এই মতকে খণ্ডন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, আর কোন মতই নহে। আমরা পরে ইহাও দেখিব যে, অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে লোকের নানাবিধ অদ্ভুত ধারণা সত্ত্বেও, অদ্বৈতবাদে ভয় খাওয়া সত্ত্বেও ইহাতেই বাস্তবিক জগতের পরিত্রাণ; কারণ, এই অদ্বৈতবাদের দ্বারাই সকল সমস্যার উত্তর পাওয়া যায়। দ্বৈতবাদাদি উপাসনা প্রণালী হিসাবে খুব ভাল বটে, উহারা মনের খুব তৃপ্তিকর বটে,—হইতে পারে উহারা মনকে উচ্চতর পথে অগ্রসর হইবার সাহায্য করে, কিন্তু যদি কেহ বিচারনিষ্ঠ অথচ ধর্ম্মপরায়ণ হইতে চাহে, তবে তাহার পক্ষে অদ্বৈতবাদই একমাত্র গতি।

ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদ ও অদ্বৈতবাদ

যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, মনও দেহের মত

একটি নদীস্বরূপ—নিয়তই একদিকে শূন্য হইতেছে অপর দিকে পূর্ণ হইতেছে ; তবে সেই একত্ব কোথায়, যাহাকে আমরা আত্মা বলিয়া অভিহিত করি ? আমরা দেখিতে পাই আমাদের দেহে ও মনে এইরূপ ক্রমাগত পরিবর্তন হইতে থাকিলেও আমাদের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা অপরিবর্তনীয়—আমাদের বস্তুবিষয়ক ধারণাসমূহ অপরিবর্তনীয়। যদি বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন আলোকরশ্মি আসিয়া একটি যবনিকা বা দেয়াল অথবা অপর কোন অচল বস্তুর উপর পড়ে, তখনই—কেবল তখনই উহারা এক অখণ্ডভাবাপন্ন বলিয়া কথিত হইতে পারে। মানবের বিভিন্ন শারীরযন্ত্রসমূহের মধ্যে কোথায় সেই নিশ্চল অখণ্ড বস্তু, যাহার উপর বিভিন্ন ভাবরাশি পতিত হইয়া পূর্ণ অখণ্ডত্ব প্রাপ্ত হইতেছে ? অবশ্য মন কখন এই এক বস্তু হইতে পারে না, কারণ, ইহাও পরিবর্তনশীল। অতএব এমন কিছু বস্তু অবশ্যই

আত্মাই অচল অখণ্ড বস্তু

আছে, যাহা দেহও নহে, মনও নহে, যাহার কখন পরিণাম হয় না, যাহার উপর আমাদের সমুদয় ভাবরাশি, সমুদয় বাহ্য বিষয় আসিয়া এক অখণ্ডভাবে পরিণত হয়—ইহাই প্রকৃত পক্ষে আমাদের আত্মা। আর যখন দেখিতে পাইতেছি সমুদয় জড়পদার্থ—তাহাকে সূক্ষ্ম জড় অথবা মন যে নামেই অভিহিত কর না—এবং সমুদয় স্থূল, জড় বা বাহ্য জগৎ উহার সহিত তুলনায় পরিবর্তনশীল, তখন এই অপরিবর্তনীয় বস্তুটি কখনই জড় পদার্থ হইতে পারে না, অতএব উহা চৈতন্য-স্বভাব অর্থাৎ উহা অজড়, অবিনাশী ও অপরিণামী।

তাহার পর আর একটি প্রশ্নের উদয় হয়। অবশ্য বাহ্য জগৎ

দেখিয়া কে উহা সৃষ্টি করিল—কে জড় পদার্থকে সৃষ্টি করিল—এইরূপ প্রশ্ন করিয়া ক্রমশঃ কৌশলবাদ (Argument from design) আনয়নরূপ যে পূর্ব্বপ্রচলিত হেতুবাদ—আমি তাহার কথা বলিতেছি না। এখানে আমাদের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি হইতে সত্যকে জানিবার চেষ্টা—আর যেমন আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল, এ প্রশ্নও ঠিক সেই ভাবে উঠিয়াছিল। যদি স্বীকার করা যায় যে, প্রত্যেক মানুষেই দেহ ও মন হইতে স্বতন্ত্র এক একটি অপরিবর্ত্তনীয় আত্মা আছেন, তথাপি ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, এই সকল আত্মার মধ্যে ধারণা, ভাব ও সহানুভূতির ঐক্য বিদ্যমান। নতুবা কি করিয়া আমার আত্মা তোমার আত্মার উপর কাজ করিবে? সে মধ্যবর্ত্তী বস্তু কি, যাহার মধ্য দিয়া এক আত্মা অপর আত্মার উপর কার্য্য করিবে? আমি যে তোমাদের আত্মা সম্বন্ধে কিছু অনুভব করিতে পারি, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? এমন কি বস্তু আছে, যাহা তোমার ও আমার উভয়ের আত্মাকেই স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে? অতএব অপর একটি আত্মা স্বীকার করিবার দার্শনিক আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে—কারণ, ঐ আত্মা সমুদয় বিভিন্ন আত্মা ও জড় বস্তুর মধ্য দিয়া কার্য্য করিবে; উহা জগতের অসংখ্য আত্মাতে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান থাকিবে; উহার সহায়তায়ই অপর আত্মাসমূহ জীবনীশক্তিসম্পন্ন হইবে, পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিবে, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি করিবে, পরস্পরের জন্য কার্য্য করিবে। এই সর্ব্বব্যাপী আত্মাই পরমাত্মা নামে অভিহিত, তিনি সমগ্র জগতের প্রভু, ঈশ্বর। আবার যখন আত্মা জড়পদার্থনির্ম্মিত

পরমাত্মা

নহে, যখন উহা চৈতন্যস্বরূপ, তখন উহা জড়ের নিয়মাবলীর অনুসরণ করিতে পারে না, জড়ের নিয়মানুসারে উহার বিচার চলিতে পারে না। অতএব উহা অবিনাশী ও অপরিণামী।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥—গীতা। ২।২৩-২৪।

অর্থাৎ অগ্নি এই আত্মাকে দগ্ধ করিতে পারে না, কোন যন্ত্র ইহাকে ছিন্ন করিতে পারে না, তরবারি ইহাকে কাটিতে পারে না, বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না, জল ইহাকে ভিজাইতে পারে না—এই মানবাত্মা অজ, অবিনাশী ও অজেয়।

গীতা ও বেদান্তমতে এই জীবাত্মা বিভু, কপিলের মতেও ইহা সর্ব্বব্যাপী। অবশ্য ভারতে এমন অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহাদের মতে এই জীবাত্মা অণু—কিন্তু তাহাদেরও মত এই যে, আত্মার প্রকৃত স্বরূপ বিভু, ব্যক্ত অবস্থায় উহা অণু।

তারপর আর একটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে হইবে। ইহা সম্ভবতঃ তোমাদের নিকট অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু এই তত্ত্বটিও বিশেষভাবে ভারতবর্ষীয়—আর এই বিষয়টি আমাদের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই হেতু আমি তোমাদিগকে এই তত্ত্বটির প্রতি অবহিত হইতে ও উহা স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করিতেছি, কারণ, উহা ভারতীয় সকল বিষয়েরই ভিত্তিস্বরূপ। তোমরা জার্ম্মান ও ইংরাজ পণ্ডিতগণ

কর্ত্তৃক পাশ্চাত্যদেশে প্রচারিত ভৌতিক পরিণামবাদের (evolution) বিষয় শুনিয়াছ। ঐ মতে সকল প্রাণীর শরীর প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন ; আমরা যে ভেদ দেখি, তাহা একই বস্তুর বিভিন্ন প্রকাশমাত্র আর ক্ষুদ্রতম কীট হইতে উচ্চতম সাধুশ্রেষ্ঠ পর্য্যন্ত সকলেই প্রকৃতপক্ষে এক, একটি অপরটিতে পরিণত হইতেছে, আর এইরূপ চলিতে চলিতে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া পূর্ণত্ব লাভ করিতেছে। আমাদের শাস্ত্রেও এই পরিণামবাদ রহিয়াছে। যোগী পতঞ্জলি বলিয়াছেন,—

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পরিণামবাদ evolution

"জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ।" ৪।২।

অর্থাৎ এক জাতি—এক শ্রেণী, অপর জাতিতে, অপর শ্রেণীতে পরিণত হয়। তবে ইউরোপীয়দিগের সহিত আমাদের প্রভেদ কোন্ খানে?—'প্রকৃত্যাপূরাৎ' প্রকৃতির আপূরণের দ্বারা। ইউরোপীয়গণ বলে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রাকৃতিক ও যৌন নির্ব্বাচন প্রভৃতি এক প্রাণীকে অপর প্রাণীর শরীর ধারণ করিতে বাধ্য করে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে এই জাত্যন্তরপরিণামের যে হেতু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার দ্বারা বোধ হয়, ইঁহারা ইউরোপীয়গণ হইতে অধিক বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, ইঁহারা আরও ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই প্রকৃতির আপূরণের অর্থ কি? আমরা স্বীকার করিয়া থাকি যে, জীবাণু ক্রমশঃ উন্নত হইতে হইতে বুদ্ধরূপে পরিণত হয়। আমরা ইহা স্বীকার করিলেও কিন্তু আমাদের দৃঢ় ধারণা যে, কোন যন্ত্রে কোন না কোন আকারে যদি উপযুক্ত পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ না করা যায়, তবে উহা হইতে তদনুরূপ কার্য্য পাওয়া

যাইবে না। যে আকারই ধারণ করুক না, শক্তিসমষ্টি চিরকালই সমান। একপ্রান্তে যদি শক্তির বিকাশ দেখিতে চাও, তবে অপর প্রান্তে উহা প্রয়োগ করিতে হইবে—হইতে পারে উহা অন্য আকারে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু পরিমাণ এক হওয়া চাইই চাই। অতএব বুদ্ধ যদি পরিমাণের এক প্রান্ত হয়, তবে অপর প্রান্তস্থ জীবাণুও অবশ্য বুদ্ধতুল্য হইবে। যদি বুদ্ধ ক্রমবিকশিত (পরিণত) জীবাণু হয়, তবে ঐ জীবাণুও নিশ্চিত ক্রমসঙ্কুচিত (অব্যক্ত) বুদ্ধ। যদি এই ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত শক্তির বিকাশস্বরূপ হয়, তবে প্রলয়কালেও সেই অনন্তশক্তির অন্য আকারে বিদ্যমানতা স্বীকার করিতে হইবে। অতএব ইহা নিশ্চিত যে, প্রত্যেক আত্মাই অনন্ত। আমাদের পদতলবিহারী ক্ষুদ্রতম কীট হইতে মহত্তম ও উচ্চতম সাধু পর্য্যন্ত সকলেরই ভিতর অনন্ত শক্তি, অনন্ত পবিত্রতা ও সমুদয় গুণই অনন্ত পরিমাণে রহিয়াছে। প্রভেদ কেবল প্রকাশের তারতম্যে। কীটে সেই মহাশক্তির অতি অল্প পরিমাণ বিকাশ হইয়াছে, তোমাতে তদপেক্ষা অধিক, আবার অপর একজন দেবতুল্য মানবে তদপেক্ষা অধিকতর শক্তির বিকাশ হইয়াছে—এই মাত্র প্রভেদ। কিন্তু সকলেতেই সেই এক শক্তি রহিয়াছে।

পতঞ্জলি বলিতেছেন,—

'ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ'—৪।৩।

কৃষক যেরূপে তাহার ক্ষেত্রে জলসেচন করে। কৃষক তাহার ক্ষেত্রে জল আনিবার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট জলাশয় হইতে একটি প্রণালী কাটিয়াছে—ঐ প্রণালীর মুখে একটি দরজা আছে—পাছে

সমুদয় জল গিয়া ক্ষেত্রকে প্লাবিত করিয়া দেয়, এই জন্য ঐ দরজা বন্ধ রাখা হয়। যখন জলের প্রয়োজন হয়, তখন ঐ দরজাটি খুলিয়া দিলেই জল নিজশক্তিবলেই উহার ভিতরে প্রবেশ করে। জলপ্রবেশের শক্তি বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই, জলাশয়ের জলে পূর্ব্ব হইতেই ঐ শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। এইরূপ আমাদের প্রত্যেকের পশ্চাতে অনন্ত শক্তি, অনন্ত পবিত্রতা, অনন্ত সত্তা, অনন্ত বীর্য্য অনন্ত আনন্দের ভাণ্ডার রহিয়াছে, কেবল এই দ্বার—দেহরূপ এই দ্বার—আমরা প্রকৃত পক্ষে যাহা, তাহার পূর্ণ বিকাশ হইতে দিতেছে না। আর যতই এই দেহের গঠন উন্নত হইতে থাকে, যতই তমোগুণ রজোগুণে এবং রজোগুণ সত্ত্বগুণে পরিণত হয়, ততই এই শক্তি ও শুদ্ধত্ব প্রকাশিত হইতে থাকে, আর এই কারণেই আমরা পানাহার সম্বন্ধে এত সাবধান।

হইতে পারে, আমরা মূল তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়াছি,—যেমন আমাদের বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে—যদিও এবিষয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক, তথাপি আমরা উহা দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিতে পারি। যদি উপযুক্ত অবসর পাই, তবে আমি এই সকল বিষয় বিশেষরূপে আলোচনা করিব। তবে ইহা বলিয়া রাখি যে, বাল্যবিবাহ প্রথা যে সকল মূলভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সকল ভাব অবলম্বনেই প্রকৃত সভ্যতার সঞ্চার হইতে পারে, অন্য কিছুতেই নহে। যদি প্রত্যেক নরনারীকেই অপর যে কোন নরনারীকে পতি বা পত্নীরূপে গ্রহণের স্বাধীনতা দেওয়া যায়, যদি ব্যক্তিগত সুখ, পাশব প্রকৃতির

বাল্যবিবাহের মূলতত্ত্ব

পরিতৃপ্তি সমাজে অবাধে সঞ্চরণ করিতে পায়, তাহার ফল নিশ্চয়ই অশুভ হইবে—দুষ্ট প্রকৃতি, আসুরস্বভাব সন্তান সমূহের উৎপত্তি হইবে। একদিকে প্রত্যেক দেশে মানুষ এই সকল পশুপ্রকৃতি সন্তান উৎপাদন করিতেছে, অপর দিকে ইহাদিগকে দমন রাখিবার জন্য পুলিশ বাড়াইতেছে। এরূপে সামাজিক ব্যাধির প্রতীকার চেষ্টায় বিশেষ ফল নাই, বরং কিরূপে সমাজ হইতে এই সকল দোষ এই সকল পশুপ্রকৃতি সন্তানের উৎপত্তি—নিবারিত হইতে পারে, ইহাই মহাসমস্যা। আর যতদিন তুমি সমাজে বাস করিতেছ, ততদিন তোমার বিবাহের ফল নিশ্চয়ই আমাকে এবং আর সকলকেই ভোগ করিতে হয়, সুতরাং তোমার কিরূপ বিবাহ করা উচিত, কিরূপ উচিত নয়, এ বিষয় তোমাকে আদেশ করিতে সমাজের অধিকার আছে। ভারতীয় বাল্যবিবাহ-প্রথার পশ্চাতে এই সকল উচ্চতর ভাব ও তত্ত্ব রহিয়াছে—কোষ্ঠীতে বরকন্যার যেরূপ জাতি, গণ প্রভৃতি লিখিত থাকে, এখনও তদনু-সারেই হিন্দুসমাজে বিবাহ হয়। আর প্রসঙ্গক্রমে আমি ইহাও বলিতে চাই যে, মনুর মতে কামোদ্ভব পুত্র আর্য্য নহে। যে সন্তানের জন্মমৃত্যু বেদের বিধানানুযায়ী, সে-ই প্রকৃতপক্ষে আর্য্য। আজকাল সকল দেশে এইরূপ আর্য্যসন্তান খুব অল্পই জন্মিতেছে এবং তাহার ফলেই কলিযুগ নামক দোষরাশির উৎপত্তি হইয়াছে। আমরা প্রাচীন মহান্ আদর্শসমূহ ভুলিয়া গিয়াছি সত্য বটে যে, আমরা এক্ষণে এই সকল ভাব সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করিতে পারি না; ইহাও সম্পূর্ণ সত্য যে, আমরা এই সকল মহান্ ভাবের কতকগুলিকে লইয়া একটা বিকৃত কিম্ভূতকিমাকার

ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছি। ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে, আজকাল আর প্রাচীন কালের গত পিতামাতা নাই, সমাজও এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় শিক্ষিত নহে, আর প্রাচীন সমাজের যেমন সমাজভুক্ত সকল লোকের উপর একটা ভালবাসা ছিল, এখনকার সমাজের তাহা নাই। কিন্তু তাহা হইলেও কার্য্যে যেরূপই দাঁড়াইয়া থাকুক, মূল তত্ত্বটি নির্দ্দোষ, আর যদি ঐ তত্ত্ব ঠিক কার্য্যে পরিণত না করা হইয়া থাকে, যদি প্রণালীবিশেষ বিফল হইয়া থাকে, তবে মূল তত্ত্বটি লইয়া যাহাতে উহা উত্তমরূপে কার্য্যে পরিণত হয়, তাহার চেষ্টা কর। মূল তত্ত্বটিকে নষ্ট করিয়া ফেলিবার চেষ্টা কর কেন? খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। ঐ তত্ত্বও যেভাবে কার্য্যে পরিণত হইতেছে, তাহা খুব খারাপ বটে, কিন্তু তাহাতে ঐ তত্ত্বের কোন দোষ নাই। উহা সনাতন, চিরকালই উহা থাকিবে। যাহাতে ভাল করিয়া কার্য্যে পরিণত হয়, তাহার চেষ্টা কর।

ভারতে আমাদের সকল সম্প্রদায়কে আত্মাসম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত মহান্ তত্ত্ব বিশ্বাস করিতে হয়, কেবল দ্বৈতবাদীরা বলেন, (আমরা পরে ইহা বিশেষভাবে দেখিব) অসৎ কর্ম্মের দ্বারা উহা সঙ্কোচপ্রাপ্ত হয়, উহার সমুদয় শক্তি ও স্বভাব সঙ্কুচিত হইয়া যায়, আবার সৎকর্ম্মের দ্বারা সেই স্বভাবের বিকাশ হয়। আর অদ্বৈতবাদী বলেন, আত্মার কখনই সঙ্কোচ বা বিকাশ কিছুই হয় না, ঐগুলি আপাততঃ প্রতীত হয় মাত্র। দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীর এইমাত্র প্রভেদ। তবে সকলেই একথা স্বীকার করিয়া থাকেন যে, আমাদের আত্মাতে পূর্ব্ব হইতেই সকল শক্তি

অবস্থিত, বাহির হইতে কোন কিছু যে আত্মাতে আসিবে, তাহা নহে, কোন জিনিস যে উহাতে আকাশ হইতে পড়িবে তাহা নহে। এইটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিও যে, তোমাদের বেদ inspired (বাহির হইতে ভিতরে আসিতেছে) নহে, উহা expired (ভিতর হইতে বাহিরে আসিতেছে)—উহারা প্রত্যেক আত্মায় অবস্থিত—সনাতন নিয়মাবলী। পিপীলিকা হইতে দেবতা পর্য্যন্ত সকলেরই আত্মায় বেদ অবস্থিত। পিপীলিকাকে কেবল বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া ঋষিদেহ লাভ করিতে হইবে; তখনই তাহার ভিতর বেদ অর্থাৎ সনাতন নিয়মাবলী প্রকাশিত হইবে। এই মহান্ তত্ত্বটি বুঝা বিশেষ প্রয়োজন যে, আমাদের ভিতরে পূর্ব্ব হইতেই শক্তি অবস্থিত, মুক্তি পূর্ব্ব হইতেই আমাদের ভিতরে অবস্থিত। হয় বল যে, উহা সঙ্কোচপ্রাপ্ত হইয়াছে, অথবা বল যে, উহা মায়ার আবরণে আবৃত হইয়াছে—ইহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্ব হইতেই উহা ভিতরে অবস্থিত। তোমাদিগকে ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে; প্রত্যেকের ভিতরে অনন্ত শক্তি যে গূঢ়ভাবে অবস্থিত, তাহা বিশ্বাস করিতে হইবে—বিশ্বাস করিতে হইবে যে, বুদ্ধের ভিতর যে শক্তি রহিয়াছে, অতি ক্ষুদ্রতম মানবেও তাহা রহিয়াছে। ইহাই হিন্দুদের আত্মতত্ত্ব।

আত্মার স্বতঃসিদ্ধ পূর্ণতায় দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদী একমত

কিন্তু এইখানেই বৌদ্ধদের সহিত মহা বিরোধ আরম্ভ। তাঁহারা দেহকে বিশ্লেষণ করিয়া বলেন, দেহ একটি জড়স্রোতমাত্র, সেইরূপ মনকে বিশ্লেষণ করিয়া উহাকেও এতদ্রূপ একটি জড়প্রবাহ

বলিয়া বর্ণনা করেন। আত্মার সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন, উহার অস্তিত্ব স্বীকার অনাবশ্যক। উহার অস্তিত্ব অনুমান করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। একটি দ্রব্য এবং ঐ দ্রব্য সংলগ্ন গুণরাশি কল্পনার প্রয়োজন কি? আমরা শুদ্ধ গুণই স্বীকার করিয়া থাকি। যেখানে একটি কারণ স্বীকার করিলেই সমুদয়ের ব্যাখ্যা হয়, সেখানে দুইটি কারণ স্বীকার করা ন্যায়বিরুদ্ধ। এইরূপে বৌদ্ধদের সঙ্গে বিরোধ আরম্ভ হইল, আর যে সকল মত দ্রব্যবিশেষের অস্তিত্ব স্বীকার করিত, বৌদ্ধেরা সে সকল মতই খণ্ডন করিয়া ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিল। যাহারা দ্রব্য ও গুণ উভয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করে, যাহারা বলে—তোমার একটি আত্মা, আমার একটি আত্মা, প্রত্যেকেরই শরীর ও মন হইতে পৃথক্ একটি একটি আত্মা আছে, প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে—তাহাদের মতে বরাবরই একটু গলদ ছিল। অবশ্য এই পর্য্যন্ত দ্বৈতবাদের মত ঠিক—ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি এই শরীর রহিয়াছে, এই সূক্ষ্ম মন রহিয়াছে, আত্মা রহিয়াছেন আর সকল আত্মার ভিতর সেই পরমাত্মা রহিয়াছেন। এখানে মুশকিল এইটুকু যে, এই আত্মা ও পরমাত্মা উভয়কেই বস্তু বলিয়া আর উহাদের উপর দেহ মন প্রভৃতি গুণরূপে লাগিয়া রহিয়াছে বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে। এখন কথা এই,—কেহই কখন বস্তু দেখে নাই, উহার সম্বন্ধে চিন্তা করিতেও পারে না। অতএব তাঁহারা বলেন, এই বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকারে প্রয়োজন কি? কেন, ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী হইয়া বল না যে, মানসিক তরঙ্গরাজি

আত্মা ও ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর সম্বন্ধে বৌদ্ধের আপত্তি

ব্যতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই? উহারা কেহই পরস্পরের সহিত সংলগ্ন নহে, উহারা মিলিয়া একটি বস্তু হয় নাই, সমুদ্রের তরঙ্গরাজির ন্যায় একটি আর একটির পশ্চাতে চলিয়াছে, উহা কখনই সম্পূর্ণ নহে, কখনই উহারা একটি অখণ্ড একত্ব গঠন করে না। মানব কেবল এইরূপ তরঙ্গ পরম্পরামাত্র—একটি চলিয়া যায়, আর একটির জন্ম দিয়া যায়, এইরূপ চলিতে থাকে আর এই সকল তরঙ্গের নিবৃত্তিকেই নির্ব্বাণ বলে।

তোমরা দেখিতেছ, দ্বৈতবাদ ইহার সমক্ষে নীরব, দ্বৈতবাদের পক্ষে ইহার বিরুদ্ধে আর কোন প্রকার যুক্তিতর্ক প্রয়োগ অসম্ভব, দ্বৈতবাদীর ঈশ্বরও এখানে টিকিতে পারে না। সর্ব্বব্যাপী অথচ ব্যক্তিবিশেষ, হস্ত বিনা যিনি জগৎ সৃষ্টি করেন, চরণ বিনা যিনি গমন করেন ইত্যাদি, কুম্ভকার যেমন ঘট প্রস্তুত করে, যিনি সেইরূপে বিশ্ব সৃষ্টি করেন,—বৌদ্ধেরা বলেন, যদি ঈশ্বর এইরূপ হন, তবে তিনি সেই ঈশ্বরের সহিত বিরোধ করিতে প্রস্তুত, তিনি তাঁহাকে উপাসনা করিতে ইচ্ছুক নহেন। এই জগৎ দুঃখপূর্ণ; যদি ইহা ঈশ্বরের কার্য্য হয়, তবে বৌদ্ধ বলেন, আমরা এইরূপ ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিব। আর দ্বিতীয়তঃ, এইরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অযৌক্তিক ও অসম্ভব। তোমরা সকলেই ইহা অনায়াসে বুঝিতে পার। যাঁহারা জগতের রচনাকৌশল দেখিয়া উহার একজন পরমকৌশলী নির্ম্মাতার অস্তিত্ব অনুমান করেন, আমাদের আর তাঁহাদের যুক্তিসমূহের দোষ আলোচনায় প্রয়োজন নাই—ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদীরাই তাঁহাদের সমুদয় যুক্তিজাল একেবারে খণ্ডন করিয়াছিলেন। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর আর টিকিতে পারিল

না। তোমরা বলিয়া থাক, সত্য, কেবলমাত্র সত্যই তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য। "সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।" মুণ্ডক ৩।১।৬ সত্যেরই জয় হইয়া থাকে, মিথ্যা কখন জয়লাভ করে না, সত্যের দ্বারাই দেবযানমার্গ লাভ হয়। সকলেই সত্যের পতাকা উড়াইয়া থাকে বটে, কিন্তু উহা কেবল দুর্ব্বল ব্যক্তিকে পদদলিত করিবার জন্য। তোমাদের ঈশ্বরসম্বন্ধীয় দ্বৈতবাদাত্মক ধারণা লইয়া প্রতিমাপূজক গরীব বেচারার সহিত বিবাদ করিতে যাইতেছ, ভাবিতেছ, তোমরা ভারি যুক্তিবাদী, তাহাকে অনায়াসে পরাস্ত করিয়া দিতে পার, আর সে যদি ঘুরিয়া তোমার ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরকে একেবারে উড়াইয়া দিয়া উহাকে কাল্পনিক বলে তখন তুমি যাও কোথায় ? তুমি তখন বিশ্বাসের দোহাই দিতে থাক, অথবা তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে নাস্তিক নামে অভিহিত করিয়া চীৎকার করিতে থাক—এ-ত দুর্ব্বল লোকে চিরকালই করিয়া থাকে—যে আমাকে পরাস্ত করিবে সেই নাস্তিক ! যদি যুক্তিবাদী হইতে চাও, তবে আগাগোড়া যুক্তিবাদী হও, আর যদি না পার, তবে তুমি নিজের জন্য যেটুকু স্বাধীনতা চাও অপরকেও তাহা দাও না কেন ? তুমি এইরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব কিরূপে প্রমাণ করিবে ? অপর দিকে, উহা একরূপ অপ্রমাণ করা যাইতে পারে। তাঁহার অস্তিত্ব বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, বরং নাস্তিত্ব বিষয়ে কতকগুলি প্রমাণ আছে। তোমার ঈশ্বর, তাঁহার গুণ, দ্রব্যস্বরূপ অসংখ্য জীবাত্মা, আবার প্রত্যেক জীবাত্মাই ব্যক্তি, এই সকল লইয়া তুমি তাঁহার অস্তিত্ব কিরূপে প্রমাণ করিতে পার ? তুমি ব্যক্তি কিসে ? দেহহিসাবে তুমি ব্যক্তি নহ, কারণ, তোমরা আজ প্রাচীন বৌদ্ধগণ অপেক্ষাও

ভালরূপ জান যে, এক সময় হয়ত যে জড়রাশি সূর্য্যে অবস্থিত ছিল, আজ তাহা তোমাতে আসিয়া থাকিতে পারে আর হয়ত এখনই বাহির হইয়া গিয়া বৃক্ষলতাদিতে অবস্থিত হইতে পারে। তবে তোমার ব্যক্তিত্ব কোথায় হে রামচন্দ্র? মনের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। তবে তোমার ব্যক্তিত্ব কোথায়? এই রাত্রে তোমার একরূপ ভাব, আবার কাল আর এক ভাব! যখন শিশু ছিলে, তখন যেরূপ চিন্তা করিতে, এখন আর সেরূপ চিন্তা কর না; বৃদ্ধ লোকে যেরূপ চিন্তা করে, যুবা অবস্থায় সে সেরূপ চিন্তা করে না। তবে তোমার ব্যক্তিত্ব কোথায়? জ্ঞানেই তোমার ব্যক্তিত্ব একথা বলিও না,—জ্ঞান অহংতত্ত্বমাত্র, আর উহা তোমার প্রকৃত অস্তিত্বের অতি সামান্য অংশব্যাপী মাত্র। আমি যখন তোমার সহিত কথা কই, তখন আমার সকল ইন্দ্রিয় কার্য্য করিয়া থাকে কিন্তু আমি উহার সম্বন্ধে জানিতে পারি না। যদি জ্ঞানই বস্তুর সত্তার প্রমাণ হয়, তবে বলিতে হইবে, উহার অস্তিত্ব নাই, কারণ, আমি ত উহাদের অস্তিত্ব জানিতে পারি নাই। তবে আর তুমি তোমার ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর লইয়া কোথায় দাঁড়াও? এরূপ ঈশ্বর তুমি কিরূপে প্রমাণ করিতে পার?

আরও, বৌদ্ধেরা উঠিয়া বলিলেন—ইহা যে শুধু অযৌক্তিক তাহা নহে, এরূপ বিশ্বাস নীতিবিরুদ্ধও বটে, কারণ উহা মানুষকে কাপুরুষ হইতে ও বাহির হইতে সাহায্য প্রার্থনা করিতে শিখায়—কেহই কিন্তু তোমাকে এরূপ সাহায্য করিতে পারে না। এই ব্রহ্মাণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে, মানুষই ইহা এরূপ করিয়াছে। তবে কেন বাহিরের একজন কাল্পনিক ব্যক্তিবিশেষে বিশ্বাস কর,

যাঁহাকে কেহ কখন দেখে নাই বা অনুভব করে নাই—অথবা যাঁহার নিকট হইতে কেহ কখন সাহায্য পায় নাই ? তবে কেন নিজেদের কাপুরুষ করিয়া ফেলিতেছ, আর তোমাদের সন্তানসন্ততিকে শিখাইতেছ যে, মানুষের সর্ব্বোচ্চ অবস্থা কুক্কুরতুল্য হওয়া, এই কাল্পনিক পুরুষের সমক্ষে আমি দুর্ব্বল, অপবিত্র ও জগতের মধ্যে অতি হেয় অপদার্থ বলিয়া হাঁটু গাড়িয়া থাকা ? অপর দিকে, বৌদ্ধগণ তোমায় বলিবেন, তুমি নিজেকে এইরূপ বলিয়া কেবল যে মিথ্যাবাদী হইতেছ, তাহা নহে, কিন্তু তুমি তোমার সন্তানসন্ততিরও ঘোর অনিষ্টের কারণ হইতেছ। কারণ, এইটি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিও যে, লোকে যেমন যেমন ভাবিয়া থাকে, তেমন তেমন হইয়া থাকে। নিজের সম্বন্ধে তোমরা যেরূপ যেরূপ বলিবে, ক্রমশঃ তোমাদের সেই বিশ্বাস দাঁড়াইবে। ভগবান্ বুদ্ধের প্রথম কথাই এই,—'তুমি আপনার সম্বন্ধে যাহা ভাবিয়াছ, তুমি তাহাই হইয়াছ ; পরে যাহা ভাবিবে, আবার তাহাই হইবে।' যদি ইহাই সত্য হয়, তবে তুমি কখন ভাবিও না যে, তুমি কিছুই নহ; আর যতক্ষণ না তুমি অপর একজনের—যিনি এখানে থাকেন না, মেঘপটলের উপর বাস করেন,—সাহায্য পাইতেছ, ততক্ষণ তুমি কিছু করিতে পার না, ইহাও ভাবিও না। ঐরূপ ভাবিলে তাহার ফল এই হইবে যে, তুমি দিন দিন অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া যাইবে। আমরা অতি অপবিত্র ; হে প্রভো আমাদিগকে পবিত্র কর—এইরূপ বলিতে বলিতে নিজেকে এরূপ দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবে যে, তাহা হইতে সকল প্রকার পাপ ক্রমশঃ আসিয়া যাইবে। বৌদ্ধেরা বলেন, প্রত্যেক সমাজে যে সকল

পাপ দেখিতে পাও, তাহার শতকরা নব্বই ভাগ এই ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের ধারণা, তাঁহার সম্মুখে কুক্কুরবৎ হইয়া থাকা,—এই ভয়ানক ধারণা যে এই আশ্চর্য্য মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য এইরূপ কুক্কুরবৎ হওয়া হইতেই হইয়াছে। বৌদ্ধ বৈষ্ণবকে বলেন, যদি তোমার আদর্শ, জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এই হয় যে, ভগবানের বাসস্থান বৈকুণ্ঠ নামক স্থানে গিয়া তথায় অনন্তকাল ধরিয়া তাঁহার সম্মুখে করজোড়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে, তবে তাহা অপেক্ষা বরং আত্মহত্যা শ্রেয়ঃ। বৌদ্ধ বলিতে পারেন, তিনি এইটি এড়াইবার জন্যই নির্ব্বাণ বা বিনাশের চেষ্টা করিতেছেন।

আমি তোমাদের নিকট ঠিক বৌদ্ধের ন্যায় হইয়া এই কথাগুলি বলিতেছি; কারণ আজকাল লোকে বলিয়া থাকে যে, অদ্বৈতবাদের দ্বারা লোকে দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া থাকে। সেইজন্য অপর পক্ষেরও কি বলিবার আছে, সেইটিই তোমাদের নিকট বলিবার চেষ্টা করিতেছি। আমাদিগকে দুই পক্ষই নির্ভীকভাবে দেখিতে হইবে। প্রথমতঃ আমরা দেখিয়াছি, একজন ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে না। আজকাল কি বালকেও এ কথা বিশ্বাস করিবে? যেহেতু কুম্ভকার ঘটনির্ম্মাণ করিতে পারে, অতএব ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তবে কুম্ভকারও ত একজন ঈশ্বর! আর যদি কেহ তোমায় বলে, তিনি মস্তক ও হস্তশূন্য হইয়াও কার্য্য করেন, তবে তাহাকে পাগলা গারদে দিতে পার। তোমার ঈশ্বর, এই জগৎ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর, যাঁহার নিকট তুমি সারাজীবন ধরিয়া চীৎকার করিতেছ, তিনি কি কখন তোমায়

সাহায্য করিয়াছেন, আর যদি করিয়া থাকেন, তবে তুমি তাঁহার নিকট হইতে কিরূপ সাহায্য পাইয়াছ? আধুনিক বিজ্ঞান তোমাদিগকে এই আর একটি প্রশ্ন করিয়া ইহার উত্তর প্রদানের জন্য আহ্বান করেন। তাঁহারা প্রমাণ করিয়া দিবেন যে, এরূপ সাহায্য যাহা কিছু তুমি পাইয়াছ, তাহা তুমি নিজ চেষ্টাতেই পাইতে পারিতে। পক্ষান্তরে তোমার এরূপ বৃথা ক্রন্দনে শক্তিক্ষয়ের কোন প্রয়োজন ছিল না, এরূপ ক্রন্দনাদি না করিয়াও তুমি অনায়াসে ঐ উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিতে। আরও, আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, এইরূপ ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের ধারণা হইতেই পৌরোহিত্য ও অন্যান্য অত্যাচার আসিয়া থাকে। যেখানেই এই ধারণা ছিল, সেইখানেই অত্যাচার ও পৌরোহিত্য রাজত্ব করিয়াছে, আর যতদিন না এই মিথ্যাভাবকে সমূলে নির্ম্মূল করা হয়, ততদিন, বৌদ্ধগণ বলেন, এই অত্যাচারের কখন নিবৃত্তি হইবে না। যতদিন মানুষের এই ধারণা থাকে যে, অপর কোন প্রবল পুরুষের নিকট তাহাকে নত হইয়া থাকিতে হইবে, ততদিনই পুরোহিতের অস্তিত্ব থাকিবে। তাঁহারা কতকগুলি দাবি দাওয়া করিবেন, মানুষ যাহাতে তাঁহাদের নিকট মাথা নোয়ায় তাহার চেষ্টা করিবেন, আর গরীব বেচারা মানুষগুলিও তাহাদের কথা ঈশ্বরকে জানাইবার জন্য একজন পুরোহিত চাহিতে থাকিবে। তোমরা ব্রাহ্মণজাতিকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া ফেলিতে পার, কিন্তু এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিও যে, যাহারা তাহাদিগকে নির্ম্মূল করিবে, তাহারাই আবার তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া লইবে, আর তাহারা আবার ব্রাহ্মণদের অপেক্ষা অধিকতর অত্যাচারী

হইয়া দাঁড়াইবে। কারণ, পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণগণের বরং কতকটা সহৃদয়তা ও উদারতা আছে ; কিন্তু এই ভুঁইফোড়েরা চিরকালই অতি ভয়ানক অত্যাচারী হইয়া থাকে। ভিখারী যদি কিছু টাকা পায়, তবে সে সমগ্র জগৎকে খড়কুটা জ্ঞান করিয়া থাকে। অতএব যতদিন এই ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের ধারণা থাকিবে, ততদিন এই সকল পুরোহিতও থাকিবে, আর সমাজে কোন প্রকার উচ্চনীতির অভ্যুদয়ের আশা করাই যাইতে পারিবে না। পৌরোহিত্য ও অত্যাচার চিরকালই এক সঙ্গে থাকিবে। আর, কেন লোক এই ঈশ্বর কল্পনা করিল? কারণ, প্রাচীনকালে কতকগুলি বলবান্ লোক সাধারণ লোককে বশ করিয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিল যে, তোমাদিগকে আমার হুকুম মানিয়া চলিতে হইবে, নতুবা তোমাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিব। এইরূপ লোকই এইরূপ ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের কল্পনা করিয়াছিল—ইহার অন্য কোন কারণ নাই—'সভয়ং বজ্রমুদ্যতম্।'

একজন বজ্রোদ্যতহস্ত পুরুষ রহিয়াছেন, যে তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, তাহাকেই তিনি বিনাশ করিয়া ফেলিতেছেন। এখন বৌদ্ধ বলিতেছেন, তুমি যুক্তিবাদী হইয়া বলিতেছ, সবই কর্ম্মফলে হইয়াছে। তোমরা সকলেই অসংখ্য জীবাত্মায় বিশ্বাসী, আর তোমাদের মতে এই জীবাত্মা সকলের জন্ম মৃত্যু নাই। এ পর্য্যন্ত বেশ যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত বলিয়াছ, সন্দেহ নাই। কারণ থাকিলেই কার্য্য থাকিবে ; বর্ত্তমানে যাহা ঘটিতেছে, তাহা অতীত কারণের ফল, আবার ঐ বর্ত্তমান ভবিষ্যতে অন্য ফল প্রসব করিবে। হিন্দু বলিতেছেন, কর্ম্ম জড়, চৈতন্য নহে ; সুতরাং কর্ম্মের ফললাভ

করিতে হইলে কোনরূপ চৈতন্যের প্রয়োজন। বৌদ্ধ তাহাতে বলেন, বৃক্ষ হইতে ফললাভ করিতে গেলে কি চৈতন্যের প্রয়োজন হয়? যদি বীজ পুঁতিয়া গাছে জল দেওয়া যায়, তাহার ফল হইতে ত কোনরূপ চৈতন্যের প্রয়োজন হয় না। তুমি বলিতে পার, আদি চৈতন্যের শক্তিতে এই ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, কিন্তু জীবাত্মাগণই ত চৈতন্য, অন্য চৈতন্য স্বীকারের প্রয়োজন কি? যদি জীবাত্মাদের চৈতন্য থাকে, তবে ঈশ্বরবিশ্বাসের প্রয়োজন কি? অবশ্য বৌদ্ধেরা জীবাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নহে, কিন্তু জৈনেরা জীবাত্মায় বিশ্বাসী, অথচ ঈশ্বর বিশ্বাস করে না। তবে হে দ্বৈতবাদিন্, তোমার যুক্তি কোথায় রহিল, তোমার নীতির ভিত্তি কোথায় রহিল? যখন তোমরা অদ্বৈতবাদে দোষারোপ করিয়া বল যে, অদ্বৈতবাদ হইতে দুর্নীতির সৃষ্টি হইবে, তখন একবার ভারতের দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখ, আদালতে দ্বৈতবাদীদের নীতিপরায়ণতার কিরূপ প্রমাণ পাও, তাহাও আলোচনা করিয়া দেখ। যদি অদ্বৈতবাদী বিশ হাজার বদমায়েস হইয়া থাকে, তবে দ্বৈত বাদীও বিশ হাজার বদমায়েস দেখিতে পাইবে। মোটামুটি বলিতে গেলে বলিতে হয়, দ্বৈতবাদী বদমায়েসের সংখ্যাই অধিক হইবে; কারণ, অদ্বৈতবাদ বুঝিতে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টতর চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন লোকের প্রয়োজন, আর তাহাদিগকে সহজে ভয় দেখাইয়া কোন কাজ করাইবার উপায় নাই। তবে তুমি আর যাও কোথায়? বৌদ্ধদের হাত এড়াইবে কিরূপে? তুমি বেদের বচন উদ্ধৃত করিতে পার, কিন্তু বৌদ্ধেরা ত বেদ মানে না। সে বলিবে, 'আমার

ত্রিপিটক ত একথা বলিতেছে না।' আর ঐ ত্রিপিটক অনাদি অনন্ত—এমন কি উহা বুদ্ধের নিজের কথা নহে ; কারণ, তিনি বলিয়াছেন, তিনি পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত সনাতন সত্যের আবৃত্তি করিতেছেন মাত্র। বৌদ্ধ আরও বলেন, তোমাদের বেদ মিথ্যা, আমাদেরই ঠিক ঠিক বেদ, তোমাদের বেদ ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণের কল্পিত—সেগুলি দূর করিয়া দাও। এখন তুমি যাও কোথায় ?

বৌদ্ধদের যুক্তিজাল কাটিয়া বাহির হইবার উপায় প্রদর্শন করা যাইতেছে। দ্রব্য ও গুণ বিভিন্ন—এইটির উপর নির্ভর করিয়াই বৌদ্ধদের প্রথম আপত্তি—এটি একটি দার্শনিক আপত্তি। অদ্বৈতবাদী বলেন, না, উহারা বিভিন্ন নহে। দ্রব্য ও গুণের মধ্যে কোন বিভিন্নতা নাই। তোমরা সেই প্রাচীন দৃষ্টান্ত 'সর্পরজ্জু ভ্রমের' কথা অবগত আছ ! যখন তুমি সর্প দেখিতেছ, তখন রজ্জু একেবারেই দেখিতে পাও না, রজ্জু তখন একেবারে উড়িয়া গিয়াছে। কোন বস্তুকে দ্রব্য ও গুণ বলিয়া বিভক্ত করা দার্শনিকদের মস্তিষ্ক-প্রসূত দার্শনিক ব্যাপার মাত্র, উহার কোন যথার্থ ভিত্তি নাই, দ্রব্য ও গুণ বলিয়া পৃথক্ পদার্থের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। তুমি যদি একজন প্রাকৃত ব্যক্তি হও, তুমি শুধু গুণরাশিই দেখিবে, আর যদি তুমি একজন মস্ত যোগী হও, তুমি কেবল দ্রব্যই দেখিবে ; কিন্তু এক সময়ে উভয়কে কখনই দেখিতে পাইবে না।

অদ্বৈতবাদের দ্বারা বৌদ্ধমত ও দ্বৈতবাদের সামঞ্জস্য

অতএব, হে বৌদ্ধ, তুমি যে দ্রব্য ও গুণ লইয়া বিবাদ করিতেছ, তাহার বাস্তবিক ভিত্তিই নাই। কিন্তু দ্রব্য যদি গুণরহিত হয়, তবে একটি দ্রব্যমাত্রেরই অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। যদি তুমি আত্মা হইতে

গুণরাশি তুলিয়া লইয়া দেখাইতে পার, গুণরাশির অস্তিত্ব কেবল মনে, উহারা প্রকৃত পক্ষে আত্মায় আরোপিত, তাহা হইলে ত দুইটি আত্মারও অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না ; কারণ, গুণই এক আত্মা হইতে অপর আত্মার বিশিষ্টতা সম্পাদন করিয়া থাকে। এক আত্মা যে অপর আত্মা হইতে ভিন্ন, তাহা তুমি কিরূপে জানিতে পার? —কতকগুলি প্রভেদকারী লিঙ্গ, কতকগুলি গুণের দ্বারা। আর যেখানে গুণের সত্তা নাই, তথায় পার্থক্য কিরূপে থাকিতে পারে? অতএব দ্বিবিধ আত্মা নাই, একমাত্র আত্মাই বিদ্যমান ; আর পরমাত্মা স্বীকার অনাবশ্যক, তোমার এই আত্মাই সেই। সেই এক আত্মাকেই পরমাত্মা বলে, তাঁহাকেই জীবাত্মা এবং অন্যান্য নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। আর হে সাংখ্য ও অন্যান্য দ্বৈতবাদিগণ, তোমরা বলিয়া থাক, আত্মা সর্ব্বব্যাপী বিভু, অথচ তোমরা কিরূপে বহু আত্মা স্বীকার কর? অনন্ত কি কখন দুইটি হইতে পারে? অনন্ত সত্তা একমাত্র হওয়াই সম্ভব। একমাত্র অনন্ত আত্মা রহিয়াছেন, আর সবই তাঁহারই প্রকাশ।

বৌদ্ধ এই উত্তরে নীরব, কিন্তু অদ্বৈতবাদী শুধু বৌদ্ধকে নিরস্ত করিয়াই ক্ষান্ত নহেন। দুর্ব্বল মতবাদসমূহের ন্যায় কেবল অপর মতের সমালোচনা করিয়াই অদ্বৈতবাদী নিরস্ত নহেন। অদ্বৈতবাদী তখনই অপরাপর মতের সমালোচনা করেন, যখন তাহারা তাঁহার খুব কাছে ঘেঁষিয়া আসিয়া তাঁহার মত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হয়।

অদ্বৈতবাদীর নিজ সিদ্ধান্ত

তিনি তাহাদিগকে দূরে সরাইয়া দেন, এই পর্য্যন্তই তাঁহার অপর বাদ খণ্ডন। তারপরই তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন। একমাত্র অদ্বৈতবাদই

শুধু অপর মত খণ্ডন করিয়া এবং তজ্জন্য শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নিরস্ত থাকে না। অদ্বৈতবাদীর যুক্তি এইরূপ। তিনি বলেন, তুমি বলিতেছ, জগৎ একটি অবিরাম গতিপ্রবাহ মাত্র। ভাল, ব্যষ্টিতে সবই গতিশীল বটে। তোমারও গতি আছে; এই টেবিলটি—ইহারও প্রতিনিয়ত গতি (পরিবর্ত্তন) হইতেছে। গতি সর্ব্বত্রই, তাই ইহার নাম সংসার (সৃ ধাতু অর্থ গমন), তাই ইহার নাম জগৎ (গম্ ধাতু ক্বিপ্—জগৎ)—অবিরাম গতি। তাই যদি হইল, তাহা হইলে ত এই জগতে ব্যক্তিত্ব বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না; কারণ, ব্যক্তিত্ব বলিতে অপরিণামী কিছু বুঝায়। পরিণামশীল ব্যক্তিত্ব হইতে পারে না; এই বাক্যটি স্ববিরোধী, সুতরাং আমাদের এই ক্ষুদ্র জগতে ব্যক্তিত্ব বলিয়া কিছুই নাই। চিন্তা, ভাব, মন, শরীর, জীব, জন্তু সকলেরই অহরহঃ পরিণাম হইতেছে। যাহা হউক, এখন সমগ্র জগৎকে একটি সমষ্টিরূপে ধর। সমষ্টিরূপে কি এই জগতের পরিণাম বা গতি হইতে পারে? কখনই নহে। কোন অল্প গতিশীল অথবা সম্পূর্ণ গতিহীন বস্তুর তুলনায়ই গতির ধারণা সম্ভবপর। অতএব সমষ্টিরূপে জগৎ গতিহীন, পরিণামহীন। সুতরাং তখনই—কেবল তখনই তোমার প্রকৃত ব্যক্তিত্ব সম্ভব, যখন তুমি আপনাকে সমগ্র জগতের সহিত অভিন্নভাবে জানিতে পার। এই কারণেই বেদান্তী (অদ্বৈতবাদী) বলেন, যতদিন দ্বৈত, ততদিন ভয় দূর হইবার উপায় নাই, কেবল যখন অপর বলিয়া কিছু না দেখে, অপর বলিয়া কিছু অনুভব না করে, যখন কেবল একমাত্র সত্তা থাকে, তখনই ভয় দূর হয়, তখনই কেবল মানুষ মৃত্যুর পারে,

সংসারের পারে যাইতে পারে। সুতরাং অদ্বৈতবাদ আমাদিগকে শিক্ষা দেন, সমষ্টিজ্ঞানেই মানুষের প্রকৃত ব্যক্তিত্ব, ব্যষ্টিজ্ঞানে নহে। যখন তুমি আপনাকে সমগ্র জগৎস্বরূপ জ্ঞান করিতে পারিবে, তখনই তোমার প্রকৃত অমৃতত্ব লাভ হইবে। তুমি তখনই ভয়শূন্য ও অমৃতস্বরূপ হইবে, যখন তুমি আপনাকে সমগ্র জগৎস্বরূপ জানিবে। আর তখনই তোমার সহিত জগৎ ও ব্রহ্মের অভেদ বোধ হইবে। এক অখণ্ড সত্তাকেই আমাদের ন্যায় মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এই চন্দ্রসূর্য্যতারকাদি-সমন্বিত জগদ্ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া থাকে। যাহারা আর একটু ভালকর্ম্ম করে ও সেই সৎকর্ম্মবলে অন্যবিধ মনোবৃত্তিসম্পন্ন হয়, তাহারা মৃত্যুর পর ইহাকেই ইন্দ্রাদিদেবসমন্বিত স্বর্গাদিলোকরূপে দর্শন করে। যাঁহারা আরও উন্নত, তাঁহারা সেই এক বস্তুকেই ব্রহ্মলোকরূপে দেখেন, আর যাঁহারা সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা পৃথিবী স্বর্গ বা অন্য কোন লোক কিছুই দেখেন না, তাঁহাদের নিকট এই ব্রহ্মাণ্ড অন্তর্হিত হয়, তাহার পরিবর্ত্তে একমাত্র ব্রহ্মই বিরাজমান থাকেন।

আমরা কি এই ব্রহ্মকে জানিতে পারি? আমি তোমাদিগকে পূর্ব্বেই সংহিতায় অনন্তের বর্ণনার কথা বলিয়াছি, এখানে তাহার ঠিক বিপরতী—এখানে অন্তর্জ্জগতের অনন্তজ্ঞানের চেষ্টা। সংহিতায় বহির্জ্জগতের অনন্ত বর্ণনা; এখানে চিন্তাজগতের, ভাবজগতের অনন্ত বর্ণনা। সংহিতায় অস্তিভাবদ্যোতক ভাষায় অনন্ত বর্ণনার চেষ্টা হইয়াছিল; এখানে সে ভাষায় কুলাইল না, নাস্তিভাবাত্মক ভাষায় অনন্ত বর্ণনার চেষ্টা হইল। এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে। স্বীকার করিলাম, ইহা ব্রহ্ম। আমরা কি ইহা জানিতে পারি? না,

নঃ। তোমাদিগকে আবার এই বিষয়টি স্পষ্টরূপে বুঝিতে হইবে ঃ পুনঃ পুনঃ তোমাদের মনে এই সন্দেহ আসিবে,—যদি ইহা ব্রহ্ম হয়, তবে আমরা কিরূপে ইহাকে জানিতে পারি ? "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ"—হে মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতাকে কিরূপে জানিবে ? চক্ষু সকল বস্তু দেখিয়া থাকে—চক্ষু কি নিজেকে দেখিতে পারে ? পারে না, কারণ, জ্ঞানক্রিয়াটিই একটি নিম্ন অবস্থা। হে আর্য্যসন্তানগণ, তোমাদিগকে এই বিষয়টি বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে, কারণ, এই তত্ত্বটির ভিতর অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। তোমাদের নিকট যে সকল পাশ্চাত্যদেশীয় প্রলোভন আসিয়া থাকে, তাহাদের ইহাই একমাত্র দার্শনিক ভিত্তি যে, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞান নাই। প্রাচ্যদেশের কিন্তু অন্যভাব। আমাদের বেদ বলিতেছে যে, এই বস্তুজ্ঞান বস্তুটি হইতে নিম্নস্থানীয়, কারণ, জ্ঞান অর্থে সর্ব্বদাই একটা বেড়া দেওয়া বা সীমাবদ্ধ ভাব বুঝিতে হইবে। যখনই তুমি কোন বস্তুকে জানিতে চাও, তখনই উহা তোমার মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। পূর্ব্বকথিত দৃষ্টান্তে যেরূপে শুক্তি হইতে মুক্তা নির্ম্মিত হয় কথিত হইয়াছে, তাহার বিষয় চিন্তা কর, তাহা হইলে বুঝিবে, জ্ঞান অর্থে সীমাবদ্ধ করা কিরূপ। একটি বস্তুকে আহরণ করিয়া তোমার স্বানুভূতিতে আরূঢ় করিলে—তাহার সমগ্র ভাবটি জানিতে পারিলে না। সকল জ্ঞান সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। তাহাই যদি হয়, জ্ঞান অর্থে যদি সীমাবদ্ধ করা হয়, তবে অনন্ত সম্বন্ধে কি তুমি তাহা করিতে পার ? যিনি সকল জ্ঞানের উপাদান, যাঁহাকে ছাড়িয়া তুমি কোনরূপ জ্ঞানলাভ করিতে পার

ব্রহ্মকে জানা যায় কি না ?

না, যাঁহার কোন গুণ নাই, যিনি সমগ্র জগতের এবং আমাদের আত্মার সাক্ষিস্বরূপ, তাঁহার সম্বন্ধে তুমি উহা কিরূপে বলিতে পার? তাঁহাকে তুমি কিরূপে জানিবে? কি উপায়ে তাঁহাকে বাঁধিবে?

যাহা কিছু দেখিতেছ—এই সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চ—অনন্তকে জানিবার এইরূপ চেষ্টা বৃথা মাত্র। যেন এই অনন্ত আত্মা নিজ মুখদর্শনের চেষ্টা করিতেছেন, আর আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকল প্রাণীই যেন তাহার মুখের প্রতিবিম্ব লইবার দর্পণস্বরূপ; এক এক করিয়া এক এক দর্পণে আপনার মুখের প্রতিবিম্ব দর্শন করিবার চেষ্টা করিয়া উহাদিগকে উপযুক্ত না দেখিয়া অবশেষে মনুষ্যদেহে তিনি বুঝিতে পারেন যে, এ সবই সসীম,—অনন্ত কখন সান্তের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। তখনই পশ্চাদ্দিকে যাত্রা আরম্ভ—আর উহাকেই ত্যাগ বা বৈরাগ্য বলে। ইন্দ্রিয় হইতে পিছু হটিয়া এস, ইন্দ্রিয়ের দিকে যাইও না—ইহাই বৈরাগ্যের মূলমন্ত্র। ইহাই সর্ব্বপ্রকার নীতির মূলমন্ত্র, ইহাই সর্ব্বপ্রকার কল্যাণের মূলমন্ত্র, কারণ, তোমাদিগকে অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে, তপস্যায়ই জগতের সৃষ্টি—ত্যাগেই জগতের উৎপত্তি। আর যতই তুমি ক্রমশঃ পশ্চাদ্দিকে ধাবিত হইবে, ততই তোমার সমক্ষে ধীরে ধীরে বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন দেহ প্রকাশিত হইতে থাকিবে, এক এক করিয়া সেগুলি পরিত্যক্ত হইবে, অবশেষে তুমি প্রকৃত যাহা, তাহাই থাকিবে। ইহাই মোক্ষ।

বৈরাগ্যের মূলতত্ত্ব

এই তত্ত্বটি আমাদিগকে বুঝিতে হইবে—'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ', বৃহদা—২।৪।১৪। বিজ্ঞাতাকে কি করিয়া জানিবে?

জ্ঞাতাকে কখন জানিতে পারা যায় না, কারণ, যদি তাঁহাকে জানা যাইত, তাহা হইলে তিনি আর জ্ঞাতা থাকিতেন না। দর্পণে যদি তুমি তোমার চক্ষের প্রতিবিম্ব দেখ, তাহাকে তুমি কখন চক্ষু বলিতে পার না, তাহা অন্য কিছু, তাহা প্রতিবিম্ব মাত্র। এখন কথা এই, যদি এই আত্মা এই অনন্ত সর্ব্বব্যাপী পুরুষ সাক্ষিমাত্র হইলেন, তাহা হইলে আর কি হইল? ইহা ত আমাদের মত চলিতে ফিরিতে জীবন ধারণ করিতে ও জগৎকে সম্ভোগ করিতে পারে না, সাক্ষিস্বরূপ যে কিরূপে আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারে লোকে সে কথা বুঝিতে পারে না। "ওহে হিন্দুগণ, তোমরা সব সাক্ষিস্বরূপ, এই মতবাদের দ্বারাই তোমরা নিষ্ক্রিয়, অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছ," এই কথা লোকে বলিয়া থাকে। তাহাদের কথার উত্তর এই,—যিনি সাক্ষিস্বরূপ, তিনিই প্রকৃতপক্ষে আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারেন। কোন স্থানে যদি একটা কুস্তি হয়, তাহা হইলে ঐ কুস্তির আনন্দ ভোগ বেশী করে কাহারা?—যাহারা কুস্তি করিতেছে তাহারা, না—দর্শকেরা? এই জীবনে যতই তুমি কোন বিষয়ে সাক্ষিস্বরূপ হইতে পারিবে, ততই তুমি উহা হইতে অধিক আনন্দ ভোগ করিবে। ইহাই প্রকৃত আনন্দ; আর এই কারণে তখনই তোমার অনন্ত আনন্দ সম্ভব, যখন তুমি এই জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষিস্বরূপ হও। তখনই তুমি মুক্তপুরুষপদবাচ্য। যে সাক্ষিস্বরূপ, সে-ই নিষ্কামভাবে স্বর্গে যাইবার বাসনা না রাখিয়া, নিন্দা স্তুতিতে সমজ্ঞানী হইয়া কার্য্য করিতে পারে। যে সাক্ষিস্বরূপ সে-ই আনন্দ ভোগ করিতে পারে, অপর কেহ নহে।

সাক্ষিস্বরূপের আনন্দ সম্ভোগ

অদ্বৈতবাদের নৈতিক ভাগ আলোচনা করিতে যাইয়া দার্শনিক ও নৈতিক ভাগের মধ্যে আর একটি বিষয় আসিয়া থাকে—উহা মায়াবাদ। অদ্বৈতবাদের অন্তর্গত এক একটি বিষয় বুঝিতেই বৎসর বৎসর কাটিয়া যায়, বুঝাইতে আবার আরো বিলম্ব লাগে। অতএব আমাকে ইহার সামান্তভাবে উল্লেখমাত্র করিয়াই নিরস্ত হইতে হইবে। এই মায়াবাদ বুঝা চিরকালই একটি কঠিন ব্যাপার। মোটামুটি আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, মায়াবাদ প্রকৃত পক্ষে বাদ বা মতবিশেষ নহে, উহা দেশকালনিমিত্তের নাম—আরও সংক্ষেপে উহাকে নামরূপ বলে। সমুদ্রের তরঙ্গের সমুদ্র হইতে প্রভেদ কেবল নাম ও রূপে, আর তরঙ্গ হইতে এই নামরূপের কোন পৃথক্ সত্তা নাই, নামরূপ তরঙ্গের সহিত বর্ত্তমান। তরঙ্গ অন্তর্হিত হইয়া যাইতে পারে, আর তরঙ্গের অন্তর্গত নামরূপ যদি চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়া যায়, তথাপি সেই একই পরিমাণ জল থাকিয়া যাইবে। অতএব এই মায়াই তোমার ও আমার মধ্যে, জীবজন্তু ও মানবের মধ্যে, দেবতা ও মানবের মধ্যে প্রভেদ করিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে এই মায়াই যেন আত্মাকে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছে, আর এই মায়া নামরূপ ব্যতীত আর কিছু নহে। যদি ঐগুলিকে পরিত্যাগ কর, নামরূপ দূর করিয়া দাও, তবে উহা চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইবে, তখন তুমি প্রকৃত পক্ষে যাহা, তাহাই থাকিবে। ইহাকেই মায়া বলে; আর উহা কোন মতবাদ নহে, উহা জগতের ঘটনাবলীর স্বরূপ বর্ণনামাত্র।

মায়াবাদ

বাস্তববাদিগণ বলেন, এই জগতের অস্তিত্ব রহিয়াছে। সে বেচারা অজ্ঞ, বালকবৎ, সে যে জগৎ সত্য বলে, সে এই অর্থে বলে যে, এই টেবিলটি বা অন্যান্য বস্তুর নিরপেক্ষ সত্তা আছে, উহাদের অস্তিত্ব জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের অপর কোন বস্তুর অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না, আর যদি এই সমগ্র জগৎ বিনষ্ট হইয়া যায়, তথাপি উহা বা অন্যান্য বস্তু যেমন রহিয়াছে, ঠিক তেমনই থাকিবে। একটু সামান্য জ্ঞানলাভ করিলেই সে বুঝিবে, ইহা কখনই হইতে পারে না। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সমুদয় পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভর করে, উহারা পরস্পর আপেক্ষিক। অতএব আমাদের বস্তুজ্ঞানের তিনটি সোপান আছে—প্রথম,—প্রত্যেক বস্তুই স্বতন্ত্র, পরস্পর পরস্পর হইতে পৃথক; দ্বিতীয় সোপান—সকল বস্তুর মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ বিদ্যমান আর শেষ সোপান এই যে, একটি মাত্র বস্তু আছে, তাহাকেই আমরা নানারূপে দেখিতেছি।

বস্তুজ্ঞানের ত্রিবিধ সোপান

অজ্ঞ ব্যক্তির ঈশ্বরের প্রাথমিক ধারণা এই যে তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে কোথাও রহিয়াছেন, অর্থাৎ তখন ঈশ্বরধারণা খুব মানবীয়ভাবাপন্ন, মানুষ যাহা করে, তিনি তাহাই করেন; তবে অপেক্ষাকৃত একটু বেশী রকমে করেন। আর আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, এরূপ ঈশ্বরকে অল্প কথায় কিরূপে অযৌক্তিক ও অপর্য্যাপ্ত প্রমাণ করিয়া দেওয়া যায়। ঈশ্বর সম্বন্ধে দ্বিতীয় ধারণা এই যে, একটি শক্তি রহিয়াছে, সর্ব্বত্র তাঁহার প্রকাশ। ইনিই প্রকৃত

ঈশ্বরধারণার ত্রিবিধ সোপান

সগুণ ঈশ্বর, চণ্ডীতে ইঁহার কথাই লিখিত আছে। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিও যে, এই ঈশ্বর কেবল সমুদয় কল্যাণকর গুণরাশির নিধান নহেন! ঈশ্বর ও শয়তান—দুইটি দেবতা থাকিতে পারে না, একই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে এবং তাঁহাকে ভরসা করিয়া ভালমন্দ উভয়ই বলিতে হইবে আর ঐ যুক্তিসঙ্গত মত স্বীকার করিলে তাহা হইতে যে স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত দাঁড়ায়, তাহাও লইতে হইবে।

'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ৫।৪৭-৯
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥' ৫।৭৪-৬—চণ্ডী।

"যিনি সর্ব্বভূতে শান্তি ও ভ্রান্তিরূপে অবস্থিত, তাঁহাকে নমস্কার করি।"

যাহা হউক, তাঁহাকে শুধু শান্তিস্বরূপ বলিলে চলিবে না, তাঁহাকে সর্ব্বস্বরূপ বলিলে তাহার ফল যাহাই হউক, তাহা লইতে হইবে।

'হে গার্গি, এ জগতে যাহা আনন্দ দেখিতে পাও, সবই তাঁহার অংশ মাত্র।'

তুমি উহার দ্বারা যাহা ইচ্ছা কাজ করিতে পার। আমার সম্মুখবর্ত্তী এই আলোকের দ্বারা তুমি একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে একশত টাকা দিতে পার, আর একজন লোক তোমার নাম জাল করিতে পারে, কিন্তু আলোক উভয়ের পক্ষেই সমান। ইহাই হইল, ঈশ্বর জ্ঞানের দ্বিতীয় সোপান। তৃতীয় সোপান এই যে,

ঈশ্বর প্রকৃতির বাহিরেও নাই, ভিতরেও নাই, কিন্তু ঈশ্বর, প্রকৃতি, আত্মা, জগৎ এইগুলি একপর্য্যায় শব্দ। দুইটি বস্তু প্রকৃতপক্ষে নাই, কতকগুলি দার্শনিক শব্দই তোমাকে প্রতারিত করিয়াছে। তুমি কল্পনা করিতেছ, তুমি শরীর আবার আত্মা, আর তুমি এক সঙ্গেই এই শরীর ও আত্মা হইয়া রহিয়াছ। তাহা কিরূপে হইতে পারে? নিজের মনের ভিতর পরীক্ষা করিয়া দেখ। যদি তোমাদের মধ্যে কেহ যোগী থাকেন, তিনি আপনাকে চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞান করিবেন, তাঁহার পক্ষে শরীর একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। যদি তুমি সাধারণ লোক হও, তবে তুমি আপনাকে দেহস্বরূপ বিবেচনা করিবে, তখন চৈতন্যের জ্ঞান একেবারে অন্তর্হিত হইবে। কিন্তু মানুষের দেহ আছে, আত্মা আছে, আরও অন্যান্য জিনিস আছে, এই সকল দার্শনিক ধারণা থাকাতে তাহার মনে হয় এগুলি এক সময়েই রহিয়াছে। এক সময় একটির অধিক বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না। যখন তুমি জড়বস্তু দেখিতেছ, তখন ঈশ্বরের কথা কহিও না। তুমি কেবল কার্য্যই দেখিতেছ, কারণকে তুমি দেখিতে পাইতেছ না। আর যে মুহূর্ত্তে তুমি কারণকে দেখিবে, সে মুহূর্ত্তে কার্য্য অন্তর্হিত হইবে। এ জগৎ কোথায় গেল? কে ইহাকে গ্রাস করিল?

"কিমপি সততবোধং কেবলানন্দরূপং
নিরুপমমতিবেলং নিত্যমুক্তং নিরীহম্।
নিরবধিগগনাভং নিষ্কলং নির্ব্বিকল্পং
হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্মপূর্ণং সমাধৌ॥ ৪০৮

প্রকৃতিবিকৃতিশূন্যং ভাবনাতীতভাবং
সমরসমসমানং মানসং বন্ধদূরম্।
নিগমবচনসিদ্ধং নিত্যমস্মৎপ্রসিদ্ধং
হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্মপূর্ণং সমাধৌ॥ ৪০৯
অজরমমরমস্তাভাববস্তুস্বরূপং
স্তিমিতসলিলরাশিপ্রখ্যমাখ্যাবিহীনম্।
শমিতগুণবিকারং শাশ্বতং শান্তমেকং
হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্ম পূর্ণং সমাধৌ॥" ৪১১

—বিবেকচূড়ামণি।

"জ্ঞানী ব্যক্তি সমাধি অবস্থায় অনির্ব্বচনীয়, কেবল আনন্দস্বরূপ, উপমারহিত, অপার, নিত্যমুক্ত, নিষ্ক্রিয়, অসীম আকাশতুল্য, অংশহীন ও ভেদশূন্য পূর্ণব্রহ্মকে হৃদয়ে অনুভব করেন।

"জ্ঞানী ব্যক্তি সমাধি অবস্থায়—প্রকৃতির বিকারহীন অচিন্ত্যতত্ত্বস্বরূপ, সমভাবাপন্ন অথচ যাঁহার সমান কেহ নাই, যাঁহাতে কোনরূপ পরিমাণের সম্বন্ধ নাই (যিনি অপরিমেয়), যিনি বেদবাক্যের দ্বারা সিদ্ধ এবং সর্ব্বদা আমাদের (ব্রহ্মতত্ত্ব অভ্যাসশীলগণের) নিকট প্রসিদ্ধ এইরূপ পূর্ণব্রহ্মকে হৃদয়ে অনুভব করেন।

"জ্ঞানী ব্যক্তি সমাধি অবস্থায় জরামৃত্যুশূন্য, যিনি বস্তুস্বরূপ এবং যাঁহাতে অভাব কিছুই নাই, স্থিরজলরাশি-সদৃশ নামরহিত, সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিবিধ গুণবিকাররহিত, ক্ষয়শূন্য, শান্ত, এক পূর্ণ ব্রহ্মকে হৃদয়ে অনুভব করেন।"

মানবের এই অবস্থাও আসিয়া থাকে, তখন তাহার পক্ষে জগৎ অন্তর্হিত হইয়া যায়।

আমরা ইহা দেখিয়াছি যে, এই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়, অবশ্য অজ্ঞেয়বাদীর অর্থে উহা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় নহে— তাঁহাকে জানিয়াছি বলিলেই তাঁহাকে ছোট করা হইল, কারণ পূর্ব্ব হইতেই তুমি সেই ব্রহ্ম। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, এই ব্রহ্ম এক হিসাবে এই টেবিল নহে, আবার অন্য হিসাবে উহা ঐ টেবিলও বটে। নামরূপ তুলিয়া লও, তাহা হইলেই যে সত্যবস্তু থাকিবে, তাহাই তিনি। তিনিই প্রত্যেক বস্তুর ভিতর সত্যস্বরূপ।

"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি
ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি
ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥" ৪।৩

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ।

"তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, তুমি কুমারী, তুমি বৃদ্ধ —দণ্ডহস্তে ভ্রমণ করিতেছ, তুমি সমগ্র জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ।

তুমি সকল বস্তুতে বর্ত্তমান রহিয়াছ, আমিই তুমি, আমিই তুমি। ইহাই অদ্বৈতবাদের কথা। এ সম্বন্ধে আরো গুটিকতক কথা বলিব। এই অদ্বৈতবাদের দ্বারাই সকল বস্তুর মূলতত্ত্বের রহস্য পাওয়া যায়। আমরা দেখিয়াছি, এই অদ্বৈতবাদের দ্বারাই কেবল আমরা যুক্তিতর্ক ও বিজ্ঞানের আক্রমণের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইতে পারি। এখানেই অবশেষে যুক্তিবিচার একটি দৃঢ় ভিত্তি পাইয়া

অদ্বৈতবাদীর অন্যান্য বাদ সমর্থন

থাকে, কিন্তু ভারতীয় বৈদান্তিক কখন তাঁহার সিদ্ধান্তের পূর্ব্ববর্ত্তী সোপানগুলির উপর দোষারোপ করেন না, তিনি নিজ সিদ্ধান্তের উপর দাঁড়াইয়া তাহাদের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাদিগকে সমর্থন করেন ; তিনি জানেন, সেগুলি সত্য, কেবল একটু ভুল করিয়া দেখিয়াছেন, ভুলভাবে উহার বর্ণনা করিয়াছেন। একই সত্য—কেবল মায়ার আবরণের মধ্য দিয়া দৃষ্ট ; হইতে পারে কিঞ্চিৎ বিকৃত চিত্র, তাহা হইলেও উহা সত্য, সত্য ব্যতীত মিথ্যা কখনই নহে। সেই এক ব্রহ্ম, যাঁহাকে অজ্ঞ ব্যক্তি প্রকৃতির বহির্দ্দেশে অবস্থিত বলিয়া দর্শন করেন, যাঁহাকে অল্পজ্ঞ ব্যক্তি জগতের অন্তর্য্যামিস্বরূপ দেখেন, যাঁহাকে জ্ঞানী ব্যক্তি নিজ আত্মস্বরূপ ও সমগ্র জগৎস্বরূপ বলিয়া অনুভব করেন, এ সকলই একই বস্তু, একই বস্তু বিভিন্নভাবে দৃষ্ট, মায়ার বিভিন্ন কাচের মধ্য দিয়া দৃষ্ট, বিভিন্ন মনের দ্বারা দৃষ্ট, আর বিভিন্ন মনের দ্বারা দৃষ্ট বলিয়াই এই সব বিভিন্নতা। শুধু তাহাই নহে, উহাদের মধ্যে একটি আর একটিকে লইয়া যায়। বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ কি ? রাস্তায় গিয়া যদি কোন আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতে দেখ, তবে একজন গাঁওয়ারকে (গ্রামবাসী—অজ্ঞ) উহার কারণ জিজ্ঞাসা কর। দশজনের মধ্যে অন্ততঃ নয় জন বলিবে, ভূতে এই ব্যাপার করিতেছে। সে সর্ব্বদাই ভূত দেখিতেছে, কারণ অজ্ঞানের স্বভাব এই যে, কার্য্যের বাহিরে কারণের অনুসন্ধান করা। একটা ঢিল পড়িলে সে বলে, ভূত বা দৈত্য উহা ফেলিয়াছে। বৈজ্ঞানিক বলে, ইহা প্রকৃতির নিয়ম—মাধ্যাকর্ষণ।

সর্ব্বত্রই বিজ্ঞান ও ধর্ম্মে কী বিরোধ ? প্রচলিত ধর্ম্মসকল বহির্ম্মুখী

ব্যাখ্যায় এতদূর আচ্ছন্ন—সূর্য্যের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, চন্দ্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা—এইরূপ অনন্ত দেবতা—আর যাহা কিছু ঘটনা হইতেছে, সবই একটা না একটা দেবতা বা ভূতে করিতেছে—ইহার মোট কথাটা এই যে, কোন বিষয়ের কারণ সেই বস্তুর বহির্দ্দেশে অন্বেষণ করা হইতেছে আর বিজ্ঞানের অর্থ এই যে, কোন কার্য্যের কারণ সেই বস্তুর ভিতরেই অন্বেষণ করা। বিজ্ঞান যেমন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে, ততই উহা কার্য্যসমূহের ব্যাখ্যা ভূত-প্রেতের হাত হইতে ছাড়াইয়া লইয়াছে। আর, যেহেতু ধর্ম্মরাজ্যে অদ্বৈতবাদ ইহা সাধন করিয়াছে, সেই হেতু ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম। এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ড বাহিরের কোন ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট হয় নাই, জগতের বহির্দ্দেশে অবস্থিত কোন দৈত্য উহা সৃষ্টি করে নাই, কিন্তু উহা আপনা আপনি সৃষ্ট হইতেছে, আপনা আপনি উহার প্রকাশ হইতেছে, আপনা আপনি উহার প্রলয় হইতেছে—এক অনন্ত সত্তা ব্রহ্ম, "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"—হে শ্বেতকেতো, তুমি তাহাই। এইরূপে তোমরা দেখিতেছ, ইহাই কেবল একমাত্র বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম—অপর কিছুই নহে; আর এই বর্ত্তমান অর্দ্ধশিক্ষিত ভারতে আজকাল প্রত্যহ যে বিজ্ঞানের বুকনি চলিতেছে, প্রত্যহ আমি যে যুক্তির দোহাই শুনিতেছি, তাহাতে আমি আশা করি, তোমাদের দলকে দল অদ্বৈতবাদী হইবে আর (বুদ্ধের কথায় বলিতেছি) 'বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়' জগতে উহা প্রচার করিতে সাহসী হইবে। যদি তাহা না পার, তবে তোমাদিগকে আমি কাপুরুষ বলিয়া স্থির করিব।

অদ্বৈতবাদই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম

যদি তোমার এইরূপ দুর্ব্বলতা থাকে, যদি তুমি একেবারে প্রকৃত সত্য স্বীকার করিতে ভয় পাও বলিয়া উহা অবলম্বন করিতে না পার, তবে অপরকেও সেইরূপ স্বাধীনতা দাও, গরীব মূর্ত্তিপূজককে একেবারে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিও না, তাহাকে একটা দৈত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিও না; যাহার সহিত তোমার মত সম্পূর্ণ না মিলে, তাহার নিকট তোমার মত প্রচার করিতে যাইও না, প্রথমে এইটি বুঝ যে, তুমি নিজে দুর্ব্বল, আর যদি সমাজের ভয় পাও, যদি তোমার নিজ প্রাচীন কুসংস্কারের দরুণ ভয় খাও, তবে যাহারা অজ্ঞ, তাহারা এই কুসংস্কারে আরো কত ভয় পাইবে, ঐ কুসংস্কার তাহাদিগকে আরো কতদূর বদ্ধ করিবে, বুঝিয়া দেখ। ইহাই অদ্বৈতবাদীর কথা। অপরের উপর সদয় হও। ঈশ্বরেচ্ছায় কালই যদি সমগ্র জগৎ, শুধু মতে নয়, অনুভূতি বিষয়েও অদ্বৈতবাদী হয়, তাহা হইলে ত খুব ভালই হয়; কিন্তু তাহা যদি না হয়, তবে তারপর যতটা ভাল করিতে পারা যায়, তাহাই কর, তাহাদের সকলের হাত ধরিয়া তাহাদের সামর্থ্যানুসারে ধীরে ধীরে লইয়া যাও, আর জানিও যে, ভারতে সকল প্রকার ধর্ম্মের বিকাশই ধীরে ধীরে ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে হইয়াছে। মন্দ হইতে ভাল হইতেছে, তাহা নহে; ভাল হইতে আরো ভালো হইতেছে।

মূর্ত্তিপূজকের প্রতি ঘৃণা পরিত্যাগ কর

অদ্বৈতবাদের নীতিতত্ত্ব সম্বন্ধে আরও কিছু বলা আবশ্যক। আমাদের বালকেরা আজকাল অভিযোগ করিয়া থাকে—তাহারা কাহারও কাছ হইতে উহা শুনিয়াছে,—ঈশ্বর জানেন,

কাহার নিকট হইতে যে,—অদ্বৈতবাদের দ্বারা সকলেই দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিবে, কারণ অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দেয়, আমরা সকলেই এক, সকলেই ঈশ্বর, অতএব আমাদের আর নীতিপরায়ণ হইবার প্রয়োজন নাই! একথার উত্তরে প্রথমে এই বলিতে হয় যে, এ যুক্তি পশুপ্রকৃতি ব্যক্তির মুখেই শোভা পায়, যাহাকে কশাঘাত ব্যতীত দমন করিবার উপায় নাই। যদি তুমি তাহাই হও, তবে এইরূপ কশামাত্রশাস্য মনুষ্যপদবাচ্য হইয়া থাকিবার অপেক্ষা বরং তোমার আত্মহত্যা করা শ্রেয়ঃ। কশা-ঘাত বন্ধ করিলেই তোমরা সকলেই অসুর হইয়া দাঁড়াইবে! তাই যদি হয়, তবে তোমাদের এখনই মারিয়া ফেলা উচিত—তোমাদের আর উপায় নাই। চিরকালই তাহা হইলে তোমাদিগকে এই কশা ও দণ্ডের ভয়ে চলিতে হইবে, তোমাদের আর উদ্ধার নাই, তোমাদের আর পলায়নের পন্থা নাই। দ্বিতীয়তঃ অদ্বৈতবাদ, কেবল অদ্বৈতবাদের দ্বারাই নীতিতত্ত্বের ব্যাখ্যা হইতে পারে। প্রত্যেক ধর্ম্মই প্রচার করিতেছে যে, সকল নীতিতত্ত্বের সার—অপরের হিতসাধন। কেন অপরের হিতসাধন করিব? সকল ধর্ম্মই উপদেশ দিতেছে, নিঃস্বার্থ হও। কেন নিঃস্বার্থ হইব? কারণ, কোন দেবতা ইহা বলিয়া গিয়াছেন! তাঁহার কথায় আমার প্রয়োজন কি? শাস্ত্রে ইহা বলিয়া গিয়াছে—শাস্ত্রে বলুক না কেন—আমি উহা মানিতে যাইব কেন? আর ধর, কতকগুলি লোকে ঐ শাস্ত্র বা ঈশ্বরের দোহাই শুনিয়া নীতি-পরায়ণ হইল—তাহাতেই বা কি! জগতের অন্ততঃ অধিকাংশ লোকের নীতি এইটুকু যে—'চাচা আপন বাঁচা' তাই বলিতেছি,

অদ্বৈতবাদের নীতিতত্ত্ব

আমি যে নীতিপরায়ণ হইব, ইহার যুক্তি দেখাও। অদ্বৈতবাদ ব্যতীত ইহা ব্যাখ্যা করিবার উপায় নাই।

"সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥"—১৩।২৮ গীতা।

অর্থাৎ "ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া আত্মার দ্বারা আত্মার হিংসা করে না।"

অদ্বৈতবাদ শিক্ষা করিয়া অবগত হও যে, অপরকে হিংসা করিতে গিয়া তুমি নিজেকে হিংসা করিতেছ—কারণ, তাহারা সকলেই যে তুমি! তুমি জান আর নাই জান, সকল হাত দিয়া তুমি কাজ করিতেছ, সকল পদ দিয়া তুমি চলিতেছ, তুমিই রাজারূপে প্রাসাদে সুখসম্ভোগ করিতেছ, আবার তুমিই রাস্তার ভিখারীরূপে দুঃখের জীবন যাপন করিতেছ। অজ্ঞ ব্যক্তিতেও তুমি, বিদ্বানেও তুমি, দুর্ব্বলের মধ্যেও তুমি, সবলের মধ্যেও তুমি। এই তত্ত্ব অবগত হইয়া সকলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হও। যেহেতু অপরকে হিংসা করিলে নিজেকেও হিংসা করা হয়, সেই হেতুই আমাদের কদাপি অপরের হিংসাচরণ কর্ত্তব্য নহে। সেই জন্যই যদি আমি না খাইয়া মরিয়া যাই, তাহাও আমি গ্রাহ্য করি না, কারণ, আমি যখন শুকাইয়া মরিতেছি, তখনই আমার লক্ষ লক্ষ মুখে আমিই আহার করিতেছি। অতএব এই ক্ষুদ্র আমি আমার—ইহাদের বিষয়—আমার গ্রাহ্যের মধ্যেই আনা উচিত নয়, কারণ, সমগ্র জগৎই আমার—আমি যুগপৎ জগতের সকল আনন্দ সম্ভোগ করিতেছি। আর আমাকে ও জগৎকে কে বিনাশ করিতে পারে? এইরূপে দেখিতেছ, অদ্বৈতবাদই নীতিতত্ত্বের

একমাত্র ভিত্তি, একমাত্র ব্যাখ্যা। অন্যান্য বাদ তোমাদিগকে নীতিশিক্ষা দিতে পারে, কিন্তু কেন নীতিপরায়ণ হইব, উহার কোন হেতু নির্দ্দেশ করিতে পারে না। যাহা হউক, এই পর্য্যন্ত দেখা গেল, অদ্বৈতবাদই নীতিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় একমাত্র সমর্থ।

অদ্বৈতবাদ সাধনে লাভ কি? উহাতে শক্তি, তেজ, বীর্য্য লাভ হইয়া থাকে। শ্রুতি বলিতেছেন—'শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ' বৃহ, ২।৪।৫। প্রথমে এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতে হইবে। সমগ্র জগতে তোমরা যে মায়াজাল বিস্তার করিয়াছ, তাহা সরাইয়া লইতে হইবে। মানবকে দুর্ব্বল ভাবি ও না, তাহাকে দুর্ব্বল বলিও না। জানিও, সকল পাপ ও সকল অশুভ—এক দুর্ব্বলতা শব্দ দ্বারাই নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। সকল অসৎকার্য্যের মূল—দুর্ব্বলতা। দুর্ব্বলতার জন্যই মানুষ, যাহা করা উচিত নয়, তাহাই করিয়া থাকে; দুর্ব্বলতার জন্যই মানুষ তাহার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারে না। তাহারা কি, তাহারা সকলে জানুক। দিনরাত্রি তাহারা নিজেদের স্বরূপের কথা বলুক। মাতৃস্তন্যের সঙ্গে তাহারা সকলে 'আমিই সেই', এই ওজোময়ী বাণী পান করুক। তাহার পর তাহারা উহা চিন্তা করুক আর ঐ চিন্তা, ঐ মনন হইতে এমন সকল কার্য্য হইবে, যাহা জগৎ কখনও দেখে নাই।

অদ্বৈতবাদ সাধনে লাভ

কিরূপে উহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে? কেহ কেহ বলিয়া থাকে—এই অদ্বৈতবাদ কার্য্যকরী নহে—অর্থাৎ জড় জগতে এখনও উহার শক্তির প্রকাশ হয় নাই। এই কথা আংশিক সত্য বটে! বেদের সেই বাণী স্মরণ কর,—

"এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥" ১।২।১৬

কঠোপনিষৎ।

অর্থাৎ ওম্—ইহা মহারহস্য। ওম্—ইহা আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি। যিনি এই ওঙ্কারের রহস্য জানেন, তিনি যাহা চান, তাহাই পাইয়া থাকেন।

অতএব প্রথমে এই ওঙ্কারের রহস্য অবগত হও—তুমিই যে সেই ওঙ্কার—তাহা জান। এই 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের রহস্য অবগত হও, তখনই, কেবল তখনই, তোমরা যাহা চাহিবে তাহা পাইবে। যদি জড়জগতে বড় হইতে চাও, বিশ্বাস কর—তুমি বড়। আমি হয়ত একটি ক্ষুদ্র বুদ্বুদ, তুমি হয়ত পর্ব্বততুল্য উচ্চ তরঙ্গ, কিন্তু জানিও, অনন্ত সমুদ্র আমাদের উভয়েরই পশ্চাদ্দেশে রহিয়াছে, অনন্ত ঈশ্বর আমাদের সকল শক্তি ও বীর্য্যের ভাণ্ডারস্বরূপ, আর আমরা উভয়েই উহা হইতে যত ইচ্ছা শক্তি সংগ্রহ করিতে পারি। অতএব আপনার উপর বিশ্বাস কর। অদ্বৈতবাদের রহস্য এই যে, প্রথমে নিজেদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়, তারপর অন্য কিছুতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পার। জগতের ইতিহাসে দেখিবে, কেবল যে সকল জাতি নিজেদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহারাই প্রবল ও বীর্য্যবান্ হইয়াছে। প্রত্যেক জাতির ইতিহাসে ইহাও দেখিবে, যে সকল ব্যক্তি নিজেদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহারাই প্রবল ও বীর্য্যবান্ হইয়াছে। এই ভারতে একজন ইংরাজ আসিয়াছিলেন—তিনি সামান্য কেরাণী মাত্র ছিলেন—পয়সা কড়ির অভাবে ও অন্যান্য কারণে তিনি দুইবার নিজের

অদ্বৈতবাদ কি কার্য্যকরী?

মাথায় গুলি করিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করেন, আর যখন তিনি উহাতে অকৃতকার্য্য হইলেন,—তাঁহার বিশ্বাস হইল,—তিনি বড় বড় কাজ করিবার জন্যই জন্মিয়াছেন—সেই ব্যক্তিই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ক্লাইভ। যদি তিনি পাদরীদের উপর বিশ্বাস করিয়া সারাজীবন হাঁটু গাড়িয়া 'হে প্রভু, আমি দুর্ব্বল, আমি হীন'—করিতেন, তবে তাঁহার গতি হইত কোথায়? নিশ্চিত বাতুলালয়েই তাঁহার গতি হইত। লোকে এই সকল কুশিক্ষা দিয়া তোমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। আমি সমগ্র জগতে দেখিয়াছি,—দীনতার দুর্ব্বলতা-সম্পাদক উপদেশের দ্বারা অতি অশুভ ফল ঘটিয়াছে, সমগ্র মনুষ্য-জাতিকে উহাতে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের সন্তানসন্ততি-গণকে এইরূপভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়—আর তাহারা যে শেষে আধপাগলা গোছ হইয়া দাঁড়ায়, ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয়?

নূতন শিক্ষা 'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তা কর'

অদ্বৈতবাদ কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় এই। অতএব নিজেদের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, আর যদি সাংসারিক ধন-সম্পদের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে এই অদ্বৈতবাদ কার্য্যে পরিণত কর; টাকা তোমার নিকট আসিবে। যদি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান্ হইতে ইচ্ছা কর, তবে অদ্বৈতবাদকে সেই দিকে প্রয়োগ কর, তুমি মহামনীষী হইবে। আর যদি তুমি মুক্তিলাভ করিতে চাও, তবে আধ্যাত্মিক ভূমিতে এই অদ্বৈতবাদ প্রয়োগ করিতে হইবে—তাহা হইলে তুমি ঈশ্বর হইয়া যাইবে—পরমানন্দ-স্বরূপ নির্ব্বাণ লাভ করিবে। এইটুকু ভুল হইয়াছিল যে, এতদিন উহা কেবল আধ্যাত্মিক দিকেই প্রযুক্ত হইয়াছিল—এই পর্য্যন্ত।

এখন কর্ম্মজীবনে উহা প্রয়োগ করিবার সময় আসিয়াছে। এখন আর উহাকে রহস্য রাখিলে চলিবে না, এখন আর হিমালয়ের গুহায় বন-জঙ্গলে সাধু-সন্ন্যাসীদের নিকট উহা আবদ্ধ থাকিবে না, লোকের প্রাত্যহিক জীবনে উহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। রাজার প্রাসাদে, সাধু সন্ন্যাসীর গুহায়, দরিদ্রের কুটীরে, সর্ব্বত্র—এমন কি, রাস্তার ভিখারী দ্বারাও ইহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। কারণ, গীতায় কি উক্ত হয় নাই যে—

"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" ২।৪০

"এই ধর্ম্মের অল্পমাত্রও আমাদিগকে মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করে।" অতএব তুমি স্ত্রীই হও বা শূদ্রই হও বা আর যাহা কিছু হও—তোমার কিছুমাত্র ভয়ের কারণ নাই, কারণ, শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন, এই ধর্ম্ম এতই বড় যে ইহার অতি অল্পমাত্র অনুষ্ঠান করিলেও মহান্ কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে—অতএব হে আর্য্যসন্তানগণ, অলসভাবে বসিয়া থাকিও না—উঠ, জাগো, আর যতদিন না সেই চরম লক্ষ্যে পঁহুছিতেছ, ততদিন নিশ্চিন্ত থাকিও না। এখন অদ্বৈতবাদকে কার্য্যে পরিণত করিবার সময় আসিয়াছে। উহাকে এখন স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে লইয়া আসিতে হইবে, ইহাই এখন বিধির বিধান। আমাদের প্রাচীন পূর্ব্ব-পুরুষগণের বাণী আমাদিগকে অবনতির দিকে আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে নিষেধ করিতেছে। অতএব হে আর্য্যসন্তানগণ, আর সে দিকে অগ্রসর হইও না। তোমাদের সেই প্রাচীন শাস্ত্রের উপদেশ উচ্চদেশ হইতে ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখী হইয়া আসিয়া সমগ্র জগৎকে আচ্ছন্ন করুক, সমাজের প্রতি স্তরে প্রবেশ করুক, প্রত্যেক ব্যক্তির সাধারণ সম্পত্তি হউক,

আমাদের জীবনের অঙ্গীভূত হউক, আমাদের শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়া আমাদের প্রত্যেক শোণিতবিন্দুর সহিত প্রবাহিত হউক।

তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, আমাদের অপেক্ষা মার্কিনেরা বেদান্তকে অধিক পরিমাণে কর্ম্মজীবনে পরিণত করিয়াছে। আমি নিউইয়র্কের সমুদ্রতটে দাঁড়াইয়া দেখিতাম—বিভিন্ন দেশ হইতে লোক আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনার্থ আসিতেছে। তাহাদের দেখিলে বোধ হইত যেন তাহারা মরমে মরিয়া আছে, পদদলিত, আশাহীন, এক পুঁটলি কাপড় কেবল তাহাদের সম্বল—কাপড়গুলিও সব ছিন্নভিন্ন, ভয়ে লোকের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে অক্ষম। একটা পুলিশের লোক দেখিলেই ভয় পাইয়া ফুটপাথের অন্যদিকে যাইবার চেষ্টা। এখন মজা দেখ, ছয়মাস বাদে সেই লোকগুলিই আবার উত্তম বস্ত্র পরিহিত হইয়া সোজা হইয়া চলিতেছে—সকলের দিকেই নির্ভীকদৃষ্টিতে চাহিতেছে। এরূপ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন কিসে করিল? মনে কর, সে ব্যক্তি আরমেনিয়া অথবা অপর কোথা হইতে আসিতেছে—সেখানে কেহ তাহাকে গ্রাহ্য করিত না, সকলেই পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিত, সেখানে সকলেই তাহাকে বলিত—'তুই জন্মেছিস্ গোলাম, থাক্‌বি গোলাম, একটু যদি নড়্‌তে চড়্‌তে চেষ্টা করিস ত তোকে পিষে ফেলব।' চারিদিকের সবই যেন তাহাকে বলিত, 'গোলাম তুই গোলাম আছিস্—যা আছিস্, তাই থাক্। জন্মেছিলি যখন, তখন যে নৈরাশ্য-অন্ধকারে জন্মেছিলি, সেই নৈরাশ্য অন্ধকারে সারাজীবন পড়িয়া থাক্।' সেখানকার

পাশ্চাত্য জাতি আমাদের অপেক্ষা অদ্বৈতবাদ কর্ম্মজীবনে অধিক পরিণত করিয়াছে

হাওয়ায় যেন তাহাকে গুন গুন করিয়া বলিত—'তোর কোন আশা নেই—গোলাম হইয়া চিরজীবন নৈরাশ্য-অন্ধকারে পড়িয়া থাক্।' সেখানে বলবান্ ব্যক্তি পিষিয়া তাহার প্রাণ হরণ করিয়া লইয়াছিল। আর যখনই সে জাহাজ হইতে নামিয়া নিউইয়র্কের রাস্তায় চলিতে লাগিল, সে দেখিল একজন উত্তমবস্ত্রপরিহিত ভদ্রলোক তাহার করমর্দ্দন করিল। সে যে চীরপরিহিত, আর ভদ্রলোকটি যে উত্তমবস্ত্রধারী, তাহাতে কিছু আসিয়া গেল না। আর একটু অগ্রসর হইয়া সে এক ভোজনাগারে গিয়া দেখিল, ভদ্রলোকেরা টেবিলে বসিয়া আহার করিতেছেন—সেই টেবিলেরই এক প্রান্তে তাহাকে বসিবার জন্য বলা হইল। সে চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল, দেখিল এ এক নূতন জীবন; সে দেখিল এমন জায়গাও আছে, যেখানে আর পাঁচজন মানুষের ভিতরে সেও একজন মানুষ। হয় ত সে ওয়াশিংটনে গিয়া যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে করমর্দ্দন করিয়া আসিল, হয় ত সে তথায় দেখিল দূরবর্ত্তী পল্লীগ্রামসমূহ হইতে মলিন-বস্ত্রপরিহিত কৃষকেরা আসিয়া সকলেই প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে করমর্দ্দন করিতেছে। তখন তাহার মায়ার আবরণ খসিয়া গেল। সে যে ব্রহ্ম—মায়াবশে এইরূপ দুর্ব্বল দাসভাবাপন্ন হইয়াছিল। এখন সে আবার জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, মনুষ্যপূর্ণ জগতের মধ্যে সেও একজন মানুষ।

আমাদের এই দেশে, এই বেদান্তের জন্মভূমিতে আমাদের সাধারণ লোককে শত শত শতাব্দী ধরিয়া এইরূপ মায়াচক্রে ফেলিয়া এইরূপ অবনতভাবাপন্ন করিয়া ফেলা হইয়াছে। তাহাদের স্পর্শে অশুচি, তাহাদের সঙ্গে বসিলে অশুচি। তাহাদিগকে বলা হইতেছে, "নৈরাশ্যের

আমাদের সমুদয় দুর্দ্দশার জন্য আমরাই দায়ী

অন্ধকারে তোদের জন্ম—থাক্ চিরকাল এই নৈরাশ্য অন্ধকারে।” আর তাহার ফল এই হইয়াছে যে, তাহারা ক্রমাগত ডুবিতেছে, গভীর অন্ধকার হইতে আরও গভীরতর অন্ধকারে ডুবিতেছে। অবশেষে মনুষ্যজাতি যতদূর নিকৃষ্টতম অবস্থায় পঁহুছিতে পারে, ততদূর পৌঁছিয়াছে। কারণ, এমন দেশ আর কোথায় আছে যেখানে মানুষকে গোমহিষাদির সঙ্গে একত্র শয়ন করিতে হয়? আর ইহার জন্য অপর কাহারও ঘাড়ে দোষ চাপাইও না—অজ্ঞ ব্যক্তিরা যে ভুল করিয়া থাকে, সেই ভ্রমে তোমরাও পড়িও না। ফলও হাতে হাতে দেখিতেছ, তাহার কারণও এইখানেই বর্ত্তমান। আমাদেরই বাস্তবিক দোষ। সাহস করিয়া দাঁড়াও, নিজেদের ঘাড়েই সব দোষ লও। অপরের স্কন্ধে দোষারোপ করিতে যাইও না, তোমরা যে সকল কষ্ট ভোগ করিতেছ, তাহার একমাত্র কারণ তোমরাই।

অতএব হে লাহোরবাসী যুবকবৃন্দ, তোমরা এইটি বিশেষভাবে অবগত হও যে, তোমাদের স্কন্ধে এই মহাপাপ—এই বংশপরম্পরাগত ও জাতীয় মহাপাপ রহিয়াছে। ইহা দূর করিতে না পারিলে তোমাদের আর উপায় নাই। তোমরা সহস্র সহস্র সমিতি গঠন করিতে পার, বিশ হাজার রাজনৈতিক সম্মিলন করিতে পার, পঞ্চাশ হাজার শিক্ষালয় স্থাপন করিতে পার। এই সকলে কিছুই ফল হইবে না, যতদিন না তোমাদের ভিতর সেই সহানুভূতি, সেই প্রেম আসিতেছে, যতদিন না তোমাদের ভিতর সেই হৃদয় আসিতেছে—যাহা সকলের জন্য ভাবে। যতদিন না ভারতে আবার বুদ্ধের হৃদয়বত্তা আসিতেছে,

উদ্ধারের উপায়—প্রেম ও সহানুভূতি

যতদিন না ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাণী কর্ম্মজীবনে পরিণত করা হইতেছে, ততদিন আমাদের আশা নাই। তোমরা ইউরোপীয়দের এবং তাহাদের সভাসমিতির অনুকরণ করিতেছ; কিন্তু তাহাদের হৃদয়ভাবের অনুকরণ কি করিয়াছ? আমি তোমাদিগকে একটি গল্প করিব—আমি স্বচক্ষে যে একটি ঘটনা দেখিয়াছি, তাহা তোমাদের নিকট বলিব—তাহা হইলেই তোমরা আমার ভাব বুঝিবে। একদল ইউরেশীয়ান কতকগুলি ব্রহ্মদেশবাসীকে লণ্ডনে লইয়া গিয়া তথায় তাহাদিগকে একটি প্রদর্শনী করিয়া খুব পয়সা উপার্জ্জন করিল। শেষে সব পয়সাগুলি নিজেরা লইয়া তাহাদিগকে ইউরোপের অন্যত্র লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া গেল। এই গরীব বেচারারা কোন ইউরোপীয় ভাষায় একটি শব্দও জানিত না। যাহা হউক, অষ্ট্রীয়ার ইংরাজ কন্‌সল তাহাদিগকে লণ্ডনে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা লণ্ডনেও কাহাকেও জানিত না, সুতরাং সেখানে গিয়াও নিরাশ্রয় অবস্থায় পড়িল। কিন্তু একজন ইংরাজ ভদ্রমহিলা তাহাদের বিষয় জানিতে পারিয়া এই ব্রহ্মবাসী বৈদেশিকগণকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া নিজের কাপড় চোপড়, নিজের বিছানা পত্র, যাহা কিছু প্রয়োজন, সব দিয়া তাহাদের সেবা করিতে লাগিলেন আর সংবাদপত্রে এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন। দেখ, তাহার ফল কেমন হইল। তার পরদিনই যেন সমগ্র জাতিটি জাগিয়া উঠিল, চারিদিক্ হইতে তাহাদের সাহায্যার্থে টাকা আসিতে লাগিল, তাহাদিগকে শেষে ব্রহ্মদেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। তাহাদের রাজনৈতিক ও অন্যান্য সভাসমিতি যাহা কিছু আছে তাহা এইরূপ সহানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই প্রেমের (অন্ততঃ নিজ জাতির প্রতি) পর্ব্বতদৃঢ় ভিত্তিই তাহাদের সমুদয় কার্য্যের মূল। তাহারা সমগ্র জগৎকে ভাল না বাসিতে পারে, তাহারা আর সকলের শত্রু হইতে পারে, কিন্তু ইহা বলা বাহুল্য যে, তাহারা নিজেদের দেশ নিজ জাতির প্রতি অগাধপ্রেমসম্পন্ন এবং তাহাদের দ্বারে সমাগত বৈদেশিকগণের প্রতিও সত্য, ন্যায় ও কৃপাপরায়ণ। পাশ্চাত্য দেশের সকল স্থানে উহারা কিরূপ অদ্ভুত ভাবে আমার আতিথ্যসৎকার ও যত্ন করিয়াছিল, একথা যদি আমি তোমাদের নিকট বারবার না বলি, তাহা হইলে আমি মহা অকৃতজ্ঞতাদোষে দূষিত হইব। এখানে সে হৃদয় কোথায়, যে ভিত্তির উপর এই জাতির উন্নতি প্রতিষ্ঠিত হইবে? আমরা পাঁচজনে মিলিয়া একটি ছোটখাট যৌথ কারবার খুলিলাম, কিছুদিন চলিতে না চলিতে আমরা পরস্পরকে ঠকাইতে লাগিলাম, শেষে সব ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল! তোমরা তাহাদের অনুকরণে কথা বল আর তাহাদের ন্যায় শক্তিশালী জাতি গঠন করিতে চাও, কিন্তু তোমাদের ভিত্তি কই? আমাদের বালির ভিত্তি, তাই উহার উপর নির্ম্মিত গৃহ অল্পকালের মধ্যেই চুরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়!

আমাদের জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় প্রেম ও সহানুভূতির অভাব

অতএব হে লাহোরবাসী যুবকবৃন্দ, আবার সেই অদ্ভুত অদ্বৈত পতাকা উড্ডীন কর—কারণ, আর কোন ভিত্তিতেই তোমাদের ভিতর সেই অপূর্ব্ব প্রেম জন্মিতে পারে না—যতদিন না তোমরা সেই এক-

সর্ব্বস্ব, এমন কি মুক্তির আশা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া

দেশের কল্যাণের জন্য প্রস্তুত হও

ভগবানকে একভাবে সর্ব্বত্র অবস্থিত দেখিতেছ, ততদিন তোমাদের ভিতর সেই প্রেম জন্মিতে পারে না, সেই প্রেমের পতাকা উড়াইয়া দাও। 'উঠ, জাগ, যতদিন না লক্ষ্যে পঁহুছিতেছ, ততদিন নিশ্চিন্ত থাকিও না', উঠ আর একবার উঠ, কারণ, ত্যাগ ব্যতীত কিছুই হইতে পারে না। অপরকে যদি সাহায্য করিতে চাও, তবে তোমার নিজের অহংকে বিসর্জ্জন করিতে হইবে। খ্রীষ্টিয়ানদের ভাষায় বলি,—তোমরা ঈশ্বর ও শয়তানের সেবা এক সঙ্গে কখন করিতে পার না। বৈরাগ্য—তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বড় বড় কাজ করিবার জন্য সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালে এমন লোক অনেক রহিয়াছেন, যাঁহারা নিজেদের মুক্তির জন্য সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। তোমরা সব ছুড়িয়া ফেলিয়া দাও, এমন কি, নিজেদের মুক্তি পর্য্যন্ত দূরে ফেলিয়া দাও ; যাও, অপরের সাহায্য কর। তোমরা সর্ব্বদাই বড় বড় কথা কহিতেছ, কিন্তু এই তোমাদের সম্মুখে কর্ম্মপরিণত বেদান্ত স্থাপন করিলাম। তোমাদের এই ক্ষুদ্র জীবন বিসর্জ্জনে প্রস্তুত হও। যদি এই জাতি জীবিত থাকে, তবে তুমি, আমি, আমাদের মত হাজার হাজার লোক যদি অনশনে মরে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি ?

দেশের জনসাধারণের জন্য প্রাণপণ কর

এই জাতি ডুবিতেছে, অগণন লক্ষ লক্ষ প্রাণীর অভিশাপ আমাদের মস্তকে রহিয়াছে—যাহাদিগকে, আমরা নিত্য-প্রবাহিত অমৃতনদী পার্শ্বে বহিয়া যাইলেও, তৃষ্ণার সময় পয়ঃপ্রণালীর জল পান করিতে দিয়া আসিয়াছি, অসংখ্য লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি—যাহাদিগকে সম্মুখে

অপর্য্যাপ্ত আহার্য্য থাকিতেও আমরা অনশনে মরিতে দিয়াছি, অসংখ্য লক্ষ লক্ষ লোক—যাহাদিগকে আমরা অদ্বৈতবাদের কথা বলিয়াছি, এবং প্রাণপণে ঘৃণা করিয়াছি, অসংখ্য লক্ষ লক্ষ প্রাণী—যাহাদের বিরুদ্ধে আমরা লোকাচারের মতবাদ আবিষ্কার করিয়াছি, যাহাদিগকে আমরা মুখে বলিয়াছি—সকলেই সমান সকলেই সেই এক ব্রহ্ম, কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত করিবার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করি নাই—"মনে মনে রাখ্‌লেই হল—ব্যবহারিক জগতে অদ্বৈতভাব লইয়া আসা—বাপ্‌ রে !!" তোমাদের চরিত্রের এই দাগ মুছিয়া ফেল। উঠ, জাগো। এই ক্ষুদ্র জীবন যদি যায়, ক্ষতি কি ? সকলেই মরিবে—সাধু অসাধু, ধনী দরিদ্র সকলেই মরিবে ! শরীর কাহারও চিরকাল থাকিবে না। অতএব উঠ, জাগো ও সম্পূর্ণ অকপট হও। ভারতে ঘোর কপটতা প্রবেশ করিয়াছে। চাই চরিত্র, চাই এইরূপ দৃঢ়তা ও চরিত্র বল, যাহাতে মানুষ একটা জিনিসকে মরণকামড়ে ধরিয়া থাকিতে পারে।

"নীতিনিপুণ ব্যক্তিগণ নিন্দাই করুন বা সুখ্যাতি করুন, লক্ষ্মী আসুন বা চলিয়া যান, মৃত্যু আজই হউক বা শতাব্দান্তেই হউক, তিনিই ধীর, যিনি ন্যায় পথ হইতে এক পদও বিচলিত না হন।" উঠ, জাগো, সময় চলিয়া যাইতেছে, আর আমাদের সমুদয় শক্তি বৃথা বাক্যে ক্ষয় হইতেছে। উঠ, জাগো, সামান্য সামান্য বিষয় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মত মতান্তর লইয়া বৃথা বিবাদ পরিত্যাগ কর। তোমাদের সামনে যে খুব বড় কাজ রহিয়াছে, লক্ষ লক্ষ লোক ডুবিতেছে, তাহাদিগকে উদ্ধার কর !

এইটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিও যে, মুসলমানগণ যখন ভারতবর্ষে

প্রথম আসে, তখন ভারতে এখনকার অপেক্ষা কত অধিক হিন্দুর নিবাস ছিল, আজ তাহাদের সংখ্যা কত হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার কোন প্রতীকার না হইলে দিন দিন আরও কমিয়া যাইবে, শেষে আর হিন্দু কেহ থাকিবে না। হিন্দু জাতি লোপের সঙ্গে সঙ্গেই, তাহাদের শত-দোষ সত্ত্বেও জগতের সমক্ষে তাহাদের শত শত বিকৃত চিত্র উপস্থাপিত হইলেও এখনও তাহারা যে সকল মহৎ মহৎ ভাবের প্রতিনিধিস্বরূপে বর্ত্তমান, সে গুলিও লুপ্ত হইবে। আর তাহাদের লোপের সঙ্গে সঙ্গে সকল অধ্যাত্মজ্ঞানের চূড়ামণিস্বরূপ অপূর্ব্ব অদ্বৈততত্ত্বও বিলুপ্ত হইবে। অতএব উঠ, জাগো, জগতের আধ্যাত্মিকতা রক্ষার জন্য বাহু প্রসারিত করিয়া দাও। আর প্রথমে তোমাদের স্বদেশের কল্যাণের জন্য এই তত্ত্ব কার্য্যে পরিণত কর। আমাদের প্রয়োজন ধর্ম্ম ততটা নহে, জড়জগতে এই অদ্বৈতবাদ একটু কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে,. প্রথমে অন্নের ব্যবস্থা করিতে হইবে, তারপর ধর্ম্ম। গরীব বেচারারা অনশনে মরিতেছে, আমরা তাহাদিগকে অতিরিক্ত ধর্ম্মোপদেশ দিতেছি। মত মতান্তরে ত আর পেট ভরে না! আমাদের একটি দোষ বড়ই প্রবল—প্রথমতঃ আমাদের দুর্ব্বলতা, দ্বিতীয়তঃ প্রেমশূন্যতা—হৃদয়ের শুষ্কতা। লক্ষ লক্ষ মত মতান্তরের কথা বলিতে পার, কোটী কোটী সম্প্রদায় গঠন করিতে পার, কিন্তু যতদিন না তাহাদের দুঃখ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ, বেদের উপদেশানুযায়ী যতদিন না জানিতেছ যে, তাহারা তোমার শরীরের অংশস্বরূপ, যতদিন না তোমরা ও তাহারা—দরিদ্র ও ধনী, সাধু ও অসাধু,

উপসংহার

সকলেই—যাহাকে তোমরা ব্রহ্ম বল, সেই অনন্ত সর্ব্বস্বরূপের অংশ হইয়া যাইতেছে, ততদিন কিছু হইবে না।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদের নিকট অদ্বৈতবাদের কয়েকটি প্রধান প্রধান ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, আর এখন ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার সময় আসিয়াছে—শুধু এ দেশে নয়, সর্ব্বত্র। আধুনিক বিজ্ঞানের লৌহমুদ্গরাঘাতে সকল স্থানের দ্বৈতবাদাত্মক ধর্ম্মসকলের কাচনির্ম্মিত ভিত্তিসমূহ চূর্ণ করিয়া গুঁড়া করিয়া ফেলিতেছে। শুধু এখানেই যে দ্বৈতবাদীরা শাস্ত্রীয় শ্লোকের টানিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে, (এতদূর টানা হইতেছে যে, আর চলে না—শ্লোকগুলি ত আর রবার নহে!) শুধু, এখানেই যে উহারা আত্মরক্ষার জন্য অন্ধকারে কোণে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা নহে। ইউরোপ আমেরিকায় এই চেষ্টা আরও বেশী। আর তথায়ও ভারত হইতে এই তত্ত্বের কিছু অন্ততঃ গিয়া প্রবেশ করা চাই। ইতঃপূর্ব্বেই উহা গিয়াছে—উহার প্রসার দিন দিন আরও বাড়াইতে হইবে। পাশ্চাত্য সভ্যজগৎকে রক্ষা করিতে উহার বিশেষ প্রয়োজন। কারণ, পাশ্চাত্যদেশে তথাকার প্রাচীন ভাব উঠিয়া গিয়া এক নূতন ধরণ—কাঞ্চনের পূজা—প্রবর্ত্তিত হইতেছে। এই আধুনিক ধর্ম্ম অর্থাৎ পরস্পর প্রতিযোগিতা ও কাঞ্চনপূজা অপেক্ষা যে, সেই প্রাচীন অপরিণত ধর্ম্মপ্রণালী ছিল ভাল। কোন জাতি যতই প্রবল হউক না কেন, কখনই এরূপ ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে পারে না। আর জগতের ইতিহাস আমাদিগকে বলিতেছে, যাহারাই এইরূপ ভিত্তির উপর তাহাদের সমাজ প্রতিষ্ঠা

করিতে গিয়াছে, তাহাদেরই বিনাশ হইয়াছে। যাহাতে ভারতে এই কাঞ্চনপূজার তরঙ্গ প্রবেশ না করে, তাহার দিকে প্রথমেই বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অতএব সকলের নিকট এই অদ্বৈতবাদ প্রচার কর, যাহাতে ধর্ম্ম আধুনিক বিজ্ঞানের প্রবলাঘাতেও অক্ষত থাকিতে পারে। শুধু তাহাই নয়, তোমাদিগকে অপরকেও সাহায্য করিতে হইবে, তোমাদের ভাবরাশি ইউরোপ আমেরিকার উদ্ধার সাধন্ করিবে। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, এখানেই প্রকৃত কাজ রহিয়াছে আর সেই কার্য্যের প্রথমাংশ—দিন দিন গভীর হইতে গভীরতর দারিদ্র্য ও অজ্ঞান তিমিরে মজ্জমান ভারতীয় লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের উন্নতি সাধন। তাহাদের কল্যাণের জন্য, তাহাদের সহায়তার জন্য বাহু প্রসারিত করিয়া দাও এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেই বাণী স্মরণ রাখিও—

"ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাৎ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥" ৫।১৯—গীতা।

"যাঁহাদের মন এই সাম্যভাবে অবস্থিত, তাঁহারা ইহজীবনেই সংসার জয় করিয়াছেন। যেহেতু ব্রহ্ম নির্দ্দোষ ও সমভাবাপন্ন, সেই হেতু তাঁহারা ব্রহ্মে অবস্থিত।"

রাজপুতানা

স্বামিজী লাহোর হইতে দেরাদুনে গমন করিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য তত ভাল না থাকায় এখানে কিছুদিন বিশ্রাম করিবেন মানস করিয়াছিলেন। যাহাতে লোকজনের সঙ্গে বেশী দেখাসাক্ষাৎ বা কথাবার্ত্তা কহিতে না হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা হইত, কিন্তু অদম্য মহাশক্তি তাঁহার ভিতর কার্য্য করিতেছে, তিনি কি স্থির থাকিতে পারেন? অতি গোপনে থাকিলেও লোকে তাঁহার বিষয় জানিতে পারিয়া দলে দলে আসিতে লাগিল এবং তিনিও তাহাদিগকে নানাবিধ উপদেশ দিতে লাগিলেন। এখানে আসিবার আর এক উদ্দেশ্য ছিল। স্বামিজীর শিষ্য সেভিয়ার-দম্পতি তখন হিমালয়ের কোন নিভৃত স্থানে একটি আশ্রমবাটী নির্ম্মাণার্থ জমি অন্বেষণ করিতেছিলেন, এখানে সুবিধামত স্থান মিলিল না। এখানে সঙ্গী শিষ্যগণকে রীতিমত রামানুজের ভাষ্যসমেত বেদান্ত অধ্যাপনা করাইতে লাগিলেন। বেদান্তাধ্যাপনায় স্বামিজী সময়ে সময়ে এরূপ তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, সেভিয়ার-দম্পতি অপরাহ্ণ ভ্রমণের জন্য আসিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিলেও খেয়াল করিতেন না।

দেরাদুন হইতে সাহারাণপুরে আসিলে স্থানীয় উকীল বন্ধুবিহারী বাবু তাঁহাকে যথোচিত সমাদরপূর্ব্বক নিজগৃহে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি এবং অন্যান্য অনেক ভদ্রলোক এখানে থাকিয়া তাঁহাকে বক্তৃতাদি করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন।

কিন্তু তিনি তখন রাজপুতানার অন্তর্গত খেতড়িতে যাইতে উৎসুক হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে হইল।

সাহারাণপুর হইতে দিল্লীতে আসিয়া স্বামিজী ৪।৫ দিন অবস্থান করিলেন। স্বামিজীর এক্ষণে আর অভ্যর্থনা প্রভৃতিতে রুচি নাই, এখন প্রাচীন শিষ্য ও বন্ধুগণের সহিত মিলনে উৎসুক। তাই এখানে ধনী লোকের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক পুরাতন গরীব শিষ্যের বাটীতে উঠিলেন। আমেরিকা যাইবার বহু পূর্ব্বেই ভারতভ্রমণের সময় ইঁহার সহিত স্বামিজীর পরিচয় হয় এবং স্বামিজীর সহবাসে ইঁহার পূর্ব্ব চরিত্রের পরিবর্ত্তন হয়। ইনি বরাবরই অতি সরল প্রকৃতি ও স্পষ্টবক্তা ছিলেন। স্বামিজীকে গুরুজী বলিয়া সম্বোধন করেন। আমেরিকা যাইবার পূর্ব্বে এক সময়ে স্বামিজী রেলের তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর কষ্টে অতিশয় অস্থির হইয়া ইঁহার নিকট একখানি মধ্যম শ্রেণীর টিকিট প্রার্থনা করায় ইনি বলিয়াছিলেন, 'কি গুরুজী, বিলাস ঢুক্‌ছে যে!' এখন তাঁহার সেই গুরুজী পাশ্চাত্যদেশ বিজয় করিয়া ফিরিয়া আসিলেও গুরুশিষ্যে সেইরূপ অকপটভাবে কথা চলিতে লাগিল। একদিন তিনি বলিলেন, 'গুরুজী, প্রায় ৫।৬ মাস যাবৎ সন্ধ্যা আহ্নিক কর্‌ছি, কিন্তু কিছু light পাচ্ছিনে।' স্বামিজী বলিলেন, 'ভাষায় (অর্থাৎ দুর্ব্বোধ্য কঠিন সংস্কৃত ভাষার পরিবর্ত্তে সহজবোধ্য চলিত ভাষায়) ভগবানকে ডাকবি।' এই বলিয়া গায়ত্রীর অর্থ বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। আর একদিন স্বামিজীর জনৈক ব্রহ্মচারী শিষ্যের শিখা দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এটি কি?'

ব্রহ্মচারী উত্তর প্রদানে কিছু ইতস্ততঃ করায় স্বামিজী বলিলেন, 'এ ব্রহ্মচারী কি না, তাই শিখা রাখিয়াছে।' শিষ্য অমনি উত্তর করিল—'আর আপনি বুঝি পরমহংস হয়েছেন!' যাহা হউক, ইনি প্রাণপণে স্বামিজী ও তাঁহার শিষ্যগণের সেবা করিতে লাগিলেন। এখানকার কলেজের একটি অধ্যাপক স্বামিজীর নিকট খুব যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্যোগে দিল্লীর কয়েকজন ভদ্রলোকের একটি ক্ষুদ্র সভা হইল। স্বামিজী সমাগত সকলেরই প্রশ্নের সুমীমাংসা করিয়া দিলেন। এখান হইতে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে দিল্লীর কেল্লা, কুতবমিনার, প্রাচীন দিল্লী প্রভৃতি সমুদয় দ্রষ্টব্য বিষয় দর্শন করা হইল। স্বামিজী সঙ্গিগণকে এই সকল ভগ্নাবশেষ দেখাইয়া কত প্রাচীন শিল্পের কথা, কত ইতিহাসের কথা গল্পের মত বলিয়া যাইতে লাগিলেন। সেই সকল কথার কিয়দংশও রক্ষা করিতে পারিলে এক একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ হইতে পারিত।

দিল্লী হইতে স্বামিজী আলোয়ারে চলিলেন। চারিদিকে রাজপুতানার বালির পাহাড় দেখা যাইতে লাগিল। ট্রেণ রেওয়াড়ি ষ্টেশনে পৌছিলে দেখা গেল, তথায় খেতড়ির রাজার লোক পাল্কী, উট, রথ, অশ্ব প্রভৃতি নানাবিধ যান লইয়া উপস্থিত। খেতড়ি জয়পুরের অধীন একটি ক্ষুদ্ররাজ্য, জয়পুর শহর হইতে মরুভূমির মধ্য দিয়া প্রায় ৯০ মাইল পথ যাইতে হয়। রেওয়াড়ি ষ্টেশন হইতে প্রায় ২০ মাইল কম পড়ে। কিন্তু স্বামিজী কিরূপে :একেবারে খেতড়ি যাইবেন? তাঁহাকে যে আলোয়ার যাইতে হইবে। যাঁহারা 'উদ্বোধনে' 'আলোয়ারে

শ্রীবিবেকানন্দ’ প্রবন্ধ পড়িয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, আমেরিকা যাত্রার পূর্ব্বে এই স্থানে স্বামিজী আসিয়া প্রায় একমাস ছিলেন। তখন অনেক যুবক তাঁহার চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শিষ্য হন। তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ আহ্বান কি তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন ? আলোয়ারে এই ভক্ত শিষ্যগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া ৪।৫ দিন তথায় থাকিলেন ও এক আধটি বক্তৃতাও করিলেন। পরে জয়পুর যাওয়া হইল। এখানেও স্থানীয় বহু বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সমাগত হইতে লাগিলেন। স্বামিজী খেতড়ির রাজার বাংলোয় রহিলেন। শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া স্বামিজী বলিতে লাগিলেন,—এই স্থানেই একদিন সামান্য ফকির বেশে আসিয়াছিলাম—তখন রাজপাচক অনেক মুখনাড়া দিয়া দিনান্তে চারিটি খাইতে দিয়া যাইত আর এখন পালকের গদিতে শয়নের বন্দোবস্ত হইতেছে, এখন কত লোক সেবার জন্য অহরহঃ জোড়হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এ কথাটি অতি সত্য যে ‘অবস্থা পূজ্যতে রাজন্ ন শরীরং শরীরিণাং।’ জয়পুর হইতে ৯০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া খেতড়ি যাওয়া হইল। এদিকে মরুভূমির মধ্য দিয়া যাওয়া হইতেছে, যাই পড়াওয়ে (পথের মধ্যে বিশ্রামার্থ স্থান) পঁহুছান হইতেছে, অমনি বেদান্ত অধ্যাপনা আরম্ভ। কেহ উষ্ট্রপৃষ্ঠে, কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ বা রথযোগে চলিতেছে। কত প্রসঙ্গ, কত আনন্দের কথাই হইতেছে। এই সময়ে স্বামিজী রাত্রে একটা পড়াওয়ে ভূত দেখিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন।

খেতড়ি পঁহুছিতে প্রায় বার মাইল আছে, এমন সময় রাজা

অগ্রবর্ত্তী হইয়া আসিয়া স্বামিজীর পাদবন্দনা করিলেন এবং নিজের ছয় ঘোড়ার গাড়ীতে স্বামিজীকে তুলিয়া লইয়া খেতড়িতে উপনীত হইলেন।

এদিকে খেতড়িতে মহোৎসব পড়িয়া গিয়াছে। রাজা অল্পদিন হইল পাশ্চাত্যদেশ ভ্রমণ করিয়া তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন। তাই প্রজাবর্গ রাজাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য নানাবিধ আয়োজন করিয়াছে। স্বামিজীর আগমনে তাহাদের এই উৎসাহ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। সমারোহ-সহকারে ভোজ, অগ্নিক্রীড়া প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইল। অভিনন্দনপত্রও পড়া হইল। স্বামিজী ও রাজাজী উভয়েই উপযুক্ত উত্তর প্রদান করিলেন। একটি পর্ব্বতচূড়ায় অবস্থিত মনোহর বাংলোয় স্বামিজী ও তাঁহার সঙ্গিগণের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

১৭ই ডিসেম্বর স্থানীয় স্কুলগৃহে একটি সভা আহূত হইয়া বিভিন্ন সমিতি হইতে রাজাজী ও স্বামিজী উভয়কে অভিনন্দন দেওয়া হইল। এই দিন স্কুলের সাম্বৎসরিক পারিতোষিক বিতরণের দিনও স্থির হইয়াছিল। রাজাজী সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধে স্বামিজী ছাত্রদিগকে পুরস্কার বিতরণ করিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন ও অন্যান্য সমিতি হইতে রাজাজীকে যে অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছিল, তাহার উত্তরে তিনি সকলকে, বিশেষতঃ রামকৃষ্ণ মিশনকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন; কারণ, মিশনের প্রধান অধ্যক্ষই (স্বামিজী) তথায় উপস্থিত। তিনি বলিলেন, তাঁহার পিতা তাঁহার পূর্ব্বে যে সকল ভাব লইয়া কার্য্য করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি সেই ভাবসমূহের যাহাতে অধিকতর বিস্তৃতি

হয়, তাহার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি আরও বলিলেন, তাঁহার রাজত্বকালে শিক্ষাবিভাগের খুব উন্নতি হইয়াছে, এই বৎসরেই তিনটি নূতন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে আর পুরাতন স্কুলটিরও বেশ উন্নতি হইতেছে; তিনি অঙ্গীকার করিলেন, চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনের জন্য তিনি শীঘ্রই চেষ্টা করিবেন।

তাঁহার বক্তৃতার পর স্বামিজী সংক্ষেপে একটি বক্তৃতা করিলেন। তিনি রাজাজীকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন, ভারতের উন্নতিকল্পে তিনি যৎকিঞ্চিৎ যাহা করিয়াছেন রাজাজীর সহিত সাক্ষাৎ না হইলে তাহাও তিনি করিতে পারিতেন না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের তুলনা করিয়া তিনি বলিলেন, পাশ্চাত্যদেশের আদর্শ—ভোগ ও প্রাচ্যদেশের—ত্যাগ। তিনি খেতড়িনিবাসী যুবকগণকে পাশ্চাত্য আদর্শের চাকচিক্যে বিহ্বল না হইয়া দৃঢ়ভাবে প্রাচ্য আদর্শের অনুসরণ করিতে উপদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন—শিক্ষা অর্থে মানবের মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই যে ঈশ্বরত্ব রহিয়াছে, তাহাকেই প্রকাশ করা। অতএব শিশুগণকে শিক্ষা দিতে হইলে তাহাদের প্রতি অগাধ বিশ্বাস-সম্পন্ন হইতে হইবে, বিশ্বাস করিতে হইবে যে, প্রত্যেক শিশুই অনন্ত ঈশ্বরীয় শক্তির আধারস্বরূপ, আর আমাদিগকে তাহার মধ্যে অবস্থিত সেই নিদ্রিত ব্রহ্মকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার সময় আর একটি বিষয় আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে; তাহারাও যাহাতে নিজেরা চিন্তা করিতে শিখে, তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে হইবে। এই মৌলিক চিন্তার অভাবই ভারতের বর্ত্তমান হীনাবস্থার কারণ। যদি এই ভাবে ছেলেদের

শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে তাহারা মানুষ হইবে এবং জীবনসংগ্রামে নিজেদের সমস্যা পূরণে সমর্থ হইবে।

২০শে ডিসেম্বর স্বামিজী শিষ্যগণের সহিত যে বাংলায় ছিলেন, তথায় প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরিয়া বেদান্ত সম্বন্ধে একটি অতি সুন্দর বক্তৃতা করেন। স্থানীয় সমুদয় ভদ্রলোক এবং কয়েকটি ইউরোপীয় মহিলা উপস্থিত ছিলেন। রাজাজী সভাপতি হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, এখানে কোন সাঙ্কেতিকলিখনবিৎ না থাকাতে সমগ্র বক্তৃতাটি পাওয়া যায় নাই। তাঁহার দুইজন শিষ্য সেই সময়ে যে নোট লইয়াছিলেন, তাহারই অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

খেতড়ি বক্তৃতা

গ্রীক ও আর্য্য—প্রাচীনকালের এই দুই জাতি বিভিন্ন অবস্থাচক্রে স্থাপিত হইয়া প্রথমোক্ত জাতির প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মধুর, যাহা কিছু লোভনীয়, তাহার মধ্যে স্থাপিত হইয়া এবং বীর্য্যপ্রদ আবহাওয়া পাইয়া, এবং শেষোক্ত জাতি চতুষ্পার্শ্বে সর্ব্ববিধ মহিমময় ভাবের মধ্যে স্থাপিত হইয়া এবং অধিক শারীরিক পরিশ্রমে অননুকূল আবহাওয়া পাইয়া দুই প্রকার বিভিন্ন ও বিশিষ্ট সভ্যতার সূচনা করিয়াছিলেন; অর্থাৎ গ্রীকগণ বহিঃপ্রকৃতির অনন্ত ও আর্য্যগণ অন্তঃপ্রকৃতির অনন্ত আলোচনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। একজন বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের আলোচনায় ব্যস্ত হইলেন, অপরে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন। জগতের সভ্যতায় উভয়কেই তাহাদের নির্দ্দিষ্ট বিশেষ অংশ অভিনয় করিতে হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে যে

একজনকে অপরের নিকট ধার করিতে হইবে, তাহা নহে, পরস্পরের সহিত কেবল পরস্পরকে পরিচিত হইতে হইবে— পরস্পরের সহিত পরস্পরের তুলনা করিতে হইবে। তাহা হইলে উভয়েই লাভবান্ হইবে। আর্য্যগণের প্রকৃতি বিশ্লেষণপ্রিয়। গণিত ও ব্যাকরণবিদ্যায় তাঁহারা অদ্ভুত ফললাভ করিয়াছিলেন, আর মনের বিশ্লেষণবিদ্যায় তাঁহারা চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। আমরা পিথাগোরাস, সক্রেটিস, প্লেটো এবং ইজিপ্তের নিওপ্লেটোনিষ্টদের ভিতর ভারতীয় চিন্তার কিছু কিছু চিহ্ন দেখিতে পাই।

তারপর তিনি বিস্তারিতভাবে ইউরোপের উপর ভারতীয় চিন্তার প্রভাবের চিহ্ন কিরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার বর্ণনা করিয়া দেখাইলেন যে, বিভিন্ন সময়ে ভারতীয় চিন্তা স্পেন, জার্ম্মানী ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ভারতীয় রাজপুত্র দারাশুকো পারসীতে উপনিষদ্ অনুবাদ করাইয়াছিলেন। শোপেনহাউয়ার নামক জার্ম্মান দার্শনিক উহার একখানি লাটিন অনুবাদ দেখিয়া উহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। তাঁহার দর্শনে উপনিষদের যথেষ্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার পরই কান্তের দর্শনে উপনিষদের উপদেশের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপে সাধারণতঃ শব্দবিদ্যাচর্চ্চার জন্যই পণ্ডিতগণ সংস্কৃত আলোচনা করিয়া থাকেন। তবে অধ্যাপক ডয়সনের ন্যায় ব্যক্তিও আছেন, যাঁহাদের অন্য কারণে নহে, দর্শনচর্চ্চার জন্যই দর্শনচর্চ্চায় আগ্রহ আছে। স্বামিজী আশা করেন, ভবিষ্যতে ইউরোপে সংস্কৃতচর্চ্চায়

আরো অধিক যত্ন দেখা যাইবে। তারপর স্বামিজী দেখাইলেন, পূর্ব্বকালে 'হিন্দু' শব্দে সিন্ধুনদের পরপারবাসিগণকে বুঝাইত—তখন ঐ শব্দের একটা সার্থকতা ছিল। কিন্তু এখন উহা নিরর্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে—ঐ শব্দের দ্বারা এখন বর্ত্তমান হিন্দু জাতি বা ধর্ম্ম কিছুই বুঝাইতে পারে না, কারণ, সিন্ধুনদের পারে এখন নানাধর্ম্মাবলম্বী নানাজাতীয় লোক বাস করিয়া থাকে।

অতঃপর তিনি বেদ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য বিস্তারিতভাবে বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, বেদ কোন ব্যক্তিবিশেষের বাক্য নহে। বেদনিবদ্ধ ভাবরাশি ধীরে ধীরে বিকাশ হইয়া পরিশেষে পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহার পর সেই গ্রন্থ প্রামাণ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বামিজী বলিলেন, অনেক ধর্ম্মই এইরূপ গ্রন্থে নিবদ্ধ, গ্রন্থসমূহের প্রভাবও অসামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। হিন্দুদের এই বেদরাশিরূপ গ্রন্থ রহিয়াছে, তাহাদিগকে এখনও সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া ঐ গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে। তবে বেদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, পর্ব্বতদৃঢ় ভিত্তির উপর এই বেদবিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। বেদরাশির কলেবর প্রকাণ্ড। এই বেদের শতকরা ৯৯ ভাগ নষ্ট হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ পরিবারে এক একটি বেদাংশের চর্চ্চা হইত। সেই পরিবারের লোপের সঙ্গে সঙ্গে সেই বেদাংশও লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু যাহা এখনও পাওয়া যায়, তাহাও এক প্রকাণ্ড হলে ধরে না। এই বেদরাশি অতি প্রাচীনতম, সরল—অতি সরল ভাষায় লিখিত। ইহার ব্যাকরণও এত অপরিণত যে, অনেকে মনে করেন, বেদাংশবিশেষের কোন অর্থই নাই।

ইহার পর তিনি বেদের দুইভাগ—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। কর্ম্মকাণ্ড বলিতে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ বুঝায়। ব্রাহ্মণে যাগযজ্ঞের কথা আছে। সংহিতা অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, জগতী প্রভৃতি ছন্দে রচিত স্তোত্রাবলী—সাধারণতঃ উহাতে বরুণ বা ইন্দ্র বা অন্য কোন দেবতার স্তুতি আছে। তারপর প্রশ্ন উঠিল, এই দেবতারা কাহারা। এই সম্বন্ধে যেমন এক এক মতবাদ উঠিতে লাগিল, অন্যান্য মতবাদ দ্বারা আবার সেই সকল মত খণ্ডিত হইতে লাগিল। এইরূপ অনেক দিন ধরিয়া চলিয়াছিল।

তারপর তিনি উপাসনা-প্রণালী-সম্বন্ধীয় বিভিন্ন ধারণাসমূহের কথা বলিতে লাগিলেন। প্রাচীন বাবিলনে আত্মার ধারণা এই ছিল যে, মানুষ মরিলে তাহা হইতে আর একটি দেহ বাহির হইয়া যায়, উহার স্বাতন্ত্র্য নাই, আর উহা মূল দেহের সহিত সম্বন্ধ কখনই ছিন্ন করিতে পারে না। এই 'দ্বিতীয়' শরীরেরও মূল শরীরের ন্যায় ক্ষুধাতৃষ্ণা মনোবৃত্তি আদিতে তাঁহারা বিশ্বাসী ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্বাসও ছিল যে, মূল দেহটিতে কোনরূপ আঘাত করিলে 'দ্বিতীয়'টিও আহত হইবে। মূল দেহটি নষ্ট হইলে 'দ্বিতীয়'টিও নষ্ট হইবে। এই কারণে মৃত দেহ রক্ষা করিবার প্রথার সৃষ্টি হয়। তাহা হইতেই মমি, সমাধিমন্দির প্রভৃতির উৎপত্তি। ইজিপ্ট ও বাবিলনবাসী এবং য়াহুদীগণ ইহার অধিক আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই, তাঁহারা আত্মতত্ত্বে পঁহুছিতে পারেন নাই! এদিকে ম্যাক্সমূলার বলেন, ঋগ্বেদে পিতৃ-উপাসনার সামান্য চিহ্নমাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় না। তথায়, মমিগণ একদৃষ্টে আমাদের দিকে চাহিয়া আছে, এই বীভৎস ও ভীষণ দৃশ্য দেখা

যায় না। দেবগণ মানবের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন, উপাস্য ও উপাসকের সম্বন্ধ বেশ সহজ স্বাভাবিক। উহার মধ্যে কোনরূপ দুঃখের ভাব নাই। উহাতে সরল হাস্যের অভাব নাই। স্বামিজী বলিলেন, বেদের কথা বলিতে বলিতে তিনি যেন দেবতাদের হাস্যধ্বনি স্পষ্ট শুনিতেছেন। বৈদিক ঋষিগণ হয়ত সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদের ভাব ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয় নিশ্চিত ভাবোর্ব্বর ছিল, আমরা তাঁহাদের তুলনায় পশুতুল্য।

তারপর তিনি অনেক বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, তাঁহার কথিত তত্ত্বের সমর্থন করিতে লাগিলেন—'যেখানে পিতৃগণ নিবাস করেন, তাঁহাকে সেই স্থানে লইয়া যাও—যেখানে কোন দুঃখ শোক নাই' ইত্যাদি। এইরূপে এদেশে এই ভাবের আবির্ভাব হইল যে, যত শীঘ্র শবদেহ দগ্ধ করিয়া ফেলা যায়, ততই ভাল। তাঁহাদের ক্রমশঃ এই ধারণা হইল যে, স্থূলদেহাতিরিক্ত একটি সূক্ষ্মতর দেহ আছে; উহা স্থূলদেহ ত্যাগের পর এমন এক স্থানে চলিয়া যায়, যেখানে কেবল আনন্দ, যেখানে কোন দুঃখ নাই। সেমিটিক ধর্ম্মে ভয় ও কষ্টের ভাব প্রচুর। তাঁহাদের ধারণা এই ছিল যে, মানুষ ঈশ্বর দর্শন করিলেই মরিবে। কিন্তু প্রাচীন ঋগ্বেদের ভাব এই যে, মানুষ যদি ঈশ্বরকে চাক্ষুষ দেখিতে পায়, তবেই তাহার যথার্থ জীবন আরম্ভ হইবে।

প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিল যে, এই দেবগণ কি? ইন্দ্র সময়ে সময়ে মানবকে সাহায্য করিয়া থাকেন। কখন কখন ইন্দ্র অতিরিক্ত সোমপানে মত্ত বলিয়াও বর্ণিত; স্থানে স্থানে তাঁহাকে

সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বব্যাপী প্রভৃতি বিশেষণও প্রদত্ত হইয়াছে। বরুণদেব সম্বন্ধেও এইরূপ নানাবিধ ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়, আর এই সকল বর্ণনাত্মক মন্ত্রগুলি স্থানে স্থানে অতি অপূর্ব্ব। তারপর আর এক কথা। বেদের ভাষা অতিশয় মহদ্ভাবদ্যোতক। অতঃপর স্বামিজী প্রলয়বর্ণনাত্মক বিখ্যাত নাসদীয় সূক্ত—যাহাতে অন্ধকার অন্ধকারের দ্বারা আবৃত বলিয়া বর্ণিত আছে—আবৃত্তি করিয়া বলিলেন, যাঁহারা এই সকল মহান্ ভাব এইরূপ কবিত্বের ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা যদি অসভ্য হন, তবে আমরা কি? সেই ঋষিদের উপর অথবা তাঁহাদিগের দেবতা ইন্দ্রবরুণাদির উপর তিনি কোনরূপ সমালোচনা করিতে অক্ষম। এ যেন ক্রমাগত পট পরিবর্ত্তন চলিতেছে আর সকলের পশ্চাতে সেই এক বস্তু রহিয়াছেন, যাঁহাকে জ্ঞানিগণ বহুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।" এই দেবগণের বর্ণনা অতি রহস্যময়, অপূর্ব্ব, অতি সুন্দর। উহার দিকে যেন ঘেঁষিবার জো নাই, উহা এত সূক্ষ্ম যে, স্পর্শমাত্রেই যেন উহা ভগ্ন হইয়া যাইবে, মরীচিকার মত অন্তর্হিত হইবে।

একটি বিষয় তাঁহার নিকট খুব স্পষ্ট ও সম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয় যে গ্রীকদের ন্যায় আর্য্যগণও জগৎসমস্যা মীমাংসার জন্য প্রথমে বহিঃপ্রকৃতির দিকে ধাবমান হইয়াছিলেন—সুন্দর রমণীয় বাহ্য জগৎ তাঁহাদিগকেও প্রলোভিত করিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ভারতের এইটুকু বিশেষত্ব ছিল যে, এখানে মহদ্ভাবদ্যোতক না হইলে তাহার কোন মূল্যই ছিল না। মৃত্যুর পর কি হইবে, তাহার যথার্থ তত্ত্বনিরূপণেচ্ছা সাধারণতঃ

গ্রীকদের মনে উদয় হয় নাই। এখানে কিন্তু এই প্রশ্ন প্রথম হইতেই বার বার জিজ্ঞাসিত হইয়াছে,—আমি কি? মৃত্যুর পর আমার কি অবস্থা হইবে? গ্রীকদের মতে মানুষ মরিয়া স্বর্গে যায়। স্বর্গে যাওয়ার অর্থ কি? সমুদয়ের বাহিরে যাওয়া, ভিতরে নয়—কেবল বাহিরে—তাহার লক্ষ্য কেবল বাহিরের দিকে, শুধু তাহাই নহে, সে নিজেও যে নিজের বাহিরে। আর যখন সে এমন এক স্থানে গমন করিতে পারিবে, যাহা অনেকটা এই জগতেরই মত, অথচ যেখানে এখানকার দুঃখগুলি নাই, তখনই সে ভাবিল, যাহা কিছু তাহার প্রার্থনীয় সে সব পাইল, জগতের দুঃখবিবর্জ্জিত সুখ লাভ করিল, অমনি সে তৃপ্ত হইল—তার ধর্ম্ম আর ইহার উপর উঠিতে পারিল না। হিন্দুদের মন কিন্তু ইহাতে তৃপ্ত হয় নাই। তাহাদের বিচারে স্বর্গও স্থূল জগতের অন্তর্গত। হিন্দুরা বলেন, যাহা কিছু সংযোগোৎপন্ন, তাহারই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তাঁহারা বহিঃপ্রকৃতিকে প্রশ্ন করিলেন,—'আত্মা কি তাহা কি তুমি জান?' উত্তর আসিল, 'না।' 'ঈশ্বর আছেন কি?' প্রকৃতি উত্তর দিল—'জানি না।' তাঁহারা তখন প্রকৃতির নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহারা বুঝিলেন, বহিঃপ্রকৃতি যতই মহান্ হউক, উহা দেশকালে সীমাবদ্ধ। তখন আর একটি বাণী উত্থিত হইল, অন্যবিধ মহান্ ভাবের ধারণা উদয় হইতে লাগিল। সেই বাণী বলিল,—'নেতি, নেতি'—ইহা নহে, ইহা নহে—তখন বিভিন্ন দেবগণ এক হইয়া গেলেন, চন্দ্র সূর্য্য তারা, শুধু তাহাই কেন, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এক হইয়া গেল—তখন ধর্ম্মের এই নূতন আদর্শের উপর উহার আধ্যাত্মিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

'ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্।' ইত্যাদি

"তথায় সূর্য্যও প্রকাশ পায় না, চন্দ্রতারকাও নহে—এই বিদ্যুৎও তথায় প্রকাশ পায় না, এই সামান্য অগ্নির আর কথা কি? তিনি প্রকাশ পাইলেই সমুদয় প্রকাশিত হয়, তাঁহার প্রকাশেই এই সমুদয় প্রকাশ পাইয়া থাকে।" আর সেই সীমাবদ্ধ, অপরিণত, ব্যক্তিবিশেষ, সকলের পাপপুণ্যের বিচারকারী ক্ষুদ্র ঈশ্বরের ধারণা রহিল না, আর বাহিরে অন্বেষণ রহিল না, নিজের ভিতরে অন্বেষণ আরম্ভ হইল।

'ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি।'

এইরূপে উপনিষৎসমূহ ভারতের বাইবেল হইয়া দাঁড়াইল। এই উপনিষদ্‌ও অসংখ্য আর ভারতে যত বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত, সবই উপনিষদ্ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

তারপর স্বামিজী দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত মতের কথা উত্থাপন করিয়া উহাদের এইভাবে সমন্বয় করিলেন—এই গুলির প্রত্যেকটি যেন এক একটি সোপানস্বরূপ—এক একটি সোপান অতিক্রম করিয়া পরবর্ত্তী সোপানে আরোহণ করিতে হয়, সর্ব্বশেষে অদ্বৈতবাদে স্বাভাবিক পরিণতি—আর ইহার শেষ কথা 'তত্ত্বমসি'। প্রাচীন ভাষ্যকারগণ, যথা শঙ্করাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য ও মধ্বাচার্য্য যদিও সকলেই উপনিষৎকেই একমাত্র প্রামাণ্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তথাপি সকলেই এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, উপনিষদ্ একটিমাত্র মত শিক্ষা দিতেছেন। শঙ্করাচার্য্য এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে তাঁহার মতে উপনিষদ্ কেবল অদ্বৈতপর, উহাতে অন্য কোন উপদেশ নাই; সুতরাং যেখানে স্পষ্ট দ্বৈতভাবাত্মক শ্লোক পাইয়াছেন

নিজ মত পোষকতার জন্য তাহা হইতে টানিয়া বুনিয়া বিকৃত অর্থ করিয়াছেন। রামানুজ ও মধ্বাচার্য্যও খাঁটি অদ্বৈতভাব-প্রতিপাদক বেদাংশ দ্বৈত ব্যাখ্যা করিয়া ঠিক তাহাই করিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে, উপনিষদ্ এক তত্ত্ব শিক্ষা দিতেছেন, কিন্তু ঐ তত্ত্ব সোপানারোহণন্যায়ে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। তারপর তিনি বলিলেন, বর্ত্তমান ভারতে ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব অন্তর্হিত হইয়াছে, কেবল কতকগুলি বাহ্য অনুষ্ঠানমাত্র পড়িয়া আছে। এখানকার লোকে এখন হিন্দুও নহে, বৈদান্তিকও নহে, তাহারা ছুঁৎমার্গী। রান্নাঘর এখন তাহাদের মন্দির এবং হাঁড়িবর্ত্তন দেবতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এভাব দূর হওয়া চাই-ই চাই আর যত শীঘ্র ইহা চলিয়া যায়, ততই মঙ্গল। উপনিষৎসমূহ নিজ মহিমায় উদ্ভাসিত হউক আর বিভিন্ন সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ যেন না থাকে। তারপর তিনি উপনিষদে বর্ণিত দুইটি পক্ষীর উদাহরণ দিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন। শ্রোতৃবৃন্দ মোহিত হইলেন।

স্বামিজীর শরীর তত সুস্থ না থাকায় এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়াতে অর্দ্ধঘণ্টা বিশ্রাম করিলেন। শ্রোতৃমণ্ডলী উৎসুকভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অর্দ্ধঘণ্টা পরে স্বামিজীর পুনরায় প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা বক্তৃতার পর সভাভঙ্গ হইল।

তিনি বুঝাইলেন যে, জ্ঞান অর্থে বহুত্বের মধ্যে একত্বের আবিষ্কার, আর যখনই কোন বিজ্ঞান সমুদয় বিভিন্নতার অন্তরালে অবস্থিত একত্ব আবিষ্কার করে, তখনই তাহা উচ্চতম সীমায় আরোহণ করে। অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের ন্যায় জড়বিজ্ঞানেও ইহা সত্য।

খেতড়ি হইতে প্রায় সকল শিষ্য ও সঙ্গিগণকে বিদায় দিয়া একজনমাত্র শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া স্বামিজী পুনরায় জয়পুরে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজাজীও সঙ্গে গেলেন। রাজাজীর সভাপতিত্বে স্থানীয় এক দেবালয়ে স্বামিজীর এক বক্তৃতা হইল। প্রায় ৫০০ শ্রোতা বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন। জয়পুর হইতে বহির্গত হইয়া স্বামিজী যোধপুর, আজমীর, খাণ্ডোয়া প্রভৃতি স্থান হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন।

ইংলণ্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব

১৮৯৮ সালের ১১ই মার্চ্চ স্বামিজীর শিষ্যা সিষ্টার নিবেদিতা (মিস্ এম্, ই, নোব্ল্) কলিকাতার ষ্টার থিয়েটারে 'ইংলণ্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব' সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। স্বামিজী সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমেই উঠিয়া সিষ্টারকে সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচয় করিয়া দিবার জন্য নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেন :—

সম্ভ্রান্ত মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আমি যখন এশিয়ার পূর্ব্বভাগে ভ্রমণ করিতেছিলাম, একটি বিষয়ে আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। আমি দেখিলাম, ঐ সকল স্থানে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তা বিশেষভাবে প্রবেশ করিয়াছে। চীন ও জাপানী মন্দিরসমূহের প্রাচীরে কতকগুলি সুপরিচিত সংস্কৃত মন্ত্র লিখিত দেখিয়া আমি যে কিরূপ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলাম, তাহা আপনারা অনায়াসে অনুমান করিতে পারেন।

পূর্ব্ব এশিয়ায় ভারতীয় ধর্ম্মের প্রভাব

সম্ভবতঃ আপনারা অনেকেই জানিয়া সুখী হইবেন যে, ঐগুলি সমুদয়ই প্রাচীন বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত। আমাদের বঙ্গীয় পূর্ব্বপুরুষগণের ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে মহোৎসাহের কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ উহারা আজ পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে।

পাশ্চাত্যদেশে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব

এই সকল এশিয়ান্তর্গত দেশ ছাড়িয়া দিলেও ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব এত বহুদূরব্যাপী ও স্পষ্ট যে, এমন কি, পাশ্চাত্যেদেশেও ঐসকল স্থানের আচারব্যবহারাদির গভীর মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিয়া, আমি তথায়ও উহার প্রভাবের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। ভারতবাসীর আধ্যাত্মিক ভাবসকল ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয়ত্রই গমন করিয়াছিল। ইহা এক্ষণে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। সমগ্র জগৎ ভারতের অধ্যাত্মতত্ত্বের নিকট কতদূর ঋণী এবং ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তি মানবজাতির অতীত ও বর্ত্তমান জীবন গঠনে কিরূপ শক্তিশালী উপাদান, তাহা এক্ষণে সকলেই অবগত আছেন। এ সব ত অতীত কালের ঘটনা।

আমি জগতে আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাই। তাহা এই যে, সেই আশ্চর্য্য এঙ্গ্‌লো-স্যাক্সন জাতি সামাজিক উন্নতি এবং সভ্যতা ও মনুষ্যত্বের বিকাশরূপ অত্যদ্ভুত শক্তির বিকাশ করিয়াছে। শুধু তাহাই কেন, আমি আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলিতে পারি, এঙ্গ্‌লো-স্যাক্সনের শক্তির প্রভাব ব্যতীত, আজ আমরা যেমন ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব আলোচনা করিবার জন্য এই সভায় সমবেত হইয়াছি, তাহাও

হইতাম না। আর পাশ্চাত্যদেশ হইতে প্রাচ্যে—আমাদের স্বদেশে—ফিরিয়া আমরা দেখিতে পাই, সেই এঙ্গ্‌লো-স্যাক্সন শক্তি তাহার সমুদয় দোষ সত্ত্বেও তাহার বিশিষ্ট সুনির্দ্দিষ্ট গুণগুলি লইয়া এখানে তাহার কার্য্য করিতেছে। আর আমার বিশ্বাস, এতদিনে অবশেষে এই উভয় জাতির সম্মিলনের সুমহৎ ফল সিদ্ধ হইয়াছে। ব্রিটিশ জাতির বিস্তার ও উন্নতির ভাব আমাদিগকে বলপূর্ব্বক উন্নতির পথে প্রধাবিত করিতেছে আর ইহাও আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রীকদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত, আর গ্রীক-সভ্যতার প্রধান ভাব—প্রকাশ বা বিস্তার।. ভারতে আমরা মননশীল বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সময়ে সময়ে আমরা এত অধিক মননশীল হই যে, ভাব প্রকাশের শক্তি কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। ক্রমে এই দাঁড়াইল যে, জগতের সমক্ষে আমাদের ভাব ব্যক্ত করিবার শক্তি আর প্রকাশিত হইল না, আর তাহার ফল কি হইল? ফল এই হইল যে, আমাদের যাহা কিছু ছিল, সবই গোপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম ব্যক্তিবিশেষের ভাবগোপনেচ্ছায় উহা আরম্ভ হইল আর শেষে উহা গোপন করা জাত অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইল। এখন আমাদের ভাবপ্রকাশের শক্তির এত অভাব হইয়াছে যে, এক্ষণে আমরা মৃত জাতি বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকি। ভাবপ্রকাশ ব্যতীত আমাদের বাঁচিবার সম্ভাবনা কোথায়?

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সম্মিলনের ফল

ভারত জাগিয়া সমগ্র জগৎকে তাহার অধ্যাত্মবিদ্যা প্রদানে অগ্রসর হইয়াছে

পাশ্চাত্য সভ্যতার মেরুদণ্ড—বিস্তার ও ভাবাভিব্যক্তি। ভারতে এঙ্গ্‌লো-স্যাক্সন জাতির কার্য্যসমূহের মধ্যে এই যে কার্য্যের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিলাম, তাহা আমাদের জাতিকে জাগাইয়া আবার তাহাকে নিজ ভাব প্রকাশে প্রবর্ত্তিত করিবে, আর এখনই উহা সেই প্রবল এঙ্গ্‌লো-স্যাক্সন জাতি উদ্ভাবিত রথ্যাদি ভাববিনিময়োপযোগী উপায় সকলের সহায়তা লইয়া ভারতকে জগতের সমক্ষে নিজ গুপ্ত রত্নসমূহ বাহির করিয়া দিতে উৎসাহিত করিতেছে। এঙ্গ্‌লো-স্যাক্সন জাতি ভারতের ভাবী উন্নতির পথ খুলিয়া দিয়াছে আর আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ভাবসমূহ এক্ষণে যেরূপ ধীরে ধীরে বহুস্থানে তাহার প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। যখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রথমে তাঁহাদের সত্য ও মুক্তির মঙ্গলময়ী বার্ত্তা ঘোষণা করেন, তখন তাঁহাদের কত সুবিধা ছিল। মহান্ বুদ্ধ কিরূপে সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবরূপ অতি উচ্চমতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন? তখনও এখানে—যে ভারতকে আমরা প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া থাকি, সেই ভারতে—প্রকৃত আনন্দ লাভ করিবার যথেষ্ট সুবিধা ছিল এবং আমরা সহজেই জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আমাদের ভাব প্রচার করিতে পারিতাম, কিন্তু এক্ষণে আমরা তদপেক্ষা অধিক অগ্রসর হইয়া এঙ্গ্‌লো-স্যাক্সন জাতিতে পর্য্যন্ত আমাদের ভাব প্রচারে কৃতকার্য্য হইয়াছি।

এই প্রকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এক্ষণে চলিতেছে এবং আমরা দেখিতেছি যে, আমাদের দেশ হইতে প্রেরিত বার্ত্তা তাহারা

শুনিতেছে, আর শুধু যে শুনিতেছে তাহাও নহে, উহার প্রত্যুত্তরও দিতেছে। ইতোমধ্যেই ইংলণ্ড তাহার কতিপয় মহামনীষীকে আমাদের কার্য্যের সাহায্যের জন্য প্রদান করিয়াছে। সকলেই আমার বন্ধু মিস্ মূলারের কথা শুনিয়াছেন এবং বোধ হয় অনেকে তাঁহার সহিত পরিচিতও আছেন—তিনি এক্ষণে এখানে এই প্লাটফর্ম্মে উপস্থিত আছেন। এই সম্ভ্রান্তবংশসম্ভূতা সুশিক্ষিতা মহিলা ভারতের প্রতি অগাধপ্রেমবশে তাঁহার সমগ্র জীবন ভারতের কল্যাণের জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন এবং ভারতকে ও ভারতবাসীকে তাঁহার গৃহ ও পরিবাররূপে পরিগণিত করিয়াছেন। আপনাদের মধ্যে প্রত্যেকেই সেই সুপ্রসিদ্ধ উদারস্বভাবা ইংরাজ মহিলার নামের সহিত পরিচিত আছেন—তিনিও তাঁহার সমগ্র জীবন ভারতের কল্যাণ ও ভারতের পুনরুজ্জীবনের জন্য নিয়োজিত করিয়াছেন। আমি মিসেস্ বেসাণ্টকে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিতেছি। ভদ্র-মহোদয়গণ, অদ্য এই প্লাটফর্ম্মে দুইজন মার্কিন মহিলা রহিয়াছেন—তাঁহারাও তাঁহাদের হৃদয়াভ্যন্তরে সেই একই উদ্দেশ্য পোষণ করিতেছেন; আর আমি আপনাদিগকে নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি যে, তাঁহারাও আমাদের দরিদ্র দেশের সামান্য কল্যাণের জন্য তাঁহাদের জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। আমি এই সুযোগে আপনাদিগের নিকট আমাদের জনৈক শ্রেষ্ঠ স্বদেশবাসীর নাম স্মরণ করাইয়া দিতে চাই—ইনি ইংলণ্ড, আমেরিকা দেখিয়াছেন, ইঁহার প্রতি আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে, ইঁহাকে আমি বিশেষ

পাশ্চাত্যদেশ উহার প্রতিদানস্বরূপ তদ্দেশের সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণকে ভারতের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিতেছে

শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকি, ইনি আধ্যাত্মিক রাজ্যে বহুদূর অগ্রসর ও মহামনীষী, দৃঢ় অথচ নিস্তব্ধভাবে আমাদের দেশের কল্যাণের জন্য কার্য্য করিতেছেন ; অন্যত্র বিশেষ কার্য্য না থাকিলে ইনি অদ্য এই সভায় নিশ্চিত উপস্থিত থাকিতেন—আমি শ্রীযুত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিতেছি। আর এক্ষণে ইংলণ্ডে মিস্ মার্গারেট নোব্‌ল্‌কে আর এক উপহাররূপে প্রেরণ করিয়াছেন—ইঁহার নিকট হইতে আমরা অনেক আশা করিয়া থাকি। আর বেশী কিছু না বলিয়া আমি মিস্ নোব্‌ল্‌কে আপনাদের সহিত পরিচয় করিয়া দিলাম—আপনারা এখনই তাঁহার বক্তৃতা শুনিবেন।

সিষ্টার নিবেদিতার পরম উপাদেয় বক্তৃতা সমাপনান্তে স্বামিজী উঠিয়া আবার বলিতে লাগিলেন :—

আমি আর দুই চারিটি কথা মাত্র বলিতে চাই। আমরা এই-মাত্র এই ভাব পাইলাম যে, ভারতবাসী আমরাও কিছু করিতে পারি। আর ভারতবাসীদের মধ্যে বাঙ্গালী আমরা এই কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারি কিন্তু আমি তাহা করি না। তোমাদের মধ্যে একটা অদম্য উৎসাহ, অদম্য চেষ্টা জাগ্রত করিয়া দেওয়াই আমার জীবনব্রত। তুমি অদ্বৈতবাদী হও, বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদী হও বা দ্বৈতবাদী হও, তাহাতে বড় কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু একটি বিষয়, যাহা আমরা দুর্ভাগ্যক্রমে সদা সর্ব্বদা ভুলিয়া যাই, তাহার দিকে আমি তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই—"হে মানব, নিজের প্রতি বিশ্বাসসম্পন্ন হও"। এই উপায়েই কেবল

আত্মবিশ্বাস-সম্পন্ন হও

আমরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসসম্পন্ন হইতে পারি। তুমি অদ্বৈতবাদী হও বা দ্বৈতবাদী হও, তুমি যোগশাস্ত্রে বিশ্বাসী হও বা শঙ্করাচার্য্যে বিশ্বাসী হও, তুমি ব্যাস বা বিশ্বামিত্র যাঁহারই অনুবর্ত্তী হও না কেন তাহাতে বড় কিছু আসিয়া যায় না, কিন্তু বিশেষ প্রণিধানের বিষয় এইটুকু যে, পূর্ব্বোক্ত 'আত্মবিশ্বাসে' ভারতীয় ভাব সমগ্র জগতের অন্যান্য সকল জাতির ভাব হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এক মুহূর্ত্তের জন্য ভাবিয়া দেখ—অন্যান্য সকল ধর্ম্মে ও অন্যান্য সকল দেশে আত্মার শক্তি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত হইয়া থাকে—আত্মাকে তাহারা একরূপ শক্তিহীন দুর্ব্বল মৃত নিশ্চেষ্ট জড়বৎ বিবেচনা করিয়া থাকে ; আমরা কিন্তু ভারতে আত্মাকে অনন্ত বলিয়া মনে করি, আর আমাদের ধারণা—উহা অনন্তকাল ধরিয়া পূর্ণ থাকিবে। আমাদিগকে সর্ব্বদা উপনিষদের উপদেশাবলী স্মরণ রখিতে হইবে।

পাশ্চাত্য অনুকরণ ত্যাগ করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবের আদান-প্রদান করিতে হইবে

তোমাদের জীবনের মহান্ ব্রত স্মরণ কর। ভারতবাসী আমরা, বিশেষতঃ বাঙ্গালী আমরা বহু পরিমাণে বৈদেশিকভাবাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি—উহাতে আমাদের জাতীয় ধর্ম্মের অস্থি-মজ্জা পর্য্যন্ত চর্ব্বণ করিয়া ফেলিতেছে। আমরা আজকাল এত পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছি কেন? আমাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন কেন সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য ভাব ও উপাদানে গঠিত হইয়া পড়িয়াছে? যদি আমরা জাতীয় গৌরবের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে চাই, তবে উহাকে দূরে ফেলিয়া দিতে হইবে ; যদি আমরা উঠিতে চাই, তবে ইহাও আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পাশ্চাত্য দেশ হইতে আমাদের অনেক শিখিবার

আছে। পাশ্চাত্যদেশ হইতে আমাদিগকে তাহাদের বিজ্ঞান শিল্প শিখিতে হইবে, তাহাদের ভৌতিক প্রকৃতি সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানসমূহ শিখিতে হইবে, আবার, পাশ্চাত্যদিগকে আমাদের নিকট আসিয়া ধর্ম্ম ও অধ্যাত্মবিদ্যা শিক্ষা ও আয়ত্ত করিতে হইবে। আমাদিগকে —হিন্দুগণকে—বিশ্বাস করিতে হইবে যে, আমরাই জগতের আচার্য্য। আমরা এখানে রাজনৈতিক অধিকার ও এতদ্রূপ অন্যান্য অনেক বিষয়ের জন্য চীৎকার করিয়া আসিতেছি। বেশ কথা; কিন্তু অধিকার, সুবিধা, এ সকল কেবল মিত্রতা দ্বারাই লাভ হইয়া থাকে আর বন্ধুত্বও কেবল দুইজন সমান সমান ব্যক্তির ভিতর আশা করা যাইতে পারে। এক পক্ষ যদি চিরকালই ভিক্ষা করিতে থাকে, তবে আর তাহাদের মধ্যে পরস্পর কি বন্ধুত্ব হইবে? ওসব কথা মুখে বলা সহজ, কিন্তু আমি বলিতেছি যে, পরস্পর সাহায্য ব্যতীত আমরা কখন শক্তিশালী হইতে পারিব না। এই হেতু আমি তোমাদিগকে ভিক্ষুকভাবে নয়, ধর্ম্মচার্য্যরূপে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যাইবার জন্য আহ্বান করিতেছি। আমাদের কার্য্যক্ষেত্রে যথাসাধ্য বিনিময়বিধি প্রয়োগ করিতে হইবে। যদি আমাদিগকে তাহাদের নিকট ইহজীবনে সুখী হইবার প্রণালী শিখিতে হয়, তবে কেন আমরা তাহার বিনিময়ে তাহাদিগকে অনন্তকাল সুখী হইবার প্রণালী না শিখাইব?

সর্ব্বোপরি সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য কার্য্য করিতে থাক। তোমরা যে আপনাদিগকে ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া খাঁটি হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাক, উহা ছাড়িয়া দাও। মৃত্যু সকলের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে

আর এই অত্যদ্ভুত ঐতিহাসিক সত্যটি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিও যে, জগতের সকল জাতিকে ভারতীয়-সাহিত্য-নিবদ্ধ সনাতন সত্যসমূহ শিক্ষা করিবার জন্য ভারতের পদতলে ধৈর্য্যের সহিত বসিতে হইয়াছে। ভারতের বিনাশ নাই, চীনের নাই, জাপানেরও নাই; অতএব আমাদিগকে আমাদের ধর্ম্মরূপ মেরুদণ্ডের বিষয় সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, আর তাহা করিতে হইলে আমাদের এমন একজন পথপ্রদর্শক চাই, যিনি আমাদিগকে সেই পথ দেখাইয়া দিবেন—যে পথের বিষয় তোমাদিগকে এইমাত্র আমি বলিতেছিলাম। যদি তোমাদের মধ্যে এমন কেহ থাকে, যে ইহা বিশ্বাস না করে, যদি আমাদের মধ্যে এমন কোন হিন্দুবালক থাকে, যে ইহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নয় যে তাহার ধর্ম্ম সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক-ভাবাপন্ন, আমি তাহাকে হিন্দু বলি না। আমার মনে পড়িতেছে, কাশ্মীরের কোন পল্লীগ্রামে জনৈকা বৃদ্ধা মুসলমান মহিলার সহিত কথাপ্রসঙ্গে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আপনি কোন ধর্ম্মাবলম্বী?" তিনি তাঁহার নিজ ভাষায় সতেজে উত্তর দিলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ; তাঁহার দয়ায় আমি মুসলমানী।" তাহার পর একজন হিন্দুকেও সেই প্রশ্ন করাতে সে সাদাসিধা "আমি হিন্দু" এইমাত্র বলিয়াছিল।

সমগ্র জগৎকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে হইবে

কঠোপনিষদের সেই মহাবাক্যটি মনে পড়িতেছে—'শ্রদ্ধা' বা অদ্ভুত বিশ্বাস। নচিকেতার জীবনে শ্রদ্ধার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে। এই 'শ্রদ্ধা' বা যথার্থ বিশ্বাস-তত্ত্ব প্রচার করাই আমার জীবনব্রত। আমি তোমাদিগকে আবার

বলিতেছি যে, এই বিশ্বাস সমস্ত মানবজাতির জীবনের এবং সকল ধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ। প্রথমতঃ, নিজের প্রতি বিশ্বাসসম্পন্ন হও। জানিও যে, একজন ক্ষুদ্র বুদ্বুদ মাত্র বিবেচিত হইতে পারে এবং অপরে পর্ব্বততুল্য বৃহৎ হইতে পারে, কিন্তু সেই বুদ্বুদ ও পর্ব্বত উভয়েরই পশ্চাতে অনন্ত সমুদ্র রহিয়াছে। অতএব সকলেরই আশা আছে, সকলেরই জন্য মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত, সকলেই শীঘ্র বা বিলম্বে মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। ইহাই আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য। অনন্ত আশা হইতে অনন্ত আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টার উৎপত্তি হয়। যদি সেই বিশ্বাস আমাদের ভিতরে আবির্ভূত হয়, তবে উহা আমাদের জাতীয় জীবনে ব্যাস ও অর্জ্জুনের সময়—যে সময়, আমাদের সমগ্র মানবজাতির পক্ষে কল্যাণকর মতবাদ-সমূহ প্রচারিত হইয়াছিল—আনয়ন করিবে। আজ আমরা আধ্যাত্মিক অন্তর্দ্দৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক চিন্তায় অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছি, কিন্তু এখনও ভারতে যথেষ্ট আধ্যাত্মিকতা বর্ত্তমান, এত অধিক বর্ত্তমান যে ভারতের আধ্যাত্মিক মহত্ত্বই উহাকে জগতের বর্ত্তমান জাতিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি করিয়াছে। আর যদি পরম্পরাগত জাতিধর্ম্ম ও লোকের আশার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায়, তবে সেইদিন আমাদের আবার ফিরিয়া আসিবে, আর উহা তোমাদের উপরে নির্ভর করিতেছে। হে বঙ্গীয় যুবকগণ, তোমরা ধনী ও বড় লোকের মুখ চাহিয়া থাকিও না; দরিদ্রেরাই জগতে চিরকাল মহৎ ও বিরাট ব্যাপারসমূহ সাধন করিয়াছে। হে দরিদ্র বঙ্গবাসিগণ, উঠ, তোমরা সব করিতে পার, আর তোমাদিগকে সব

নচিকেতার ন্যায় শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও

করিতেই হইবে। যদিও তোমরা দরিদ্র, তথাপি অনেকে তোমাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবে। দৃঢ়চিত্ত হও ; সর্ব্বোপরি, পবিত্র ও সম্পূর্ণ অকপট হও ; বিশ্বাস কর যে, তোমাদের ভবিষ্যৎ অতি গৌরবময়। হে বঙ্গীয় যুবকগণ, তোমাদের দ্বারাই ভারতের উদ্ধার সাধিত হইবে। তোমরা ইহা বিশ্বাস কর বা না কর, উহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিও। মনে করিও না, আজ বা কালই উহা হইয়া যাইবে। আমি যেমন আমার দেহ ও আমার আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী, তদ্রূপ দৃঢ়ভাবে ইহাও বিশ্বাস করিয়া থাকি। সেই হেতু, হে বঙ্গীয় যুবকগণ, তোমাদের প্রতি আমার হৃদয় আকৃষ্ট। তোমাদের উপরই ইহা নির্ভর করিতেছে—যাহাদের টাকা কড়ি নাই ; যেহেতু তোমরা দরিদ্র, সেই হেতুই তোমরা কার্য্য করিবে। যেহেতু তোমাদের কিছুই নাই, সেহেতু তোমরা অকপট হইবে। আর অকপট বলিয়াই তোমরা সর্ব্বত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইবে। ইহাই আমি তোমাদিগকে এইমাত্র বলিতেছিলাম। আবার তোমাদিগের নিকট ইহার উল্লেখ করিতেছি—ইহাই তোমাদের জীবনব্রত, ইহাই আমার জীবনব্রত। তোমরা যে দার্শনিক মতই অবলম্বন কর না কেন, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। কেবল আমি এখানে ইহাই প্রমাণ করিতে চাই যে, সমগ্র ভারতের মধ্যে সমগ্র মানবজাতির পূর্ণতায় অনন্ত বিশ্বাসরূপ প্রেমসূত্র ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান আর আমিও স্বয়ং ইহা বিশ্বাস করিয়া থাকি—ঐ বিশ্বাস সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হউক।

ইহার পর স্বামিজীর স্বাস্থ্য তত ভাল না থাকায় এবং অন্যান্য কারণে চারিদিকে ঘুরিয়া বক্তৃতাদি প্রদানে সমর্থ হন নাই। মঠাদি প্রতিষ্ঠা, শিষ্যগণকে শিক্ষাদান প্রভৃতি কার্য্যেই অধিক সময় যাপন

করিয়াছিলেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুন তারিখে তিনি দ্বিতীয়বার আমেরিকা যাত্রা করেন। তাহার পূর্ব্ব দিন ১৯শে জুন সন্ধ্যাকালে বেলুড় মঠে তাঁহার গুরুভাই ও শিষ্যগণকে লইয়া একটি সভা হয়। এই সভায় স্বামিজী ইংরাজীতে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিয়াছিলেন। মঠের ডায়েরীতে তাহার সারাংশ সঙ্কলিত হইয়া রক্ষিত হইয়াছিল। তাহা হইতে বঙ্গানুবাদ করিয়া দেওয়া হইল।

সন্ন্যাসীর আদর্শ ও তৎপ্রাপ্তির সাধন

ভ্রাতৃগণ ও সন্তানগণ,

এখন দীর্ঘ বক্তৃতা করিবার অথবা বক্তৃতাশক্তি প্রকাশ করিবার সময় নহে। আমি তোমাদিগকে কয়েকটি বিষয় বলিতে ইচ্ছা করি। আশা—তোমরা এইগুলি কার্য্যে পরিণত করিবে, প্রথমতঃ আমাদের আদর্শ কি, তাহা বুঝিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ উহা কার্য্যে পরিণত করিবার উপায়গুলি কি, তাহাও বুঝিতে হইবে। তোমাদের মধ্যে যাহারা সন্ন্যাসী, তাহাদিগকে পরের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করিতেই হইবে—কারণ, সন্ন্যাসী বলিতে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। ত্যাগ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিবার এখন সময় নাই—আমি সংক্ষেপে উহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে চাই—মৃত্যুকে ভালবাসা। সাংসারিক ব্যক্তিগণ বাঁচিতে ভালবাসে, সন্ন্যাসীকে মৃত্যু ভালবাসিতে হইবে। তবে কি আমাদিগকে আত্মহত্যা করিতে হইবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। কারণ, আত্মহত্যাকারিগণ প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুকে ভালবাসে না। দেখা-ও যায়—আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করিয়া যদি কেহ তাহাতে অকৃতকার্য্য হয়, সে পুনরায় ঐ চেষ্টা প্রায় করে না।

তবে মৃত্যুকে ভালবাসার অর্থ কি ? তাৎপর্য্য এই—আমাদিগকে মরিতেই হইবে—ইহা অপেক্ষা ধ্রুব সত্য কিছুই নাই। তবে আমরা কোন মহৎ সৎ উদ্দেশ্যের জন্য দেহপাত করি না কেন ? আমাদের সকল কার্য্য—আহার, বিহার, অধ্যয়ন প্রভৃতি যাহা কিছু আমরা করি—সবগুলিই যেন আমাদিগকে আত্মত্যাগের অভিমুখ করিয়া দেয়। তোমরা আহারের দ্বারা শরীর পুষ্টি করিতেছ—কিন্তু শরীর পুষ্টি করিয়া কি হইবে, যদি উহাকে আমরা অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিতে না পারি ? তোমরা অধ্যয়নাদি দ্বারা মনের পুষ্টি বা বিকাশ সাধন করিতেছ—ইহাতেই বা কি হইবে, যদি ইহাকেও অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিতে না পার ? কারণ, সমগ্র জগৎ এক অখণ্ড-সত্তাস্বরূপ—তুমি ত ইহার নগণ্য ক্ষুদ্র অংশ মাত্র—সুতরাং এই ক্ষুদ্র আমিত্বটাকে না বাড়াইয়া তোমার কোটী কোটী ভাইয়ের সেবা করাই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক কার্য্য—না করাই অস্বাভাবিক। উপনিষদের সেই মহতী বাণী কি স্মরণ নাই ?—

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ শ্বেতাঃ উঃ ৩।১৬

এইরূপে তোমাদিগকে আস্তে আস্তে মরিতে হইবে। মৃত্যুতেই স্বর্গ—মৃত্যুতেই সকল কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত আর ইহার বিপরীত বস্তুতে সমুদয় অকল্যাণ ও আসুরিক ভাব নিহিত।

তারপর এই আদর্শটিকে কার্য্যে পরিণত করিবার উপায়গুলি কি, তাহা বুঝিতে হইবে। প্রথমতঃ, এইটি বুঝিতে হইবে যে অসম্ভব আদর্শ রাখিলে চলিবে না। অতি মাত্রায় উচ্চ আদর্শে

জাতিকে দুর্ব্বল ও হীন করিয়া ফেলে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম সংস্কারের পর এইটি ঘটিয়াছে। অপর দিকে আবার অতি মাত্রায় 'কাজের লোক' হওয়াও ভুল। যদি এতটুকুও কল্পনাশক্তি তোমার না থাকে, যদি তোমাকে নিয়মিত করিবার একটা আদর্শ না থাকে, তবে তুমি ত একটা পশু মাত্র। অতএব আমাদিগকে আদর্শও খাট করিলে চলিবে না, আবার যেন আমরা কর্ম্মকেও অবহেলা না করি। এই দুইটি 'অত্যন্ত'কে ছাড়িতে হইবে। আমাদের দেশের প্রাচীন ভাব এই—কোন গুহায় বসিয়া ধ্যান করিতে করিতে মরিয়া যাওয়া। কিন্তু এখন এই বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে যে, আমি অমুকের চেয়ে শীঘ্র শীঘ্র মুক্তিলাভ করিব—এ ভাবটিও ভুল। মানুষ শীঘ্র বা বিলম্বে বুঝিতে পারে যে, যদি সে তাহার নিজ ভাইয়ের মুক্তির চেষ্টা না করে, তবে সে কখনই মুক্ত হইতে পারে না। তোমাদের জীবনে যাহাতে প্রবল ভাবপরায়ণতার সহিত প্রবল কার্য্যকারিতা সংযুক্ত থাকে, তাহা করিতে হইবে। তোমাদিগকে গভীর ধ্যান-ধারণার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, আবার পরমুহূর্ত্তেই যাইয়া এই মঠের জমিতে চাষ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তোমাদিগকে শাস্ত্রীয় কঠিন সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে, আবার পর মুহূর্ত্তেই এই জমিতে যে ফসল হইবে, তাহা বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। তোমাদিগকে খুব সামান্য কাজ—যেমন পাইখানা সাফ—পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে—শুধু এখানে নহে, অন্যত্রও।

তারপর তোমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে—এই মঠের উদ্দেশ্য—মানুষ প্রস্তুত করা। অমুক ঋষি এই কথা বলিতেছেন—

শুধু এইটি শিখিলেই চলিবে না। সেই ঋষিগণ এখন আর নাই—তাঁহাদের সহিত তাঁহাদের মতামতও চলিয়া গিয়াছে। তোমাদিগকে ঋষি হইতে হইবে। তোমরাও ত মানুষ—মহাপুরুষ, এমন কি, অবতার পর্য্যন্ত যেমন মানুষ, তোমরাও ত সেই মানুষ। তোমাদিগকে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে হইবে। কেবল শাস্ত্র পাঠে কি হয়? এমন কি ধ্যান ধারণাতেই বা কতদূর হইবে? মন্ত্রতন্ত্রেই বা কি করিতে পারে? তোমাদিগকে এই নূতন প্রণালী—মানুষ প্রস্তুতকরণরূপ নূতন প্রণালী—অবলম্বন করিতে হইবে। মানুষ তাহাকেই বলা যায়, যে এত বলবান যে, তাহাকে বলের অবতার বলা যাইতে পারে, আবার যাহার হৃদয়ে রমণীসুলভ কোমলতা আছে—তাহাদের দুর্ব্বলতা নহে। তোমাদের চারিদিকে যে কোটী কোটী প্রাণী রহিয়াছে, তাহাদের জন্য যেন তোমাদের হৃদয় কাঁদে অথচ তোমাদিগকে দৃঢ়চিত্ত হইতে হইবে। কিন্তু আবার এইটি বুঝিতে হইবে যে, স্বাধীনচিন্তা যেমন আবশ্যক, তদ্রূপ আজ্ঞাবহতাও অবশ্যই চাই। আপাততঃ এই দুইটি পরস্পর বিরোধী বোধ হইতে পারে, কিন্তু তোমাদিগকে এহ দুইটি আপাতবিরুদ্ধ ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে হইবে। যদি অধ্যক্ষগণ নদীতে ঝাঁপ দিয়া কুমীর ধরিতে বলেন, তবে প্রথমে তোমাদিগকে তাঁহাদের কথামত কাজ করিতে হইবে, তাহার পর তাঁহাদিগকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পার। যদি সেই আদেশ অন্যায়ও হয় তথাপি প্রথমে তাঁহাদের কথানুসারে কার্য্য কর, তাহার পর প্রতিবাদ করিও। আমাদের সম্প্রদায়সমূহের—বিশেষতঃ, বঙ্গীয় সম্প্রদায়সকলের এই এক বিশেষ দোষ যে, যদি তাহাদের মধ্যে কাহারও একটু ভিন্ন মত হয়, সে অমনি একটি নূতন

সম্প্রদায় করিয়া বসে—তাহার আর অপেক্ষা করিবার সহিষ্ণুতা থাকে না। অতএব তোমাদিগকে তোমাদের সম্প্রদায়ের উপর গভীর শ্রদ্ধা রাখিতে হইবে। এখানে অবাধ্যগণের স্থান নাই। যদি কেহ অবাধ্য হয়, তাহাকে মমতারহিত হইয়া দূর করিয়া দাও—বিশ্বাসঘাতক যেন কেহ না থাকে! বায়ুর ন্যায় মুক্ত ও অবাধগতি হও, অথচ লতা ও কুকুরের ন্যায় নম্র ও আজ্ঞাবহ হও।

স্বামিজী আমেরিকায় প্রায় দেড় বৎসর থাকিয়া পুনরায় ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, কিন্তু এবার আর প্রথম বারের ন্যায় প্রকাশ্যভাবে নহে, অতি গোপনে। এবার গুরুতর পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। একটু শরীর সুস্থবোধ করিলে ঢাকায় এবং আসামের গৌহাটি ও শিলঙে কয়েকটি বক্তৃতা করেন। উহাদের রীতিমত রিপোর্ট পাওয়া যায় না। কেবল ঢাকা হইতে স্বামিজীর জনৈক শিষ্য 'উদ্বোধনে' যে রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেইটি এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করা গেল।

ঢাকা

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার কয়েকজন সন্ন্যাসী শিষ্য সমভিব্যাহারে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ্চ, ঢাকা যাত্রা করিয়া তৎপরদিন তথায় পৌছিয়াছিলেন। নারায়ণগঞ্জে গোয়ালন্দের ষ্টীমার পৌছিবামাত্র ঢাকানিবাসী কয়েকজন ভদ্রলোক আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। ঢাকায় অপরাহ্লে ট্রেণ পৌছিবামাত্র স্থানীয় বিখ্যাত উকীল শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও গগনচন্দ্র ঘোষ মহাশয়দ্বয় সমগ্র ঢাকানিবাসীর নামে স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করিয়া ভূতপূর্ব্ব জমিদার ৺মোহিনীমোহন দাস মহাশয়ের বাটীতে লইয়া গেলেন। ষ্টেশনে অনেক ভদ্রলোক ও ছাত্রাদি আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে আনন্দে 'জয় রামকৃষ্ণদেব কী জয়' ধ্বনিতে গগন পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন। ছাত্রগণ স্বামিজীর গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইয়া যাইতে লাগিলেন। মোহিনীবাবুর বাটিতে অনেক ভদ্রলোক সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারা স্বামিজীর সন্দর্শনে আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতে লাগিলেন।

স্বামিজীর নিকট সদা সর্ব্বদাই ভদ্রলোকগণ তাঁহার উপদেশামৃত পান করিতে আসিতে লাগিলেন। অপরাহ্লে তিন দিন প্রায় দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস, ত্যাগ, বিবেক, বৈরাগ্য, কর্ম্ম প্রভৃতি নানাবিধ আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনা হয়। প্রত্যহ প্রায় শতাবধি লোকের সমাগম হইত। সকলেই তাঁহার বিশ্বাসভক্তি ও

তেজঃপূর্ণ উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া বিশেষ তৃপ্ত হইয়াছিলেন। বুধাষ্টমী উপলক্ষে ব্রহ্মপুত্র স্নানের মানসে স্বামিজী সশিষ্য নৌকাযোগে লাঙ্গলবন্দ নামক স্থানে যাত্রা করেন। নারায়ণগঞ্জের নিকট শীতলক্ষা নদীর দৃশ্য বড় মনোহর। তথা হইতে ধলেশ্বরীতে পড়িয়া পরে ব্রহ্মপুত্রে প্রবেশ করিতে হয়। এই স্থানে ব্রহ্মপুত্র খুব সরু। শুনা যায় নাকি ভগবান পরশুরাম এই তীর্থে স্নান করিয়া মাতৃহত্যাপাপ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। তাই দলে দলে এখানে আবালবৃদ্ধবনিতা পাপক্ষয়ের জন্য আগমন করিয়া থাকে। এই মেলায় খুব জনতা হইয়াছিল। যাত্রিগণের নৌকা হইতে অবিরাম আনন্দসূচক হুলুধ্বনি উত্থিত হইতেছে—কোথাও বা হরিনামের মধুর ধ্বনি কর্ণকুহর পবিত্র করিতেছে। স্নানান্তে স্বামিজী ব্রহ্মপুত্র হইতে ধলেশ্বরী—তথা হইতে বুড়ীগঙ্গা হইয়া ঢাকা শহরে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। ঢাকাবাসীগণের অত্যন্ত অনুরোধে স্বামিজী এখানকার জগন্নাথকলেজগৃহে প্রায় দুই সহস্র শ্রোতার সমক্ষে 'আমি কি শিখিয়াছি?' এই সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় প্রায় একঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন। এখানকার বিখ্যাত উকীল রমাকান্ত নন্দী মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই :—

আমি কি শিখিয়াছি?

আমি নানা দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছি—কিন্তু আমি কখন নিজের জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশের সবিশেষ দর্শন করি নাই। জানিতাম না, এদেশের জলে স্থলে সর্ব্বত্র এত সৌন্দর্য্য ; কিন্তু

নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া আমার লাভ হইয়াছে, যে আমি ইহার সৌন্দর্য্য বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। এইরূপই আমি প্রথমে ধর্ম্মের জন্য নানা সম্প্রদায়ে—বৈদেশিকভাববহুল বহুবিধ সম্প্রদায়ে—ভ্রমণ করিতেছিলাম, অপরের দ্বারে ভিক্ষা করিতেছিলাম—জানিতাম না যে, আমার দেশের ধর্ম্মে, আমার জাতীয় ধর্ম্মে এত সৌন্দর্য্য আছে। আজকাল এক দল আছেন, তাঁহারা ধর্ম্মের ভিতর বৈদেশিক ভাব চালাইবার বিশেষ পক্ষপাতী—ইঁহারা 'পৌত্তলিকতা' বলিয়া একটি কথা রচনা করিয়াছেন। ইঁহারা বলেন, হিন্দুধর্ম্ম সত্য নয়, কারণ, উহা পৌত্তলিক। পৌত্তলিকতা কি, উহা ভাল কি মন্দ, তাহা কেহ অনুসন্ধান করেন না, কেবল ঐ শব্দেরই প্রভাবে তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মকে ভুল বলিতে সাহস করেন। আর এক দল আছেন, তাঁহারা হাঁচি টিকটিকির পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বাহির করেন। তাঁহারা কোন্ দিন ভগবানকেই তাড়িতের পরিণামবিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিবেন! যাহা হউক, মা ইহাদিগকেও আশীর্ব্বাদ করুন। তিনিই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির দ্বারা আপন কার্য্য সাধন করিয়া লইতেছেন। ইঁহাদের অতিরিক্ত দল—প্রাচীন সম্প্রদায়—যাঁহারা বলেন, আমি তোমার অত শত বুঝি না—বুঝিতে চাহিও না, আমি চাই ঈশ্বরকে, আমি চাই আত্মাকে—চাই জগৎকে ছাড়িয়া, সুখ দুঃখকে ছাড়িয়া উহার অতীত প্রদেশে যাইতে—যাঁহারা বলেন, বিশ্বাসসহকারে গঙ্গাস্নানে মুক্তি হয়—যাঁহারা বলেন, শিব রাম প্রভৃতি যাঁহার প্রতিই হউক না কেন, ঈশ্বরবুদ্ধি করিয়া উপাসনা করিলে মুক্তি হইয়া থাকে, আমি সেই প্রাচীন সম্প্রদায়ভুক্ত।

আমি প্রাচীন সম্প্রদায়ভুক্ত

আজকালকার এক সম্প্রদায় বলেন, ঈশ্বর ও সংসার, এক সঙ্গে কর। ইঁহাদের মনমুখ এক নহে। প্রকৃত মহাত্মাগণের উপদেশ এই,—

'জঁহা কাম তঁহা রাম নহিঁ, জঁহা রাম তঁহা নহিঁ কাম।
কবহুঁ ন মিলত বিলোকিয়ে রবি রজনী ইক্ ঠাম্॥'

যেখানে ভগবান্ সেখানে কখন সংসার থাকিতে পারে না। অন্ধকার ও আলোক কি কখন এক সঙ্গে থাকিতে পারে? এই জন্য ইঁহারা বলেন, যদি ভগবান্ পাইতে চাও, কামকাঞ্চন ত্যাগ করিতে হইবে। এই সংসারটা ত ভুয়া, শূন্য, কিছুই নয়। ইহাকে না ছাড়িলে কিছুতেই তাঁহাকে পাইবে না। যদি তাহা না পার, তবে স্বীকার কর যে, আমি দুর্ব্বল, কিন্তু তা বলিয়া আদর্শকে নিম্ন করিও না। মড়াকে সোণার পাত মুড়িয়া ঢাকিও না। এই জন্য ইঁহাদের মতে এই ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে, ঈশ্বরলাভ করিতে হইলে, ভাবের ঘরে চুরি প্রথমে ছাড়িতে হইবে।

আমি কি শিখিয়াছি? এই প্রাচীন সম্প্রদায়ের নিকট আমি কি শিখিয়াছি? শিখিয়াছি—

"দুর্লভং ত্রয়মেবৈতৎ দেবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ॥" বিবেক চূড়ামণি ৩

প্রথমে—চাই—মনুষ্যত্ব—মানুষ জন্ম—ইহাতেই মুক্তিলাভের বিশেষ সুবিধা। তারপর চাই মুমুক্ষুতা—আমাদের সম্প্রদায় ও ব্যক্তিভেদে সাধনপ্রণালী ভিন্ন ভিন্ন—অধিকার বিভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন—কিন্তু মোটামুটি এই বলা যাইতে পারে যে, মুমুক্ষুতা ব্যতীত

ঈশ্বরের উপলব্ধি অসম্ভব। মুমুক্ষুতা কি? মোক্ষের জন্য—এই সুখ দুঃখ হইতে বাহির হইবার জন্য—প্রবল আগ্রহ, এই সংসারে প্রবল ঘৃণা। যখন ভগবানের জন্য এই তীব্র ব্যাকুলতা হইবে, তখনই জানিবে, তুমি ঈশ্বরলাভের অধিকারী হইয়াছ। তারপর চাই মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ—গুরুলাভ। গুরুপরম্পরাক্রমে যে শক্তি আসিয়াছে তাহারই সহিত আপনার সংযোগ সংস্থাপন। তদ্ব্যতীত মুমুক্ষুতা থাকিলেও কিছু হইবে না অর্থাৎ তোমার গুরুকরণ আবশ্যক। কাহাকে গুরু করিব?—

আমাদের চরম আদর্শ মুক্তিলাভের জন্য প্রয়োজন—ব্যাকুলতা গুরুকরণ ও সাধন

"শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতো যো ব্রহ্মবিত্তমঃ।" বিবেকচূড়ামণি ৩৩

যিনি শাস্ত্রের সূক্ষ্ম রহস্য জানেন—

"পোথি পঢ়ি তোতা ভয়ো পণ্ডিত ভয়ো ন কোয়।
ঢাই অক্ষর প্রেমসে পঢ়ে সো পণ্ডিত হোয়॥"

শুধু পণ্ডিত হইলে চলিবে না। আজকাল যে সে গুরু হইতে চাহে। ভিক্ষুকও লক্ষ মুদ্রা দান করিতে চায়। "অবৃজিনঃ"—যিনি নিষ্পাপ—"অকামহত"—যাঁহার কেবল জীবের হিত ব্যতীত আর কোন অভিসন্ধি নাই—যিনি অহেতুক-দয়াসিন্ধু, যিনি কোন লাভের উদ্দেশ্যে অথবা নাম বা যশের জন্য উপদেশ না দেন—আর যিনি ব্রহ্মকে বিশেষ করিয়া জানেন—যিনি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—যিনি তাঁহাকে করতলামলকবৎ করিয়াছেন। তিনিই গুরু—তাঁহারই সহিত আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপিত হইলে তবে ঈশ্বরলাভ—ঈশ্বরপ্রত্যক্ষ সুগম হইবে। তারপর চাই অভ্যাস। ব্যাকুলই হও, আর গুরুই লাভ কর, অভ্যাস না করিলে, সাধন

না করিলে, কখন উপলব্ধি হইতে পারে না। এই কয়টি যখন দৃঢ় হইবে, তখনই প্রত্যক্ষ হইবে। তাই বলি, হে হিন্দুগণ—হে আর্য্যসন্তানগণ—তোমরা এই আদর্শ কখন বিস্মৃত হইও না যে, হিন্দুর লক্ষ্য এই সংসারের বাহিরে যাওয়া—শুধু এই জগৎকে ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা নয়, স্বর্গকেও ত্যাগ করিতে হইবে—মন্দকে ত্যাগ করিতে হইবে, শুধু তাহা নয়, ভালকেও ত্যাগ করিতে হইবে—এই সকলের অতীত প্রদেশে যাইতে হইবে।"

৩১শে মার্চ্চ স্বামিজী পোগোজ স্কুলের বিস্তৃত খোলা ময়দানে প্রায় তিন সহস্র শ্রোতার সমক্ষে "আমাদের জন্মপ্রাপ্ত ধর্ম্ম" (The Religion We are Born In) সম্বন্ধে দুই ঘণ্টা-কালব্যাপী এক বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাও ইংরাজী ভাষায়ই হইয়াছিল। শ্রোতৃগণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নিস্তব্ধ ছিলেন। ইহারও সার মর্ম্ম নিম্নে সঙ্কলিত হইল।

আমাদের জন্মপ্রাপ্ত ধর্ম্ম

প্রাচীনকালে আমাদের দেশে আধ্যাত্মিক ভাবের অতিশয় উন্নতি হইয়াছিল। আমাদিগকে আজ সেই প্রাচীন কাহিনী স্মরণ করিতে হইবে। প্রাচীনকালের গৌরবের চিন্তায় বিপদাশঙ্কা এই যে, আমরা আর নূতন কিছু করিতে চাহি না—কেবল সেই প্রাচীন গৌরব স্মরণে ও কীর্ত্তনে কালাতিপাত করি। প্রাচীনকালে অনেক ঋষি মহর্ষি ছিলেন—তাঁহারা সত্যের সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন।

প্রাচীন ও বর্ত্তমান

কিন্তু প্রাচীনকাল স্মরণে প্রকৃত উপকার লাভ করিতে হইলে আমাদিগকেও তাঁহাদের ন্যায় ঋষি হইতে হইবে; শুধু তাহাই নহে—আমার বিশ্বাস, আমরা আরও শ্রেষ্ঠ ঋষি হইব। অতীতকালে আমাদের খুব উন্নতি হইয়াছিল—আমি তাহা স্মরণ করিয়া গৌরব বোধ করিয়া থাকি। বর্ত্তমানকালের অবনত অবস্থা দেখিয়াও আমি দুঃখিত নহি; আর ভবিষ্যতে যাহা হইবে, তাহা ভাবিয়াও আমি আশান্বিত। কারণ, আমি জানি, বীজের বীজত্বভাব নষ্ট হইয়া তবে বৃক্ষ হয়। সেইরূপ বর্ত্তমান অবস্থার অবনত ভাবের ভিতর ভবিষ্যৎ মহত্ত্বভাব নিহিত রহিয়াছে!

আমাদের জন্মপ্রাপ্ত ধর্ম্মের ভিতরে সাধারণ ভাব কি কি? আপাততঃ দেখিতে পাই, নানা বিরোধ। মতসম্বন্ধে কেহ অদ্বৈতবাদী, কেহ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, কেহ বা দ্বৈতবাদী। কেহ অবতার মানেন, মূর্ত্তিপূজা মানেন, কেহ বা নিরাকারবাদী। আবার আচার সম্বন্ধে ত নানা বিভিন্নতা দেখিতে পাই। জাঠেরা, মুসলমান বা খ্রীষ্টান পর্য্যন্ত বিবাহ করিলেও জাতিচ্যুত হয় না। তাহারা অবাধে সকল দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে। পাঞ্জাবে অনেক গ্রামে, যে হিন্দু শূকর ভক্ষণ না করে, সে মুসলমান বলিয়া বিবেচিত হয়। নেপালে ব্রাহ্মণ চারিবর্ণেই বিবাহ করিতে পারেন, আবার বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মণের অবান্তর বিভাগের ভিতরেও বিবাহ হইবার জো নাই। এইরূপ নানা বিভিন্নতা দেখিতে পাই। কিন্তু সকল হিন্দুর মধ্যে এই একটি বিষয়ের একত্ব দেখিতে পাই যে, কোন হিন্দু গোমাংস ভক্ষণ করে না।

হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে আপাতবিরোধ-সমূহ

এইরূপ আমাদের ধর্ম্মের ভিতরেও এক মহান্ সামঞ্জস্য আছে। প্রথমতঃ—শাস্ত্রের কথা লইয়া একটু আলোচনা করা যাক্। যে সকল ধর্ম্ম এতদূর উন্নত হইয়াছিল যে, তাহাদের ভিতর একখানি বা বহু শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই সকল ধর্ম্ম নানাবিধ অত্যাচার সত্ত্বেও এতদিন টিকিয়া রহিয়াছে। গ্রীক ধর্ম্মের নানাবিধ সৌন্দর্য্য থাকিলেও শাস্ত্র অভাবে উহা লোপ পাইয়া গেল, কিন্তু য়াহুদীধর্ম্ম ওল্ডটেষ্টামেণ্টের বলে এখনও অক্ষুণ্ণপ্রতাপ। হিন্দুধর্ম্মও তদ্রূপ। উহার শাস্ত্র "বেদ" জগতের সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ। উহার দুইটি ভাগ—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। ভারতের সৌভাগ্যেই হউক, দুর্ভাগ্যেই হউক, কর্ম্মকাণ্ড এখন লোপ পাইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে কতকগুলি ব্রাহ্মণ মধ্যে মধ্যে ছাগবধ করিয়া যজ্ঞ করিয়া থাকেন, আর বিবাহ-শ্রাদ্ধাদির মন্ত্রে মধ্যে মধ্যে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। এখন আর উহা পূর্ব্বের ন্যায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার উপায় নাই। কুমারিলভট্ট একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে অকৃতকার্য্য হন। তারপর বেদের জ্ঞানকাণ্ড যাহার নাম উপনিষৎ—বেদান্ত। উহাকেই শ্রুতিশির বলিয়া থাকে। আর্য্যগণ যেখানে শ্রুতি উদ্ধৃত করিতেছেন, সেইখানেই দেখা যায় যে, তাঁহারা এই উপনিষদ্ উদ্ধৃত করিতেছেন। এই বেদান্তের ধর্ম্মই এক্ষণে ভারতের ধর্ম্ম। কোন সম্প্রদায় যদি নিজ মতের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ইচ্ছা করে, তবে উহাকে বেদান্তের দোহাই দিতে হয়। কি দ্বৈতবাদী, কি অদ্বৈতবাদী, সকলকেই উহার দোহাই দিতে হয়। বৈষ্ণবগণ আপন মত প্রমাণ করিতে

আমাদের শাস্ত্র বেদ

গোপালতাপিনী উপনিষদ্ উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। নিজের মনোমত রচনাবলী না পাইলে কেহ কেহ উপনিষদ্ রচনা পর্য্যন্ত করিয়া লন। এক্ষণে বেদসম্বন্ধে হিন্দুগণের মত এই যে, উহা কোন পুস্তক বিশেষ বা কাহারও রচনা নহে। উহা ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানরাশি—কখন ব্যক্ত হয়, কখন বা অব্যক্ত থাকে। সায়ণাচার্য্য একস্থলে বলিয়াছেন, "যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ নির্ম্মমে"—যিনি বেদজ্ঞানের প্রভাবে সমুদয় জগৎ সৃষ্টি করেন। বেদের রচয়িতা কেহ কখন দেখেন নাই। সুতরাং উহা কল্পনা করাও অসম্ভব। ঋষিগণ কেবল ঐ সকল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ঋষি অর্থাৎ দ্রষ্টা, মন্ত্রদ্রষ্টা তাঁহারা অনাদিকাল হইতে স্থিত বেদ সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন মাত্র।

এই ঋষিগণ কে? বাৎস্যায়ন বলেন, যিনি যথাবিহিত সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা—তিনি ম্লেচ্ছ হইলেও ঋষি হইতে পারেন। তাই প্রাচীনকালে বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ, ধীবরতনয় ব্যাস, দাসীপুত্র নারদ প্রভৃতি সকলেই ঋষিপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রকৃত উপায়ে এই ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে আর কোন ভেদ থাকে না। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ যদি ঋষি হইয়া থাকেন—তবে হে আধুনিক কালের কুলীন ব্রাহ্মণগণ—তোমরা আরও কত উচ্চ ঋষি হইতে পার।

ঋষি—বেদই মূল প্রমাণ, উহাতে সকলেরই অধিকার

সেই ঋষিত্বলাভের চেষ্টা কর—জগৎ তোমাদের নিকট আপনা আপনিই নত হইবে। এই বেদই আমাদের একমাত্র প্রমাণ—আর ইহাতে সকলেরই অধিকার! "যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ। ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায়॥"—(শুক্লযজুর্ব্বেদ, মাধ্যন্দিন শাখা, ২৬ অধ্যায়, ২ মন্ত্র)।

এই বেদ হইতে এমন কোন প্রমাণ দেখাইতে পার যে, ইহাতে সকলের অধিকার নাই? পুরাণ বলিতেছে, বেদের অমুক শাখায় অমুক জাতির অধিকার, অমুক অংশ সত্যযুগের, অমুক অংশ কলিযুগের জন্য। কিন্তু বেদ ত এ কথা বলিতেছে না। ভৃত্য কি কখন প্রভুকে আজ্ঞা করিতে পারে? স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র এ সকলগুলিই ততটুকু গ্রাহ্য, যতটুকু বেদের সহিত মিলে। না মিলিলে—অগ্রাহ্য। কিন্তু এখন আমরা পুরাণকে বেদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছি। বেদের চর্চ্চা ত বাঙ্গলাদেশ হইতে লোপই পাইয়াছে। আমি সেই দিন শীঘ্র দেখিতে চাই, যে দিন প্রত্যেক বাটীতে শালগ্রাম শিলার সহিত বেদও পূজিত হইবে, আবালবৃদ্ধ-বনিতা বেদের পূজা করিবে।

বেদ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে আমার কোন আস্থা নাই। তাঁহারা বেদের কাল আজ এই নির্ণয় করিতেছেন, কাল আবার উহা বদলাইয়া সহস্রবর্ষ পিছাইয়া দিতেছেন। যাহা হউক, পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি, পুরাণের যতটুকু বেদের সহিত মিলে, উহার ততটুকু গ্রাহ্য। পুরাণে অনেক কথা দেখিতে পাই, যাহা বেদের সহিত মিলে না। যথা পুরাণে লিখিত আছে, কেহ দশ সহস্র, কেহ বা বিশ সহস্র বর্ষ জীবিত রহিয়াছেন, কিন্তু বেদে দেখিতে পাই—শতায়ুর্ব্বৈ পুরুষঃ—এখানে বেদের কথাই গ্রাহ্য। তাহা হইলেও পুরাণে যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্মের অনেক সুন্দর সুন্দর কথা দেখিতে পাই, সেগুলি অবশ্য লইতে হইবে। তারপর তন্ত্র। তন্ত্র শব্দের প্রকৃত অর্থ শাস্ত্র, যেমন কাপিল তন্ত্র। কিন্তু এখানে তন্ত্র শব্দ আমি উহার

বেদের কাল—পুরাণ—তন্ত্র

বর্ত্তমান প্রচলিত সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করিতেছি। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী রাজগণের শাসনে বৈদিক যাগযজ্ঞ সব লোপ পাইলে কেহ আর রাজভয়ে হিংসা করিতে পারিল না। কিন্তু অবশেষে বৌদ্ধদের ভিতরে এই যাগযজ্ঞের ভাল ভাল অংশগুলি গোপনে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল—তাহা হইতেই তন্ত্রের উৎপত্তি। তন্ত্রে বামাচার প্রভৃতি কতকগুলি খারাপ জিনিষ থাকিলেও লোকে উহা যতদূর খারাপ ভাবে, তাহা নহে। বাস্তবিক বেদের ব্রাহ্মণভাগই একটু পরিবর্ত্তিত হইয়া তন্ত্রের মধ্যে বর্ত্তমান। আজকালকার সমুদয় উপাসনা পূজাপদ্ধতি কর্ম্মকাণ্ড তন্ত্রমতেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এক্ষণে ধর্ম্মমত সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাউক।

ধর্ম্মমতেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরোধ সত্ত্বেও কতকগুলি ঐক্য আছে। প্রথমতঃ—তিনটি বিষয়—তিনটি অস্তিত্ব—প্রায় সকলেই স্বীকার করেন—ঈশ্বর, আত্মা ও জগৎ। ঈশ্বর, অর্থাৎ যিনি জগৎকে অনন্তকাল সৃজন, পালন ও লয় করিতেছেন। সাংখ্যগণ ব্যতীত আর সকলেই ইহা স্বীকার করেন। আত্মা,—অসংখ্য, জীবাত্মাগণ বারবার শরীর পরিগ্রহ করিয়া জন্মমৃত্যুচক্রে ভ্রাম্যমাণ; ইহাকে সংসারবাদ বলে—চলিত কথায় পুনর্জ্জন্মবাদ।

হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ ভিত্তিসমূহ

আর, এই অনাদি অনন্ত জগৎ। এই তিনকে কেহ এক, কেহ কেহ বা পৃথক্ প্রভৃতি নানারূপ মানিলেও এই তিনটি সকলেই বিশ্বাস করেন। এখানে একটু বক্তব্য এই যে, আত্মাকে হিন্দুরা চিরকাল মন হইত পৃথক্ বলিয়া জানিতেন। পাশ্চাত্যেরা কিন্তু মনের উপর আর উঠিতে পারেন নাই, পাশ্চাত্যগণ জগৎকে আনন্দপূর্ণ, সম্ভোগ করিবার জিনিস

বলিয়া জানেন—আর প্রাচ্যগণের জন্ম হইতে ধারণা—সংসার দুঃখপূর্ণ—উহা কিছুই নয়। এইজন্য পাশ্চাত্যেরা সঙ্ঘবদ্ধ কর্ম্মে বিশেষ পটু, প্রাচ্যেরা তদ্রূপ অন্তর্জগতের অন্বেষণে অতিশয় সাহসী।

যাহা হউক—এক্ষণে হিন্দুধর্ম্মের আর দু একটি কথা লইয়া আলোচনা করা যাক। হিন্দুদের মধ্যে অবতারবাদ প্রচলিত। বেদে আমরা কেবল মৎস্য-অবতারের কথা দেখিতে পাই। যাহা হউক, এই অবতারবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য—মনুষ্যপূজা—মনুষ্যের ভিতর ঈশ্বরসাক্ষাৎই প্রকৃত ঈশ্বরসাক্ষাৎ। হিন্দুগণ প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির ঈশ্বরে যান না—মনুষ্য হইতে মনুষ্যের ঈশ্বরে গমন করিয়া থাকেন। তারপর মূর্ত্তিপূজা—শাস্ত্রোক্ত পঞ্চ উপাস্যদেবতা ব্যতীত সকল দেবতাই এক একটি পদের নাম—কিন্তু এই পঞ্চ উপাস্য দেবতা সেই এক ভগবানের নাম মাত্র। এই মূর্ত্তিপূজা আমাদের সকল শাস্ত্রেই অধমাধম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে—কিন্তু তা বলিয়া উহা অন্যায় কার্য্য নহে। এই মূর্ত্তিপূজার ভিতরে নানাবিধ কুৎসিতভাব প্রবেশ করিয়া থাকিলেও আমি উহা নিন্দা করি না। যদি সেই মূর্ত্তিপূজক ব্রাহ্মণের পদধূলি আমি না পাইতাম, তবে আমি কোথায় থাকিতাম! যে সকল সংস্কারক মূর্ত্তিপূজার নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আমি বলি, ভাই, তুমি যদি নিরাকার উপাসনার যোগ্য হইয়া থাক, তাহা কর, কিন্তু অপরকে গালি দাও কেন? সংস্কার কেবল পুরাতন বাটীর জীর্ণসংস্কার মাত্র। জীর্ণসংস্কার হইয়া গেলে আর উহার প্রয়োজন কি! কিন্তু

অবতারবাদ —মূর্ত্তিপূজা —সংস্কার ও সংস্কারকগণ

সংস্কারকদল এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠন করিতে চান। তাঁহারা মহৎ কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহাদের মস্তকে ভগবানের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক। কিন্তু তোমরা আপনাদিগকে পৃথক করিতে চাও কেন? হিন্দু নাম লইতে লজ্জিত হও কেন? আমাদের জাতীয় অর্ণবযানে আমরা সকলে আরোহণ করিয়াছি—হয়ত উহাতে একটু ছিদ্র হইয়াছে। এস সকলে মিলিয়া উহা বন্ধ করিতে চেষ্টা করি, না পারি—একসঙ্গে ডুবিয়া মরি। আর ব্রাহ্মণগণকেও বলি, তোমরা বৃথা অভিমান আর রাখিও না—শাস্ত্রমতে তোমাদের ব্রাহ্মণত্ব আর নাই—কারণ তোমরা এতকাল ম্লেচ্ছ রাজ্যে বাস করিতেছ। যদি তোমরা নিজেদের কথায় নিজেরা বিশ্বাস কর, তবে সেই প্রাচীন কুমারিলভট্ট যেমন বৌদ্ধগণকে সংহার করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমে বৌদ্ধের শিষ্য হইয়া শেষে তাহাদিগকে হত্যা করার প্রায়শ্চিত্ত জন্য তুষানলে প্রবেশ করেন, সেইরূপ তোমরা সকলে মিলিয়া তুষানলে প্রবেশ কর; তাহা না পার, আপনাদের দুর্ব্বলতা স্বীকার করিয়া সর্ব্বসাধারণকে তাহাদের প্রকৃত অধিকার দাও।